A certain baboo was travelling by carriage from Kalikata to his home some little distance from the Town. The carriage crept forward with mournful slowness. The horse was one of the offsprings of Pegasus described by Baboo Tekchand Thakore, no sting of whip could induce it to change from a walk to a trot. On the way, the baboo met a neighbour of his, a Brahmin pundit, who too was going home. "O, Venerable Crown-Jewel! pray come with me in my carriage", said the baboo. But the wise old men preferred to walk, turning the invitation down with: "Baboo, I have pressing tasks at home, I must get there quickly!"

FROM RAJNARAIN BOSE'S
Times Past & Present

ON WITH THE DRILLING!

This vignette from the pen of Rajnarain is of Calcutta at the beginning of the 19th century. But do we not faced with the choice of taking the public transport or using our own trusted legs often decide like the venerable Shiromani to walk rather than ride! "You have to be back home in time? You want to be certain to get there? Better walk!" It is ironic that in the Calcutta of the era of sputniks Boeings and the TV the pedestrian is often the fastest object on its clogged streets. The reason the town has grown the population has multiplied at a geometric rate but its streets remain the narrowest of lines. It is no use putting more of the fastest vehicles on our streets, these will only clog them further.

The only solution of course, is the tunnel rail. The preparations are complete. The citizens of Calcutta have shown their patience and discipline and good humour during repeated traffic diversion drills. Now—on with the drilling!

THE TUBE ETCHES A NEW MAP OF CALCUTTA
METROPOLITAN TRANSPORT PROJECT (RAILWAYS)

medium

অবিশ্বাস্য ফিরিস্তি

উল্টাডাঙ্গা (অরবিন্দ) সেতু, হাওড়া সুড়ঙ্গ পথ, চেতলা সেতু, কালীঘাট সেতু, ডায়মণ্ডহারবার রোড, জগদীশ বসু রোড, ব্রেবোর্ন রোড, গুরুসদয় রোড, আনওয়ার শা' রোড, সুবোধ মল্লিক রোড, তিনশ' গভীর নলকূপ, টালা পলতার শক্তি বৃদ্ধি, লেকটাউন/কাশীপুর-দমদমে পয়ঃপ্রণালী, পৌরসভায় রাস্তা, জল, খেলার মাঠ ইত্যাদি মল ও জল-নিকাশী ব্যবস্থা, হাসপাতালে দু'হাজার অতিরিক্ত শয্যা, প্রায় ছ'শ প্রাথমিক বিদ্যালয়...

শুধু কথার কথা নয়, এই কাজগুলো সি, এম, ডি, এ সত্যিই করেছে। এখনও কি অবিশ্বাস যে সি, এম, ডি, এ কিছু করতে পারছে না? তাহলে আরও বলি।

দেড় হাজার বস্তীর ১১ লক্ষাধিক মানুষ আজ পাকা রাস্তা, স্যানিটারি পায়খানা, পানীয় জল এবং রাস্তায় বিজলী আলো পাচ্ছেন।

তবে স্বীকার করছি, সি, এম, ডি, এ গত ১০০ বছরের বকেয়া কাজগুলি চার বছরে শেষ করতে পারে নি। আরও স্বীকার করি যে নাগরিকদের আশার সঙ্গে তাল রাখতে পারে নি। কিন্তু অপবাদ পাবার মত কাজ করেছি কি আমরা?

যাঁরা প্রাচীন, তাঁদের জিজ্ঞেস করে দেখুন। যাঁরা কলকাতার আশে-পাশে বা বাইরে পৌর অথবা অঞ্চল এলাকায় থাকেন, তাঁদের প্রশ্ন করুন তাঁদের জীবনে তাঁরা এত বৃহৎ কর্মকাণ্ড দেখেছেন কিনা। সি, এম, ডি, এর কাজ নাকি খুবই ঢিলে। কিন্তু কেন দেরি হচ্ছে সে খবর নিয়েছেন কি? আমাদের বিরুদ্ধে ক'টা মামলা চলছে জানেন কি? ঘন-বসতি এলাকার রাস্তা খুঁড়ে, জল, টেলিফোন, বিজলীর তার সরিয়ে বিরাট পাইপ বসিয়ে আবার রাস্তা ঠিক করা কি একদিনের বা এক মাসের কাজ? আমাদের দেশের ইঞ্জিনীয়ার বা শ্রমিকদের 'খাটো' করবেন না। তাঁরা অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন—তবে

২/১ বছরের কাজকে ২/১ সপ্তাহে করা যায় না। একশ' বছরের বকেয়া কাজ চার বছরে হয় না।

উত্তেজিত না হয়ে একটু বিবেচনা করুন—সি, এম, ডি, এ কি কেবল "কাটছে মাটি দেখবি আয়?" দেখাবার মত না হলেও কাজের কাজ কিছুই করেনি? করতে পারে না?

তাহলে গোড়ায় যে ফিরিস্তি দিয়েছি, সেগুলি কি?

সুড়ঙ্গ পথ, সেতু, রাস্তা, নর্দমা, জল, আলো, বস্তী-উন্নয়ন এগুলি তো কিছু কিছু চোখে দেখতে পাচ্ছেন, আর একেবারে চোখ বন্ধ করে না থাকলে যতদিন যাবে অনেক কিছু দেখতে পাবেন। আগামী দিনে দেখবেন কসবা সেতু হয়েছে, ব্রেবোর্ন রোডে উড়াল পুল হয়েছে, এক বিস্তীর্ণ এলাকায় পানীয় জল যাচ্ছে এবং বিশ্বাস করুন আর না করুন, আগামী দিনে কলকাতায় কম এবং কম-সময় জল জমবে। কিন্তু কেবল জল জমলে আতঙ্কিত হবেন না, বা উপহাস করবেন না। মরতে বসা, ডুবতে বসা কলকাতার জল জমাটাই আসল সমস্যা নয়। আসল সমস্যা, সুস্থ নাগরিক জীবন।

সি, এম, ডি, এ কিছুটা নিশ্চয়ই করেছে। আপনাদের উপহাস বা আশীর্বাদ মাথা পেতে নেবে এই সংস্থা আরেকটু এগিয়ে যাবার পথেই। অবশ্য এই সঙ্গে বলে রাখি, প্রতিটি পাড়ায়, প্রতিটি রাস্তায়, আমরা কাজে নামছি না। আমাদের লক্ষ্য কলকাতার সামগ্রিক উন্নয়ন।

আপনারা কি আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করবেন? নাকি, আমরা ক্ষ্যান্ত দেবো? বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন না হলে কে খুশী হবে?

আপনি? প্রশ্নটা আপনাকেই।

C. M. D. A.

মে, ১৯৭৫

ভোলানাথ সেন
সি. এম. ডি. এ-র চেয়ারম্যান
কলিকাতা-১

ঋতু বসন্তের মরশুমী জুতো
পিণ্টু ০৬
সাইজ ৩-৬, ৭-১০
১১-১
রিতেশ ৪৫
সাইজ ৫-১০
শিখা ০২
সাইজ ৩-৭
ক্যাভাদিস্ ১২
সাইজ ৫-১০
Bata

বিখ্যাত ডাটা
গুঁড়ো মশলার
প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত
(কুকমী) প্রাঃ লিঃ
এখন আপনাদের দিচ্ছেন
একটি নতুন অতি
সুদৃশ্য টিনের কৌটায়
সবরকম গুঁড়ো মশলার
অপূর্ব সংমিশ্রণ
KRISHNA CHANDRA DUTTA
(COOKME) PVT. LTD.
DUTA
READY MIXED SPICE POWDER
A KITCHEN QUEEN PACK
এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন প্রভৃতি আলাদা করে রান্নায় দিতে হয় না, ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকএ মাছ, মাংস, ডিম ও সবরকম মুখরোচক তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায় আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার (কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।
ডাটা
রেডিমিক্সড কারি
পাউডার
কিচেন কুইন প্যাক
প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোস্ট বক্স নং ৬৭৭৪.
ফোন : ৩৩-১৩৩৭, ৩৪-১৭০৮
PAM–KCD-74
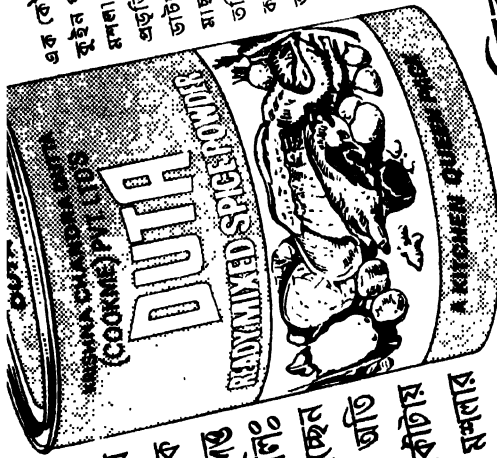
বর্ষ ৪৪ । সংখ্যা ১০-১২ । বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮২ । মে-জুলাই ১৯৭৫

ফ্যাসিস্টবিরোধী সংখ্যা

সূচীপত্র

চিত্রকর্ম

পাবলো পিকাসো । ক্যোথে কোলভিৎজ । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুভো ঠাকুর । সুনীল মুন্সী

প্রচ্ছদ

চিত্র : পাবলো পিকাসো

লিপি : বিশ্বরঞ্জন দে

আলোকচিত্র

Liberation, Immortal Testament, Peoples' War ও 'জনযুদ্ধ' থেকে

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য । হিরণকুমার সান্যাল । সুশোভন সরকার

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র । গোপাল হালদার । বিষ্ণু দে । চিন্মোহন সেহানবীশ

সুভাষ মুখোপাধ্যায় । গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তরুণ সান্যাল

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

তুমি আমি সকলেই আজ বিপন্ন

রোমাঁ রোলাঁ

[১৯৩৬ সালের ১৮ জুলাই ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থান স্পেনের বৈধ প্রজাতন্ত্রী সরকারকে বিপন্ন করে। মুসোলিনি ও হিটলারের প্রত্যক্ষ সহায়তা-পুষ্ট ফ্রাঙ্কোর পৈশাচিকতাকে প্রতিরোধ করার জন্য ২০ নভেম্বর রোলাঁ এক মর্মস্পর্শী আবেদন জানান। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ১৭ জানুয়ারি ১৯৩৭ সালে (৪ মাঘ ১৩৪৩) তা প্রকাশিত হয়। নেপাল মজুমদার কর্তৃক সংগৃহীত সেই আবেদনই এখানে পুনর্মুদ্রিত হল। বানান ও যতিচিহ্নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক]

মাদ্রিদের ধূমান্বিত প্রস্তরস্তূপ হইতে আর্তের ভয়ার্ত ক্রন্দন উঠিতেছে। যে গর্বিতা নগরী এককালে অর্ধজগতের অধিশ্বরী ছিল এবং যাহা অধুনা পাশ্চাত্য সভ্যতার এক আলোকোজ্জল কেন্দ্র—আজ আফ্রিকার মুর এবং 'বিদেশী বাহিনী' আসিয়া তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিতেছে ও রক্তের প্লাবন বহাইতেছে। তাহাদের বিদ্রোহী নেতারা যে-স্পেনের হিতৈষী বলিয়া দাবি করিতেছে—সেই স্পেনকেই লুণ্ঠনে তাহারা রত হইয়াছে এবং স্পেনের সভ্যতা পদতলে দলিত করিতেছে।

সহস্র সহস্র নারী ও শিশু নিহত, অঙ্গহীন এবং জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছে। শহরের সর্বাপেক্ষা জনবহুল অঞ্চলই বোমাবর্ষণের লক্ষ্যস্থল। হাসপাতাল রেহাই পাইতেছে না। গৌরবময় সুরম্য অট্টালিকাগুলি অগ্নিশিখা লেহন করিতেছে; আজ ডিউক অব আলবা-র প্রাসাদ, কাল প্রাদো-র বহু শতাব্দীর কারুশিল্প বোমার আঘাতে ভাঙিয়া পড়িতেছে। সমগ্র অধিবাসীসহ ভাল্‌স্‌কুইজ মৃত।

যে বীর্যবতী নগরীর প্রাচীন রাজন্যবৃন্দ আরব অভিযান হইতে ইয়োরোপকে রক্ষা করিয়াছেন, আজ তাহার বেদনার দিনে, হিটলার ও মুসোলিনি আফ্রিকান ফ্রাঙ্কোর 'গবর্নমেন্ট'কে সমর্থন করিতেছেন এবং ঐ ব্যক্তি ইতালি ও জার্মান ফ্যাসিস্টগণ প্রদত্ত অস্ত্রে স্পেনকে হত্যা করিতেছে। বিনিময়ে ফ্রাঙ্কো স্পেনের ঐশ্বর্য ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি তাহাদের হাতে তুলিয়া দিতেছে। এই

উন্মাদেরা দেখিতেছে না, যে রক্তের মূল্যে তাহারা আজ যে পাপাভিসন্ধি চরিতার্থ করিতেছে, একদিন তাহা ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের অধিবাসীদের উপরই বর্ষিত হইবে ; অদ্যকার উচ্ছৃঙ্খল বর্বরতা মাদ্রিদ ও বার্সিলোনার (কারণ কাল বার্সিলোনা ধ্বংস হইবে) পর রোম, বার্লিন, লণ্ডন এবং পারীর দিকে ধাবিত হইবে। ইয়োরোপের মহান জাতিগুলি—যাহারা সভ্যতার মাতৃভূমি, তাহারা আজ ক্ষুধিত শার্দুলের মতো পরস্পরকে পৈশাচিক আনন্দে ভক্ষণ করিতেছে ; জাতির সুসন্তানগণ পরস্পরের গলায় ছুরি দিতেছে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, উপস্থিত ও অনাগত দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে।

মনুষ্যত্ব ! মনুষ্যত্ব ! আজ তোমার দ্বারে আমি ভিখারি। এসো, স্পেনকে সাহায্য করো ! আমাদের সাহায্য করো। তোমাদের সাহায্য করো ! কেন না তুমি আমি সকলেই আজ বিপন্ন !...

এই সকল নরনারী বালক-বালিকা এবং জগতের শিল্প ও ঐশ্বর্যসম্ভার নষ্ট হইতে দিও না। আজ যদি তুমি নীরব থাকো, কাল তোমার পুত্রকন্যা, তোমার স্ত্রী, তোমার জীবনের যাহা কিছু প্রিয় ও পবিত্র, তাহাও একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আজ যদি তোমরা হাসপাতাল, যাদুঘর, শিশুদের ক্রীড়া-উদ্যান, ঘন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে বোমাবর্ষণ বন্ধ না করো তাহা হইলে হে জগতের অধিবাসীবৃন্দ, শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক, তোমাদের ভাগ্যও অনুরূপ হইবে। এই সূচনায় তোমরা যদি ইহা নিভাইয়া না ফেলো, তাহা হইলে এই প্রলয়ানলের ধ্বংসের গতি আর কে সংযত করিবে ? সমগ্র জগৎ ইহার কবলে পড়িবে।

সময় নাই ! অতি দ্রুত প্রস্তুত হও ! উঠো, জাগো, কথা বলো, চিৎকার করো, কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও ! আমরা যদি যুদ্ধ বন্ধ না-ও করিতে পারি, তথাপি যাহাতে আন্তর্জাতিক বিধি-ব্যবস্থা সকলে সম্মান করিতে বাধ্য হয়, সে ব্যবস্থা করিতে তো পারি। এসো, আমরা নির্দোষ ও নিরুপায়কে রক্ষা করি ! জাতি দল বা ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সর্বজনীন কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সকল মানব একযোগে পীড়িতের সাহায্যে ও সেবায় হস্ত প্রসারিত করুক। ভয়াবহ রণক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া সকল শ্রেণীর পীড়িত, সকল শ্রেণীর জীবিত মানবের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে হইবে।

মুক্ত মানবাত্মার নিকট আবেদন

আঁরি বারব্যুস

[আঁরি বারব্যুস মার্কসবাদী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী। ফ্যাসিবাদের আবির্ভাবের সময় থেকেই তার ভয়ঙ্কর পরিণাম, তার হিংস্র সাম্রাজ্যলোলুপতা, তার নরঘাতন নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে তিনি বিশ্ববাসীকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

কমরেড বারব্যুস ও মনীষী রোমাঁ রোলাঁ একসঙ্গে যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জনমত গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। বিশেষ করে, মানবাত্মার কারিগর শিল্পী-সাহিত্যিকদের ফ্যাসিবিরোধী ফ্রণ্টে শামিল করে নৈতিক ও বাস্তব প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

ফরাসী এই বুদ্ধিজীবী শ্রমজীবী মানুষের প্রাণের বন্ধু ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সাহিত্য-শিল্প জনগণের সংগ্রামের হাতিয়ার ও আত্মার নন্দিত ঐশ্বর্য। তাই তিনি রোলাঁর সঙ্গে একযোগে 'বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের সংযুক্ত ফ্রণ্ট' গঠনে অগ্রসর হয়েছিলেন।

১৯২৭ সালে বারব্যুস একটি মর্মস্পর্শী চিঠি সহ রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বাক্ষর চেয়ে 'মুক্ত মানবাত্মার নিকট আবেদন'পত্রটি পাঠান। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সেই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বারব্যুসকে একটি সুন্দর উত্তর লেখেন। *Anti Fascist Traditions of Bengal* সংকলন থেকে বারব্যুসের সেই ঐতিহাসিক আবেদনপত্রটি এখানে অনুবাদ করা হল।—অনুবাদক]

আট বৎসর হইল যুদ্ধাবসান হইয়াছে, তবুও যুদ্ধাবস্থা বিদ্যমান। প্রায় সমস্ত দেশেই স্বাধীনতার অপরিহার্য অধিকারগুলি হিংসার দ্বারা বিপদাপন্ন। প্রথম দিকে, কেহ কেহ বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এই সমস্ত হইতেছে ঝঞ্ঝার শেষ তরঙ্গাভিঘাত, ইহা ক্রমান্বয়ে অবসিত হইবে, ফলাফল মারাত্মক হইলেও সাময়িক এবং যে সকল জাতি আদর্শগত কারণে উৎপীড়িত হইয়াছিল, তাহারাও ক্রমে ন্যায়সঙ্গত অধিকারসমূহ পুনরুদ্ধার করিবে। কিন্তু দেখা গেল, কতিপয় দল ও ব্যক্তি হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঐ অন্ধশক্তির সহিত মিলিয়া একটি হিংসাশ্রয়ী সরকারি ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিল। আমরা সর্বত্র লক্ষ্য করিতেছি যে ফ্যাসিবাদের নামে, স্বাধীনতার

সমস্ত বিজয়কে হয় ধ্বংস নতুবা বিপদাপন্ন করা হইতেছে। সংগঠন গড়ার অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের ও বিবেকের স্বাধীনতা—যাহা শত শত বৎসরের আত্মত্যাগ ও আয়াসে অর্জিত হইয়াছে—আজ সেই সব-কিছুকেই নির্দয়ভাবে নির্মূল করা হইতেছে। প্রগতির এই দেউলিয়া অবস্থায় আমরা আর নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকিতে পারি না।

আমাদের ধারণা, ইদানিংকালে পৃথিবীতে মনীষা ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে যে যতটুকু প্রভাব বিস্তারে সক্ষম, তাঁহাদের সকলকে ফ্যাসিবাদের বর্বর অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি সংগঠনে মিলিত হইতে আহ্বান জানাইবার সময় আসিয়াছে।

প্রত্যেকটি দেশে অল্পবিস্তর নগ্নরূপে, কিন্তু ক্রমেই অধিকতর স্পর্ধায় ও পাপের পথে, প্রতিদিন, সর্বত্রই, ক্রমবর্ধমান সংগঠিতরূপে জনসমষ্টির উপর এবং ব্যক্তিমানুষের সর্বাপেক্ষা পবিত্র নীতিসমূহ ও সমষ্টিগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বল্গাহীন শ্বেত-সন্ত্রাস চালানো হইতেছে।

এই পরিস্থিতিতে যে সকল হিংসাত্মক ঘটনাবলী, নিতান্ত অমার্জনীয় এবং অনস্বীকার্য সব অপরাধ, অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং আরো বহু বীভৎস ঘটনায় বিপদাশঙ্কা দেখা দিতেছে—তাহার বিরুদ্ধে সর্বজনপ্রশংসাধন্য শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের লইয়া গণপ্রতিরোধ সংগঠিত করিলে কার্যকর বাধা সৃষ্টি করা যাইবে। এমন একটি আন্তর্জাতিক সমিতি, শুধুমাত্র গঠিত হইলেই, জনমতের উপর তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে। তাহাকে আলোকিত ও আকৃষ্ট করিবে এবং স্বীয় স্বার্থ ও ভাগ্যবিধানে কি তাহাদের অভিপ্রায় তাহা প্রকাশে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিবে। ফ্যাসিবাদের সঙ্গে যে সকল সরকার অবাঞ্ছিত সহায়তা ও সহযোগিতা করিতেছে, তাহাদের শুভবুদ্ধির উন্মেষেও এই উদ্যোগ সক্রিয় চাপ সৃষ্টি করিবে।

ইহাই সব নয়। ইতালি, স্পেন, পোলাণ্ড, বলকান রাজ্যগুলি হইতে, প্রতিদিন সকল স্থান হইতেই, অসংখ্য অপরাধ ও বে-আইনী ক্ষমতাদখলের সংবাদ আমাদের নিকট পৌছাইতেছে। অগণিত বীর ও অনুগত নাগরিকদের উপর প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা হিসাবে জীবন-ধারণোপযোগী খাদ্য হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইতেছে। ফ্যাসিস্ত প্রতিক্রিয়ার নির্দেশে, কোনো কোনো অঞ্চলকে মর্মন্তুদ দুর্দশার মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে। এই সমিতির অন্যতম প্রথম কাজ হইবে—আদর্শগত কারণে যাহারা মৃত্যুযন্ত্রণা ও নিপীড়ন সহ্য করিতেছে,

তাহাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াইয়া দেওয়া এবং কিভাবে তাহাদের দুর্দশা মোচন করা যায় তাহা বিচার-বিবেচনা করা।

রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষভাবে, ন্যায় বিচার যুক্তি ও গণতান্ত্রিক প্রগতি—যাহা বর্তমানে বিপদাপন্ন শুধুমাত্র তাহার উপর দাঁড়াইয়া একবার এই সমিতি গঠিত হইলে তাহার পর সমিতিই ঠিক করিবে কী উপায়ে ইহার মহৎ ও ন্যায়পরায়ণ সেবাধর্ম বাস্তবে রূপায়িত করা যায়।

অতএব যাঁহাদের নিকট এই আবেদন পাঠাইতেছি তাঁহাদের সকলের নিকট আমাদের অনুরোধ যেন তাঁহারা এই নীতিসমূহের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

অনুবাদঃ অমিয় ধর

ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে

ম্যাকসিম গোর্কি

[১৯৫৪ সালে প্রকাশিত 'নানা লেখা' সংকলন থেকে গোর্কির তিনটি রচনা পুনর্মুদ্রিত করা হল। প্রথম দুটি লেখা সংক্ষেপিত। ছাপার ভুলগুলি শুদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে, বানান ও যতিচিহ্নের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। 'ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে' এই শিরোনাম আমাদেরই দেওয়া।—সম্পাদক]

শ্রমিকশ্রেণীর মানবতাবাদ

•••শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী চেতনার বিকাশকে বাধা দিবার জন্য কি করিতেছে সমস্ত দেশের পুঁজিপতিরা? কোটি কোটি মেহনতী মানুষের উপর নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, অর্থহীন শ্রমিকশোষণ চালাইয়া যাইবার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শেষ শক্তিবিন্দু নিয়োগ করিয়া তাহারা আজ ফ্যাসিজম সংগঠিত করিয়া তুলিতেছে। পুঁজিবাদ কর্তৃক জরাজর্জর বুর্জোয়া সমাজের কায়িক ও নৈতিক অস্বাস্থ্যকর স্তরটির সমাবেশ ও সংগঠনই হইতেছে ফ্যাসিজম। যৌনব্যাধিগ্রস্ত সুরাসক্ত তরুণ সম্প্রদায়, ১৯১৪—১৮ সালের যুদ্ধস্মৃতির বিভীষিকা—বিকারগ্রস্ত সন্তানের দল, পরাজয়ের প্রতিশোধকামী পেতিবুর্জোয়াদের সন্তানের দল, যে জয়লাভ পরাজয়ের মতোই বিপর্যয় আনিয়াছে বুর্জোয়াদের নিকট, সেই জয়লাভের সন্তানের দল—পুঁজিবাদ কর্তৃক ইহাদেরই সমাবেশ ও সংগঠনের নাম ফ্যাসিজম। নিম্নলিখিত ঘটনাটি হইতেই এই তরুণদের মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে: এ বৎসর মে মাসের গোড়ার দিকে জার্মানির এসেন শহরে হাইনৎস ক্রীস্টেন নামে ১৪ বছরের একটি ছেলে ফ্রিৎস ওয়াকেন হোর্স্ট নামে ১৩ বছরের একটি ছেলেকে হত্যা করে। হত্যাকারী শান্তভাবে বলে যে, সে আগেই তাহার বন্ধুর জন্য একটি কবর খুঁড়িয়া রাখিয়াছিল, তারপর তাহাকে সে জীবন্ত অবস্থায় কবরের মধ্যে ফেলিয়া দেয় ও যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহার দম বন্ধ হইয়া যায় ততক্ষণ তাহার মুখ বালিতে চাপিয়া রাখে। সে বলে, ওয়াকেন হোর্স্টের হিটলারি স্টর্মট্রুপার উর্দিটি দখল করিবার জন্যই সে এই হত্যা করিয়াছে।

যাঁহারাই ফ্যাসিস্ত প্যারেড দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, এ প্যারেড ন্যুব্জদেহ বিকৃতচর্ম, ক্ষয়রোগাক্রান্ত তরুণদের প্যারেড; রুগ্ন মানুষের সমস্ত কামনা লইয়া যাহারা বাঁচিতে চায় তাহাদের প্যারেড। নিজেদের বিষাক্ত রক্তের পূতিগন্ধময় উদ্গারের স্বাধীনতা দিবে এমন সবকিছুই তাহারা গ্রহণ করিতে

প্রস্তুত। হাজার হাজার বিবর্ণ, নিরক্ত মুখের মধ্যে স্বাস্থ্যবান, রক্তিম মুখগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়াই চোখে পড়ে, কারণ তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। সেগুলি অবশ্য শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীসচেতন শত্রুর মুখ, পেতিবুর্জোয়া ভাগ্যান্বেষীদের মুখ, গতকল্যকার সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের মুখ, বড় কারবারী হইতে ইচ্ছুক ক্ষুদে-কারবারীদের মুখ। বিনামূল্যে অর্থাৎ চাষী-মজুরদের পকেট কাটিয়া একটু জ্বালানি অথবা কয়েকটা আলু দিয়া জার্মান ফ্যাসিস্ত নেতারা এইসব কারবারীদের ভোট কিনিয়া লয়। প্রধান খানসামারা চায় রেস্তোরাঁর মালিক হইতে। বড় চোরকে চুরির অধিকার দিয়াছে রাষ্ট্রশক্তিধারকেরা, সেই চুরির অধিকারই চায় ক্ষুদে চোরেরা। ইহাদের মধ্য হইতেই ফ্যাসিবাদ তাহার 'কর্মী' সংগ্রহ করে। ফ্যাসিস্ত প্যারেড একই সঙ্গে পুঁজিবাদের শক্তি ও দুর্বলতার অভিব্যক্তি।

আমাদের চোখ বুজিয়া থাকিলে চলিবে না। ফ্যাসিস্তদের মধ্যে মজুরের সংখ্যা কম নহে। ইহারা সেই স্তরের মজুর যাহাদের এখনও বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর চূড়ান্ত শক্তি সম্পর্কে চেতনা জাগে নাই। এ কথা যেন নিজেদের নিকট হইতে আমরা গোপন না করি যে, বিশ্বপরাশ্রয়ী পুঁজিবাদ এখনও খুবই শক্তিশালী কারণ এখনও কৃষক ও শ্রমিক অস্ত্র ও খাদ্য তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া নিজের রক্তমাংসে তাহাকে পরিপুষ্ট করিতেছে। এই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ যুগের ইহাই সবচেয়ে শোচনীয় ও লজ্জাকর ঘটনা। আজও শ্রমিকশ্রেণী নিরীহভাবে শত্রুর মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেছে। অসহ্য এ দৃশ্য। এ নিরীহতা তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে সোশ্যাল ডেমোক্রাট নেতারা। এই নেতাদের নাম আজ ও চিরদিনই কলঙ্কের কালিতে লেখা থাকিবে। ঠিক যখন বেকারি বাড়িতেছে, মজুরি কমিতেছে এবং এমন কি পেতিবুর্জোয়াদের ক্রয়ক্ষমতাও কমিতেছে—ঠিক তখনই বাজারের দ্রব্যমূল্য একটি বিশেষ স্তরে রাখিবার জন্য খাদ্যশস্য ধ্বংস করিয়া ফেলা হইতেছে। আর ইহা সহ্য করিয়া যাইতেছে বেকার ও ক্ষুধিতের দল। কী বিস্ময়কর ধৈর্য!…

…ইয়োরোপের তরুণদের উপর ফ্যাসিজমের ধ্বংস ও দুর্নীতির প্রভাবের মাত্র কয়েকটি নহে, শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এই ঘটনাগুলি বিবৃত করিতে গেলেও বমির উদ্রেক হয়। এই কদর্য আবর্জনায় স্মৃতির ভাণ্ডার ভরিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয় না। অথচ ক্রমবর্ধমান উৎসাহ ও প্রাচুর্যের সহিত এই আবর্জনাই সৃষ্টি করিয়া চলে বুর্জোয়া।…যে-ইহুদীরা প্রয়োজনে নিজেদের জাতিবিশুদ্ধতার গর্ব করিতে পারে এবং যাহারা মানবসমাজকে এতগুলি সত্যকার সংস্কৃতিস্রষ্টা দান করিয়াছে, দান করিয়াছে সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত প্রবক্তা কার্ল মার্কসকে,

সেই ইহুদীদের আজ জার্মানির ফ্যাসিস্ত বুর্জোয়ারা তাড়াইয়া দিতেছে। ব্রিটেনে যেখানে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মধ্যে ইহুদীদের সংখ্যা কম নহে এবং যেখানে দেশের অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে ইহুদীরা গৃহীত হইয়াছে—সেখানেও ইহুদী-বিদ্বেষের কদর্য তত্ত্বের প্রচার শুরু হইয়াছে।

অপরপক্ষে যে-দেশের শাসনক্ষমতা শ্রমিকশ্রেণীর হাতে, সেখানে একটি স্বাধীন ইহুদী প্রজাতন্ত্র—ইহুদী স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল—গঠিত হইয়াছে।

বিভিন্ন জাতির পুঁজিপতিরা রুদ্ধশ্বাসে আর একটি বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি চালাইতেছে। শ্রমিক ও কৃষকের শ্রমশক্তিকে আরও বেশি করিয়া ও আরও সুবিধাজনকভাবে শোষণের জন্য তাহারা পৃথিবীকে নূতনভাবে ভাগ করিতে চায়। ছোট ছোট দেশগুলি আবার বড় বড় দেশের লৌহকবলে পড়িতে চলিয়াছে; আবার তাহারা তাহাদের স্বাধীন সংস্কৃতি-বিকাশের অধিকারটিকে হারাইতে চলিয়াছে।

বিভিন্ন ভাষা ও জাতির শ্রমিকদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিজম জাতিগত কলহ, দম্ভ ও বিদ্বেষের বীজ বপন করিতেছে। এই জাতিবিদ্বেষ বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থের একাত্মতার চেতনার বিকাশ ব্যাহত করিবে। বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যবসায়ীদের অরক্ষিত ও পদদলিত ক্রীতদাসের অবস্থা হইতে দুনিয়ার শ্রমিক-কৃষককে শুধুমাত্র এই চেতনাই মুক্তি দিতে সক্ষম। তাহাদের জাতিগত, বাণিজ্যগত, শিল্পগত শত্রুতা অতি সহজেই জাতি-শত্রুতা ও জাতিযুদ্ধের প্রচারে পর্যবসিত হইতে পারে, এবং হইতেছেও। আজ তাহারা ইহুদীবিদ্বেষ প্রচার করিতেছে এবং ইতোমধ্যেই অত্যন্ত ঘৃণিতভাবেই উহার প্রয়োগ শুরু করিয়া দিয়াছে। কাল তাহারা মমসেন, ট্রাইটস্কে প্রমুখের মতবাদ স্মরণ করিয়া স্লাভ-বিদ্বেষ প্রচার করিতে শুরু করিবে, ভুলিয়া যাইবে জার্মান সংস্কৃতিতে কতজন প্রতিভা দান করিয়াছে পোলেরা, পোমোরেরা, চেকেরা। ইয়োরোপের সমস্ত কারখানা-মালিকেরা ও দোকানীরা যখন একই ধরনের মাল তৈয়ারি করে ও একই ধরনের মাল লইয়া কারবার করে, রোমানসীয় অথবা এ্যাংলো-স্তাকসন জাতির বিরুদ্ধে জার্মান জাতির শত্রুতা ও যুদ্ধ তখন খুবই স্বাভাবিক। মৈত্রী আছে অবশ্য; কিন্তু যখন বিক্রয় করিতেই হইবে, তখন বেইমানী করিতে ক্ষতি কি? যথা: ব্রিটেনের মৈত্রী রহিয়াছে জাপানের সহিত, কিন্তু জাপানীরা জোড়া তিন পেনিতে দিব্যের মোজা বেচিতেছে লণ্ডনে; ব্যাপারটি সামান্য কিন্তু জাপানের 'ডাম্পিং' (উৎপাদনব্যয়ের কমে জিনিস বিক্রয়) পীতজাতির

বিরুদ্ধে শত্রুতা জাগাইয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের মাঞ্চুরিয়ায় যাহা বিনা বাধায় চালাইয়া যাইতেছে তাহা দেখিয়া ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের রসনা সজল হইয়া উঠিয়াছে।

জাতিতত্ত্ব মুমূর্ষু পুঁজিবাদের ভাবাদর্শ ভাণ্ডারের শেষ মজুতশক্তি। কিন্তু ইহার পূতিগন্ধ সুস্থমনা মানুষকেও বিষাক্ত করিয়া তোলে। কারণ এতকাল মারাত্মকভাবে অস্ত্রসজ্জিত ইয়োরোপীয় শ্বেতাঙ্গদের হাতে নিরস্ত্র ভারতীয়, চীনা ও নিগ্রোদের বিনা বাধায় ক্রীতদাসে পরিণত হইতে দেখিয়া সাধারণ মানুষের মন বিকৃত ও বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে।

শ্রেণীভ্রাতাদের এই নৃশংস অবাধ লুণ্ঠন দাঁড়াইয়া দেখিবার বিষাক্ত মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়িতে পারে সংযুক্ত মোর্চায় সম্মিলিত একমাত্র বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীই। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শে শিক্ষিত এই শ্রমিকশ্রেণী। এই মতাদর্শকেই তাহাদের নেতা স্তালিন পরম প্রজ্ঞার সহিত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেছেন। এই শ্রমিকশ্রেণীই দুনিয়াকে দেখাইয়াছে যে, তাহার বহুজাতিক দেশে সমস্ত জাতি ও উপজাতি, জীবন, শ্রম ও সংস্কৃতি বিকাশের অধিকারে সম্পূর্ণ সমান। যে সকল নিরক্ষর, অর্ধ-সভ্য জাতির পূর্বে নিজেদের বর্ণমালা পর্যন্ত ছিল না, রুশ শ্রমিক আজ তাহাদের সম্মুখে জ্ঞানের বিস্তৃত রাজপথ খুলিয়া দিয়াছে।...

১৯৩৪

সংস্কৃতি

ফ্যাসিবাদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ হইতে সংস্কৃতিকে রক্ষা করাই প্যারিসের লেখক-মহাসম্মেলনের মূল লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, আধুনিক বুর্জোয়া সংস্কৃতির সত্যকার অন্তর্নিহিত বস্তুটি কি, তাহা সমস্ত প্রতিনিধিই একইভাবে বুঝিবেন এবং ইহা লইয়া কোনো মতভেদ হইবে না। কিন্তু সত্যই কি তাই?

বুর্জোয়া সংস্কৃতির অবস্থা আজ ক্ষয় ও ভাঙনের অবস্থা। ফ্যাসিবাদ এই বুর্জোয়া সংস্কৃতিরই সৃষ্টি, বুর্জোয়া সংস্কৃতির উপর সে এক ক্যানসারের স্ফীতি। ফ্যাসিবাদের তাত্ত্বিকেরা ও প্রয়োগকর্তা সেই সব ভাগ্যান্বেষীরা, বুর্জোয়াশ্রেণী নিজের মধ্য হইতে যাহাদের সৃষ্টি করিয়াছে। ইতালি ও জার্মানিতে বুর্জোয়ারা ফ্যাসিস্তদের হাতে রাজনৈতিক ও কায়িক ক্ষমতা তুলিয়া দিয়াছে। ইতালীয় শহরগুলির মধ্যযুগীয় বুর্জোয়ারা ভাড়াটিয়া সৈন্যদলের পরিচালকদের ম্যাকিয়াভেলী-

ধুরন্ধর ধূর্ততার সহিত নিয়ন্ত্রণ করিতেন, প্রায় সেই ধূর্ততার সহিতই জার্মানি ও ইতালির বুর্জোয়ারা ফ্যাসিস্তদের নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। ফ্যাসিস্তদের হাতে শ্রমিকদের উচ্ছেদসাধনকে তাহারা শুধু খুশি মনেই উৎসাহ দেয় নাই, লেখক ও বিজ্ঞানীদের শাস্তি দিতে ও দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতেও ফাসিস্তদের তাহারা বাধা দেয় না। অথচ ইহারাই তাহাদের মানসশক্তির প্রতিনিধি, এই সেদিন পর্যন্তও যাহারা ছিল তাহাদের গর্ব ও দম্ভের বস্তু।

আর-একটি বিশ্বযুদ্ধের সাহায্যে নূতনভাবে 'দুনিয়া বাঁটোয়ারা'র জন্য সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের মনে যে ইচ্ছা জাগিয়াছে, সেই ইচ্ছাপূরণের জন্য ফ্যাসিবাদ এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছে যে, সমস্ত জগৎকে ও অন্য সমস্ত জাতিকে শাসন করিবার অধিকার আছে জার্মান জাতির। ইহা ফ্রিড্রিক নিট্শের বিকৃত মনের সৃষ্টি 'শ্বেত জানোয়ার'-এর শ্রেষ্ঠত্বের সেই বহুবিস্মৃত তত্ত্ব। ভারতীয়, ইন্দোচীনা, মেলানেশিয়ান, পলিনেশিয়ান, নিগ্রো প্রভৃতি জাতিগুলি লাল চুল ও সাদা মাথাওয়ালা জাতিদের দ্বারা শাসিত হইতেছে—এই ঘটনা হইতেই এই তত্ত্বের সৃষ্টি। অস্ট্রীয় ও ফরাসী বুর্জোয়াদের পরাজিত করিয়া জার্মান বুর্জোয়ারা যখন ব্রিটিশ, ডাচ ও ফরাসী বুর্জোয়াদের ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনে ভাগ বসাইবার ইচ্ছা পোষণ করিতে শুরু করিল, তখনই এই তত্ত্বের বিকাশ হয়। সমগ্র দুনিয়ার উপর শ্বেত জাতির প্রতিযোগীহীন কর্তৃত্বের অধিকারের তত্ত্ব হইতেই প্রত্যেক জাতীয় বুর্জোয়া দল শুধু সমস্ত কৃষ্ণাঙ্গ জাতিকে নহে, নিজেদের শ্বেতাঙ্গ ইয়োরোপীয় প্রতিবেশীদের পর্যন্ত বর্বর বলিয়া মনে করিতেছে এবং বর্বর বলিয়াই তাহাদের পদদলিত রাখা অথবা ধ্বংস করার কথা চিন্তা করিতেছে। ইতালি ও জাপানের বুর্জোয়াশ্রেণী ইতোমধ্যেই এই তত্ত্বকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে শুরু করিয়াছে; 'সংস্কৃতি'র আধুনিক 'ধারণা'র মধ্যে এই তত্ত্বটির একটি বিশেষ বাস্তব স্থান রহিয়াছে।

বুদ্ধিজীবীদের অতি-উৎপাদন ঘটিয়া গিয়াছে, শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে, 'অন্তরায়' সৃষ্টি করিতে হইবে সংস্কৃতির বিকাশের পথে, যন্ত্রপাতির সংখ্যা পর্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে এবং হস্তশিল্পে ফিরিয়া যাইবার দিন আসিয়াছে—ইয়োরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা তারস্বরে এই কথাগুলি ঘোষণা করিতেছেন। তাঁহাদের কণ্ঠস্বরের তীব্রতা ক্রমেই বাড়িতেছে। ইয়র্কের আর্কবিশপ বোর্নমাউথের একটি স্কুলের উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "আমি দেখিতে চাই, সমস্ত আবিষ্কার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যদি আমি 'ইণ্টার্নাল কমবাস্শন ইঞ্জিন' তুলিয়া দিতে পারিতাম, তবে নিশ্চয়ই তাহা দিতাম।" তাঁহার মর্যাদাচ্যুত পেশার সহযোগী ক্যাণ্টারবেরীর

আর্কবিশপ যন্ত্রের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন, কারণ তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' প্রচার করিতেছেন এবং বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন আগামী যুদ্ধ হইবে 'যন্ত্রের যুদ্ধ'। খ্রীস্টের লণ্ডন ও রোমের পার্থিব প্রতিনিধিদের এই বক্তৃতাগুলি এবং অনিবার্য সামাজিক বিপর্যয়ের আতঙ্কে অথবা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি ঘৃণায় উন্মাদ যে-বুর্জোয়ারা সাংস্কৃতিক বিকাশ রোধের জন্য প্রচার চালাইতেছেন তাঁহাদের বক্তৃতাগুলি, যদি, ধরুন ১৮৮০ সালে প্রদত্ত হইত, তাহা হইলে বুর্জোয়ারাই এই বক্তৃতাগুলিকে মূঢ়তার নিদর্শন ও বর্বরতার যুগে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান বলিয়া আখ্যা দান করিত।

আজ যখন বুর্জোয়াশ্রেণীর চোখে সাহস ও লজ্জাহীনতার মধ্যে কোনো পার্থক্যই নাই, তখন মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তনের আহ্বানকেই বলা হইতেছে 'দুঃসাহসী কল্পনা'।

অতএব আমরা দেখিতেছি, ইয়োরোপীয় বুর্জোয়া সংস্কৃতি 'কোনও একীভূত পদার্থ' নহে, অথচ বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা ইহাকে এই আখ্যাই দিয়া থাকেন। ইহার 'জনশক্তি' ভাঙিয়া গিয়া পরিণত হইয়াছে দোকানী ও ব্যাঙ্কারে যাহারা অন্য সমস্ত মানুষকেই সস্তা ও পর্যাপ্ত পণ্য বলিয়া গণ্য করে এবং যাহারা যে কোনো প্রকারে সমাজে নিজেদের উচ্চ ও আরামের অবস্থা রক্ষা করিয়া চলিতে চায়; পরিণত হইয়াছে ফ্যাসিস্তে যাহাদের হয়ত এখনও মানুষ বলা চলে, কিন্তু যাহারা কয়েক যুগব্যাপী সুদীর্ঘ নেশার ফলে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে এবং রক্তাক্ত ঘৃণিত পাপকার্য বন্ধ করিবার জন্য যাহাদের কঠোরভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার অথবা যাহাদের বিরুদ্ধে আরও কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হইবে।

* * *

মরিস বুর্দে নামক কোনো ব্যক্তি মনে করেন, "সংস্কৃতির সীমা নির্ধারণ ও সঙ্কোচন করা প্রয়োজন ও সম্ভব।" শ্রম অথবা কায়িক যান্ত্রিক বা মানসিক সংস্কৃতিই মূল সৃজনীশক্তি। এই প্রবন্ধের লেখক মনে করেন, মূলত এবং ব্যাপক অর্থে প্রত্যেক মতাদর্শই একটি যন্ত্রবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, অর্থাৎ শ্রম ও যুক্তি সম্মত এমন একটি ব্যবস্থা যাহার সাহায্যে মানুষ ধীরে ধীরে দুনিয়ার পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য তাহার বিশ্বদৃষ্টিকে বিস্তৃত করে। আমরা দেখিতেছি আধুনিক বুর্জোয়াশ্রেণী যাহা আছে তাহা লইয়া সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট এবং বিরাট এক বেকারবাহিনী সৃষ্টি করিয়া, যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রসার রোধের জন্য আন্দোলন চালাইয়া, উচ্চ শিক্ষালয় মিউজিয়াম প্রভৃতির রক্ষণব্যয় কমাইয়া, সত্যসত্যই অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে "সংস্কৃতির সাধারণ

বিকাশের পথ···রোধ করিতেছে"। আমরা জানি, একমাত্র শিল্প যাহা বিনা বাধায় কাজ করিতেছে এবং যাহা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা হইতেছে যুদ্ধ-শিল্প। এ শিল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রে কোটি কোটি শ্রমিক ও কৃষকের হত্যাসাধন। কোন জাতীয় বুর্জোয়া উপদল অন্যদের উপর কর্তৃত্ব করিবে? এই আন্তর্জাতিক বিরোধের ফয়সালা করিতে চায় পশ্চিমী ইয়োরোপীয় বুর্জোয়া-শ্রেণী এই যুদ্ধক্ষেত্রেই। পদদলিত প্রতিবেশীর রক্তে স্ফীত হইয়া উঠিবার জন্য বুর্জোয়াশ্রেণী যে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে, সেই যুদ্ধের সামরিক অধিকর্তারা প্রকাশ্যেই ধীর শান্তভাবে ঘোষণা করিতেছে যে, এই যুদ্ধ ১৯১৪—১৮ সালের যুদ্ধ অপেক্ষা আরও বেশি রক্তক্ষয়ী ও ধ্বংসাত্মক হইবে।···
১৯৩৫

সংস্কৃতি-রক্ষা কংগ্রেসের প্রতি

স্বাস্থ্যের জন্য আন্তর্জাতিক লেখক কংগ্রেসে সশরীরে উপস্থিত থাকিতে পারিলাম না বলিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত। ফ্যাসিবাদের আবির্ভাবে যাঁহারা নিজেদের তীব্রভাবে অপমানিত মনে করেন, যাঁহারা চোখের উপর দেখিতেছেন ফ্যাসিবাদের বিষাক্ত ভয়ঙ্কর ভাবধারা কিভাবে প্রসারলাভ করিতেছে, কিভাবে ফ্যাসিবাদ বিনা বাধায় নির্ভয়ে পাপের পর পাপ করিয়া চলিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে উপস্থিত থাকিতে পারিলাম না বলিয়া আমি সত্যই দুঃখিত।

ফ্যাসিবাদ বুর্জোয়া-প্রজ্ঞার নূতন চিৎকার নহে। ইহা নৈরাশ্যের বিজ্ঞতার শেষ চিৎকার। ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি বলিতে যাহা কিছু বুঝায়—সবকিছুর বিরুদ্ধেই তাহার হিংস্র বিতৃষ্ণাকে সে ক্রমেই বেশি নির্লজ্জতার সহিত প্রকাশ করিতেছে।

যে মানবপ্রেমিক সংস্কৃতির কীর্তিগুলি এতদিন বুর্জোয়াশ্রেণীর গর্ব ও দম্ভের বস্তু ছিল, কেন সেই 'মানবপ্রেমিক' সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে? আমরা জানি, যদি সে যুগের কুসীদজীবী ও কারবারীদের প্রয়োজন না হইত, তবে সামন্তবাদের ধর্ম ক্যাথলিক ধর্মকে লুথার অস্বীকার করিতেন না। আমাদের যুগে ব্যাঙ্কমালিক, কামান প্রস্তুতকারী ও অন্যান্য পরাশ্রয়ীদের জাতীয় উপদলগুলি ইয়োরোপে আধিপত্যের অধিকার স্থাপনের জন্য, সাধারণভাবে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে বঞ্চিত করিবার জন্য এক নূতন যুদ্ধের চক্রান্ত করিতেছে। এ যুদ্ধ হইবে বিভিন্ন জাতির উচ্ছেদের যুদ্ধ। বুর্জোয়া মানবতা চিরদিনই বুর্জোয়ার হাতে 'আড়াল করিয়া রাখিবার উপকরণ হিসাবে' ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এই উপকরণ

দিয়াই বুর্জোয়াশ্রেণী পেতি-বুর্জোয়াদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নিজেদের দিকে টানিয়া আনিয়াছে, কিন্তু আজ বুর্জোয়া 'সংস্কৃতির ভিত্তি' এই বুর্জোয়া মানবতাকেও বুর্জোয়াশ্রেণী ধ্বংস করিতে চায়। কারণ, নূতন নরমেধের আয়োজনে মানবতার ধারণাকে ফ্যাসিবাদ তাহার মূল লক্ষ্যের বিরোধী মনে করে।

ফ্রান্সের লেখকদের উদ্যোগে দুনিয়ার সমস্ত সৎ লেখকেরা আজ ফ্যাসিবাদ ও তাহার সমস্ত পাপিষ্ঠতার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছেন।

'সংস্কৃতির অধিকর্তা'দের পক্ষে এই মহান লক্ষ্য খুবই স্বাভাবিক এবং বিজ্ঞানীরাও যে শিল্পীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন নিশ্চয়ই এ আশাও করা যায়।

কিন্তু এ কথাও মনে রাখিতে হইবে, ইতিহাস অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়াছে যে মানবতার যুক্তি দ্বিপদ নেকড়ে ও বরাহের বুদ্ধির নাগালের বাহিরে এবং মানবতার সর্বজনীন তাৎপর্য উপলব্ধি করিবার ও তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল হইবার ক্ষমতা দুনিয়ায় মাত্র একটি শ্রেণীরই আছে। এই শ্রেণী শ্রমিকশ্রেণী।

অতএব, যাহাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন অসম্ভব তাহাদেরই সমন্বয়সাধনের দিকে এবং যে বুর্জোয়াসমাজ শত্রুতা ছাড়া, মানবজাতির বৃহত্তম অংশকে নিপীড়ন করা ছাড়া বাঁচিতে পারে না, সেই বুর্জোয়াসমাজের সংস্কারের দিকে যেন আমাদের প্রচেষ্টা আমরা চালিত না করি। কোটি কোটি মেহনতী মানুষের অন্তর্নিহিত মানসশক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া দিবার কাজেই যেন আমরা আমাদের সর্বপ্রয়াস, সর্বশক্তি নিয়োগ করি।

শ্রমিকশ্রেণীর মানবতাই একমাত্র সত্যকার মানবতা। বর্তমান জগতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তিমূলটির পরিবর্তন সাধনের মহান কর্তব্য পালনের ভার গ্রহণ করিয়াছে শ্রমিকশ্রেণী। যে-দেশে শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছে সে-দেশে আমরা দেখিতেছি জনসাধারণের মধ্যে কি বিপুল শক্তি সুপ্ত ছিল, দেখিতেছি কত প্রতিভা জাগিয়া উঠিতেছে এই জনতার মধ্য হইতে, দেখিতেছি নূতন আধেয় দিয়া কত দ্রুত সেখানকার জীবনের আধারে পরিবর্তন ঘটাইতেছে শ্রমিকশ্রেণী।

প্রিয় কমরেডগণ, চিন্তাশীল মানুষের আন্তরিক বাণীকে উপলব্ধি করিতে পারে শুধু শ্রমিকেরা, সংস্কৃতির হস্তশিল্পীরা, মেহনতী বুদ্ধিজীবীরা ও মেহনতী কৃষকেরা। ইহারাই সংস্কৃতির অধিকর্তা হইতে চায়, ইহারাই সংস্কৃতির অধিকর্তা হইবার যোগ্যতা রাখে।

অনুবাদ: সরোজ দত্ত

সংস্কৃতির শত্রু

আঁদ্রে জিদ

[জার্মানিতে নির্বিচার হত্যা গ্রেপ্তার বহিষ্কার বইপোড়ানো প্রভৃতি নাৎসি বর্বরতা যখন তুঙ্গে উঠেছে, যখন হিটলার প্রকাশ্যেই অস্ট্রিয়া আক্রমণের তোড়জোড় করছে; ইতালিতে গণতন্ত্রী ও প্রগতিকামীদের কণ্ঠরোধ করে মুসোলিনি যখন আবিসিনিয়া আক্রমণে উদ্যত; জাপানে হিংস্র সমরনায়কদের যুদ্ধপ্রস্তুতি যখন উগ্র চেহারা নিয়েছে—তখন, সেই ১৯৩৫ সালে, রোমাঁ রোলাঁ-ম্যাকসিম গোর্কি ও আঁরি বারব্যুস নারকীয় ফ্যাসিবাদ ও তার হিংস্র যুদ্ধায়োজনকে পরাস্ত করার পথ আবিষ্কারের জন্য পৃথিবীর অগ্রগণ্য প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মানবিকতাবাদী সাহিত্যিকদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। ২১ জুন প্যারিসে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে আঁদ্রে জিদ, ঈ. এম. ফর্স্টার, আঁদ্রে মালরো, অলডস হাকসলি, জুলিয়া বাঁদা, ওয়াল্ডো ফ্রাঙ্ক, মাইকেল গোল্ড, জন স্ট্র্যাচি প্রমুখ যোগ দেন। এই সম্মেলনের পর লণ্ডনে হ্যারল্ড লাস্কি, হার্বার্ট রীড, মণ্টেগু স্ল্যাটার, ঈ. এম. ফর্স্টার, পাম্ দত্ত, সাজ্জাদ জহীর, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মুলকরাজ আনন্দ প্রমুখ ব্রিটিশ ও ভারতীয় লেখক এবং বুদ্ধিজীবী একটি প্রগতি সাহিত্য সংঘ গঠন করেন। ভারতবর্ষেও অনুরূপ সাহিত্য সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ শুরু হয়। লখনৌয়ে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনকালে ১৯৩৬ সালের ১০ এপ্রিল মুনশী প্রেমচন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্য সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ গঠিত হয় (মুনশী প্রেমচন্দ ও সাজ্জাদ জহীর সংঘের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হন)। যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রগতি সাহিত্যিকদের ঐ প্রথম সম্মেলনেই একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। [দ্র. *Towards A Progressive Literature*]

লখনৌ সম্মেলনের কিছুদিনের মধ্যেই এলাহাবাদ, লখনৌ, আলিগড়, দিল্লী, লাহোর, বোম্বাই, পুনা, দেরাদুন, ওয়াল্টেয়ার প্রভৃতি শহরে প্র. লে. স-র শাখা কমিটি গড়ে ওঠে। কলকাতায় বিচ্ছিন্নভাবে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন আগেই শুরু হয়েছিল, নিখিল বঙ্গ প্রগতি লেখক সংঘের সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হওয়ায় সেই বিক্ষিপ্ত প্রয়াস এবার সংহত হয়। বাঙলায় প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের আদি পর্বে মুখ্য সংগঠকের ভূমিকা নেন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। [দ্র. 'প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রাথমিক অধ্যায়' : নেপাল মজুমদার]

১৯৩৬ সালের ১৮ জুন মসকোয় ম্যাকসিম গোর্কির মৃত্যু হয়। প্র. লে. স.-র

বাঙলা সাংগঠনিক কমিটি ১১ জুলাই অ্যালবার্ট হলে একটি শোকসভা আহ্বান করেন। আহ্বায়ক ছিলেন: সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (সম্পাদক, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'), কাজী নজরুল ইসলাম, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন (সম্পাদক, 'এডভান্স') ও খগেন্দ্রনাথ সেন। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ গঠিত হয়। (ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার যথাক্রমে সংঘের সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।)

১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ তার প্রথম সংকলন 'প্রগতি' প্রকাশ করে। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত অধুনা দুষ্প্রাপ্য এই গ্রন্থে ১৯৩৫ সালের ঐতিহাসিক প্যারিস সম্মেলনে প্রদত্ত আঁদ্রে জিদের বক্তৃতাটি 'ব্যষ্টি ও সমষ্টি' নামে প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেন অরুণ মিত্র ('প্রগতি'তে নাম ছিল অরুণকুমার মিত্র)। ঐ প্রবন্ধেরই একটি অংশ এখানে প্রকাশ করা হল। প্রবন্ধের শিরোনামা আমাদের দেওয়া। বানান ও যতিচিহ্নের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়েছে।—সম্পাদক]

ছাঁচ এবং সম্ভবত রূপের প্রতি অত্যধিক প্রীতির জন্যে ফরাসী সাহিত্য অনবরত কৃত্রিমতার রাজ্যে আকৃষ্ট হয়েছে। ক্লাসিক যুগের সাহিত্যের কৃত্রিমতা নষ্ট করবার জন্যে রোমান্টিসিস্ট আন্দোলন যে চেষ্টা করেছিল তাতে আরও বেশি কৃত্রিম সাহিত্যেরই সৃষ্টি হয়েছিল। তা ছাড়া নতুন লেখকগোষ্ঠীর প্রধান প্রতিনিধিরা কেউই—লামার্তিন, ভিঞি, এমন কি ভিক্তর য়্যুগো পর্যন্ত—এঁরা কেউই জনসাধারণের মধ্য থেকে উদ্ভূত হন নি, কিংবা জনগণের তাজা রক্তের স্পন্দন জাগাতে পারেন নি সাহিত্যে। অবশ্য য়্যুগো বেশ ভালোই জানতেন, মুক্তি আসবে কোন দিক থেকে। য়্যুগো যে জনসাধারণের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের, জনসাধারণের নামে কথা বলার, তাদের প্রতিনিধিত্ব করার প্রবল চেষ্টা করেছিলেন —তার কারণই এই। য়্যুগোর এই চেষ্টাই এখনকার দক্ষিণপন্থীদের কাছে অত্যন্ত বিসদৃশ এবং য়্যুগোর নির্বুদ্ধিতার প্রমাণস্বরূপ। আমিও অবশ্য মনে করি যে য়্যুগোর সুবিধাবাদ এর একটা কারণ; কিন্তু সে সুবিধাবাদ গভীর সহজাত অনুভূতির ফল।

কৃত্রিমতার দিকে, ভণ্ডামির দিকে আমাদের সাহিত্যের এই গতির উপর

আমি যে খুব জোর দিচ্ছি, এতে কি অতিরঞ্জন হচ্ছে? আমি মনে করি না। জোলার স্বভাববাদের (naturalism) পরেই যে প্রতীকপন্থী (symbolist) প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, তাতেও এই গতি লক্ষ্য করি। এমন কি জোলার মধ্যেও (যার গুণ ও প্রাধান্যকে বহু সমালোচক অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করেছেন) আমি দেখি বিষয়কে সংশ্লেষণ করবার, বস্তুনিরপেক্ষ করবার একটা ঝোঁক; এর ফলে তাঁর সমস্ত "বাস্তববাদ" সত্ত্বেও তাঁর রচনা প্রেরণায় না হোক, ছাঁচে হয়েছে রোমান্টিসিস্টদের অনুরূপ।

না, অতিরঞ্জন আমি একটুও করছি না; দক্ষিণপন্থীদের মধ্য থেকে একজন যে আমাদের সংস্কৃতির কৃত্রিমতা স্বীকার করেছেন এ জন্য আমি আনন্দিত; তবে তিনি স্বীকার করেও সেই কৃত্রিমতাকেই সমর্থন করেছেন। মঃ তিয়েরি মল্‌জিয়ের 'আক্‌সিয়ঁ ফ্রাঁসেজ' পত্রিকায় লিখছেন, "সভ্যতা হচ্ছে মিথ্যাচার। এ হচ্ছে স্বাভাবিক মানুষের স্থানে কৃত্রিম মানুষকে, নগ্নতার স্থানে পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ও মুখোশকে চালাবার চেষ্টা। কিন্তু সভ্যতার এই স্বভাববিরোধী গতি, সভ্যতার এই অপূর্ব মিথ্যাচারই সভ্যতার আসল উদ্দেশ্য, তার এবং আমাদের মহত্ত্ব—এ কথা যে অস্বীকার করে সে সভ্যতার বিরোধী।"

আমি বলি, "না"। আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে, সভ্যতাকে মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। এই রকম সভ্যতা—যা নিজে চায় ভুয়া হতে এবং নিজেকে ঘোষণাও করে তাই বলে, যা মিথ্যাময় সামাজিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি এবং ফল—এই রকম সভ্যতার মৃত্যুর বীজ নিজের মধ্যেই রয়েছে। যেসব রচনা সে এখনও সৃষ্টি করছে তা মৃতপ্রায়, যে সমাজ তাকে সমর্থন করছে তারই মতন মৃতপ্রায়। আমরা যদি এই কৃত্রিমতাকে নষ্ট না করতে পারি তবে আমরা মরব। কৃত্রিম আবেষ্টনীতে লালিত সংস্কৃতির দিন চলে গিয়েছে; যদি জাতীয়তাবাদীরা তাকে সমর্থন করেন তবে ভালোই; তাতে আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই এবং বুঝতে পারি যে, সংস্কৃতির প্রকৃত রক্ষকেরা আজ তাঁদের দিকে নেই, তারা বিপরীত তীরে, বিপক্ষ শিবিরে রয়েছে। অবশ্য আমি বলতে চাই যে, এই সংস্কৃতিকে আক্রমণ করতে আমি আদৌ ইচ্ছুক নই, তার দানের আমি প্রশংসা করি। অতীতকে অস্বীকার করা বিফল ও হাস্যকর। এমন কি, একথাও আমি স্বীকার করব যে, যে সংস্কৃতির স্বপ্ন আমরা দেখছি তাকে অবিলম্বে উপযুক্ত-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয় এবং এ সংস্কৃতির উপক্রমণিকারূপে একটা মিথ্যাচারী সংস্কৃতি প্রথমে নিশ্চয়ই আসবে। তা ছাড়া, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যতই

স্মরণ্য মনে হোক, আমাদের ঈপ্সিত কমিউনিজমে পৌঁছবার পথে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটা আবশ্যকীয় পর্যায়।

কিন্তু আমি জোর গলায় বলছি যে, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা এই অতীত সংস্কৃতির বিরোধিতা করেই শুধু বিকশিত ও সমৃদ্ধ হতে পারে, এই সংস্কৃতির জের টেনে আর সে বাড়তে পারে না। উপরোক্ত প্রবন্ধ রচয়িতা আমাকে তিরস্কার করে বলেছেন, আমি সংস্কৃতির শত্রু, কারণ আমি আন্তরিকতার দাবি নিয়ে যুঝি। আমার বৈরিতা আমাদের বর্তমান সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নয়; সেই সংস্কৃতির ঝুটা রীতিনীতির বিরুদ্ধে। আমি দৃঢ়স্বরে বলি, তারাই হচ্ছে সংস্কৃতির শত্রু যারা মিথ্যাকে সমর্থন করে এবং সেই সঙ্গে আমাদের বর্তমান মিথ্যাচারী সমাজব্যবস্থাকে সমর্থন করে, আমি দৃঢ়স্বরে বলি, সংস্কৃতির শত্রু আজ ফ্যাসিস্টরা, নাৎসিরা, এবং আমাদের স্বদেশের জাতীয়তাবাদীরা।…

অনুবাদ: অরুণ মিত্র

বিপথগামিনী মাতাকে হ্যামলেটের সম্ভাষণ

ঈ. এম. ফর্স্টার

['প্রগতি' সংকলনে প্রকাশিত 'ইংলণ্ডে স্বাধীনতা' প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশ (১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। প্রবন্ধের শুরুতে তারকাচিহ্নিত এই দুটি বাক্য ছিল : " 'A passage to India'-র লেখক ঈ. এম. ফর্স্টারের পরিচয় আমাদের দেশে নিষ্প্রয়োজন। প্যারিসের আন্তর্জাতিক লেখক সঙ্ঘের সম্মেলনে তাঁর বক্তৃতার অনুবাদ এখানে দেওয়া হল।" বানান ও যতিচিহ্নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রবন্ধের শিরোনামা আমাদের দেওয়া।—সম্পাদক]

এই পরিষদ যখন বক্তৃতা দেবার জন্য নিমন্ত্রণ করে আমাকে গৌরবান্বিত করলেন এবং তার বিষয় নির্বাচন করতে বললেন, তখন আমি উত্তরে জানিয়েছিলাম যে আমার বিষয় হবে 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতা' অথবা 'সংস্কৃতির ঐতিহ্য'—পরিষদের যেটা মনঃপূত। তবে উভয় প্রসঙ্গে আমি একই বক্তৃতা করব বলে স্থির করেছি। ইংরেজ ছাড়া আর কারও মুখে এই কথাটি ব্যঙ্গোক্তির মতো শোনাত। কিন্তু আমাদের দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে স্বাধীনতা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে দুটোর একত্র আলোচনা সেখানে কষ্টকল্পনা নয়। স্বাধীনতার স্তোত্রপাঠে ইংলণ্ড বহু শতাব্দী ধরে অভ্যস্ত। কর্তব্যনিষ্ঠা কিংবা আত্মত্যাগের স্তুতিও কম হয় নি। কিন্তু স্বাধীনতার মহিমা-কীর্তনেই সবচেয়ে বেশি লোকের কণ্ঠ সর্বদা মেতেছে। আজ যদি আমাদের সাহিত্যিকবৃন্দ সেই চিরাগত ঐতিহ্যের ধারাটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, যদি আজকের সমাজ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমরা সেই কথা বলতে ভরসা পাই, মিলটন শেলী ও ডিকেনস তাঁদের যুগে যা বলতে পেরেছিলেন, তাহলে ভাবব যে অন্তত এদিক থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ তিমিরাচ্ছন্ন নয়।

আমি জানি আমাদের এই স্বাধীনতা কত সঙ্কীর্ণ, কত ত্রুটিতে কত কলঙ্কে পরিপূর্ণ। এর পরিব্যাপ্তি একটি জাতির মধ্যে এবং সে-জাতির একটি শ্রেণীর মধ্যে নিবদ্ধ। এ-স্বাধীনতা ইংরেজের জন্য, তার সাম্রাজ্যভুক্ত অশ্বেতাঙ্গদের জন্য নয়। কোনো সাধারণ ইংরেজকে যদি বলা হয় তার স্বাধীনতার উত্তরাধিকারে ভারতবর্ষ ও কেনিয়াবাসীদেরও শরিক করতে, তাহলে 'টরি' হলে সে উত্তর দেবে

"কস্মিন কালেও না", এবং 'লিবরেল' হলে বলবে "তারা আগে যোগ্য হোক, তখন ভেবে দেখব"। গত বৎসর জেনেরল স্মটস সেণ্ট এণ্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভায় একটি জমকালো বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সে-বক্তৃতায় তিনি যা বললেন তার প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু একটি কথা তিনি বলেন নি। তিনি কোথাও ঘুণাক্ষরেও ইঙ্গিত করেন নি, মুহূর্তের জন্য চিন্তাও করেন নি, যে, যে-স্বাধীনতার বন্দনা তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে নির্ঘোষিত হল তা দক্ষিণ-আফ্রিকার কৃষ্ণকায় জাতিদেরও প্রাপ্য। এই একটি ত্রুটি তাঁর সমস্ত প্রশস্তিকে প্রহসন করে দিল।

তারপরে শ্রেণীর কথা। ইংলণ্ডে স্বাধীনতা তারাই ভোগ করে যাদের ট্যাঁকে পয়সা আছে। যার দুবেলা অন্নের সংস্থান নেই, স্বাধীনতায় তার পেট ভরে না। আমাদের লেখকগোষ্ঠীর কাছে আত্মপ্রকাশের স্বর্গাধিকার যতই অমূল্য হোক, সরকারি মুষ্টিভিক্ষার উপর যার দিন গুজরান এসব নিয়ে মাথা ঘামানো তার পোষায় না। সে জানে যে স্বাধীনতা হল বড়লোকের ব্যসন; যারা নিশ্চিন্তে খেয়ে দেয়ে তোয়াজ করে বেড়ায়, আইন অমান্য করার বাবুগিরি তাদেরই শোভা পায়। আমার নিঃস্বপ্রায় বন্ধু এবং একেবারে নিঃস্ব আত্মীয় কয়েকজন আছেন। এ-সম্মেলনের উপর তাঁদের অনাস্থা অবজ্ঞায় গিয়ে ঠেকেছে। স্বাধীনতায় যে আমার মতো বিশ্বাস করে অথচ চোখকান বুজে থাকা যার অভ্যাস নয়, এই তিক্ত বিদ্রূপের ভাব সে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছে নিশ্চয়ই। নিরন্ন ও নিরাশ্রয় যারা তারা স্বাধীনতার জন্য উদ্‌গ্রীব নয়, সংস্কৃতির ঐতিহ্য নিয়েও বিচলিত নয়। এ কথা স্বীকার করতে না চাওয়া নিছক ভণ্ডামি।

আমাদের জাতিগত ও শ্রেণীগত সঙ্কীর্ণতা সম্বন্ধে আমি সত্য গোপন করি না, কারণ তা সত্ত্বেও আমি স্বাধীনতার আদর্শে নিষ্ঠাবান, এবং আমার বিশ্বাস যে তার যে-বিশিষ্ট রূপটি ইংলণ্ডে পরিস্ফুট হয়েছে তার সার্থকতা আজো ঘুচে যায় নি—ইংলণ্ডের জন্য এবং সমস্ত পৃথিবীর জন্য। আমার রাষ্ট্রনীতি যে ফ্যাসিস্ত নয় তা আপনারা অনুমান করে থাকবেন; ফ্যাসিজম-এর কর্ম ও কাম্য দুই-ই অসৎ। আমি সাম্যবাদীও নই। হতে পারতাম, বয়স কম আর সাহস বেশি থাকলে, কারণ সাম্যবাদে আমি এখনো আশার স্ফুলিঙ্গ দেখতে পাই। তার কর্মপদ্ধতি যে সবক্ষেত্রে আমার মনঃপূত তা নয়, তবে উদ্দেশ্য তার শুভ বলেই মানি। আমার যুগ এবং আমার শিক্ষা আমাকে যা গড়েছে আমি তাই—

অর্থাৎ একজন বুর্জোয়া, ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের খুঁটিটাকে যে চোখ বুজে আঁকড়ে রয়েছে যদিও সে জানে যে ঐ খুঁটির কাঠে ঘুণ ধরেছে। এ-অসম্মানের লজ্জাটাও আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। আমাদের অতীত যুগকে আমি শ্রদ্ধা করি; সে-যুগের মৌরুসে আমরা যে-স্বাধীনতা পেয়েছি তার সংরক্ষণ ও সংবর্ধনকে একান্ত আবশ্যক জ্ঞান করি। তাই আজ আমি এখানে এসেছি আপনাদের কাছে জানবার জন্য অন্য সব দেশে কোন পথে এ-চেষ্টা চলেছে, কোন দুঃখের মধ্য দিয়ে। আমাদের দেশেও আজ দুর্দিন। তবু আমাদের কর্তাদের যে মুখে অন্তত স্বাধীনতার ভড়ংটুকু বজায় রাখতে হচ্ছে সেটা মস্ত সুবিধে। শেকস্পীয়রের ব্যক্তিগত মতামত যাই থাক, কবিগুরু ভণ্ডামির মাহাত্ম্য বুঝতেন। হ্যামলেট তার বিপথগামিনী মাতাকে যে সম্ভাষণ করেছিল, আমরা পার্লামেণ্টের আদি জননীকে সেই সম্ভাষণে অভিহিত করতে পারি :

> Good night ; but go not to mine uncle's bed ;
> Assume a virtue, if you have not.
> That monster, custom, who all sense doth eat,
> Of habits devil, is angel yet in this,
> That to the use of actions fair and good
> He likewise gives a frock of livery,
> That aptly is put on.

ব্রিট্যানিয়া আজ কুলত্যাগিনী হতে চাইলে একটু বিব্রত হবেন। এতকাল তিনি পতিভক্তির বহ্বাড়ম্বর করে এসেছেন বলে কলঙ্কের কথা চেপে রাখতে অধিকতর বেগ পেতে হবে। তাই তো আমাদের কাছে রাষ্ট্রব্যবস্থার বহিরাবরণ, ন্যায়বিচারের বাহ্যরূপ এত গুরুত্বপূর্ণ, তাদের উপর কড়া নজর রাখা এত আবশ্যক। "mine uncle's bed" পার্লামেণ্ট গৃহের বেঞ্চিগুলির অত্যন্ত কাছাকাছি, এবং সতী-সাধ্বীদের মন ভাঙানোর পক্ষে তার প্রলোভন দুর্নিবার— সে "uncle" ভর অসওয়ালড মসলে হলেও। অবশ্য এটাও কম কথা নয় যে ইংলণ্ডে আজো ভিক্টোরিয়া ভিক্টোরিয়াকে অভদ্র ভাবা হয়। ইহুদিদের মেরে ফেলাকে বদরুচি বলা হয়, এবং বেসরকারি সৈন্যদের যাত্রার সঙ মনে করা হয়।...

...তথ্যের খুঁটিনাটি থেকে ফিরে আসা যাক একটি সর্বব্যাপী প্রচেষ্টার উদ্বোধন প্রসঙ্গে—আমার মনে হয় তাই আমাদের সম্মেলনের মূল প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে আপনাদের সামনে পেশ করবার মতো আমার কিছু নেই। আমি কী চাই সেটুকু

অবশ্য আমি জানি। এবং তাই সংক্ষেপে ব্যক্ত করব। আমি চাই সাহিত্যসৃষ্টিতে ও সাহিত্যবিচারে পূর্ণতর স্বাধীনতা। বিশেষত ইংলণ্ডে লেখকদের সৃজনীশক্তি ব্যাহত হচ্ছে যৌন প্রসঙ্গে তারা স্বচ্ছন্দে লিখতে পারছেন না বলে; আমি চাই এ কথার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি যে ঐ প্রসঙ্গটির গভীর বিশ্লেষণ ও লঘু বিবরণ দুই-ই আবশ্যক। এর দ্বিতীয় দিকটা বক্তৃতামঞ্চে প্রায়ই উপেক্ষিত হয়ে থাকে বলে আমি বিশেষ করে সে-কথা পাড়লাম, সমালোচনার দিক দিয়ে আমি চাই সর্বসাধারণের পক্ষে সবকিছুর ভালোমন্দ বিচারের নির্বিঘ্ন অধিকার। ইংলণ্ডে আমাদের বরাত ভালো, আমরা এখনো সেটা থেকে বঞ্চিত হই নি, যদিচ বাইরে কোনো কোনো দেশে তার অন্তর্ধান ঘটেছে। কিন্তু এই অধিকারকে সার্থক করতে হলে শ্রোতারও দরকার, কাজে কাজেই আমি চাই মত প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হরেক রকম মত প্রচারের পরিপূর্ণ সুযোগ। এদিক দিয়ে ইংলণ্ডেও অন্যান্য দেশের মতো বিঘ্নের সৃষ্টি হয়েছে, প্রধানত বেতারের উপর সরকারি দখল পাকা হবার পর থেকে। সর্বোপরি আমি চাই আমাদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে।

এতে আমার কর্তব্য কী? আমি চেষ্টা করব নিজের দেশে বর্তমান শাসনতন্ত্রের সম্পূর্ণ সুযোগটুকু গ্রহণ করতে, এবং যা কতিপয় ধনী ও শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ তাকে সর্বশ্রেণী ও জাতির অধিগম্য করতে। আর চেষ্টা করব ইংরেজ লেখকদের সঙ্গে অন্যান্য য়ুরোপীয় লেখকদের সংযোগ নিবিড়তর করতে। আমরা এত দূরে দূরে থাকি, চারদিকে কী ঘটছে না ঘটছে তার খবর এত কম রাখি।

আমার বক্তব্য শেষ করবার পূর্বে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে আমি যা বলেছি তা আমারই মত, ইংরেজ প্রতিনিধিদের সমষ্টিগত মতামত নয়। দেশের পরিস্থিতি আমি যেমনভাবে বিবৃত করেছি তাতে বোধহয় ওঁদের আপত্তি হবে না, তবে আমার সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের মনের মতো নাও হতে পারে। তাঁরা হয়তো ভাবছেন, স্বাধীনতা ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে কথা বলা কথার অপব্যয় মাত্র যতদিন সমাজের আর্থিক ব্যবস্থার গোড়ায় গলদ রয়েছে। তাঁরা বলতে পারেন যে আরেকবার যুদ্ধ বাধলে মিঃ অলডস হক্সলি কিংবা আমার মতো ব্যক্তিবাদী ও উদারপন্থী লেখকদের পাততাড়ি গুটোতে হবে। এটা নিশ্চিত যে আমাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে, এবং আগামী যুদ্ধও আসন্নপ্রায়। আমার বিশ্বাস যে জাতির পর জাতি যদি রণসম্ভারে কেবলই ভাণ্ডার ভরতে থাকে তাহলে তাদের কামান-বন্দুক থেকে গুলিবর্ষণ তেমনি অনিবার্য যেমন অনিবার্য নিরন্তর খাদ্যরত জন্তুর পক্ষে মলত্যাগ। অবস্থা যখন এইরূপ তখন আমার এবং আমার সমানুভব

ব্যক্তিদের কাজ হচ্ছে ইতোমধ্যের কাজ। আমাদের মরচে-পড়া যন্ত্রপাতি দিয়ে টুকিটাকি এটা ওটা করে যেতে হবে যতদিন না সভ্যতার ইমারতসুদ্ধ ভেঙে পড়ছে। ভেঙে যখন পড়বে, কিছুই আর কোনো কাজে লাগবে না, তারপরে, যদি "তারপরে" বলতে কিছু থাকে, সভ্যতার নব-অভিযানে যারা এসে যোগ দেবে, তারা নতুন শিক্ষা নতুন মন্ত্র নিয়ে আসবে।

যুদ্ধের দুর্ভাবনা নিজের মৃত্যুর দুর্ভাবনার চেয়েও আমাকে বেশি বিব্রত করে, যদিও ওদুটো কদর্য ব্যাপারে আমার একই কর্তব্য। দৈনন্দিনের কাজকর্মে আমাকে এমন ভাব ধারণ করতে হবে যেন পরমায়ু অক্ষয় আর সভ্যতা অনন্ত। দুটি উক্তিই মিথ্যা—আমিও বেঁচে থাকব না, আমাদের এই বিপুল পৃথিবীটাও টিকে থাকবে না—দুটোই সত্য বলে ধরে নিতে হবে যদি আমরা খাওয়া-দাওয়া চলা-ফেরা বন্ধ করতে না চাই, আর যদি মনের অন্ধকার কক্ষে দুটি-একটি মুক্ত বাতায়নের প্রয়োজন বোধ করি। বক্তৃতা করা যদিও আমার পেশা নয়, তবু এই কটি কথা বলবার জন্য প্যারিসে আসবার ইচ্ছা সংবরণ করতে পারি নি। বর্তমান সংকটের প্রতিবিধান সম্বন্ধে মতানৈক্য যতই ঘটুক, এবং অনিবার্যরূপে তা ঘটবেই, নির্ভীকতার প্রয়োজন আমরা সকলেই স্বীকার করি। লেখকের মন যদি ভয়শূন্য ও সংবেদনশীল হয় তাহলে আমার বিশ্বাস যে সাধারণের কাছে আপন কর্তব্য সে পালন করেছে; আসন্ন দুর্যোগে মানবজাতিকে দলবদ্ধ করতে সে সহায়তা করেছে। এবং আমি এখানে বিভিন্ন দেশ থেকে সমাগত সহযাত্রীদের মধ্যে যে-নির্ভীক চিত্তের সাক্ষাৎ পাব, আমার সাহসকেও তা বলিষ্ঠ করবে।

অনুবাদ: আবু সয়ীদ আইয়ুব

অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলি

ডলরেস ইবারুরি

[১৯৩৬-এর ১৮ জুলাই ফ্রাঙ্কো, মোলা ও অন্যান্য ফ্যাসিস্ট সেনাপতিরা স্পেনের প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সেইদিনই স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ শহরের বেতারকেন্দ্র থেকে নারীকণ্ঠে প্রতিরোধের দৃপ্ত আহ্বান ছড়িয়ে পড়ে সারা স্পেনে: "হাঁটু গেড়ে বেঁচে থাকার চেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মরাও ভালো।" ছড়িয়ে পড়ে তাঁর ইস্পাত-কঠিন ঘোষণা: "নো পাসারান! দস্যুদের বিজয়ী হতে কিছুতেই দেব না।" যে-বিপ্লবী নেত্রীর ঘোষণা সেদিন সমগ্র স্পেনের শ্রমজীবী জনতাকে উদ্দীপিত করেছিল, তাঁর নাম ডলরেস ইবারুরি—'লা পাসিওনারিয়া'। নিজে খনি শ্রমিকের মেয়ে, ১৮৯৫-তে তাঁর জন্ম। ২১ বছর বয়সে তিনি সমাজতন্ত্রের আদর্শে দীক্ষিত হন, ১৯২০-তে স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৩৪-এ দক্ষিণপন্থী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আস্টুরিয়ার খনি শ্রমিকদের সশস্ত্র গণউত্থানের তিনি ছিলেন অন্যতম নেত্রী। ফ্যাসিস্ট প্রতিবিদ্রোহের ও গৃহযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী বছরগুলিতে (১৯৩৬-১৯৩৯) তিনি ছিলেন ফ্যাসিস্টবিরোধী প্রতিরোধ-সংগ্রামের উজ্জ্বলতম প্রতিনিধি। বর্তমানে ৮০ বছর বয়সেও তাঁর বিপ্লবী উদ্দীপনা অম্লান রয়েছে—তিনি এখন স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদিকা। তাঁরই আত্মজীবনী থেকে একটি অধ্যায় এখানে পরিবেশন করা হচ্ছে—যে-অধ্যায়ে বিশেষ করে তিনি লিখেছেন ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে ও স্পেনের প্রজাতন্ত্রের সপক্ষে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যের কথা। —অনুবাদক]

হিংস্র পশুটার মুখের দুর্গন্ধ মাদ্রিদের বাতাসকে কলুষিত করছে। এগিয়ে আসছে জন্তুটা, আর আজকেই গণপ্রতিরোধকে মরণ-কামড় দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। আজ, ১৯৩৬-এর ৭ই নভেম্বর, ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের জন্মবার্ষিকী। প্রতিবিদ্রোহীরা ভাবছে যে তারা এমন এক প্রচণ্ড আঘাত করবে, যে-আঘাতে মাদ্রিদের প্রবেশপথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে, হাঁটু গেড়ে আত্মসমর্পণ করবে প্রজাতন্ত্রী স্পেন, আর মানুষের চেতনা থেকে সম্পূর্ণ মুছে যাবে এই স্মরণীয় তারিখটি।

প্রচণ্ড লড়াই চলছে। রাজধানী দখল করার জন্ত বিদ্রোহীদের প্রথম প্রচেষ্টা গণবাহিনীর হাতে পরাজিত হল। তবুও, বেশ খানিকটা এগিয়ে এল বিদ্রোহীরা। মাদ্রিদ এখন ক্ষতবিক্ষত ; অস্ত্রের আঘাতে রক্ত ঝরছে তার সর্বাঙ্গ থেকে। শহরের চারপাশের রাস্তায় দ্রুত পরিখা খনন করা হচ্ছে, ব্যারিকেড গড়ে তোলা হচ্ছে ভাঙা বাড়িঘর ও কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে। শহর থমথম করছে ; মাঝে মাঝে সাইরেনের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শহরের মানুষদের মনে করিয়ে দিচ্ছে যে বিপদ খুবই কাছে।

বিদ্রোহীরা কামান দাগছে সেরো দে লো এঞ্জেলস থেকে, বোমাবর্ষণ করছে তাদের বোমারু বিমান থেকে। ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে মাদ্রিদের বড় বড় বাড়িগুলি, বিস্ফোরণে যেন তাদের নাড়িভুঁড়িও বেরিয়ে পড়েছে ; শতাব্দীর পুরনো স্মৃতি-স্তম্ভগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে, আগুনে ভস্মীভূত হচ্ছে কত অমূল্য শিল্প-সম্ভার, প্রাণ হারাচ্ছে হাজার হাজার নরনারী। বোমায় বিধ্বস্ত হল প্রাদোর যাদুঘরটি। পুড়ে ছাই হয়ে গেল আলবার ডিউকের প্রাসাদ, যার মধ্যে ছিল কত না মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল আর শিল্প-সম্ভার। আশেপাশের সমস্ত বাসিন্দা কামান গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে পেছিয়ে যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঞ্চলে।

পঞ্চম রেজিমেন্টের (কমিউনিস্ট নেতৃত্বে গঠিত : অনুবাদক) লাউডস্পীকার থেকে অনবরত জনসাধারণকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে—কি তাদের করা উচিত, আর কি না করা উচিত। তারা হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে যে শত্রুর এই নবতম আক্রমণকে রুখতেই হবে। মাদ্রিদ আজ আর গতকালের নিরাপদ, মুক্ত শহর নয়। আজ এটা অবরুদ্ধ দুর্গ। মাদ্রিদের শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থদের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন যেসব লোক—ছেলে ও মেয়ে—মাদ্রিদে রয়েছে, তারা মাদ্রিদের গৌরবময় ইতিহাসে আর এক নতুন উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাদের দুর্জয় সঙ্কল্প : তাদের প্রিয় শহরটির প্রতিটি রাস্তা, প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি ইঞ্চি জমি, তারা রক্তের মূল্যেও রক্ষা করবে।

শত্রুর আক্রমণ এগিয়ে আসছে। জনতাও সজাগ এবং প্রস্তুত। হিসেব করা হচ্ছে, সমস্ত সম্ভাবনার কথা মনে রাখা হচ্ছে। কয়েকটি ঘণ্টা কেটে গেল। উত্তেজনায় স্নায়ুতন্ত্রে অসহনীয় চাপ পড়ছে। মাদ্রিদের জনতা মুঠো শক্ত করে অপেক্ষা করছে, কান খাড়া, চোখে অতন্দ্র প্রহরা—তারা খুঁজছে কোথায় দুশমন, কোন ছিদ্রপথে তারা মাদ্রিদে ঢুকতে পারে, কোথায় ছোবল মারতে পারে তাদের বিষদাঁত !

সাবধান! চারদিকে আতঙ্ক, বিপদ, চোরাগোপ্তা আক্রমণের সম্ভাবনা! এমন সময় আমরা শুনতে পেলাম একটানা ভারী বুটের শব্দ, ক্রমেই বাড়ছে, ক্রমেই কাছে আসছে। এবারে, একেবারে পাশের রাস্তায় অবিশ্রান্ত বুটের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্য আমাদের মনে সংশয়, কি করব? ওরা কারা? আজ, ১৯৩৬-এর এই ৭ই নভেম্বরে, ওরা কারা চলেছে মাদ্রিদের রাজপথ প্রকম্পিত করে? ওদের মুখ কঠোর, মাথা উঁচু, কাঁধে রাইফেল, তাতে ধারালো বেয়নেটগুলি রোদে ঝলসাচ্ছে!

জানালার পিছনে গণবাহিনীর যোদ্ধাদের হাত বন্দুকের ট্রিগারে, বোমা তৈরি। উদ্বিগ্ন চোখে ওরা তাকিয়ে রয়েছে এই অভিযাত্রী সেনাদলের দিকে। মেয়েরা হতাশায় ছেলেদের কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে বলছে: "ওরা ঢুকে পড়েছে! আমরা কেন অপেক্ষা করছি?"

এমন সময় রাস্তা থেকে বিদেশী ভাষায়, তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ শোনা গেল—বাতাসে যেন চাবুকের শিষ। তারপরই অজানা একাধিক বিদেশী ভাষায়, অভিযাত্রীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল আমাদের অতি পরিচিত, অতি প্রিয় সেই গানের কলি: "জাগো, জাগো, জাগো সর্বহারা…"। আকাশ বাতাস ভরে গেল গানের সেই বজ্রনিনাদে। মাদ্রিদের জনতার স্নায়ুতে শিহরণ খেলে গেল। মেয়েরা আনন্দে কেঁদে ফেলল: "আমরা কি স্বপ্ন দেখছি?" মাদ্রিদের রাজপথ পদভারে কাঁপিয়ে অভিযাত্রীরা তখন 'ইন্টারন্যাশনাল' গাইছে ফরাসী ও ইতালীয়, জার্মান ও পোলিশ, রুমানীয় ও হাঙ্গেরীয় ভাষায়। এরা ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের দেশে, আমাদেরই পাশে দাঁড়িয়ে লড়তে এবং হয়তো মরতে এসেছে।

মাদ্রিদের জনতা প্রবল উচ্ছ্বাসে রাস্তায় নেমে এসে তাদের অভ্যর্থনা জানাল। এখন তারা বুঝেছে যে এরা আমাদের বন্ধু। ভালোবাসায়, আবেগে তারা হাসছে, কাঁদছে, জড়িয়ে ধরে আদর করছে ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের সহযোদ্ধাদের। থমকে দাঁড়িয়েছে অভিযাত্রীরা। মাদ্রিদের প্রতিটি মানুষই চাইছে তার নিজের বাড়িতে, অন্তত একবারের জন্য একজন স্বেচ্ছাসেবককে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতে। ভুলে গেছে তারা মুহূর্তের জন্য অবরোধের কথা, বিপদের কথা। হঠাৎ, আনন্দ গান হাসি ছাপিয়ে শোনা গেল দূরে বিমানের মৃদু গর্জন। সবাই চিৎকার করে উঠল: "বোমারু বিমান! বোমারু বিমান!"

কয়েকটা কালো বিন্দু ক্রমে বড় হয়ে উঠল। এবার তাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে,

ওরা কাছে আসছে, খুব নিচু দিয়ে উড়ছে। কিন্তু এগুলি তো জার্মান বা ইতালীয় বিমান বলে বোধ হচ্ছে না। এ কাদের অজানা বিমান, আমাদের কাছে এগিয়ে আসছে? কিন্তু তারা তো মেশিনগান চালাচ্ছে না, বা বোমাও ফেলছে না! এরা কারা?

এক ঝাঁক বিমান মাদ্রিদের আকাশের উপর দিয়ে উড়ে, নিচু হয়ে অভিবাদন জানাল জনতাকে। তখন আমরা দেখতে পেলাম তাদের প্রত্যেকের ডানায় আঁকা প্রজাতন্ত্রের পতাকা। পরে স্পেনীয়রা ভালোবেসে এদের নাম দিয়েছিল 'মাছি' আর 'বোঁচা নাক'। কিন্তু সেদিনের সেই মুহূর্তটি বর্ণনার অতীত। আকাশের দিকে তাকিয়ে, বিস্ময়ে ভালোবাসায় উল্লাসে হাজার হাজার কণ্ঠ থেকে জয়ধ্বনি বেরিয়ে এল—অভিবাদন জানাল আমাদের আকাশে ওড়া প্রথম সোভিয়েত বিমানবহরটিকে। লক্ষ কণ্ঠে শোনা গেল: "এগুলো সোভিয়েত বিমান! এগুলো আমাদের···আমাদের···আমাদের!" এই এক অবিস্মরণীয় মুহূর্তে বহু দূরের সমাজতন্ত্রী দেশ আমাদের গণফৌজ ও সমস্ত নরনারীর হৃদয়ের এত কাছাকাছি এসে গেল, যে আর কোনওদিনই কোনও সীমান্ত, কোনও সমুদ্র, কোনও পর্বতমালা, কোনও বন্দীশালা বা কোনও সন্ত্রাসই স্পেনের জনগণ ও সোভিয়েতের জনগণের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না। আজও না, ভবিষ্যতেও না। চিরকালের মতো অচ্ছেদ্য বন্ধনে তারা আবদ্ধ—সংগ্রামে, বীরত্বে, আত্মত্যাগে।

মাদ্রিদ তার শক্তিকে যেন আবার ফিরে পেয়েছে। সে এখন দুর্জয়। বিদ্রোহীদের আক্রমণ প্রতিহত হচ্ছে বার বার, প্রতিহত হবে আরও শতবার।··· মাদ্রিদ রক্ষার সংগ্রামে ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের এক সম্মানিত স্থান রয়েছে। অবরোধের শাণিত ছুরিকা যখন প্রায় মাদ্রিদের কণ্ঠনালীতে ঠেকছিল, তখন আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড। তাদের দেখে মাদ্রিদের জনগণের প্রতিরোধের ক্ষমতা শত গুণ বেড়ে গেল এবং তাদের উভয়ের সম্মিলিত শক্তিতে তারা রুখে দিয়েছিল ফ্যাসিস্টদের জয়যাত্রাকে।

মাদ্রিদ রক্ষার এই সংগ্রামেই জন্মেছিল থেলম্যানের গান। জার্মান সহযোদ্ধারা লড়তে লড়তে এবং মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই গান গাইতেন। জার্মানির জনগণ আজও সগর্বে এই গান গেয়ে চলেন, অভিবাদন জানান স্পেনের মৃত্যুহীন সংগ্রামকে—

স্পেনের আকাশে তারাগুলি ঝলমল করছে;
নিচে, অনেক নিচে, পরিখায় বসে আমরা—
ভোর হয়ে আসছে,
ডাক আসছে যুদ্ধের!
বহুদূরে ফেলে এসেছি আমাদের মাতৃভূমি;
তবু, এখানেই, প্রতিরোধে আমরা অটল!
তোমাদের, আমাদের সংগ্রামের একই লক্ষ্য—
স্বাধীনতা!

ফ্যাসিস্টদের বিদ্রোহ একটা মহাপ্লাবনের মতো আমাদের দেশকে ধ্বংস করছিল। তার বিরুদ্ধে জনগণের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সারা পৃথিবীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। এই সংগ্রামে কেউ নিরপেক্ষ ছিল না। হয় তোমরা আমাদের পক্ষে, নয়তো বিপক্ষে। যুদ্ধ ও শান্তি, ফ্যাসিবাদ ও গণতন্ত্র—এদের মধ্যে সংগ্রামে উদাসীন থাকার অর্থই হল আক্রমণকারীকে সাহায্য করা। সারা পৃথিবীর মানুষদের সংগ্রামী মেজাজকে লক্ষ্য করে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সকল ফ্যাসিস্টবিরোধী ও গণতন্ত্রকামীর কাছে ডাক দিল: স্পেনের পাশে দাঁড়াও। তারা ডাক দিল: নিজের দেশে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ো এবং স্বাধীনতার সপক্ষে লড়বার জন্য তাদের স্পেনে পাঠাও।

এই আহ্বানে সবার আগে সাড়া দিল ফরাসী, জার্মান, ইতালীয় ও পোলরা। প্রথম আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সেনাপতি হয়ে এলেন হাঙ্গেরীর কমিউনিস্ট নেতা এমিল ক্লেবার—মাদ্রিদকে রক্ষা করতে। জার্মানি তখন হিংস্র নাৎসি পশুর থাবার নিচে। কিন্তু হিটলার ভাঙতে পারে নি তাদের সবার মনোবল। সেখান থেকে এল বাছাই করা ফ্যাসিস্টবিরোধীরা ও কমিউনিস্টরা—ফ্রানৎস ডাহ্লেম, হানস বেইমলার, হেনরিখ রাউ, গুস্তাফ ৎসিস্তা, হাইনৎস হফ্‌মান, লুই স্স্টার, লুডউইস রেন।

হিটলারের বিরুদ্ধে প্রথম রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বুলগার জনতার মহান সন্তান ও বিপ্লবী নেতা ডিমিট্রভ। সেই বুলগারিয়া থেকে এল শত শত শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবী। স্পেনের মাটিতে তারা নিয়ে এল নিজেদের বীরত্ব ও বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা। ইতালি থেকে এলেন ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রামে পোড়খাওয়া সহযোদ্ধারা—লুইজি লঙ্গো, পিয়েত্রো নেন্নি, ঘ ভিত্তোরিও, নিনো নানেত্তি, ভিত্তোরিও ভিদালি, প্যাকিয়ার্ডি, রোসেল্লি প্রভৃতি। সবচেয়ে বেশিসংখ্যক

স্বেচ্ছাসেবক এল ফ্রান্স থেকে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন তুর্ম, আঁদ্রে মার্তি, ডাঃ রুকে, কর্নেল ফ্যাবিয়েন—আরও অনেকে।

১৯৩৬-এর নভেম্বরে, মাদ্রিদের রাজপথে ফরাসী ও জার্মান স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়কত্ব করছিলেন তুর্ম ও হানস কাহ্লে—যাঁরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়েছেন এবং এখন স্পেনের মাটিতে তাঁরা সহযোদ্ধা—কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়ছেন ফ্যাসিস্ট দুশমনের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সপক্ষে। হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, ব্রিটেন, যুগোস্লাভিয়া, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন—মোট ৫৪টি দেশ থেকে হাজার হাজার সেরা তরুণ তাদের রক্ত ঢেলে দিতে এসেছিলেন স্পেনে। ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের জনসংখ্যা হয়তো খুব বেশি ছিল না, কিন্তু ঐতিহাসিক তার গুরুত্ব। স্পেনের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল তাদের নিজ নিজ দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামী ঐতিহ্য।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের যে বীরেরা ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের হয়ে লড়তে এসে, স্পেনের মাটিতে শহিদত্ব বরণ করেছিলেন, তাঁদের স্মরণ করে ল্যাংস্টন হিউজ লিখেছেন :

একটা সমুদ্র
আর আধখানা মহাদেশ পেরিয়ে
আমি এলাম!
সীমান্ত,
স্বর্গের মতো উঁচু পর্বতমালা
আর রক্তচক্ষু সরকারেরা,
আমাকে বলল : না,
তুমি কিছুতেই যেতে পাবে না!
তবু আমি এলাম!
আগামীকালের প্রদীপ্ত সীমানায়
আমি জয় করলাম
আমার সাহস ও বুদ্ধি নিয়ে—
খুব বেশি নয়,
কারণ বয়স আমার নিতান্তই অল্প!

(বলা ভালো আমি তরুণ ছিলাম,
কেন না আমি তো এখন মৃত !)

যা দিতে চেয়েছিলাম
তা আমি দিয়েছি—
আমার সর্বস্ব—
যাতে আর সবাই বাঁচতে পারে।
আর যখন বুলেটে বিদ্ধ হল আমার হৃদয়,
যখন ঝলক ঝলক রক্তে
ভরে গেল আমার মুখ—
তখন আমি ভাবলাম,
এটা কি রক্ত,
না রক্তাভ বহ্নিশিখা ?
না কি আমার মৃত্যু
জন্ম দিচ্ছে নতুন জীবনকে ?

সবই এক !
আমাদের স্বপ্ন !
আমার মৃত্যু,
তোমাদের জীবন !
আমাদের রক্ত !
দীপ্ত বহ্নিশিখা !
সবই আজ এক হয়ে গেছে।

অনুবাদ : গৌতম চট্টোপাধ্যায়

১০

এগিয়ে চলো

আঁদ্রে মালরো

[বিশ্ববখ্যাত ফরাসী বুদ্ধিজীবী আঁদ্রে মালরো রাজনীতিতে বরাবরই ছিলেন বামপন্থী। ১৯২৭-এ চীনা গণবিপ্লব যখন চিয়াং-এর বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজিত হয়, তখন তিনি ছিলেন সাংহাইয়ে। নিজের চোখে দেখেছিলেন প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে চীনা কমিউনিস্টদের মৃত্যুভয়হীন লড়াই। সেই অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে তিনি লিখেছিলেন প্রসিদ্ধ উপন্যাস—'মানুষের ভাগ্য'। আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ যখন স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রকে আক্রমণ করে, তখন সেখানকার 'পপুলার ফ্রন্ট' সরকারের আহ্বানে সারা পৃথিবীর প্রগতিশীল মানুষেরা বিপন্ন স্পেনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, গড়ে তুললেন আন্তর্জাতিক বাহিনী। সেই বাহিনীরই ছোট্ট বিমান বহরের অধিনায়ক ছিলেন আঁদ্রে মালরো। আর সেই অভিজ্ঞতা থেকেই রচনা করেছিলেন স্পেনের মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কিত উপন্যাস—'আশাভরা দিনগুলি।' তারই একটি ছোট অধ্যায় এখানে অনুবাদ করে দেওয়া হল। মাদ্রিদ থেকে সামান্য দূরে ইতালীয় ফ্যাসিস্টদের পাল্টা আক্রমণের প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক বাহিনীর একাংশের ও তাদের স্পেনীয় সাথীদের বেপরোয়া লড়াইয়ের বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে।— অনুবাদক]

গুয়াডালাজারা
১৮ই মার্চ

ইতালীয়রা ব্রিহুয়েগার দিকে পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছিল। যদি তারা একবার সেখানে ঢুকে পড়তে পারে, তাহলে প্রজাতন্ত্রী ফৌজদের পিছন থেকে আক্রমণ করতে পারবে। তার ফলে, গুয়াডালাজারা আবার বিপন্ন হবে, কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মাদ্রিদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, শহরের প্রতিরোধ-ক্ষমতা কার্যত ভেঙে পড়বে; আর ডিমিট্রভ, থেলম্যান, গারিবল্ডি, আঁদ্রে-মার্তি এবং '৬ই ফেব্রুয়ারি' বাহিনীগুলির পিছু হটার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। ত্রিজুয়েক এবং আইবারা দখলের লাভ সবই মুছে যাবে।

থেলম্যান ও এডগার আঁদ্রিয়া বাহিনীদ্বয় যুদ্ধে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ডিমিট্রভ বাহিনীর সৈন্যরা (সমস্ত বলকান রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধি, ক্রোট, বুলগার, রুমানীয়, সার্ব এবং প্যারিসের যুগোস্লাভ ছাত্র) ফ্যাসিস্টদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মনে করত যে তারা তাদের দেশের জনগণের হত্যাকারীদেরই সামনে দাঁড়িয়ে। এখানেও তারা জারামারই মতো, চব্বিশ ঘন্টা ধরে, বনের মধ্যে লুকিয়ে থেকে, ইতালীয় ট্যাঙ্কগুলিকে অজস্র গালিগালাজে বিধ্বস্ত করে। তারা আধ মাইল জমি দখল করে, কিন্তু ভয়ঙ্কর ক্ষোভ সত্ত্বেও, লাইন সোজা রাখবার জন্য আবার পিছিয়ে যায়। চার-পাঁচ জন একসঙ্গে মাছির মতো পরস্পরের গায়ে হেলান দিয়ে শুয়েছিল—ঠাণ্ডা যাতে কম লাগে, তাই। এই বাহিনী এখন বোমাবর্ষণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছিল আক্রমণ করতে। একটি শাখার নায়ক, কোনো এক মণ্টেনেগ্রিন, পিছন দিকে দৌড়চ্ছিল চিৎকার করতে করতে: "এই শালারা, লাইন ঠ্যাখ, আমাকে দেখতে হবে না।" সে ডান হাত দিয়ে তার ভাঙা বাঁ হাতটা ধরে ছিল। এমন সময়ে একটা বিস্ফোরক বুলেট এসে তার মাথাটা পাঠিয়ে দিল বরফের মধ্যে।

আবার তুষারপাত শুরু হয়েছিল। সমস্ত লাইন জুড়ে সেনারা, যারা এগোচ্ছিল মাথা নিচু করে, ক্ষতের আশঙ্কায় পেটের পেশী কঠিন করে; বোমার টুকরোগুলো তারা পাশ দিয়ে যেতে দেখল তুষারকণারই মতো দলে দলে।

থেলম্যান বাহিনীতে এখন দুটি মাত্র কথা শোনা গেল: "খাবারটা কোথায়?" আর "ভাই, যুদ্ধও হবে, লোকও মরবে না, এও কি আশা করা যায়?"

মেশিনগান কোর-এর রাজনৈতিক প্রতিনিধির পাকস্থলীতে আঘাত লেগেছে; বিকারগ্রস্ত অবস্থায় সে মাঝে মাঝেই চেঁচিয়ে উঠছে: "আমাদের ট্যাঙ্কগুলো পাঠাও! আমাদের ট্যাঙ্কগুলো পাঠাও!"

যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর পর্যন্ত একাদশতম আক্রমণটি ব্যাটেলিয়ান সবে প্রতিহত করেছে। গাছগুলোর গুঁড়ি তখনও ছিল, কিন্তু ডালপালা আর ছিল না। সাইরি ফ্রাঙ্কো বেলজীয়দের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে, "এটা যুদ্ধ নয়! এটা কেবল হাততালির গমক, যা চলেছে তো চলেইছে।" এই বলেই সে মেশিন-গানের ঢোঁকগেলা র‍্যাট-ট্যাট-ট্যাট শব্দের অনুকরণ করতে থাকল।

রাইফেলগুলো তাদের হাতে আগুন-গরম হয়ে উঠছিল। ম্যানুয়েলের বাহিনীতে, পোপের লোকেদের একটা মেশিনগানের জন্য সাত শ পঞ্চাশ রাউণ্ড বাকি ছিল। মেশিনগানটা মিনিটে ছোড়ে ছ শ রাউণ্ড। এর অর্ধেক বিলি

করে দেওয়া হল সেরা বন্দুকবাজদের মধ্যে। পুরনো, পরিত্যক্ত বন্দুকগুলো দেখে ক্ষোভ ও বিরক্তিতে সৈন্যদের কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা। শাখা-নায়ক চেঁচিয়ে ডাকল, "মেশিনগানটা এখানে আনো।" প্রথম বোমাটির ধোঁয়া যখন কেটে গেল, তখন, সে যেখানে তর্জনী দিয়ে মেশিনগান আনবার জন্য দেখিয়েছিল, ঠিক সেখানেই তার মৃতদেহ পড়েছিল। কিছু পরে কিছু গোলাগুলি এবং কয়েকটি রাইফেল এসে হাজির হল।

অবশেষে ব্রিহুয়েগার উপরকার মাঠ ও বন থেকে একটি হুঙ্কার ধ্বনিত হল, যে ধ্বনি প্রবল বোমাবর্ষণ ভেদ করেও কানে আসছিল। সেই হুঙ্কার তুলে নেওয়া হল অলিভ ঝাড় এবং নিচু পাঁচিলগুলির কাছে, যেখানে প্রজাতন্ত্রীরা পোকার মতো মাটি এঁটে শুয়েছিল, আর তুলে নেওয়া হল বিধ্বস্ত খামার ও চষা জমিতে। দিকচক্রবালরেখা যেন ফ্যাসিস্ট গোলন্দাজ বাহিনীর কানফাটানো তীব্র নাদে বর্ধমান—প্রজাতন্ত্রী ট্যাঙ্কগুলি লড়াইয়ে নামছে। তারা আক্রমণ করেছিল গোটা যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে। পাশাপাশি পঞ্চাশটিরও বেশি ট্যাঙ্ক; দিগন্তের এক সীমারেখা থেকে আর এক সীমারেখা পর্যন্ত তাদের বিস্তার, তাদের উপর দিয়ে তীব্র ঝড় বয়ে গেলে মাঝে মাঝে যার কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

জমে যাওয়া অলিভ গাছের নিচে যারা কয়েক মুহূর্তের অশান্ত ঘুম ছিনিয়ে নিচ্ছিল; নিদারুণ ক্লান্তির আচ্ছন্নতায় যারা ঢলে পড়ছিল এবং উঠে বসছিল নিজেদের দেহ তক্তার মতো কঠিন বোধ করে; তারা শেষ ট্যাঙ্কগুলির—যে ট্যাঙ্কের দর্শন তারা হারিয়ে ফেলছিল বারংবার তুষারপাতের ফলে—পিছনে পিছনে দৌড়তে শুরু করল।

ঐ কোর-এ প্রথম মারা যায় ১নং কোম্পানির ক্যাপ্টেন। কয়েক মুহূর্ত পরে প্রজাতন্ত্রীদের একটি ট্যাঙ্ক জ্বলে উঠল; রাঙিয়ে দিল অদ্ভুত এক নীলচে আভায় শ্বেতবর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র এবং ঝুলন্ত তুষারকণাগুলিকে।

দুই দিক থেকে শত্রুর গুলিচালনায় আটকা পড়ে, গাছের গুঁড়ির পিছনে মাটিতে সটান শুয়ে, সকলে গুলির খোল এবং টুপি দিয়ে খুঁচিয়ে বরফ তুলতে লাগল—বেয়নেট ব্যবহার করলে নিজেদের তারা ধরিয়ে দিত—এবং গর্তের মধ্যে গেড়ে বসল; কখনো কখনো উঠে দাঁড়াচ্ছিল মুহূর্তের জন্য, বোমা ছুড়তে, আর ফের বসে পড়ছিল গর্তে, যখনই মেসিনগান তাদের দিকে তাগ করা হচ্ছিল। যে ছয় জন স্বেচ্ছাসেবক আহত ক্যাপ্টেনকে ফিরিয়ে আনছিল, তাদের চার জনের পতন হয়। দু-ধারের আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলি কেবলই শুনতে পাচ্ছিল

পিছনে বিস্ফোরক বোমা ফাটার শব্দ, আর কখনো সখনো একটা গলার চিৎকার : "সব ঠিক আছে, ভাইসব ?" এবং অন্যদের উত্তর, "মন্দ নয় ! তোমাদের কি অবস্থা ?"—এবং, এরই মধ্যে, আস্তে, চাপা স্বরে, গোটা যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে, সাহায্যের কাতর আবেদনে এক করুণ আর্তনাদ।

তিনটে নাগাদ অসম্ভব ক্লান্তির তাড়নায় লোকে ঝিমিয়ে পড়ছিল, আর, বরফের মধ্যে রাত্রি কাটানোর চিন্তায় ভীত হয়ে উঠছিল। গরম কফি হাতে হাতে ঘুরে গেল। ভারী কান ঢাকা টুপির নিচে তাদের মাথায় ঘুরছিল মাদ্রিদের দিনগুলির কথা, যেখানে ট্রেঞ্চে বসে, খাবার সময়ে তারা দু-একটা ফালতু গুলি চালাত, যেখানে চালাক চতুর অনেকে ইঁদুর পুষেছিল, এবং বিবাহিত লোকেরা বোমা পড়বার অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে নিঃশব্দে তাকাত তাদের ছেলেমেয়েদের ছবির দিকে। সেগুলো ছিল আরামের দিন। তাদের মনে পড়ছিল জারামার যুদ্ধের কথাও—যেখানে তারা ফ্যাসিস্ট ট্যাঙ্কগুলোর গোলা-বারুদ ফুরিয়ে গেলে সেগুলোর পিছু ধাওয়া করেছিল ; এবং লোকে দৌড়ে এসেছিল, জল নেই বলে মেশিনগানের নল ঠাণ্ডা করবার জন্ত প্রস্রাব চেয়ে।

"বুলেটহীন কোনো ট্যাঙ্ক নয়, কোনো বুলেট ট্যাঙ্ক ছাড়া নয়," পেপে গর্জে ওঠে তার অগ্রগামী লোকদের প্রতি, নিজের স্লোগানে নিজেই খুব আনন্দ পেয়ে। তার দক্ষিণে ৫ম কোরও বুলেট-ঝটিকা ভেদ করে স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছিল। আন্তর্জাতিকরা অনেকে ডাকাডাকি করছিল, "ওরা আমাকে খতম করে দিলে কিন্তু আমার ডান-হাতি পকেটে এক প্যাকেট আমেরিকান সিগারেট আছে!" অথবা, "ধ্যেৎ, এই বজ্জাত ফ্যাসিস্টগুলোর জন্য এবার আমি সেমিফাইনালটা দেখতে পেলাম না!" তারা এগিয়ে চলেছিল এক স্পেনীয় অফিসারের দক্ষ পরিচালনায় প্রচণ্ড গোলবর্ষণ করতে করতে। এমন কি, প্রাথমিক পরিচর্যা বিভাগের শান্তিবাদীরা পর্যন্ত হাতে বন্ধনী না পরে, বোমা হাতে আক্রমণ করছিল ট্যাঙ্কগুলোকে, তাদের আহতদের যাতে তারা সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

কয়েকটা গলা 'আন্তর্জাতিক' গাইতে শুরু করে, কিন্তু সে গান ডুবে যায় স্পেনীয়দের প্রচণ্ড গর্জনে এবং আন্তর্জাতিক বাহিনীর দিক থেকে এক ছোট্ট, তীক্ষ্ণ চীৎকারে : "এগিয়ে চলো !"

অনুবাদ : কুণাল চট্টোপাধ্যায়

মৃত্যুহীন মাদ্রিদ

টেড এ্যালেন/সিডনি গর্ডন

[নর্মান বেথুন ছিলেন কানাডার প্রসিদ্ধ ডাক্তার। জনসেবার আদর্শই তাঁকে টেনে এনেছিল শ্রমজীবী জনতার কাছে। মানবতার আহ্বানে সাড়া দিয়েই তিনি প্রথমে গিয়েছিলেন স্পেনে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মাদ্রিদের জনতার পাশে। তারপর তিনি ছুটে যান মহাচীনে, জাপানি ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। চীনা কমিউনিস্টদের সহায়তায় তিনি গড়ে তোলেন সারা দেশব্যাপী এক সংগ্রামী চিকিৎসা-বাহিনী, যারা লক্ষ লক্ষ চীনা মুক্তিফৌজ ও গেরিলার প্রাণরক্ষা করে। রণক্ষেত্রে শল্য-চিকিৎসা করতে গিয়ে সালফা ঔষধের অভাবে শহিদত্ব বরণ করেন নর্মান বেথুন। তাঁর অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন ভারতীয় মেডিকেল মিশনের সদস্য ডা. কোটনিস। তিনিও শহিদত্ব বরণ করেন ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রামে। মাদ্রিদে বেথুনের অভিজ্ঞতার সামান্য অংশ এখানে অনুবাদ করে দেওয়া হল Seven Seas Books-এর অন্যতম 'দ্য স্ক্যালপেল, দ্য সোর্ড' গ্রন্থ থেকে।—অনুবাদক]

৬ই ডিসেম্বর, সময়—সকাল ছটা। বেথুন মাদ্রিদে ফিরলেন, সঙ্গে একটা স্টেশনওয়াগন। চিকিৎসার সাজসরঞ্জামে গাড়িটা ভর্তি। সঙ্গে সরেনসেন, তাঁর নতুন রিক্রুট এবং হ্যাজেন সাইস নামে একজন কানাডিয়ান যুবক যে লণ্ডনে গিয়ে বেথুনের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং সেই থেকেই তাঁর মেডিক্যাল ইউনিটে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করছে।

এই সময়ে মাদ্রিদে বিরাট উৎসব চলছিল। ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ট বাহিনী দক্ষিণ থেকে যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছিল, তাকে আপাতত ব্যর্থ করা হয়েছে। সুতরাং শহরের জনসাধারণ একটু হাঁপ ছাড়ার সুযোগ পেয়েছে। এক নবীন দৈত্য যেন তার শক্ত আঁট করে রাখা পেশীগুলোকে একটু আলগা করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। এক প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে তারা লড়েছে এবং সফল হয়েছে, হোক সে সফলতা সাময়িক। নিজেদের এই শক্তি সম্বন্ধে তারা নিজেরাই এতদিন সচেতন ছিল না, আজ এই জয় তাদের মধ্যে এনে দিয়েছে সংগ্রামী মানুষের

আত্মবিশ্বাস। বর্তমান মিলিটারি কমাণ্ডের আর সমঝোতায় বসার জন্য মিনতি জানাবার প্রয়োজন নেই, মাদ্রিদের জঙ্গী জনতা আত্মরক্ষায় সক্ষম। ফ্রাঙ্কোর অফিসারদের মাদ্রিদের বুকে পা দেওয়ার আগে এখনো অনেক রক্ত ঢালতে হবে।

মাদ্রিদের কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তাঁদের মেডিক্যাল ইউনিট সামরিক ইতিহাসে অভিনবত্বের এক নজির সৃষ্টি করবে। একটি বিশাল প্রাসাদের কতগুলি বিশেষ ঘরে blood transfusion unit তৈরি করা গেল। এগারটি ঘরবিশিষ্ট এই প্রাসাদে বেথুন কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর দুই সহকারীকে নিয়ে চলে এলেন। এটা আগে জার্মান দূতাবাসের লিগ্যাল কাউন্সিলের বাড়ি ছিল। বাড়িটি মাদ্রিদের সব চাইতে অভিজাত অঞ্চল প্রিন্সিপ দ্য ভ্যরগরায় অবস্থিত। একজন অফিসার বেথুনকে জানালেন "এখানে কেউ বোমা ফেলে আপনাকে বিরক্ত করবে না, ফ্রাঙ্কোর বোমা ধনীর প্রাসাদের চৌহদ্দি মাড়ায় না...।"

তিনটি ঘরে বেথুন, সরেনসেন এবং সাইস থাকতেন। বাকি আটটি ঘরের কোনোটা রেফ্রিজারেটিঙ রুম, কোনোটা রক্ত সংরক্ষণের হিমঘর, কোনোটা রিসেপশন অফিস; এই রকম বিভিন্ন দপ্তরে বিভক্ত ছিল। বেথুনের সহকারী নিযুক্ত হলেন আরো দুজন স্প্যানিস ডাক্তার। এ ছাড়া ছিলেন দুজন লেবরেট্যরি টেকনিশিয়ান, তিনজন নার্স, একজন রাঁধুনী, একজন কেরানী এবং একজন দারোয়ান।

আস্তে আস্তে ট্রান্সফিউশনের জন্য আরো প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আসতে থাকলে এই ইউনিটটি ৪০০ মাইলের ফ্রন্ট জুড়ে কাজ করতে লাগল। বেথুন এবং তাঁর দুজন ডাক্তার সহকারীকে ফ্রন্টের তিনটি আলাদা আলাদা অঞ্চলের ভার দেওয়া হল। সামরিক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত এই মেডিক্যাল ইউনিটটির 'কমাণ্ডার' হিসাবে এর সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোনো ঘটনার দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে পড়ল বেথুনের ওপর। লিঁয়াজো বা যোগাযোগ সংক্রান্ত অফিসার নিযুক্ত হলেন সরেনসেন এবং ফ্রন্ট জুড়ে যাতে সুষ্ঠুভাবে ওষুধ এবং ফার্স্ট এইড বস্ত্র বহনকারী যানবাহনগুলি যাতায়াত করতে পারে তা দেখার দায়িত্ব পড়ল সাইসের ওপর।

যে মুহূর্ত থেকে এঁরা কাজ শুরু করবেন সে মুহূর্ত থেকে বিশ্রাম বলে আর কিছুই তাঁদের থাকবে না। দিন রাত ধরে তাঁদের অবিশ্রান্ত কাজ করতে

হবে ফ্রন্টের এখানে-ওখানে, যুদ্ধের খবর পেলেই ছুটতে হবে, জীবনদান করার মহৎ সৌভাগ্যকে অর্জন করতে।

ইতোমধ্যে সবকিছু ঠিক হয়ে গেল। ছোট ছোট রেফ্রিজারেটিঙ ইউনিটগুলো বিতরণ করে দেওয়া হল তিনটি অঞ্চলের হাসপাতাল এবং ফিল্ড স্টেশনগুলিতে। এরপর বেথুন দেখা করলেন মেডিক্যাল ইউনিটের সদস্যবৃন্দ এবং এই সংক্রান্ত অফিসারদের সঙ্গে। বললেন "মহাশয়গণ, আমাদের মহান 'দুধ বিতরণ কেন্দ্রে'র কাজ প্রস্তুত। কিন্তু একটা অত্যন্ত অদরকারী জিনিস আমাদের নেই, তা হল দুধ···। সেটা যদি না পাই তাহলে বন্ধুগণ বাড়ি ফিরে যাওয়াটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।" এ কথা বলে এই প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ঘুরে তাকাল অফিসারদের দিকে। চরম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘাড় নাড়লেন স্প্যানিশ ভদ্রলোকটি "আমরা দেখব যাতে আপনার প্রয়োজনমতো রক্তদাতা আমরা যোগাড় করতে পারি।" "মনে রাখবেন কমরেড, যতদিন এই মেডিক্যাল ইউনিট কাজ করবে, ততদিন রক্তের প্রয়োজন ফুরোবে না। রক্তের স্টক অফুরন্ত না থাকায় জরুরী অবস্থায় আমরা যেন মানুষকে পড়ে পড়ে মরতে না দেখি। আমাদের দাবি পূরণ করতে গেলে প্রতিদিন আরো আরো লোককে এগিয়ে আসতে হবে।" স্প্যানিশ ভদ্রলোক মনে হল অত্যন্ত বিরক্ত হচ্ছেন। তিনি বুঝতেই পারছিলেন না এ নিয়ে এতো আলোচনার কি আছে। "আপনাদের দাবি আমরা পূরণ করব।" গভীরতর আত্মবিশ্বাস তাঁর কণ্ঠ ফুঁড়ে বেরল।

তিনদিন ধরে মাদ্রিদের বেতার এবং প্রেসের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে আবেদন জানানো হল। ফ্রন্টের মহান যোদ্ধারা ফ্যাসিজমকে রোখবার জন্য রক্ত দিচ্ছেন, তাঁদের সে রক্ত ফিরিয়ে দিতে হবে। তিনরাত্রির শেষ রাত্রি। কাল সকালে শুরু হবে রক্ত দেওয়া। বেথুন নিঃশব্দে রেডিয়োতে ঘোষণা শুনছিলেন। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন ল্যাবরেটারির দিকে। রক্ত গ্রহণের যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন খালি বিকারগুলোর দিকে।

'আচ্ছা, কাল যদি কেউ না আসে?'···সবকিছু প্রস্তুত, কিন্তু অনিশ্চয়তা তাঁর মস্তিষ্কের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ধাক্কা খেতে লাগল। 'খুব সোজা বড় বড় পরিকল্পনা করা, টাকা থাকলে যন্ত্রপাতি কেনাটাও কিছু না। কিন্তু রক্ত? প্যারিস-লণ্ডনের বুকে হাজার ডলারের বিনিময়েও পাওয়া যাবে না এক ফোঁটা রক্ত। কিন্তু এই মাদ্রিদে? একটাও কি বাড়ি আছে এ-শহরে যেখানে ক্ষুধা নেই? একটাও

কি পরিবার আছে যার একজনও এই মুহূর্তে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করছে না ফ্রাঙ্কোর পোষা কুকুরদের বিরুদ্ধে—স্বাধীনতার জন্য, শান্তির জন্য? আর কি আশা করা যায় সেই পুরুষদের কাছ থেকে যারা সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর রাত্রির কাছে আত্মসমর্পণ না করে সদাসতর্ক থাকছে আধো-ঘুমের মধ্যে, আর কি পাওয়া যেতে পারে সেই মহিলাদের কাছ থেকে, যারা বীন খেয়ে বেঁচে আছে আর দৃঢ়তাকে সম্বল করে গড়ে তুলছে দুর্গ?'

বেথুন সাইসকে জাগিয়ে তুললেন। "কালকের কথা নিয়েই ভাবছিলাম।" বললেন তিনি: "তোমার কি মনে হয় উপযুক্ত সংখ্যক লোক আমরা পাব?" সাইস জানালেন: "অফিসাররা তো বললেন সেটা কোনো সমস্যাই নয়।" "হ্যাঁ, তবু…", বেথুন পায়চারি করতে লাগলেন। "আচ্ছা, শুভরাত্রি—আজকের রাত্রিতেই আমাদের যা ঘুমোবার ঘুমিয়ে নিতে হবে।"

সকালবেলা। "ডক্টর বেথুন"—ডাক্তার লোপেজের ডাক শুনে বেথুন ঘুরে দাঁড়ালেন। সারা রাত্রি বোধহয় তাঁর ঘুম হয় নি। লোপেজ তাঁকে নিয়ে গেলেন বারান্দার দিকে। হাত তুলে আঙুল দেখালেন রাস্তার দিকে নির্দেশ করে।

দু হাজারেরও বেশি লোকের এক জনতা ইতোমধ্যেই রাস্তাটার প্রতি ইঞ্চি জমি ভরে ফেলেছিল এবং প্রতি মিনিটেই আরো নতুন লোক লাইনে ঢোকার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। তাদের প্রত্যেকের চোখগুলো স্থিরনিবদ্ধ ইনস্টিটিউটের দিকে। মেয়ে-ছেলে, যুবক-বৃদ্ধ, খেতে পাওয়া-না খেতে পাওয়া, নাগরিক, সৈন্য, গৃহিণী, গরিব শ্রমিক কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে এই বিশাল জনসমুদ্রে এসে মিলেছে। অসীম ধৈর্যভরে তারা অপেক্ষা করছে। বেথুন আর দেরি করতে চাইলেন না। ইনস্টিটিউটের দরজা খুলে গেল। সারা সকাল, সারা দুপুর কাজ চলল। একের পর এক লোক আসছে—যাচ্ছে। রক্তে সিফিলিসি এবং ম্যালেরিয়ার জীবাণু আছে কিনা তা একের পর এক পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং তারপর রক্ত নেওয়া হচ্ছে। যন্ত্রের মতো পুরো ব্যাপারটা সংঘটিত হচ্ছে। সবই হচ্ছে, কিন্তু ভিড় বাড়ছে বই কমছে না। জনতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই অঞ্চলে শেষে একটা মিলিশিয়া গ্রুপকে পাঠাতে হল, আনতে হল একদল অতিরিক্ত কর্মচারীকে। অবশেষে আর কোনো বোতল বাকি রইল না। রাখার জন্য রাখা রেফ্রিজারেটরটাও যখন ভর্তি হয়ে গেল তখন কাজ বন্ধ করা ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না। বারান্দা থেকে ডাক্তার লোপেজ ঘোষণা করলেন যে পরের দিনের আগে আর রক্ত নেওয়া

যাবে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যারা দাঁড়িয়ে আছে, তারা সেকথা শুনবে কেন? প্রচণ্ড চিৎকারের মধ্যে লোপেজ বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, কেন এই সিদ্ধান্ত নিতে হল···কিন্তু কে কার কথা শোনে? বিব্রত লোপেজ তাকালেন বেথুনের দিকে। "কি করা যায়? ওদের তো কিছুতেই বোঝানো যাবে না।" বেথুন বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে সেই একগুঁয়ে লোকগুলোকে দেখতে লাগলেন। উৎফুল্ল মুখটা লোপেজের দিকে ফিরিয়ে বেথুন বললেন "ওরা যদি না ফেরে তাহলে আজ ওদের নাম-ঠিকানা রেজিস্ট্রি করে রাখা যাক, আর ওদের যতজনের সম্ভব রক্ত পরীক্ষা করে রাখা যাক, যাতে কিছুদিন বাদেই প্রয়োজনের সময়ে ওদের কাছ থেকে আমরা আবার উপকার পেতে পারি।" দশদিন বাদে বেথুন স্প্যানিশ এইড কমিটিকে একটা টেলিগ্রাম পাঠালেন: "ইনস্টিটিউটের মিশন সফল। জনতার কাছ থেকে অপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। সবাইকে অভিনন্দন।"

অনুবাদ: প্রজিত জানা

ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকার জন্য

রাফায়েল আলবের্তি

[লোরকার বন্ধু ও সহকর্মী রাফায়েল আলবের্তি হিস্পানি ভাষার অন্যতম প্রধান কবি। ১৯৩১ সালে তিনি কমিউনিস্ট হন। ফ্রাঙ্কোর স্পেনে তাঁর জায়গা হয় না। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রকাশিত Seven Seas Books-এর অন্যতম *New* Masses (An Anthology of the Rebel Thirties) থেকে এই রচনাটি অনুবাদ করা হয়েছে।—অনুবাদক]

তোমার মৃত্যুর পর তোমাকে নিয়ে এই আমার প্রথম লেখা। ফেদেরিকো, সেই অপরাধের পর তোমার বিপক্ষে তোমারই নিজের গ্রানাদার কেউ মুখ খোলে নি। এই কয়েকটি পঙক্তি তোমারই জিপসি গাথার (রোমানসেরো জিতানো) মুখবন্ধ হিসাবে লেখা যদিও, তবু বলি, এ লেখা তোমার কাছেই পাঠালাম, হিস্পানি জনগণের হৃদয়ের পথ চেয়ে তোমার কাছেই এই শব্দগুলি পৌঁছে যাবে বলে। তারা শব্দগুলি পড়বে আর তোমার কবিতা হৃদয়ে গেঁথে নেবে।

১৯২৪ সালের অক্টোবর, মনে পড়ছে মাদ্রিদের ছাত্রাবাসের সেই ছোট্ট বাগানটিতে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বের সেই আমাদের প্রথম দিন। তুমি তখন গ্রানাদার ফুয়েন্তে ভাকরোস থেকে সবে ফিরেছ। সঙ্গে এনেছ তোমার প্রথম গাথা-কবিতার বই :

সবুজ তোমায় সবুজ যেন পাই
সবুজ হাওয়া, সবুজ ডালপালা…

শুনছি, তুমি প্রথমেই সেটি পড়ছ। তোমার সেই সেরা ব্যালাড। সন্দেহ নেই, আজকের হিস্পানি কাব্যে সব সেরা সেই কবিতাটি। তোমার 'সবুজ হাওয়া' আমাদের সবাইকে কেমন মাতিয়ে তুলল। এখনো আমাদের কানে বাজে তার প্রতিধ্বনি। এমনকি আজো, এই তের বছর পর, আমাদের কবিতার নতুন নতুন শাখায় বয়ে চলেছে তারই ধ্বনিপুঞ্জ।

হুয়ান রামন হিমনেথ যাঁর কাছে তুমি কত কিছুই না শিখেছিলে, শিখেছিলাম আমরা সবাই—তাঁর আরিয়াস ত্রিসতেস-এ সেই অনাস্বাদিতপূর্ব, সঙ্গীতমূর্চ্ছিত ব্যালাড লিখেছিলেন, সেই কবিতা ভোলবার নয়। তুমি তোমার 'রোমান্স সোনামবুলো'-তে আবিষ্কার করলে এক নাট্যআঙ্গিক, গোপন শিহরণ আর রহস্যময় রক্তপ্রবাহে তা স্পন্দিত। আন্তোনিয়ো মাচাদোর 'লা টিয়েরা আল-ভারগঞ্জালেস'-এ কাহিনী বিবৃত হল। কাস্তিলীয় এক ভয়ঙ্কর কাহিনী

কবিতাটিতে বিধৃত। গল্প হিসাবেও কবিতাটি গ্রহণ করা যায়। 'রোমান্স সোনামবুলো' ও অন্যান্য কবিতা, যেগুলি তোমার 'রোমানসেরো জিতানো'-তে আমরা পেয়েছি, সেগুলিকে নিছক কাহিনীকাব্য বলা যায় না। গল্প বলিয়ের সব প্রচেষ্টাই তা তুচ্ছ করে দেয়। পুরনো হিস্পানি আঙ্গিকের ভিত্তির উপরে, হুয়ান রামন আর মাচাদোর সঙ্গে তুমি অন্য এক রচনাভঙ্গি গড়ে নিলে—অনাস্বাদিতপূর্ব আর দৃঢ়সম্বদ্ধ। একই সঙ্গে তা পুরনো 'কাস্তিলীয় আবহমানতা রক্ষা করে অথচ তারই মাথায় তা হয়ে উঠেছে রাজমুকুট।

তারপর এল সেই যুদ্ধ। আমাদের কবিরা আর জনগণ গাথা বাঁধলেন সেই যুদ্ধ নিয়ে। যুদ্ধের দশ মাসের মধ্যে প্রায় হাজারের মতো সংখ্যায় তা সংগৃহীত হল। তোমার মহিমা যে কতখানি, মনে হল প্রায় সবগুলিতেই ধরা পড়েছে তোমারই প্রভাব। অন্য কণ্ঠস্বরের অন্তরালে তোমার কণ্ঠস্বর লড়াইয়ের মধ্যে বেজে উঠল। তবু সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠে আমাদের সঙ্গে কথা বলছে তোমার রক্ত। সমস্ত শক্তি নিয়ে তা চিৎকার করে উঠছে। বিশাল এক মুষ্টির মতো তা সমুত্থিত, অভিযোগ আর প্রতিবাদে সেই মুষ্টি দৃঢ়সংবদ্ধ। কেউই যেন সেই শোণিতপাত মেনে নিতে পারছে না। অসম্ভব। কেউ মনে ঠাঁই দিতে পারে না, তুমি মরে গেছ। আমরা কল্পনা করতে পারছি না, তুমি এক ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে। ওরা তোমাকে উষাসমাগমে ধরে নিয়ে গেল। কেউ বলে কবরখানার দিকে। কেউ বলে রাস্তায়। সত্য কথাটি হল…কেউ কি ঐ বিষয়ে সত্য কথাটি বলতে পারে? তাই এই নানা ধরনের কথা।

পেটেন্ট লেদারে বানানো আত্মা নিয়ে
এই রাস্তায় ওরা এসেছিল, ওরা…

কে তোমাকে আগে থেকে সাবধান করে দেবে যে তোমার কবিতায় কথিত সেই একই সিভিল গার্ডরা, একদিন ভোরবেলায়, তোমারই নিজের গ্রানাদার জনহীন উপকণ্ঠে তোমাকেই খুন করবে? তাইতো ঘটল! সে মৃত্যু তো তোমারই মরণ নয়।

ক্ষমতা কেড়ে নেবার জন্য যেদিন হানাদাররা আক্রমণ করল, সেই আঠারোই জুলাই আমি ছিলাম ঈবিজা দ্বীপে। সিভিল গার্ডরা এল আমার খোঁজে। আমি পালালাম। সতের দিন এ-পাহাড় ও-পর্বতে ঘুরলাম। রাইনার মারিয়া রিলকে বলেছেন, কেউ কেউ অন্য কারো মরণের সঙ্গে নিজেরও মৃত্যু ঘটায়—যা তাদের একান্তই নিজস্ব মৃত্যু, সে মরণ নয়। তুমি মরলে, সে মৃত্যু তো

আমারই হবার কথা। তোমাকে ওরা খুন করল। আমি পালালাম। তবু তোমার রক্ত এখনো টাটকা রয়ে গেছে, চিরদিন তা তাজাই থাকবে।

তোমার 'রোমানসেরো জিতানো'-এর সংস্করণগুলির মুদ্রণসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। তোমার নাম আর তোমার স্মৃতি স্পেনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ শিকড়, প্রবেশ করেছে সেগুলি আমাদের স্বদেশভূমির অন্তঃমূলে। কেউ যেন ঐ শিকড়ে জটিল পুঞ্জতা উপড়ে নিয়ে অন্ত কোনো মাটিতে না রুইতে চায়। যে মৃত্তিকায় সেগুলি প্রোথিত মূল, সেই মাটি ঐ অনুমতি দেবে না। সে মাটি বিস্ফোরিত হবে আগুনে, গুলিগোলায়, যে তোমাকে উপড়ে ফেলতে চাইবে—তার হাত ছারখার করে দেবে। হিস্পানি ফ্যালাঞ্জিস্টরা, তোমাকে যারা খুন করেছে, সেই তারা আজ তাদের নিজেদের বন্দুকের গুলিতে ছিন্নভিন্ন। তোমার মহিমার সুযোগ তারা শয়তানের মতো নিতে চায়। যেমন জালিয়াতের মতো ওরা তোমাকে হিস্পানির সাম্রাজ্যের কবির শিরোপা দিতে চায়—মুসোলিনি-কথিত সেই হতভাগ্য হিস্পানি সাম্রাজ্য! ওরা চেষ্টা করুক! নিজেদের নির্লজ্জতার ফলে তোমার খুনীর দল সম্ভবত ভুলেই গেছে যে তোমার নাম আর তোমার কবিতা আজ চিরকালের জন্য দৃঢ়গ্রথিত পদপাতে চলেছে স্পেনের ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামী মানুষের মুখে মুখে। তোমাকে যারা খুন করল তাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিটি কবিতার আবৃত্তি অমোঘ অভিযোগ ধ্বনিত করে তোলে।

আমরা স্মরণে রেখেছি। আমরা মনে রাখব। আমরা সবচেয়ে নির্বোধ আর ভয়ঙ্কর অপরাধসমূহ যা এই যুদ্ধে অনুষ্ঠিত হয়েছে, শোচনীয় সেই প্রহসন চালিয়ে যাওয়ার কাজে সহায়তা পাওয়ার জন্য তোমার দেহটা পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে মিথ্যে পরিচয়ে যারা তোমাকে প্রদর্শন করতে চায়—তাদের মুখগুলো আমরা শনাক্ত করছি। ওরা ব্যর্থ হবে। লুই চারনুদা, ম্যানুয়েল আলতোলাগুয়ের, এমিলিও প্রাদো, ভিসেন্ত আলেইক্সান্দর। পাবলো নেরুদা, মিগুয়েল হারনান্দেজ, আর আমি—তোমার এইসব বন্ধু ও সহ-কবিরা—তোমার হাত নোঙরা হতে দেব না। তোমার কবিতার সেই দুঃখী আর মহিমাময় জনগণের সঙ্গে আমরা তোমার স্মৃতি পাহারা দেব। জাগিয়ে রাখব তোমার উপস্থিতি সেই ভালোবাসায়, যেমন-ভাবে পুরনো দিনের কবিরা জাগিয়ে রেখেছিলেন সেই শিরস্ত্রাণহীন তরুণ কবি গারচিলাসো দে লা ভেগাকে, ঘোড়ায় চেপে যিনি শত্রুসৈন্যের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আর ফেরেন নি, যিনি তাঁর সাহস আর গানের জন্য পেয়েছেন একই চরম সম্মান।

অনুবাদ : তরুণ সান্যাল

স্পেনে মৃত আমেরিকানদের কথা মনে করে

আরনেস্ট হেমিংওয়ে

[হেমিংওয়ে তিন হাজার শব্দে পাঁচ দিন ধরে এই রচনাটি লেখেন—তারপর কেটে-ছেঁটে অমোঘ রূপটি দেন যা বহু ভাষায় অনূদিত হয়। বহু ভাষায় এর রেকর্ডও আছে। লেখাটি 'নিউ ম্যাসেস' (সেভেন সিজ বুকস) সংকলন থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।—অনুবাদক]

আজ এই রাতে মৃতরা ঠাণ্ডায় সিটিয়ে গিয়ে ঘুমোয়। তুষার বইছে জলপাই বাগানের মধ্য দিয়ে, ঝরে যাচ্ছে শিকড়ের আঁকি বুঁকি ছাঁকনির মধ্য দিয়ে। স্মৃতিফলকলাঞ্ছিত কবরস্তূপের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে তুষার (স্মৃতিফলকেরও সময় ছিল একদিন!) জলপাই গাছগুলি এই শীতের হাওয়ায় কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায়। ট্যাংকগুলি গোপন করার জন্য নিচের দিকের ডালপালা কেটে নেওয়া হয়েছিল। জারামা নদীর উপরে ছোট টিলাগুলিতে এখন মৃতেরা ঘুমোচ্ছে ঠাণ্ডায় সিটিয়ে গিয়ে। সেই ফেব্রুয়ারি মাসের শীতে ওরা মাটি নিয়েছে, আর তারপর থেকে কত-যে ঋতুচক্র পার হল তার হদিশ আর ওরা রাখে নি।

আজ থেকে দু-বছর আগে জারামার চড়াই সাড়ে চার মাস দখলে রেখেছিল লিঙ্কন ব্যাটেলিয়ান। আর স্পেনের মাটিতে মাটি হয়ে মিশে গেছে প্রথম আমেরিকান মৃতদেহটি ঢের দিন আগে।

আজ এই রাতে ঠাণ্ডায় সিটিয়ে গিয়ে মৃতরা স্পেনে ঘুমোচ্ছে—সারাটা শীত জুড়ে ওরা ঘুমন্ত মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে ঘুমোবে। আবার বসন্তের বৃষ্টিপতন মাটিকে করে তুলবে করুণাময়ী। দক্ষিণের পাহাড় পার হয়ে বইবে ঝুরু ঝুরু মলয় বাতাস। কালো গাছগুলোয় ছোট ছোট পল্লবে হেসে উঠবে জীবন। জারামা নদীর পাড় ঘেঁষে আপেল গাছগুলিতে মঞ্জরী ধরবে। এই বসন্তে মৃতরা অনুভব করবে, আবার মাটিতে ফিরে এসেছে প্রাণের স্পন্দন।

কেননা আমাদের মৃতরা আজ হিস্পানি মৃত্তিকারই অংশ, আর স্পেনের মাটির মৃত্যু নেই। প্রতি শীতে মনে হবে যেন তা মৃত, তবু প্রতি বসন্তে তা প্রাণ পেয়ে জেগে উঠবে। আমাদের মৃতরা চিরকাল প্রাণময় রইবে তারই সঙ্গে।

মাটির যেমন মৃত্যু নেই, তেমনি যে একবারও স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে—সে কখনো আর দাসত্বে ফেরে না। যেখানে আমাদের মৃতরা শুয়ে, ওখানে চাষীরা কাজ করছে। ওরা জানে কেন তারা মরণকে বরণ করে নিল। যুদ্ধের সময় তো এমন দিনই ছিল ঐ সব শিক্ষা নেবারই। আর চিরদিনের জন্য তারা মনের গভীরে বহন করবে এই জ্ঞান।

হিস্পানি চাষী, হিস্পানি মজুর সেইসব ভালোমানুষ, সাধারণ সৎ মানুষ, যারা স্পেনের প্রজাতন্ত্রের প্রতি আস্থা রেখেছিল, লড়াই করেছিল তারই জন্য, তাদের হৃদয়ে তাদের মনে বেঁচে রইবে আমাদের মৃতরা। আর আমাদের মৃতরা যতদিন স্পেনের মাটিতে জীবিত থাকবে, যতদিন পৃথিবী বেঁচে থাকবে, ততদিন অত্যাচারের কোনো জমানাই স্পেনে টিকতে পারবে না।

ফ্যাসিস্তরা মাটির উপরে ছড়িয়ে পড়তে পারে, ভিনদেশ থেকে আনা ধাতুপিণ্ডের চাপে পথ করে নিয়ে। বেইমান আর ভীরুদের সাহায্যে তারা এগোতে পারে। তারা শহর গ্রাম জনপদ ধ্বংস করতে পারে। জনগণকে দাসত্বে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করতে পারে।

হিস্পানি জনগণ আবার উঠে দাঁড়াবে, আগেও যেমন তারা রুখে দাঁড়াত অত্যাচারের মুখোমুখি।

মৃতদের আর উঠে দাঁড়াবার কিইবা প্রয়োজন। তারা এখন মাটির মধ্যে মাটি হয়ে আছে আর মাটিকে কখনও জয় করা যায় না। কেননা পৃথিবী সর্বংসহা। অত্যাচারের তাবৎ জমানা সে পার হয়ে যায়।

যারা মৃত্তিকায় প্রবেশ করেছে এমন মহিমায়, যারা স্পেনে শহিদ হল তাদের চেয়ে কেউ বেশি সম্মান নিয়ে মাটি নেয় নি কোনো কালে, তারা তো ইতোমধ্যেই অমরত্বে পৌঁছে গেছে।

অনুবাদ : তরুণ সান্যাল

ফ্যাসিস্ত নায়কের উত্থান-পতন

জর্জ বার্নাড শ

[১৯৩৮ সালে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই, জর্জ বার্নাড শ 'জেনিভা' নাটক রচনা করেন। ১৯৪৫ সালে সেই নাটকের জন্য যে-ভূমিকা তিনি লেখেন, তারই দুটি পরিচ্ছেদের কিছুটা সংক্ষেপিত অনুবাদ এখানে প্রকাশ করা হল। জি. বি. এস-এর বিশিষ্ট রচনারীতির সাক্ষ্যবহ এই রচনায় ফেবিয়ান সোশ্যালিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক দিকটি যেমন পরিস্ফুট, তেমনই স্পষ্ট তার আত্যন্তিক সীমাবদ্ধতাও। —অনুবাদক]

হিটলার

জার্মান প্রশাসনের কেন্দ্র থেকে দূরতম প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত সর্বত্র তখন পচন ধরেছে। ১৮৭১ সালে বোনাপার্তিস্ট ফরাসী বাহিনীকে প্রচণ্ডভাবে পরাজিত করে সামরিক মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত জার্মানির হোহেনজোলার্ন রাজতন্ত্র ১৯১৮ সালে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের আঘাতে পর্যুদস্ত হল। রাজার শাসনের জায়গায় এল সকলের দ্বারা নির্বাচিত যার তার শাসন। লোকের ধারণা, এতেই জনসাধারণের সবচেয়ে বেশি কল্যাণ, অর্থাৎ গণতন্ত্রের যা লক্ষ্য, কিন্তু কার্যত এতে যে-কোনো উচ্চাভিলাষীর রাজনৈতিক উন্নতির পথ খুলে যায়। ১৯৩০-এ মিউনিখে ছিল হিটলার নামে এক তরুণ, চার বছরের যুদ্ধে সে সৈনিক ছিল। কোনো বিশেষ সামরিক গুণপনা না থাকায় আয়রন ক্রস ও করপোরালের পদের চেয়ে বড় কিছু তার ভাগ্যে জোটে নি। হিটলার ছিল গরিব। কোনো শ্রেণীতেই তাকে ফেলা যেত না। সে ছিল বোহেমিয়ান; শিল্পে কিছুটা রুচি ছিল, কিন্তু শিল্পী হিসেবে সফল হবার শিক্ষা বা প্রতিভা ছিল না। ফলে সে আটকে ছিল বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যখানে, বুর্জোয়াশ্রেণীতে যাবার মতো আয় ছিল না, আবার শ্রমিকশ্রেণীতে যাবার মতো কারিগরি দক্ষতা ছিল না। কিন্তু তার ছিল কণ্ঠস্বর, বক্তৃতা করতে পারত। সে হয়ে উঠল বীয়ারের আড্ডার বক্তা, সেখানকার শ্রোতাদের সে জমিয়ে রাখতে পারত। সে যোগ দিল এক মদের আড্ডার বিতর্ক

পরিষদে (আমাদের পুরাতন কোজার্স হলের মতো), তাকে নিয়ে যায় সভ্যসংখ্যা দাঁড়াল সাত। তার বক্তৃতার টানে আরো লোক জড়ো হল, সে হয়ে দাঁড়াল আড্ডার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। সে যেসব বাণীবর্ষণ করত, তার অনেকটাই সত্য। সৈনিক হিসেবে সে শিখেছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষেরা জনতাকে সহজেই শায়েস্তা করতে পারে ; ব্রিটিশ কায়দার পার্টি পার্লামেন্ট কখনোই দারিদ্র্যের অবসান ঘটাতে পারে না, ঘটাবে না, যে-দারিদ্র্য তার কাছে এমন তিক্ত ; যে ভার্সাই চুক্তির তাড়নায় পরাভূত জার্মানি তার শেষ কানাকড়ি বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েছে, লুঠেরাদের সংযত করার মতো বড় একটা সৈন্যবাহিনী থাকলেই সেই চুক্তির প্রত্যেকটা শর্ত ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা যায় ; য়ুরোপের অর্থনীতিকে শাসন করছে অর্থব্যবসায়ীদের যে প্রবল গোষ্ঠী তারাই চালাচ্ছে মালিকদেরও। এই পর্যন্ত হিটলার যা বুঝেছিল, তাতে কোনো ফাঁক ছিল না। কিন্তু তথ্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে সে সব তালগোল পাকিয়ে ফেলল। সে ধরে নিল, সব অর্থ-ব্যবসায়ীই ইহুদি ; ইহুদিরা অভিশপ্ত, তাই তাদের নির্মূল করতে হবে ; জার্মানরা ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতি, পৃথিবী শাসন করার ভার ঈশ্বরই তাদের উপর ন্যস্ত করেছেন ; আর এই শাসন কায়েম করার জন্য তার দরকার কেবল এক দুর্দমনীয় সেনাবাহিনী। এইসব ভ্রান্ত মোহ হানৎস, ফ্রিট্স, গ্রেচেন এবং মদের আড্ডার রসিকদের মুগ্ধ করেছিল। ভাড়াটে গুণ্ডাদের দিয়ে নব্য হিটলারপন্থীদের ঠাণ্ডা করার চেষ্টা হলে হিটলার এমন এক শক্তপোক্ত দেহরক্ষীবাহিনী গড়ে তুলল যার দাপটে বিরোধীরা শেষ পর্যন্ত রাস্তায় দেহ রাখল।

এই সম্বল পুঁজি করেই হিটলার আবিষ্কার করল, সে নেতা হবার জন্যই জন্মেছে। জ্যাক কেড, ওয়াট টাইলার, রানী এলিজাবেথের অধীনস্থ এসেক্স, ডাবলিন প্রাসাদের অধীনস্থ এবেট এবং দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের অধীনস্থ লুই নেপোলিওনের মতোই সেও ভেবে বসল, রাস্তায় একটা পতাকা হাতে নিয়ে নামলেই সমগ্র জনমণ্ডলী তাকে স্বাগত জানাবে, অনুসরণ করবে। চার বছরের যুদ্ধের এক সৈন্যাধ্যক্ষ আর বীয়ারের আড্ডায় তার চাল ও বাকচাতুরীতে যারা মজেছে, তাদের সঙ্গী করে হিটলার পরীক্ষা করে দেখল। এই ছোট্ট গোষ্ঠী নিয়ে সে রাস্তায় কুচকাওয়াজে বেরোল। যে-কোনো শহরে যা ঘটে থাকে, তাই ঘটল। মজা দেখতে রাস্তায় লোকের ভিড় জমল। আমি লণ্ডনে দেখেছি, হাজার হাজার নাগরিক ছুটছে, অন্যরা কেন ছুটছে, তাই জানবার জন্য। ব্যাপারটা দেখায় বিপ্লবী গণজাগরণের মতোই। একবার উপলক্ষ ছিল একটা পলাতক

গোরু। অন্যবার মেরি পিকফোর্ড; পুরনো নির্বাক ছবির 'বিশ্বের প্রিয়তমা' ট্যাক্সিতে চড়ে হোটেলে যাচ্ছিলেন।

হিটলার হয়ত একবার ভেবেছিল, মুসোলিনির রোম অভিযানের (মুসোলিনি গেছল ট্রেনে) মতো জমজমাট কিছু সেও ঘটাতে পারবে। কুর্ট আইসনারের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সাম্প্রতিক সাফল্য তাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। কিন্তু আইসনারকে কেউ বাধা দেয় নি। হিটলার ও তার জনতা যখন সরকারি বাহিনীর সম্মুখীন হল, তারা হিটলারকে স্বাগত জানাল না; বুরবঁ বাহিনীর প্রবীণ সৈনিকেরা এলবা প্রত্যাগত নেপোলিওনকে যেভাবে অভিবাদন জানিয়েছিল, তার পুনরাবৃত্তি ঘটল না। তারা গুলি চালাল। হিটলারের জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাল। বুলেটের বর্ষণ থেকে বাঁচবার জন্য হিটলার ও জেনেরাল লুডেনর্ফকে শেষ পর্যন্ত রাস্তায় শুয়ে পড়তে হল। এই পাগলামির জন্য হিটলারের আট মাস কারাদণ্ড হল। হিটলার সরকারকে তেমন ভয়ও দেখাতে পারে নি যাতে কেড, টাইলার বা এসেকসের মতো তাকেও হত্যা করতে সরকার বাধ্য হয়। কারাগারে বসে হিটলার ও তার সঙ্গ-সচিব হেস 'মাইন কাম্পফ' (আমার সংগ্রাম, আমার কর্মসূচী, আমার মতামত অথবা যা ইচ্ছা হয় তাই) বলে এক বই লিখে ফেলল।

লুই নেপোলিওনের মতো হিটলারও এবার শিখেছে, বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান শেষ চূড়ান্ত পদক্ষেপ হতে পারে, প্রথম পদক্ষেপ কখনোই নয়। হিটলার শিখেছে, জনতার শিরোপা পাবার আগে উচ্চাভিলাষীদের আঁতাত করতে হয় অর্থব্যবসায়ীদের সঙ্গে, শিল্পপতিদের সঙ্গে, ব্যাঙ্কমালিকদের সঙ্গে, রক্ষণশীলদের সঙ্গে, কারণ যেসব দেশে জনসাধারণ নিজেদের ইচ্ছামতো শাসক নির্বাচন করে, সেই-সব দেশ আসলে চালায় এরাই। অভিনেতৃসুলভ চটকের জোরে হিটলার সহজেই একটা ব্যবস্থা করে ফেলে যাতে রাজকীয় সম্মানের চেয়েও বেশি সম্মানসহ জার্মান রাজত্বের আজীবন চানসেলারের পদে সে অভিষিক্ত হয়। অথচ তার পুঁজি বলতে জোরালো কণ্ঠ, সমাজবাদের ছিটেফোঁটা দিয়ে তৈরি এক মতাদর্শ, ইহুদিদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা, আর গণতন্ত্রের ভেকধারী পার্লামেনটারি জনতাতন্ত্রের প্রতি প্রবল অবজ্ঞা।

নকল অবতার ও বদ্ধ উন্মাদ

এ পর্যন্ত হিটলার ছিল অর্থব্যবসায়ীদেরই সৃষ্টি, তাদেরই হাতের উপকরণ। কিন্তু অর্থব্যবসায়ীদের হিসেবে ভুল হয়েছিল। যে মুহূর্তে তারা হিটলারকে

শিখণ্ডী খাড়া করল, জনতার ভক্তিবাদের উচ্ছ্বাসে হিটলার অবতার হয়ে উঠল, জননায়ক হয়ে উঠল। যে কোনো বড় ব্যবসায়ীর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা তার হাতে এসে পড়ল। বিনা দ্বিধায় পুরোদস্তুর পার্লামেনটারি অনুমোদন নিয়ে সে তার রাজনৈতিক বিরোধীদের হত্যা করল। অতীতের বিখ্যাত কোনো ক্ষণে সন্ত পীটার যেমন বলেছিলেন, "তুমিই খ্রীস্ট", জার্মান জাতিও সেই একই বাণী উচ্চারণ করল। ফলও একই হল। ক্ষমতা ও ভক্তির প্রাবল্য হিটলারের মাথা ঘুরিয়ে দিল। জাতির কল্যাণকামী যে নেতা বেকারির উচ্ছেদ ঘটিয়েছিল, ভারসাইয়ের চুক্তি ছিঁড়ে ফেলে ছ-কোটি দেশবাসীর আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়ে এনেছিল, সেই হয়ে দাঁড়াল পাগল অবতার। ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য জাতির প্রভু হিসেবে তার ঈশ্বরাদিষ্ট দায়িত্ব, বাকি মানবসমাজকে যুদ্ধে পরাভূত করে পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা, জার্মান ঈশ্বরের জার্মান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা। তাকে প্রীত করে শান্ত করার কাপুরুষোচিত চেষ্টা দেখে উৎসাহিত হয়ে সে রাশিয়া আক্রমণ করল। সে হিসেব করে রেখেছিল, সোভিয়েত সাম্যবাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে সমগ্র পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য শেষ পর্যন্ত তার সহযোগী হবে।

কিন্তু পুঁজিবাদী পাশ্চাত্যের অতটা দূরদৃষ্টি ছিল না। তার উপর ঈর্ষ্যা। তারা খুব একটা বুদ্ধিমন্তের মতো আচরণ করল না। তারা স্তালিনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হিটলারকে পিঠে ছুরি মারল। হিটলার প্রাণপণে লড়ল, ইতালি ও স্পেনে তার উচ্চাভিলাষী সহযোদ্ধারাও মদত দিল। কিন্তু হিটলার জুলিয়াস সীজারও নয়, মহম্মদও নয়। অধিবাসীদের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটিয়ে তার বিজয়াভিযানকে গ্রহণীয় ও স্থায়ী করে তোলার চেষ্টাই সে করে নি। বরং যেখানেই সে জয়লাভ করেছে, সেখানেই তার নাম ঘৃণিত হয়ে উঠেছে। নিকট পাশ্চাত্য তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল, আমেরিকার প্রবল শক্তি দূর পাশ্চাত্যও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। বারো বছর ধরে অসংখ্য লোককে হত্যা করে শেষে তাকে আত্মঘাতী হতে হল, তার সহযোগীদের ফাঁসিতে ঝুলতে হল।

যারা সাম্রাজ্য জয় করে, তাদের জন্য নীতিবাক্য, তারা যদি সভ্যতার জায়গায় বর্বরতা কায়েম করে, তাদের পতন অনিবার্য। তারা যদি বর্বরতার জায়গায় সভ্যতা আনতে পারে, তারা টিকে যাবে। মুসোলিনি আবিসিনিয়া জয় করে যখন স্থানীয় দানাকিলদের আক্রমণ থেকে অপরিচিত যাত্রীদের নিরাপদ করলেন, তখন তিনি পৃথিবীর যে কল্যাণ সাধন করলেন, আমরাও সেই লক্ষ্যই সাধন করে চলেছি, বিষবাষ্পসহ সেই একই কায়দায়, ভারতের উত্তর-পশ্চিম

প্রদেশগুলিতে ; লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি অস্ট্রেলিয়ায়, নিউজীল্যাণ্ডে, স্কটিশ হাইল্যাণ্ডসে। মুসোকে তিরস্কার করা আমাদের শোভা পায় না, তার ক্রীড়নক রাজাকে সম্রাট বলতে ছেলেমানুষের মতো অস্বীকার করাও শোভা পায় না। তবুও আমরা তাই করেছি।...

যেটুকু সাফল্য এরা অর্জন করেছে, তা ছিল পার্লামেনটারি কথার বাজারের ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ায়, যেমন ঐ পার্লামেনটের উৎসব আবার অপদার্থ রাজাদের ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ায়, কারণ জনতাও যেমন, রাজারাও তেমনই রাজনৈতিক পুতুলপূজো ও অজ্ঞতার মধ্যেই জীবনধারণ করে। ভোটাধিকার যতই ব্যাপক হয়, বিভ্রান্তিও ততই বাড়ে।...আমরা এখনও নিজেদের ঠকিয়ে চলেছি, বামের দিকে হেললেই বুঝি সেটা গণতান্ত্রিক, আর দক্ষিণের দিকে হেললেই সাম্রাজ্যবাদী। কিন্তু আসলে আমরা হেলে পড়ছি এক ব্যর্থতা থেকে আরেক ব্যর্থতায়, বাস্তব গণতন্ত্রকে আর নিশ্চিত করতে পারছি না আমরা, যে গণতন্ত্রের লক্ষ্য যোগ্য শাসকদের নেতৃত্বে শাসিতদের কল্যাণের জন্য অপক্ষপাতী প্রশাসন। জনতার নৈরাজ্যবাদে তারই পরাভব।

অনুবাদঃ শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্যাসিফিজমের অবসান

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

[বার্ট্রাণ্ড রাসেলের প্যাসিফিজম প্রথম ধাক্কা খায় ১৯৩৭ সালে, স্পেনের ঘটনায়। কিন্তু, ১৯৩৯-এও 'শান্তিবাদী'র অপক্ষপাতী মনোভাবের তাড়নায় রবার্ট ট্রিভেলিয়ানকে একটি চিঠিতে তিনি লেখেন : "আমি প্যাসিফিস্ট থাকবার প্রাণপণ চেষ্টা করছি।..." দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাসেল ছিলেন আমেরিকায়। একদিকে নীতিবাগীশদের আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়ছেন; অন্যদিকে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস লিখছেন, হরেস ও লিওপার্দির কবিতা আর মঁতেইনের প্রবন্ধ অনুবাদ করছেন। তারই মধ্যে খবর আসছে নাৎসিবাদের বিজয় অভিযানের। রাসেলের চিঠিতে তাঁর অবস্থান ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে বিরোধী মনোভাব সত্ত্বেও তিনি পক্ষ বেছে নেন।—অনুবাদক]

য়ুরোপের খবর অসহনীয় রকম দুঃখজনক। আমাদের সকলেরই মনে হচ্ছে দেশ থেকে এত দূরে না থাকলেই ভালো ছিল, যদিও দেশে থাকলেও আমাদের দিয়ে তেমন কোনো কাজ হত না।

এবারকার যুদ্ধের শুরু থেকেই আমি ভেবেছি, আমি আর প্যাসিফিস্ট থাকতে পারি না। কিন্তু এ কথা বলতে আমি দ্বিধা বোধ করেছি, এ কথা বলার সঙ্গে যুক্ত দায়িত্বের কথা ভেবে। আমার যদি যুদ্ধে নামবার মতো তরুণ বয়স থাকত, আমি যুদ্ধেই যেতাম। কিন্তু অন্যদের যুদ্ধে প্রণোদিত করা আরো কঠিন ব্যাপার। তবুও আমার মনে হচ্ছে, এবার আমার ঘোষণা করা উচিত যে আমি আমার মত পাল্টেছি। আপনি যদি কোনো সূত্রে 'নিউ স্টেটসম্যান' এ প্রকাশ করতে পারেন যে আমার কাছ থেকে আপনি এই কথা জেনেছেন আমি তাতে খুশি হব।[১]

এবার আমি আর প্যাসিফিস্ট নই। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের জয়ের উপর সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। পঞ্চম শতাব্দীতেও একবার জার্মানরা পৃথিবীকে বর্বর যুগে টেনে নামিয়েছিল। তারপর এমন ভয়ানক আর কোনো ঘটনা এর আগে ঘটে নি।[২]

স্পেন অনেকেরই প্যাসিফিজমকে ধাক্কা দিয়েছে। আমিও আর প্যাসিফিজমকে আঁকড়ে থাকতে পারি নি; আরো বিশেষ করে এই কারণে যে, স্পেন আমার চেনা, যে-সব জায়গায় যুদ্ধ চলছে, তার প্রত্যেকটাই আমার চেনা, স্পেনের মানুষ

আমার চেনা। স্পেনের প্রশ্নে আমার সমস্ত অনুভূতিতে নাড়া লাগে। চেকোস্লোভাকিয়ার প্রশ্নেও আমি জড়িয়ে পড়ছি। ১৯১৪ সালে জার্মানরা যখন ফ্রান্স ও বেলজিয়াম অধিকার করছিল, তখন প্যাসিফিস্ট ছিলাম বলেই আবার তারা সেই একই কাণ্ড করলেও আমাকে কেন প্যাসিফিস্ট থাকতে হবে, আমি বুঝতে পারি না।[৩]

আমি আমার নীতি বার বার পাল্টেছি, এ কথা আমি অস্বীকার করি না। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার নীতি পরিবর্তিত হয়েছে। একই লক্ষ্য-সাধনে সুস্থবুদ্ধি মানুষেরা পরিস্থিতির সঙ্গে তাদের নীতি মানিয়ে নেয়। যারা তা করে না তারা মানসিক বিকারের রোগী।[৪]

প্রশ্ন : প্রথম মহাযুদ্ধে আপনি প্যাসিফিস্ট ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আপনি আর প্যাসিফিস্ট রইলেন না। এতে কি একটু অসঙ্গতি হল না ?

উত্তর : কই, আমার তো তা মনে হয় না। আমি কোনোদিন বলব না যে, সব যুদ্ধই ন্যায়সঙ্গত কিংবা সব যুদ্ধই অন্যায়। কোনোদিনও নয়। আমার মনে হয়েছে, কোনো কোনো যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত, কোনো কোনো যুদ্ধ তা নয়। আমার মনে হয়েছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত, প্রথম মহাযুদ্ধ অন্যায়।

প্রশ্ন : আপনার কেন মনে হল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত ?

উত্তর : কারণ আমার মতে হিটলার একেবারেই অসহনীয়। নাৎসি দৃষ্টি-ভঙ্গিটাই ভয়ঙ্কর। আমি দেখলাম, নাৎসিরা যদি পৃথিবী জয় করে বসে, কারণ পারলে সেইটেই তাদের উদ্দেশ্য, পৃথিবীতে জীবনধারণই নারকীয় হয়ে উঠবে। আমার মনে হল, এ আমাদের বন্ধ করতেই হবে। করতেই হবে।[৫]

অনুবাদ : শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

পাদটীকা :

১. 'নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক কিংসলি মার্টিনকে লেখা চিঠি, ১৩ মে ১৯৪০।
২. রবার্ট ট্রিভেলিয়ানকে লেখা চিঠি, ১৯ মে ১৯৪০।
৩. গিলবার্ট মারেকে লেখা চিঠি, ৩ মার্চ ১৯৩৭।
৪. 'কমনসেনস অ্যাণ্ড নিউক্লিয়র ওয়্যারফেয়ার', লণ্ডন, ১৯৫৯।
৫. রাসেলের সঙ্গে উডরো ওয়াআটের টেলিভিশন সাক্ষাৎকার, ১৯৫৯ : 'বার্ট্রাণ্ড রাসেল স্পীকস হিজ মাইনড', নিউ ইয়র্ক, ১৯৬০।

আলোচনার গোলটেবিল প্রস্তুত

কার্ল ফন অসিয়েৎস্কি

[সাংবাদিক ও লেখক কার্ল ফন অসিয়েৎস্কি জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সারা জীবন লড়াই করে নাৎসি জেলে ১৯৩৮ সালে প্রাণ হারান। অসিয়েৎস্কি কমিউনিস্ট ছিলেন না, কিন্তু জঙ্গীবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর কলম ১৯৩৩ সালে নাৎসি দস্যুদলের গ্রেপ্তারের পূর্ব পর্যন্ত কখনও স্তব্ধ হয় নি। ১৯৩৬ সালে অসিয়েৎস্কি নোবেল শান্তি পুরস্কার পান, কিন্তু গোয়েরিং-এর হুকুমে দেশের বাইরে গিয়ে পুরস্কার গ্রহণের সুযোগ তাঁর মেলে নি। গ্রেপ্তারের পরে প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় স্পাণ্ডাও দুর্গে। সেখান থেকে সোনেনবার্গ জেল হয়ে প্যাপেন-বার্গ-এস্তেরভাগেন ক্যাম্পে যখন তিনি গিয়ে পৌছন তখন নাৎসি অত্যাচারে সারা দেহ তাঁর ক্ষতবিক্ষত। আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের এক প্রতিনিধি এখানে অসিয়েৎস্কির সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পান। তিনি লিখেছিলেনঃ ফ্যাকাসে, মুখে মৃত্যুর ছায়া নিয়ে থর থর করে কাঁপছেন লোকটি। একটি চোখ স্ফীত, দাঁতগুলো সব ভেঙে ফেলা হয়েছে। একটি ভাঙা পা নিয়ে কোনোক্রমে খুঁড়িয়ে চলছেন। দেখে মনে হয় বোধশক্তি সব নষ্ট হয়ে গেছে। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম, কিন্তু তিনি নিলেন না।

অসিয়েৎস্কিকে মুক্ত করার জন্য আন্তর্জাতিক কমিটি তৈরি হয়েছিল; জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি থায়েলমান ও অসিয়েৎস্কির মুক্তির জন্য একযোগে আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছিল। হিটলারি চোখরাঙানি সত্ত্বেও নাৎসি জার্মানির এই 'দাগী আসামী'কে বিশ্বজোড়া আন্দোলন 'অন্য জার্মানি'র প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকার করেছিল।

১৯১১ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত লেখা অসিয়েৎস্কির কয়েকটি রচনা একত্রিত করে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র থেকে সম্প্রতি 'অপহৃত প্রজাতন্ত্র' (*The Stolen Republic*, Carl Von Ossietzky, Seven Seas Books, G. D. R., 1971) নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এই বই থেকে 'আলোচনার গোলটেবিল প্রস্তুত' নামক প্রবন্ধটির সচ্ছন্দ অনুবাদ নিচে দেওয়া হল।

১৯৩২ সালের বসন্তে জার্মানিতে প্রেসিডেন্ট ও প্রাদেশিক নির্বাচনে নাৎসি পার্টি বিপুল ভোট পায়। দেশের উপর হিটলারি ফ্যাসিবাদের কালো ছায়া ঘনীভূত হয়ে আসে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রণ্ট গঠনের জন্য সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের কাছে আবেদন জানায় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি। নিচের লেখাটিতে অসিয়েৎস্কি যুক্তফ্রণ্ট গঠনের এই উদ্যমকে আন্তরিক স্বাগত জানিয়েছেন। গ্রেপ্তারের পূর্বে এইটিই তাঁর শেষ লেখা। —অনুবাদক]

প্রুশিয়ার নির্বাচনে নাৎসি পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে নি। কিন্তু তা থেকে তাদের দূরত্ব এতই সামান্য যে অনতিবিলম্বে আক্রমণ সুরু করার পক্ষে সেইটিই প্রলোভন হয়ে উঠতে পারে। হ্বাইমার জোট[১] সম্মানজনকভাবে হলেও নিঃসন্দেহে পরাজিত হয়েছে। অটো ব্রাউনের[২] প্রতি সম্প্রতি বর্ষিত অনেক উপদেশের মধ্যে সবচেয়ে খারাপটি হচ্ছে স্বয়ং ভগবান অন্যথা না করা পর্যন্ত সাময়িকভাবে হলেও রাজত্ব যেন তিনিই চালিয়ে যান। কিন্তু মুশকিল এই যে রাজনীতিতেও ভগবান বৃহৎ শক্তির পৃষ্ঠপোষক।

ফ্রাঙ্কফুর্টার ৎসাইতুং[৩] ঠিকই বলেছেন যে পার্লামেণ্ট বা সংবিধান সমর্থিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অর্থই হল আসলে অছি সরকার গঠন। "যদি কোনো পরাজিত পার্টির নেতারা পরাজয়ের পরেও মন্ত্রিত্ব দখল করে থাকেন তাহলে এই নীতি অনুসারেই সেই পার্টিকে চলতে হবে। এই নীতি অগ্রাহ্য করলে পরবর্তী নির্বাচন বিষম প্রতিশোধ নেয়।" যে সরকারের কর্তৃত্ব অনেক ব্যর্থতার মধ্যে ক্ষয় হয়ে গেছে, ভোটদাতাদের শতকরা ৩৭ জন সমর্থিত অনেক পার্টির বিরুদ্ধে তার টিকে থাকা সম্ভব নয়। ক্রমবর্ধমান সংকটের চাপে সম্ভবত অনেক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা আগামী দিনে দেখা দেবে যখন কোনো কোনো সময়ে কেবলমাত্র একনায়কত্বের ভিত্তিতেই রাজত্ব চলতে পারে। তখন আগামী হেমন্ত কালের নূতন নির্বাচনে ৩৭ শতাংশ অনায়াসেই ৫২ শতাংশে উঠতে পারে।

আজকের প্রুশিয়ায় পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের পক্ষে বেঁচে থাকার উপায়গুলো কি?

(ক) ব্রাউন মন্ত্রিসভা সাময়িকভাবে ক্ষমতাসীন থাকুক।

(খ) ৎসেনট্রুম পার্টি[৪] ও নাৎসিরা জোট বেঁধে সরকার গঠন করুক।

(গ) ব্রাউন-সেভেরিং সরকার আইনসভায় কমিউনিস্টদের সমর্থনের উপর ভরসা করুক।

(ঘ) বুর্জোয়া পার্টিগুলো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে কমিউনিস্টদের সঙ্গে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা একটি বিরোধী শ্রমিক জোট গঠন করুক।

আমরা মনে করি 'গ' ও 'ঘ'তে বর্ণিত উপায় দুটিই শুধুমাত্র আলোচনার যোগ্য। 'খ'তে বর্ণিত পথ ঐ দুটি পার্টির ঘরোয়া ব্যাপার এবং 'ক'তে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের কাঁধে এমন গুরুভার বর্তায় যা তারা আর বহন করতে সক্ষম নয়।

যে নাৎসিরা অতীতে রাইখ থেকে প্রুশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল, আজ তারাই প্রুশিয়া থেকে রাইখ দখলের উদ্যোগ নিচ্ছে। তারা ৎসেনট্রুম পার্টির সঙ্গে কোনো বোঝাপড়া করে উঠতে পারবে কিনা তা বলা সম্ভব নয়। তবে এই দুই পার্টির কেউই পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা অথবা পরস্পরকে ধাপ্পা দেবার দৃঢ় মানসিকতা হারায় নি। রাইখ সরকারের চারপাশে এমন অনেক উদ্যোগী ব্যক্তি আছে যারা মনে করে যে পার্লামেণ্টারি পথের ব্যর্থতার পরে স্টেগেরভাল্ড-এর[৫] মতো কোনো কমিশনারকে প্রুশিয়ার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে রাইখের পক্ষে প্রুশিয়ার শাসনভার গ্রহণ করাই হবে উপযুক্ত বিধান। "রাইখের সংশোধন করো"—এই আওয়াজের ভিত্তিতে রাজস্ব ও পুলিশকে রাইখের মধ্যে একত্র করে নিজের মাথায় জাতীয় ফ্যাসিবাদের ধ্বজা বেঁধে মহানন্দে গ্রেগর স্ট্রাসের প্রুশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শূন্য স্থান পূরণ করতে পারে।

মূল প্রশ্ন হল, বিজয়ী নাৎসিরা কি তাদের নাকের তলা থেকে সহজে জয়ের মাল্য ছিনিয়ে নিতে দেবে? আরও প্রশ্ন হল, প্রুশিয়ার উপর সামরিক কর্তৃত্বের সুবর্ণ সুযোগ আপাতত থাকলেও ৎসেনট্রুম পার্টি কি এই পথ বেছে নিতে ইতস্তত করবে না? কারণ এখানে ব্যর্থ হলে শুধুমাত্র সেই পার্টির উপরেই নয়, সমগ্র জার্মান ক্যাথলিকবাদের উপরই তার প্রচণ্ড প্রভাব পড়বে। মনে হয়, বেশি সম্ভাবনা হল, ৎসেনট্রুম পার্টি রাইখের উপরেই প্রুশিয়ার সংগঠনের দায়িত্ব দেবে।

আসলে রাইখের বর্তমান সরকার শুধু যে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অস্থায়ী ব্যবস্থা চালু রেখেছে তাই নয়, এমন আরও কয়েকটি মন্ত্রীকে সাথে ভিড়িয়েছে যাদের পার্টিগত পরিচয় প্রুশিয়ার নির্বাচনের পরে একেবারেই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। যেমন, কনজারভেটিব ফোক্‌স পার্টির ট্রেভিরানিসিমো[৬] কার প্রতিনিধিত্ব করে? বাডেনের হের ভাইট্রেখ[৭] তার নিজের দেউলিয়াপনা ছাড়া

আর কিসের প্রতিনিধি? হুগেনবার্গ থেকে বিতাড়িত এবং তার কৃষক সমর্থকদের দ্বারা ধিকৃত হের মার্টিন শিলে[৮] কাদের মুখপাত্র?

হ্বাইমারের পুরাতন জোট আর নেই। ৎসেনট্রুম পার্টি বার হয়ে যাচ্ছে। বুর্জোয়া মধ্যপন্থীরা নিরুদ্দেশ। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি বাইরে ক্ষতবিক্ষত হলেও তার ভিৎ অক্ষত আছে। হেরে গেলেও তারা দারুণ লড়েছে। কমিউনিস্টরাও তাদের পরাজয়ে বিমর্ষ। কিন্তু তাদের ভিৎও ঠিক আছে। শুধু তাদের পার্টির প্রান্তস্থ মাস্তান পাতিবুর্জোয়া সমর্থকরা হিটলারের পক্ষে চলে গেছে।

তা সত্ত্বেও কমিউনিস্টরা আজ তৃতীয় পার্টিতে উন্নীত হয়েছে এবং তাদের উপরে আজ অনেক কিছু নির্ভর করে। পুরনো দিনের উদারপন্থা ও জুংডোর[৯] সঙ্গে নিষ্ফল প্রণয়ে কলঙ্কিত তার 'ষাঁড়', স্টট্স পার্টি, [১০] এই কৃতিত্বের স্বপ্ন দেখত। কমিউনিস্টদের উপরেই প্রুশিয়ার পার্লামেণ্টারি ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এই অবস্থায় কিছু সংবাদপত্র হঠাৎ কমিউনিস্টদের প্রতি তাদের দরদ আবিষ্কার করেছে এবং বন্ধুতাপূর্ণ ও খানিকটা নিরেট বাক্যবাণে তাদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে। এভাবে কাজ করার অর্থ, ঠিক কাজ ভুলভাবে করা। বহু বছর ধরে যে কমিউনিস্টদের কেবলমাত্র ফাঁসির মঞ্চের খোরাক হিসেবে ভাবা হয়েছে, ভাবা হয়েছে রাজনৈতিক বিচারালয়ের মাধ্যমে তাদের একমাত্র ঐ গন্তব্যস্থলেই পাঠানো চলতে পারে, আজ হঠাৎ তাদের সঙ্গে হ্বাইমার জোটের লক্ষ্যভ্রষ্ট লেজুড় হিসাবে ব্যবহার করা চলে না। কমিউনিস্টদের যদি সাময়িক-ভাবে পার্লামেণ্টারি সমর্থনে রাজীও করানো যায়, সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের উপরে তার গভীর প্রভাব পড়বে। বর্তমান পরিস্থিতি সত্যিই বেদনাদায়ক, কিন্তু এরই মধ্যে এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ লুকিয়ে রয়েছে: পুনরায় দুটি সুবৃহৎ সমাজতান্ত্রিক দল আজ নিঃসঙ্গ। কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের বহু আশা তিনটি নির্বাচনরাত্রির ব্যর্থতার মধ্যে মরীচিকায় পরিণত হয়েছে।

নির্বাচনের পরের দিন বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন অপজিশনের[১১] সঙ্গে একত্রে কমিউনিস্ট পার্টি একটি আবেদন প্রচার করেছে। তাতে বলা হয়েছে, "শ্রমিকদের সাহায্যকল্পে প্রবর্তিত ব্যবস্থাগুলি খর্ব ও তাদের মজুরি হ্রাসের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যারা শ্রমিকদের একত্রিত করে সত্যিকারের লড়াই করতে চায় এমন প্রতিটি সংগঠনের সঙ্গেই আমরা যুক্তভাবে সংগ্রামে নামতে প্রস্তুত। এজন্য আমরা কমিউনিস্টরা নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করছি: প্রতিটি কারখানায় ও খনিতে, প্রতিটি শ্রমিক নিয়োগ কেন্দ্রে, রিলিফ অফিসে, প্রতিটি ট্রেড ইউনিয়নে এখনই

সাধারণ সভা ডাকা হোক ; এই সভাগুলিতে বর্তমানের বিপজ্জনক পরিস্থিতির মূল্যায়ন হোক, যুক্ত দাবিপত্র তৈরি হোক এবং কমিউনিস্ট, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট, ক্রিশ্চিয়ান ও নির্দলীয় শ্রমিকদের নিয়ে সংগ্রাম সমিতি ও স্ট্রাইক কমিটি নির্বাচিত করে মজুরি ও রিলিফ হ্রাসের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম পরিচালিত হোক।"

একই সঙ্গে কমিউনিস্ট সংবাদপত্রে এই গভীর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, সোয়াস্তিকার হাতে প্রুশিয়াকে তুলে দেবার কোনো ইচ্ছে পার্টির নেই। এর উত্তরে যুক্তফ্রণ্টের নামে কমিউনিস্টদের নিজ পার্টির কাজ গুছিয়ে নেবার 'কৌশল'-এর বিরুদ্ধে স্বভাবসিদ্ধ মেজাজ অপেক্ষা অনেক নম্রভাবে 'ওরভার্টস'[২] গ্যারান্টি দাবি করেছে। দুটি মহান সোশ্যালিস্ট পার্টির মধ্যে সমঝোতার সম্ভাবনা অতীতে কোনোদিন এর থেকে বেশি উজ্জ্বল ছিল না এবং এত অত্যাবশ্যকও ছিল না।

এই আলোচনার বিষয়বস্তুকে সুদূরপ্রসারী আদর্শ বা লক্ষ্যের সঙ্গে মেলানো ঠিক হবে না। রেড ইউনাইটেড ফ্রণ্টের আওয়াজের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা উভয় পক্ষই পার্টি অহমিকা এবং একে অন্যের প্রভাবে হস্তক্ষেপের বহু চেষ্টার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে। দুজন শ্রমিক যখন একত্র হয় তখন এই আওয়াজের খানিকটা ফল হয়তো দেখা যায়, কিন্তু আখেরে সেটা এই দুটি শ্রমিককর্মীকে পরস্পরের প্রতি আরও সন্দিগ্ধই করে তোলে। বর্তমানে আসুন আমরা এই আওয়াজ ছেড়ে দিই। কারণ সমস্যা এ নয় যে দুটি পার্টিকে মিলিয়ে এক পার্টিতে পরিণত করতে হবে। মূল সমস্যা হল, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে দুটি পার্টির মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা গড়ে তোলা।

দুই সহযোগীর মধ্যে প্রথমেই একটি কথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। সংশোধনবাদ ও বিপ্লববাদ দুটিই শ্রমিক আন্দোলনের স্বাভাবিক ও সঙ্গত ধারা। একটির দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে, অন্যটির লক্ষ্য বর্তমান। এই দুটি কর্মপন্থারই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু আজ উভয়েই বিষম বিপদগ্রস্ত। এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এখন অতীতের ইতিহাসে পরিণত হতে চলেছে। সোজা কথায় বলা প্রয়োজন যে, বর্তমান যুগে শ্রমিক আন্দোলনের হাতে আর উদ্যোগের সুযোগ নেই —সে সংশোধনবাদী অংশই হোক আর বিপ্লবী অংশই হোক। সুবিধাবাদী ধূর্ততা নিয়ে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি পথের অন্তিম প্রান্তে পৌঁছে গেছে, ঠিক যে অবস্থা হয়েছে কমিউনিস্টদের, বিশ্ববিপ্লবের জন্য প্রবল উদ্যমের মধ্য দিয়ে। ফ্যাসিবাদ এখন আদেশ দিচ্ছে। প্রগতির জন্য শ্রমিক আন্দোলন জার্মানির

বর্তমান বিপ্লবী বিক্ষোভের জন্ম দেয় নি; পতনের মুখ থেকে বাঁচবার জন্য বুর্জোয়াদের আপ্রাণ চেষ্টাই রয়েছে এর মূলে। ধনতন্ত্র যখন পতনোন্মুখী, শ্রমিকরা তখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত! বর্তমানে এই হল সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা এবং এই থেকেই দৃষ্টিভঙ্গি ও রণকৌশল ঠিক করতে হবে।

শুধুমাত্র আলোচনার জন্য হলেও সকল সোশ্যালিস্ট গ্রুপকে একত্র করা সোজা নয়। তারা পরস্পরের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। আজ তাই সহিষ্ণুতা প্রয়োজন। আজ সকলের পক্ষেই শত্রুতা প্রায় ঐতিহ্য ও সম্মানের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। উর্বর মস্তিষ্কে সবকিছুই ভয়াবহ বিশদতার সঙ্গে জমিয়ে রাখা হয়েছে। এইসব ভীতিপ্রদ ও সুবিন্যস্ত স্মৃতি সমাজতন্ত্রের সব আলোচনাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। হাজার হাজার মানুষের মগজে অন্যের ভুল (তা যতই পুরনো হোক) এমন তীক্ষ্ণ সূঁচ দিয়ে লিখে রাখা হয়েছে যে তা জ্বালা ধরায়। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে কাগজের দেয়াল।

"আমিই ঠিক" এ কথা বলার দিন আজ ফুরিয়েছে। ধ্বংসের হাত থেকে সংগঠিত সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকশ্রেণীর সর্ব অংশকে রক্ষা করাই এখন প্রধান প্রশ্ন। আমাদের বাসগৃহের ক্ষেত্র ক্রমান্বয়ে হ্রস্ব হয়ে আসছে। ঘরের দেওয়ালগুলো যেন এক অদৃশ্য হাতের চাপে এগিয়ে আসছে এবং তার সীমিত ক্ষেত্রে পিষ্ট হয়ে আমাদের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এখনও কি আমরা সেই পুরাতন লড়াই চালাব? কর্মপন্থা ও নীতি, 'লক্ষ্য' ও 'ধাপ'-এর প্রশ্ন এখন প্রধান নয়। আজ শ্রমিকশ্রেণীর যা কিছু পুঁজি, তার প্রেস, তার ট্রেড ইউনিয়ন হল (Trade Union Hall), তার রক্তমাংস চায় আশা, ভরসা ও সংগ্রাম।

সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ও কমিউনিস্ট, তোমাদের আমি জিজ্ঞাসা করি: কাল কি আর আলোচনার সময় বা সুযোগ থাকবে?

তোমাদের মধ্যে ব্যবধানের যে প্রাচীর গড়ে উঠেছে তাকে আমি অস্বীকার করি না। আমি অন্যদের থেকে অবস্থা ভালোভাবে বুঝতে পারি, কারণ উভয় পক্ষ থেকেই আমার প্রতি নিন্দা বর্ষিত হয়েছে।

আমাদের সবাইকে রক্ষা করতে পারে এমন একমাত্র পদক্ষেপে তোমরা যদি দ্বিধা করো, যদি অতীত এখনও তার কঙ্কালসার হাত দিয়ে বর্তমানের কণ্ঠরোধ করে, তাহলে প্রয়োজন সৎ মধ্যস্থতার—এমন নির্দলীয় লোকের, যারা নিজের স্বার্থসিদ্ধির চিন্তা করে না এবং যারা পুরোপুরি সমাজতন্ত্রের পক্ষে। প্রথম আলোচনা সভা তাদেরই ডাকতে হবে। আগামী দিনে সমস্ত জার্মান

সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্টদের ভাগ্য নিক্তির সুতোয় ঝুলছে। কিন্তু তাদের কাগজ দেখলে এর সামান্য আভাসও মিলবে না। ঠাণ্ডা লড়াই এখনও চলছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ঐক্যের কথা ধ্বনিত হয়েছে এবং তার প্রতিধ্বনি উঠছে। আলোচনার গোলটেবিল এখন তৈরি রয়েছে।

অনুবাদঃ সুনীল মুন্সী

১. হ্বাইমার প্রজাতন্ত্রঃ প্রথম জার্মান প্রজাতন্ত্র, ১৯১৯-১৯৩৩।

২. সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট, ১৯২০-১৯৩২ পর্যন্ত প্রায় ক্রমান্বয়ে প্রুশিয়ার প্রধানমন্ত্রী। ১৯৩২ সালের জুলাইতে ফন পাপেন কর্তৃক শাসনভার জবরদখলের ফলে অপসারিত।

৩. সংবাদপত্র।

৪. মধ্যপন্থী বুর্জোয়া ক্যাথলিক পার্টি, ১৮৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত।

৫. অ্যাডাম স্টেগেরভাল্ড,ৎসেনট্রুম পার্টির ও ক্যাথলিক ট্রেড ইউনিয়নের নেতা। ১৯৩০-১৯৩২ সালে রাইখের শ্রমমন্ত্রী।

৬. গট্‌ফ্রীড রাইনহোল্ড ট্রেভিরেনাস, রক্ষণশীল রাজনৈতিক নেতা, জার্মান ন্যাশনাল পার্টি ভাগ হবার পর রক্ষণশীল জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩০-৩২ সালে রাইখের পরিবহনমন্ত্রী।

৭. জার্মানির স্টট্‌স পার্টির নেতা এবং ১৯৩০-৩২ সালে রাইখের অর্থমন্ত্রী।

৮. জমিদার, ১৯২৫ সালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পরে খাদ্যমন্ত্রী। ১৯২৯ সালে হুগেনবার্গের ন্যাশনাল ফোক্‌স পার্টি থেকে বিতাড়িত হয়ে লাণ্ড ফোক নামে একটি কৃষকদল গঠন করে।

৯. দক্ষিণপন্থী র‍্যাডিকাল সংগঠন। ১৯২০ সালে গঠিত।

১০. উদারপন্থী পার্টি।

১১. কমিউনিস্ট প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা। ১৯২৭ সালে সংগঠিত। রেড ইনটারন্যাশনাল অব লেবার ইউনিয়নস-এর সঙ্গে যুক্ত।

১২. সংবাদপত্র।

ফ্যাসিবাদে লেখকের মুক্তি নেই

জঁ-পল সার্ত্রে

[ফ্যাসিবাদের মোহ অনেক লেখক বুদ্ধিজীবীকেই আবিষ্ট করে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা ক্ষমতার আত্মপ্রসাদ লেখককে প্রলুব্ধ করে। এমনই এক লেখকের মর্মান্তিক ইতিহাস থেকে জঁ-পল সার্ত্রে তাঁর সিদ্ধান্তে পৌছান: ফ্যাসিবাদে লেখকের মুক্তি নেই, সাহিত্যের ধর্মই তাকে ফ্যাসিবাদে শান্তি দেবে না। 'লেখা কী?' নামে একটি প্রবন্ধের উপসংহার, ইংরেজী থেকে অনুবাদিত। 'হোয়াট ইজ লিটেরেচার' বা 'সাহিত্য কী' নামে ইংরেজী বইয়ে প্রবন্ধটি আছে। —অনুবাদক]

লেখক লিখতে বসলেন; তার মানেই তিনি পাঠকদের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেন। পাঠক বই খুলে ধরলেন; তার মানেই তিনি লেখকের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেন। যেদিক থেকেই দেখুন না কেন, শিল্পকর্ম মাত্রেই মানবসমাজের স্বাধীনতায় আস্থা ঘোষণা। লেখকের মতোই পাঠকেরাও এই স্বাধীনতা স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই তার আত্মপ্রকাশ প্রত্যাশা করেন। তাই শিল্পকর্মের সংজ্ঞা দেওয়া যায়, মানবমুক্তি দাবি করে বলেই তা বিশ্বলোকের কাল্পনিক উপস্থাপনা। ফলত 'বিষাদাচ্ছন্ন সাহিত্য' বলে কিছু নেই, কেননা, যত কালো রঙেই কোনো লেখক পৃথিবীকে আঁকুন না কেন, তাঁর রঙ লাগাবার একটাই উদ্দেশ্য, যাতে স্বাধীন মানুষ সেই ছবির দিকে তাকিয়ে তাদের স্বাধীনতা অনুভব করতে পারে। উপন্যাস ভালো হতে পারে, খারাপ হতে পারে। খারাপ উপন্যাস চাটুবাক্যে খুশি করতে চায়। ভালো উপন্যাস জন্মায় প্রচণ্ড তাগিদে, বিশ্বাসের তাড়নায়। কিন্তু সর্বোপরি যে অনন্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোনো লেখক পৃথিবীকে সেইসব স্বাধীনতার দিকে তুলে ধরেন যা তিনি বাস্তবে সত্য করে তুলতে চান, তার ভিত্তি, এমন এক পৃথিবীতে বিশ্বাস যা ক্রমাগতই আরো স্বাধীনতাকে জাগ্রিত করে। উদারতার এই যে মুক্তি লেখক ছড়িয়ে দেন, তা কখনোই কোনো অন্যায়কে স্বীকার করে নেওয়ার যুক্তিতে প্রযুক্ত হতে পারে না। যে রচনা মানুষের হাতে মানুষের পরাধীনতাকে সমর্থন করে, স্বীকার করে নেয়, কিংবা নিন্দা করা থেকে বিরত থাকে, সেই রচনা পড়তে পড়তে পাঠক তাঁর স্বাধীনতা-

বোধ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকবেন, এও হতে পারে না। শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে পরিব্যাপ্ত ঘৃণায় পরিপূর্ণ হলেও কোনো মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গের লেখা উপন্যাস ভালো হতে পারে, কারণ সেই ঘৃণার মধ্য দিয়েও তিনি তাঁর জাতির স্বাধীনতা দাবি করছেন। যেহেতু তিনি আমার মধ্যে উদারতার দৃষ্টিভঙ্গিই সঞ্চারিত করছেন, যে মুহূর্তে আমি নিজে সেই শুদ্ধ স্বাধীনতার উপলব্ধি বোধ করি, আমি আর কোনো অত্যাচারী শ্রেণীর সগোত্র থাকতে পারি না। তাই সর্বপ্রকারের স্বাধীনতার কাছে আমার দাবি শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গ জাতির মুক্তির দাবি উচ্চারিত হোক, আমিও যেহেতু সেই শ্বেতাঙ্গকুলের অংশ, আমার বিরুদ্ধেও তা ধ্বনিত হোক। এক মুহূর্তের জন্যও কেউ ভাববেন না, যে, ইহুদিবিদ্বেষের সমর্থনে কোনো ভালো উপন্যাস লেখা সম্ভব। যে-মুহূর্তে আমি অনুভব করি যে আমার স্বাধীনতা অন্য সমস্ত মানুষের স্বাধীনতার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সূত্রে জড়িত, সেই মুহূর্তেই আমি জানি যে এই জনসমষ্টির একাংশের দাসত্বের সমর্থনে আমার স্বাধীনতাকে আমি কাজে লাগাতে পারি না। প্রাবন্ধিক, পুস্তিকাকার, ব্যঙ্গসাহিত্যিক, বা ঔপন্যাসিক, ব্যক্তিগত আবেগের ধারক বা সমাজব্যবস্থার প্রতিবাদী, প্রত্যেক লেখকই স্বাধীন মানুষের মুখোমুখি স্বাধীন মানুষ। তাঁর বিষয় কেবল একটাই হতে পারে—স্বাধীনতা। তাই পাঠকদের দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধবার যে-কোনো চেষ্টাই লেখকের শিল্পেই চিড় ধরাবে। কোনো লোহার কারিগর তাঁর ব্যক্তিজীবনে ফ্যাসিবাদের আক্রমণের শিকার হতে পারেন। কিন্তু তাই বলে তাঁর কারিগরিতেও তার প্রভাব পড়বে, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু লেখক বিপর্যস্ত হবেন উভয় ক্ষেত্রেই, জীবনের চেয়েও বেশি আঘাত পাবেন তাঁর লেখার ক্ষেত্রে। আমি এমন লেখকদের দেখেছি, যাঁরা যুদ্ধের আগে মনেপ্রাণে ফ্যাসিবাদকেই চেয়েছেন, অথচ নাৎসিরা যখন তাঁদের উপর সম্মান ঢেলে দিয়েছেন, তখন তাঁরা বন্ধ্যাতায় নিমজ্জিত হয়েছেন। আমি বিশেষ করে দ্রিউ লা রোশেলের কথা ভাবছি। তিনি ভুল করেছিলেন, কিন্তু তাঁর নিষ্ঠায় ফাঁকি ছিল না। তিনি তা প্রমাণ করেছিলেন। নাৎসিদের উদ্যোগে প্রকাশিত এক পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম কয়েক মাস তিনি তাঁর দেশবাসীকে তিরস্কার করেছেন, নিন্দা করেছেন, উপদেশ দিয়েছেন। কেউ তাঁর লেখার জবাব দেয় নি, কারণ জবাব দেবার স্বাধীনতা তখন কারো ছিল না। তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন; তিনি আর তাঁর পাঠকদের অনুভব করতে পারেন না। তিনি আরো জোর দিয়ে লিখতে লাগলেন। কিন্তু কেউ যে তাঁকে

এতটুকু বুঝেছে তার কোনো চিহ্ন কোথাও নেই। ঘৃণা বা রাগেরও কোনও চিহ্ন নেই; কিচ্ছু নেই। তাঁর মনে হল, তিনি আর কোনো কিছু ধরতে পারছেন না। তাঁর ক্ষোভ বেড়ে উঠছে। তিনি জার্মানদের কাছে তিক্ত অনুযোগ জানালেন। তাঁর আগের প্রবন্ধগুলি চমৎকার হয়েছিল; এবারে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। একটা সময় এল যখন বুক চাপড়ে চিৎকার করতে লাগলেন; কোথাও কোনো প্রতিধ্বনি উঠল না। সাড়া এল কেবল সেই কেনা সাংবাদিকদের দঙ্গল থেকে, যাদের তিনি ঘৃণা করেন। তিনি পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন, সেই পত্র প্রত্যাহার করলেন, আবার লিখলেন, আবার সেই মরুভূমিতে। শেষে তিনি নীরব হয়ে গেলেন, অন্যদের নীরবতা তাঁর গলা চেপে ধরল। তিনি অন্যদের দাসত্বে টেনে নামাতে চেয়েছিলেন, পাগলের মতো ভেবেছিলেন এটা তাঁর স্বাধীন চিন্তা, ভেবেছিলেন তাঁর নিজের মন বুঝি তখনও স্বাধীন। দাসত্ব এল। তাঁর ভিতরের মানুষটা তাঁকে পিঠ চাপড়াল। কিন্তু তাঁর ভিতরে যে লেখক সে সইতে পারল না। এই টানাপোড়েন যখন চলছে, তখন অন্যরা, যারা সংখ্যা-গরিষ্ঠ, তারা বুঝেছে, নাগরিকের স্বাধীনতা না থাকলে লেখার স্বাধীনতা থাকবে কি করে? কেউ তো আর ক্রীতদাসের জন্য লেখে না। গদ্যের শিল্প সেই এক শাসনব্যবস্থার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে, ঐ এক শাসনব্যবস্থাতেই গদ্যের যা কিছু তাৎপর্য, যার নাম গণতন্ত্র। একের উপর আঘাত এলে অন্যও আহত হয়। শুধু কলমের জোরেই এদের রক্ষা করার চেষ্টা করলে চলবে না। এক-একটা সময় আসে যখন কলমকে জোর করে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়, তখন লেখককে অস্ত্র তুলে নিতে হয়। তখন যে পথেই আপনি এসে পৌঁছান না কেন, যে মতামতই আপনি ধারণ করে থাকুন না কেন, সাহিত্য আপনাকে লড়াইয়ের মাঝখানে এনে ফেলবে। লেখা বলতে একভাবে স্বাধীনতা চাওয়া। একবার শুরু করলেই, চান বা না চান, আপনি জড়িয়ে পড়েছেন।

কিসে জড়িয়ে পড়েছেন? স্বাধীনতার প্রতিরক্ষায়? কথাটা বলা সহজ। বেন্দার বুদ্ধিজীবীর মতো বিশ্বাসঘাতকতার আগে আদর্শ মূল্যবোধের রক্ষাকর্তার ভূমিকায়, না কি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রামে পক্ষ বেছে নিয়ে প্রতিদিনের বাস্তব স্বাধীনতাকে রক্ষা করা? এই প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে আরেকটি প্রশ্নের সঙ্গে, সেই আপাত সহজ প্রশ্ন, যে-প্রশ্ন কেউ কখনও নিজেকে করে না: 'কার জন্য লিখি?'

অনুবাদ: অজিষ্ণু ভট্টাচার্য

ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট

চার্লস চ্যাপলিন

[মহান মানবতাবাদী শিল্পী চার্লস চ্যাপলিনের একটি বিখ্যাত ও বিতর্কিত বক্তৃতার অনুবাদ নিচে দেওয়া হল। আমেরিকার মাটিতে বসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনে বক্তৃতা দেওয়া সাহসের পরিচয়। এই বক্তৃতার সূত্র ধরেই পরে চ্যাপলিনের বিরুদ্ধে ম্যাকার্থির আমলে নানা কুৎসা প্রচার করা হয়। চ্যাপলিন একটি বক্তৃতার সময় কেন 'কমরেডস' সম্বোধন করেছিলেন সেটাও ফ্যাসিপন্থী মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তরের জিজ্ঞাস্য হয়ে ওঠে। চ্যাপলিন আমেরিকার এই স্পর্ধিত ব্ল্যাকমেইলের কাছে অবশ্য নতিস্বীকার করেন নি। তিনি মার্কিন নাগরিকত্বও গ্রহণ করেন নি। ফলে শেষ পর্যন্ত এই মহান শিল্পীকে আমেরিকা থেকে চলে আসতে হয়। চ্যাপলিন এই বক্তৃতাটি দেন ১৯৪২ সালের ২২ জুলাই, ন্যুয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে এক জনসভায়। এই সভা আহূত হয়েছিল প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সমর্থনে, ইয়োরোপে অবিলম্বে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার দাবিতে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, সংস্থা এবং কাউন্সিল অভ দ্য কংগ্রেস অভ ইনডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশন ছিল এর উদ্যোক্তা। চ্যাপলিন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে দূরপাল্লার টেলিফোনে ভাষণটি দেন; সেটি সভায় রিলে করে শোনানো হয়।—অনুবাদক]

রাশিয়ার রণাঙ্গনে নির্ধারিত হবে গণতন্ত্রের জীবনমরণ। মিত্রশক্তির ভাগ্য এখন কমিউনিস্টদের হাতে। রাশিয়া যদি পরাভূত হয়, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও সমৃদ্ধ মহাদেশ এশিয়া চলে যাবে নাৎসিদের অধীনে। প্রায় পুরো প্রাচ্যদেশ জাপানীদের করতলগত হওয়ায় নাৎসিরা পৃথিবীর প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ রণসামগ্রী একেবারে নাগালের মধ্যে পেয়ে যাবে। এরপর হিটলারকে হারাবার আর কি সুযোগ থাকবে আমাদের ?

এদিকে যানবাহনের অসুবিধা, হাজার হাজার মাইল দূরে আমাদের যোগাযোগ রক্ষার সমস্যা, ইস্পাত তেল ও রাবারের সমস্যা এবং বিভেদ সৃষ্টি করে জয় করার হিটলারি রণকৌশল—এ অবস্থায় রাশিয়া যদি পরাজিত হয়, আমাদের অবস্থা হবে সঙ্গিন।

কেউ কেউ বলেন, তাতে আর কি ? যুদ্ধ না হয় আরও দশ কি কুড়ি বছর

চলবে। আমার হিসেবে এটা হল একটু বেশি আশাবাদিতা। এই পরিস্থিতিতে এবং এমন দুর্ধর্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ হবে খুবই অনিশ্চিত।

কিসের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি ?

রাশিয়ানদের এখন খুবই সাহায্যের প্রয়োজন। তারা দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার জন্য দাবি জানাচ্ছে। মিত্র দেশগুলোর মধ্যে এ-বিষয়ে মতভেদ আছে যে এক্ষুণি দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা সম্ভব কিনা। আমরা শুনে থাকি দ্বিতীয় ফ্রণ্ট চালাবার মতো যথেষ্ট যুদ্ধসামগ্রী মিত্রশক্তির নেই। আবার শুনি যে তাদের তা আছে। আমরা এও শুনি যে পরাজয়ের আশঙ্কায় তারা এই সময়ে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার ঝুঁকি নিতে চাইছে না। পুরোপুরি নিশ্চিত ও প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত তারা কোনো ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক।

কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত ও প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত কি আমরা অপেক্ষা করতে পারি ? ঝুঁকি না নিয়ে কি আমরা থাকতে পারি ? যুদ্ধে ঝুঁকি ছাড়া কোনো রণকৌশল নেই। এই মুহূর্তে জার্মানরা ককেসাস থেকে ৩৫ মাইল দূরে। ককেসাস যদি যায়, রাশিয়ার ৯৫ শতাংশ তেল হাতছাড়া হবে। যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ মরছে, আরও লক্ষ লক্ষ মৃত্যুমুখে—তখন আমরা কি ভাবছি তা সৎভাবে স্পষ্ট করে বলতে হবে। মানুষের মনে নানা প্রশ্ন উঠছে। আমরা শুনছি আয়ারল্যাণ্ডে বিরাট অভিযাত্রী ফৌজ নামছে, আমাদের জাহাজের কনভয়ের ৯৫ শতাংশ অক্ষতভাবে ইয়োরোপে পৌঁছচ্ছে, কুড়ি লক্ষ ব্রিটিশ সৈন্য সম্পূর্ণ অস্ত্র-সজ্জিত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য তৈরি। তাহলে কিসের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি, রাশিয়ার যখন এমন মরিয়া অবস্থা ?

আমরা মুখোমুখি হতে পারি

সরকারি ওয়াশিংটন ও সরকারি লণ্ডনকে বলছি, এ প্রশ্নগুলো বিভেদ সৃষ্টির জন্য নয়। বিভ্রান্তি দূর করে, আত্মবিশ্বাস ও ঐক্য গড়ে তুলে চূড়ান্ত জয়ের জন্যই এই প্রশ্ন আমরা রাখছি। এবং এর উত্তর যাই হোক না কেন আমরা তার মুখোমুখি হতে পারি। রাশিয়া দেয়ালে পিঠ দিয়ে লড়ছে। সে দেয়ালটাই হল মিত্রশক্তির সবচেয়ে মজবুত প্রতিরক্ষা। লিবিয়াকে রক্ষা করতে গিয়ে আমরা তা হারিয়েছি। ক্রীট রক্ষা করতে গিয়েও আমরা হেরেছি। ফিলিপিনস ও প্রশান্ত মহাসাগরে অন্যান্য দ্বীপ বাঁচাতে গিয়েও আমরা সেগুলো হারিয়েছি। কিন্তু রাশিয়াকে আমরা হারাতে পারি না, কারণ তার অবস্থান গণতন্ত্রের

সংগ্রামীদের প্রথম সারিতে। যখন আমাদের জগৎ, আমাদের জীবন, আমাদের সভ্যতা, আমাদের পায়ের কাছে ধসে পড়ছে—তখন আমাদের একটা ঝুঁকি নিতেই হবে।

রাশিয়া যদি ককেসাস হারায় তাহলে মিত্রশক্তির পক্ষে তা হবে চরম সর্বনাশ। তখন তোষণকারীদের দিকে নজর রাখতে হবে, কারণ তারা গর্ত থেকে তখন বেরিয়ে আসবে। তারা চাইবে বিজয়ী হিটলারের সঙ্গে একটা রফা করতে। তারা বলবে "আর আমেরিকান জীবন নষ্ট করা অর্থহীন—আমরা হিটলারের সঙ্গে 'একটা ভালো রফা' করতে পারি।"

নাৎসি ফাঁদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার

এই নাৎসি ফাঁদের ওপর নজর রাখুন। এই নাৎসি নেকড়েগুলো ভেড়ার পোশাক পরবে। তারা শান্তির ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুব লোভনীয় করে তুলবে এবং ভালো করে বোঝবার আগেই আমরা নাৎসি মতবাদের কাছে ধরা দেব। আমরা দাস হয়ে পড়ব। তারা আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেবে এবং আমাদের চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করবে। পৃথিবী শাসিত হবে গেস্টাপো দ্বারা। তারা আকাশ থেকে আমাদের শাসন করবে। হ্যাঁ, সেটাই হবে ভবিষ্যতের শক্তি।

আকাশে নাৎসি একাধিপত্য সমস্ত বিরোধিতার অস্তিত্ব উড়িয়ে দেবে। মানব প্রগতি যাবে নষ্ট হয়ে। সংখ্যালঘুদের কোনো অধিকার থাকবে না। শ্রমিকদের কোনো অধিকার থাকবে না, থাকবে না কোনো নাগরিকাধিকার। সমস্ত কিছু একেবারে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। একবার যদি আমরা তোষণকারীদের কথা শুনি এবং বিজয়ী হিটলারের সঙ্গে সন্ধি করি তাহলে তার বর্বর আদেশই নিয়ন্ত্রণ করবে পৃথিবী।

আমরা একটা ঝুঁকি নিতে পারি

তোষণকারীদের দিকে নজর রাখুন। তারা সব সময়েই কোনো একটা সর্বনাশের পর মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

যদি আমরা সতর্ক থাকি এবং আমাদের মনোবল ঠিক রাখি তাহলে আমাদের ভয়ের কিছু নেই। মনে রাখবেন, মনোবলই ইংল্যাণ্ডকে বাঁচিয়েছে। আমরা যদি মনোবল ঠিক রাখি তাহলে জয় সুনিশ্চিত।

হিটলার অনেক ঝুঁকি নিয়েছে। তার সব চেয়ে বড় ঝুঁকি হল রাশিয়া আক্রমণ। এই গ্রীষ্মে যদি সে ককেসাসে ঢুকতে না পারে, তাহলে তার ভাগ্যে

কি আছে ভগবানই জানেন। যদি তাকে আরেকটা শীত মস্কোর আশেপাশে কাটাতে হয় তাহলেও তার ভাগ্য একান্তই ভগবানের হাতে। তার ঝুঁকি অত্যন্ত বিপজ্জনক, কিন্তু সে তা নিয়েছে। যদি হিটলার ঝুঁকি নিতে পারে, আমরা পারব না কেন? আমাদের দায়িত্ব দিন। বার্লিনের ওপর ফেলবার জন্য আরও বোমা দিন। আমাদের পরিবহন সমস্যাকে সাহায্য করার জন্য গ্লেন মার্টিন সামুদ্রিক বিমান দিন। সর্বোপরি, আমাদের এক্ষুণি একটা দ্বিতীয় রণাঙ্গন দিন।

বসন্তেই জয়

বসন্তে জয়লাভ যেন আমাদের লক্ষ্য হয়। কারখানায় যাঁরা আছেন, যাঁরা সৈনিকের পোশাকে আছেন, যাঁরা বিশ্বের নাগরিক, আসুন আমরা সকলে সেই লক্ষ্যসাধনের জন্য কাজ করি ও যুদ্ধ করি। সরকারি ওয়াশিংটন এবং সরকারি লণ্ডন, আসুন এটাই আমাদের লক্ষ্য হোক—আগামী বসন্তেই জয়।

যদি এই লক্ষ্যে আমরা স্থির থাকি, এই লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করি, এই লক্ষ্যের জন্য বাঁচি তাহলে তা এমন একটা মনোভাব গড়ে তুলবে যা আমাদের শক্তি বাড়াবে এবং আমাদের কর্মক্ষমতা ত্বরান্বিত করবে।

আসুন আমরা অসম্ভবের জন্যই চেষ্টা করি। মনে রাখবেন ইতিহাসে মহৎ কৃতিত্বগুলো সবই হল যা অসম্ভব মনে হয়েছিল তাকে সম্ভব করা।

অনুবাদ : কৃষ্ণ ধর

গ্যোনিকা [অংশ]

ঃ পাবলো পিকাসো

শিল্পী ঃ কোথে কোলভিৎস

শিল্পী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চল্লিশ দশকের ফ্যাসিস্টবিরোধী পোস্টার

শিল্পী : শুভো ঠাকুর

বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসে ভারতীয় মনীষীদের বাণী

['প্রগতি' (১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) থেকে বানান ও যতিচিহ্নে প্রয়োজনীয় সংশোধন সহ উদ্ধৃত। 'বাণী'-টি সংকলনের 'পরিশিষ্ট—খ' হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। —সম্পাদক]

* গবর্নমেণ্ট কর্তৃক পুস্তক ও পত্রিকাদি নিষিদ্ধ করা এবং আর-এক মহাযুদ্ধের আয়োজনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভারতের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নিম্নলিখিত ইস্তাহার প্রচার করিতেছেন। রোমাঁ রোলাঁর আহ্বানে ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ তারিখে ব্রুসেলসে যে বিশ্বশান্তি সম্মেলন হইয়াছে, ইস্তাহারটি তথায় প্রেরিত হইয়াছে। প্যারিসে সংস্কৃতি-রক্ষা সম্মেলনেও উহা প্রেরিত হইয়াছে। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের লেখক, শিল্পী ও মনীষীরা এই ইস্তাহারে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের উদ্যোগেই এই প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। *

দেশে এবং বিদেশে সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহা অত্যন্ত আশঙ্কা ও উদ্বেগজনক। উন্মত্ত প্রতিক্রিয়া এবং জঙ্গীবাদ আজ সভ্যতার ভাগ্য লইয়া খেলা করিতেছে এবং সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিবার উপক্রম করিয়াছে। সুতরাং আমরা ইহার বিরুদ্ধে ভারতের লেখক ও শিল্পিগণের, এবং সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতি যাহাদের দরদ আছে তাঁহাদের সকলের, প্রতিনিধিরূপে প্রতিবাদ জানানো অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। এ সময়ে আমাদের নীরব থাকা অপরাধ হইবে, সমাজের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য তাহার ঘোর ব্যত্যয় করা হইবে।

ভারতে নাগরিক অধিকার হইতে জনগণকে যেরূপে সাঙ্ঘাতিকভাবে বঞ্চিত করা হইয়াছে, তাহা শুধু রাজনীতির দিক দিয়াই সর্বনাশকর নহে, উহা দ্বারা সংস্কৃতি ও জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতি বিস্তারের চেষ্টাকে খোলাখুলি আক্রমণ করা হইতেছে। প্রায়শই যেভাবে পুস্তকাদি, বিশেষত সমাজতন্ত্রের মতবাদ ও কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত পুস্তক বাজেয়াপ্ত করা হইতেছে, তাহা আমাদের মতে অত্যন্ত কলঙ্করকর। নামজাদা বাণিজ্য শুল্ক আইনের (Sea Customs Act) ১৯ ধারা অনুসারে বিদেশ হইতে প্রেরিত পুস্তক, পুস্তিকা ও পত্রিকা আটক করার কথা প্রায়ই শুনি। শ্রেষ্ঠ সমাজতত্ত্ববিদ হিসাবে সিডনী ও বিয়াট্রিস ওয়েবের প্রচুর খ্যাতি আছে; কিন্তু তাঁহাদের সে খ্যাতি সত্ত্বেও তাঁহাদের লেখা 'সোভিয়েট কমিউনিজম' নামক পুস্তক পর্যন্ত ঐ আইনে ভারতে আমদানি করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাশিয়ার চিঠি'র ইংরাজী অনুবাদ নিষিদ্ধ হইয়াছে। গবর্নমেণ্টের সংস্কৃতি ও প্রগতিবিরোধী মনোভাব ছাড়া ইহার আর কোনো কারণ থাকিতে পারে না। বোম্বাইতে সম্প্রতি

সো'র 'রাশিয়ান স্কেচ বুক' বাজেয়াপ্ত হয়; ব্যাপারটি অত্যন্ত বিস্ময়কর হইলেও উহা হইতে স্বৈরনীতির কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাজেয়াপ্ত বা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের আদেশে নিষিদ্ধ পুস্তক ও পত্রিকার তালিকা প্রকাশ করিলেই বোঝা যাইবে, এ দেশে সরকারী কার্যপদ্ধতি কিরূপ নিন্দার্হ। ইহা ছাড়া, দেশে স্বাধীন ও শক্তিশালী সংবাদপত্র সৃষ্টির বিরুদ্ধে অবিরাম আক্রমণ তো আছেই।

সরকারি হিসাব অনুসারে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ৩৪৮ খানি সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। চিন্তার ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা আমরা ভোগ করি বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহার দুরবস্থা সকলের পক্ষে উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে।

সংস্কৃতির প্রতি যাহাদের দরদ আছে তাহাদের কাছে ভারত অপেক্ষাও ভারতের বাহিরের অবস্থা আরও উদ্বেগজনক। মহাযুদ্ধের প্রেতচ্ছায়া পৃথিবীময় বিচরণ করিতেছে। ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরি খাদ্যের পরিবর্তে অস্ত্র যোগাইয়া এবং সংস্কৃতির সুযোগের পরিবর্তে সাম্রাজ্যগঠনের প্রলোভন ধরিয়া নিজের জঙ্গীবাদী রূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছে। আবিসিনিয়াকে পদানত করিবার জন্য ইতালি যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহা যুক্তি ও সভ্যতার প্রতি বিশ্বাসবান সকলকে কঠিন আঘাত করিয়াছে। বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধিতা, স্থূল জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তিকে ইচ্ছাপূর্বক প্ররোচনা দান, দ্রুত অস্ত্র-সজ্জা বৃদ্ধি, সংকটময় পরিস্থিতির এই সব পূর্বসূচনা। আমরা এই সুযোগে আমাদের এবং আমাদের দেশবাসীর পক্ষ হইতে অন্যান্য দেশের জনসাধারণের সহিত সমস্বরে বলিতেছি যে, আমরা যুদ্ধকে ঘৃণা করি এবং যুদ্ধ পরিহার করিতে চাই; যুদ্ধে আমাদের কোনো স্বার্থ নাই। কোনো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারত-বর্ষের যোগদানের আমরা ঘোর বিরোধী; কারণ আমরা জানি যে, আগামী যুদ্ধে সভ্যতা ধ্বংস হইবে। সোভিয়েট ইউনিয়নই হউক, বা নাৎসি জার্মানি হউক— যেখানে সংস্কৃতি বিপন্ন হইবে সেখানেই উহার রক্ষার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব এবং আমাদের মহৎ উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য আমরা যথাশক্তি সংগ্রাম করিব।

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়,
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী,
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু,
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রেমচাঁদ,
জওহরলাল নেহরু, প্রভৃতি। ১৪ই ভাদ্র ১৩৪৩

মানবকল্যাণে সোভিয়েটের দান

[২২-এ জুন ১৯৪১ সালে সোভিয়েতভূমি আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরিত্র বদলে যায়। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক ঐতিহাসিক জনসভা থেকে গঠিত হয় 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি'। সভাপতি: ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সম্পাদক: স্নেহাংশুকান্ত আচার্য ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। গোপাল হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, রাধারমণ মিত্র (মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী, এককালের বিখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী) এবং সদ্য বিলেত-প্রত্যাগত জ্যোতি বসু প্রমুখ এই সুহৃৎ সমিতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। বাঙলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তথা জাতীয় জীবনে 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি'র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে।

সমিতির উদ্যোগে ২০-এ জুলাই বাঙলার বিশিষ্ট শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের একটি বিবৃতি প্রচারিত হয়। আজ এই বিবৃতিটিকে ঐতিহাসিক বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

সোভিয়েত আক্রান্ত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি' গোপাল হালদার ও সুকুমার মিত্র (বিখ্যাত সাংবাদিক, অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির অধুনা লুপ্ত দৈনিক মুখপত্র 'স্বাধীনতা'র বার্তাসম্পাদক, বর্তমানে কলকাতায় সোভিয়েত কনস্যুলেটের বার্তাবিভাগে কর্মরত) সম্পাদিত প্রবন্ধ-সংকলন 'সোভিয়েট দেশ' প্রকাশ করেন। সম্ভবত এই গ্রন্থই হল সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে শুধু বাঙলা নয় ভারতীয় কোনো ভাষায় প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধ-সংকলন। কি বিষয়বিন্যাসে, কি লেখক নির্বাচনে, কি রচনার গুণগত উৎকর্ষে 'সোভিয়েট দেশ' আজও পাঠকদের সম্ভ্রম উদ্রেক করে। (সংকলনটির সূচীপত্র: সোভিয়েট রাষ্ট্র…হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বিপ্লবের জয়…সুকুমার মিত্র। সোভিয়েটের অর্থনৈতিক ইতিহাস…বিনয় ঘোষ। মহাজাতি সংগঠন…গোপাল হালদার। সোভিয়েট শিক্ষাব্যবস্থা…সরোজকুমার দত্ত। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যসম্পদ…স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য। সোভিয়েট রুশিয়ায় নারী ও শিশু… মন্মথনাথ সান্যাল। শিল্প সাহিত্য…বিষ্ণু দে। লাল ফৌজ…শিবশঙ্কর মিত্র। সোভিয়েট পররাষ্ট্র-নীতি…অরুণ মিত্র। পরিশিষ্ট—ক) সংঘ সোভিয়েট সমাজবাদী রাষ্ট্রের

নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য (খ) মানব কল্যাণে সোভিয়েটের দান।) বইটি 'সোভিয়েট সুহৃদ্ সমিতি'র পক্ষে সুবোধ চৌধুরী 'পুথিঘর' ২২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট (বর্তমানে বিধান সরণী), কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। সে-আমলে প্রগতিশীল গ্রন্থাদি প্রকাশে 'পুথিঘর' ও সুবোধ চৌধুরীর বিশেষ ভূমিকা ছিল।

'সোভিয়েট দেশ'-এর প্রকাশকাল ভাদ্র ১৩৪৮, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৪১। ২৭-এ ভাদ্র তারিখ চিহ্নিত উভয় সম্পাদকের নামে লেখা একটি ছোট্ট 'ভূমিকা' আছে। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে সন্ত লোকান্তরিত "রবীন্দ্রনাথের পুণ স্মৃত উদ্দেশে"। এই উৎসর্গলিপির নিচেই রবীন্দ্রনাথের "নাগিনীরা চারিদিকে[১]... প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে" কবিতাংশটি উদ্ধৃত। বইয়ের চতুর্থ কভারে 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি' প্রকাশিত 'দি ল্যাণ্ড অব দি সোভিয়েটস্' গ্রন্থের ইংরিজি ও বাঙলা বিজ্ঞাপন আছে। সবশেষে আছে এই আবেদন: "সোভিয়েট সুহৃদ সমিতিতে যোগদান করুন—/মানুষের নবজন্মের মুক্তি-সংগ্রামে অগ্রসর হউন"। প্রথম কভারে একটি বিখ্যাত সোভিয়েত ভাস্কর্যের ("লাল পল্টনের সৈনিক") চমৎকার প্রতিলিপি ও ভেতরের ফ্ল্যাপে তার ও শিল্পী ডিমিট্রি সাপ্‌লিনের পরিচয় ("কৃষকের ঘরে সাপ্‌লিনের জন্ম, ছিলেনও কৃষক। বিপ্লবের পরে তাঁহার শিল্প-প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাইল। সাপ্‌লিন শিল্পের জন্য প্যারিসেও প্রেরিত হইলেন। সোভিয়েটের নূতন শিল্পকলা এইভাবেই বিকাশ লাভ করিতেছে।") মুদ্রিত হয়েছে। বইটির দাম ছিল দেড় টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮+১২৫।

প্রসঙ্গত জানানো প্রয়োজন সুহৃৎ সমিতির উদ্যোগে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং এস. কে. (স্নেহাংশুকান্ত) আচার্য সম্পাদিত *The Land of the Soviets* প্রবন্ধ-সংকলনটিও সেপ্টেম্বর ১৯৪১ সালেই প্রকাশিত হয়। (Contents: The Soviet State···Gopal Haldar. Revolution, Civil War, Intervention···Jyoti Basu. The Drama of Soviet Planning··· Stella Brown. New Incentives In The Soviet Union··· Anila Bonnerjee. Regeneration···Ela Sen. Soviet Central Asia···S. Upadhyay. Military Strength of the Soviet Union···S. K. Acharyya. Science In The Soviet Union··· Surendranath Goswami. Art And Literature In The Soviet Union···Chitrasen. The Soviets In World Affairs···

১. "দিকে দিকে" ছিল—সম্পাদক

Manikuntala Sen. The New World of The Soviets··· Hirendranath Mukerjee. App.ndix···Soviet Achievements/ Indian Intellectuals' Manifesto.)

Friends of the Soviet Union-এর পক্ষে 'পুথিঘর'-এর এস. উপাধ্যায় (প্রখ্যাত প্রগতিশীল হিন্দী-সাংবাদিক, প্রগতিশীল প্রকাশনাকর্মের সঙ্গে আজও জড়িত) *The Land of The Soviets*-এর প্রকাশক ছিলেন। গ্রন্থের শুরুতে H. N. M. এবং S. K. A.-র ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪১ তারিখ চিহ্নিত একটি ছোট্ট Acknowledgement আছে। এই সংকলনে বিবৃতির স্বাক্ষরদাতার সংখ্যা চুয়াত্তর।

'সোভিয়েট দেশ'-এর 'পরিশিষ্ট (খ)' হিসেবে প্রকাশিত 'মানবকল্যাণে সোভিয়েটের দান' বিবৃতিটি এখানে অবিকল প্রকাশ করা হল। —সম্পাদক]

সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর নাৎসী আক্রমণ পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। বিশাল রণক্ষেত্র জুড়িয়া আজ যন্ত্র ও মানুষের তাণ্ডব চলিতেছে ; ব্যাপকতায় এ যুদ্ধ অভূতপূর্ব্ব। এই সঙ্কট কালে আমরা মনে করি, নৈতিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপুল কীর্ত্তির প্রতি সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা কেহ কেহ সোভিয়েট শাসনের কোন কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া থাকি ; কেহ কেহ মার্কসবাদ সমর্থনও করি না। কিন্তু জার আমলের কুশাসনের যে কুৎসিৎ উত্তরাধিকার সোভিয়েট ইউনিয়নকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এবং তারপর সদ্যোজাত সোভিয়েটের বিরুদ্ধে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রের যে মারাত্মক আক্রমণ চলিয়াছিল তাহা যখন স্মরণ করা যায়, তখন সোভিয়েটের বর্ত্তমান কীর্ত্তিকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। রবীন্দ্রনাথ উহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। আধুনিক জগতের দুইজন প্রধান সমাজতত্ত্ববিদ্—সিডনি ও বীটরিস্ ওয়েব—তাঁহাদের "সোভিয়েট কম্যুনিজম্—এক নূতন সভ্যতা" (Soviet Communism—A New Civilisation) নামক পুস্তক প্রকাশ করার পর সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্বন্ধে প্রচুর নির্ভরযোগ্য তথ্য সকলের গোচরে আসিয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে সমস্ত কারখানা, খনি, রেলওয়ে জাহাজ জমি ও ব্যবসায় বাণিজ্য জনসাধারণের সম্পত্তি। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন

সকলের মঙ্গলের জন্য পরিকল্পিত—কয়েকজন লোকের মুনাফার জন্য নয়। যাহারা সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সমর্থক নয়, সোভিয়েট পরিকল্পনা তাহাদিগকেও অনুরক্ত করে। সেখানে শিক্ষার সমান সুযোগ সার্ব্বজনীন; প্রত্যেককে সতেরো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্কুলে পড়িতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সরকারী ব্যয়ে অধ্যয়ন করে। সকলের জন্য কাজের ব্যবস্থা আছে; সোভিয়েট ইউনিয়নে কেহ বেকার নাই। অন্য সমস্ত স্থানে বারবার যে অর্থ-নৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়া থাকে, সেখানে তাহা লুপ্ত হইয়াছে। সর্ব্বাধিক খাটুনির সময় দিনে আট ঘণ্টা; গড়ে তাহা দিনে সাত ঘণ্টার কম। সকলের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। শ্রমিকরা পীড়িত অবস্থায় পুরা মজুরী পায়; এতদ্ব্যতীত তাহারা প্রতি বৎসর বেতনসহ ছুটি পায়। সোভিয়েট ইউনিয়নে নারী ও শিশুর যেরূপ যত্ন লওয়া হয় জগতে আর কোথাও সেরূপ লওয়া হয় না। নিরপেক্ষ পর্য্যবেক্ষকগণই এইসব কথা স্বীকার করিয়াছেন। সোভিয়েট পরিকল্পনাগুলি যে কার্য্য সাধনে প্রয়াসী, কোন প্রাচীন বা আধুনিক রাষ্ট্র এ পর্য্যন্ত সে কাজে হাত দেয় নাই; এই পরিকল্পনাগুলি ব্যাপকতায় যেমন বিরাট, তেমনই বাস্তব প্রয়োগোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত।

সিডনি ও বীট্রীস ওয়েব বলিয়াছেন, "আমাদের মনে হয়, এমন দেশ নাই যেখানে সমভাবে থিয়োরী ও টেকনিকের ক্ষেত্রে সরকারী অর্থ ব্যয়ে এতবেশী ও এত বিচিত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিতেছে। মুনাফালোভী প্রবৃত্তির ফলে বিজ্ঞান যেভাবে ব্যর্থ হইতেছে, সে সম্বন্ধে বৃটিশ ও আমেরিকান বৈজ্ঞানিকেরা এখন অনুযোগ করিতেছেন। একথা অন্ততঃ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এখানে (সোভিয়েট দেশে) সে ব্যর্থতার সুযোগ একরকম নাই।"

জার গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য প্রধান রাষ্ট্রের সহযোগে এশিয়ার দেশসমূহে যে সকল অন্যায় সুবিধা ভোগ করিত, বিপ্লবের পর সোভিয়েট সে সব সুবিধা এক কথায় ছাড়িয়া দেয়;—আমরা ভারতবাসীরা ইহা ভুলিতে পারি না। বহু জাতিকে ও কোটি কোটি লোককে জার শাসন ইচ্ছাপূর্ব্বক 'অনুন্নত' করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু সোভিয়েটের জাতিগত ও ভাষাগত স্বাধীনতা প্রত্যেকের উৎকৃষ্ট সংস্কৃতিকে বিকশিত করিয়াছে। যেখানে একদিন কুসংস্কার ও ধর্ম্মতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার রাজত্ব ছিল, সেখানে আজ এক নূতন মানস-জীবনের সঞ্চার হইয়াছে। কারণ, সোভিয়েট ইউনিয়নের ১৮২টি জাতি ও ১৪৭টি ভাষার মধ্যের কোন একটা বিশেষ জাতি বা ভাষার কৃত্রিম প্রাধান্য নাই।

মুসলমান রাষ্ট্রের মধ্যে নারীমুক্তির প্রথম আইন প্রবর্ত্তিত হয় সোভিয়েট 'আজের বাইজানে', কামালের তুরস্কে নয়। বুখারা রাজ্যের সহিত আধুনিক সোভিয়েট 'উজবেকিস্তানের' পার্থক্য কি বিপুল। বুখারায় ছিল আট হাজার ওঝা এবং আমীর, তাহার হারেম ও তাহার দরবারের জন্য মাত্র একজন ডাক্তার। ওয়েব দম্পতি লিখিয়াছেন, "সোভিয়েট ইউনিয়ন অনগ্রসর জাতিগুলিকে শুধু যে সমান অধিকার দিয়াছে তাহা নয়, পরন্তু তাহাদের অনুন্নত অবস্থার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী দারিদ্র্য, অত্যাচার ও দাসত্ব দায়ী ইহা স্বীকার করিয়া তাহাদের শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতি, শ্রম শিল্পের উন্নতি ও কৃষি সংস্কার বাবদ উন্নত জাতিগুলি অপেক্ষা মাথা পিছু বেশী ব্যয় সরকারী তহবিল হইতে বরাদ্দ করিয়াছে।"

সোভিয়েট ইউনিয়নে পুস্তক প্রকাশের সংখ্যাও বিপুল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা একত্রে ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণী ও জাপান অপেক্ষা বেশী ছিল। নাৎসী নির্ব্বাসিত আইনষ্টাইনের পুস্তক সম্ভবতঃ অন্য যে কোন দেশ অপেক্ষা সোভিয়েট ইউনিয়নে বেশী বিক্রয় হয়; ১৯২৭ ও ১৯৩৬ সালের মধ্যে তাঁহার গ্রন্থ ৫৫, ০০ খণ্ড সেখানে বিক্রয় হয়। শেকসপীয়ারের ৩৭৫ তম জন্মবার্ষিকী তাহার স্বদেশে অলক্ষিত থাকিলেও, সোভিয়েট ইউনিয়নে সর্ব্বত্র শ্রমিক ও কৃষকগণ তাঁহার জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত করে। ১৯৩৯ সালের বসন্তকালে মস্কোতে প্রায় দুই লক্ষ লোক 'কিং লীয়ার' অভিনয় দেখে। ক্ষুদ্র আর্ম্মেনিয়া রাষ্ট্রে গত পাঁচ বৎসরের শেকসপীয়ারের গ্রন্থ ৩২,০০০ খণ্ড বিক্রয় হয়।

আমরা যে অর্থে বুঝি সে অর্থে সোভিয়েটের জনসাধারণের মধ্যে কোনও সংস্কৃতিবান শ্রেণী নাই; এবং তাহারা উহা চাহেও না। তাঁহারা চাহে সমগ্র জাতিকে সংস্কৃতিবান করিতে। তাহারা সকলকে অবকাশ, নির্ব্বিঘ্নতা ও সুযোগ দিতে চায়।

কুড়ি বৎসরের প্রবল বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়নের জনসাধারণ এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। সেই সভ্যতা যখন বিপদাপন্ন, তখন আমরা বহু যুগব্যাপী অন্নাভাবে জীর্ণ, হীনতায় নিমজ্জিত ভারতবাসীরা নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারি না। আমরা অসহায় ও পরাধীন; তথাপি সোভিয়েটে অন্ততঃ আমাদের শুভকামনা আমরা প্রেরণ করিতে পারি। সোভিয়েট ইউনিয়ন যে দিন তাহার বিরুদ্ধ শক্তিপুঞ্জকে পরাভূত করিয়া আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠ করিবে, সেই দিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করিয়া থাকিব।

(স্বাঃ) আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

সাহিত্যিক ও শিল্পী

প্রমথ চৌধুরী অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, যামিনী রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্ত্তী, হিরণকুমার সান্যাল, নীরেন্দ্র রায়, গোপাল হালদার, আবু সৈয়দ আয়ুব, আব্দুল কাদের, সমর সেন, বিনয় ঘোষ, অজিত চক্রবর্ত্তী, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র,[১] কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

হাইকোর্ট, বার লাইব্রেরী

অরুণ সেন, অবনী ব্যানার্জ্জি, সুকুমার মিত্র, মিঃ এন এস মালেহজি, এস কে আচার্য্য, জ্যোতি বসু।

অধ্যাপক

(স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ)—নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য, সুশীল দত্ত। (রিপণ কলেজ)—আনন্দকৃষ্ণ সিংহ, বিজয় কুমার রায়, সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ভবতোষ দত্ত, নন্দলাল ঘোষ। (বঙ্গবাসী কলেজ)—এন এন সেনগুপ্ত, করুণাময় মুখোপাধ্যায়। (বিদ্যাসাগর কলেজ)—প্রভাসচন্দ্র ঘোষ। (ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন)—অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র।

সাংবাদিক

হেমচন্দ্র নাগ (সম্পাদক, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড), বঙ্কিমচন্দ্র সেন (সম্পাদক, দেশ), সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, মৃণালকান্তি বসু (অমৃতবাজার পত্রিকা), বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক, যুগান্তর), অমল হোম (সম্পাদক, মিউনিসিপ্যাল গেজেট) জ্যোতিষ ভৌমিক (সম্পাদক, ফরোয়ার্ড), এ আর মলিহাবাদী (সম্পাদক, রোজানা হিন্দ)।

অধ্যক্ষ

রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ (রিপণ কলেজ), প্রশান্তকুমার[২] বসু (বঙ্গবাসী কলেজ), বীরেশচন্দ্র গুহ (বিজ্ঞান কলেজ)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কালিদাস নাগ, অমিয়কুমার সেন, নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী, এন কে সিংহ, হুমায়ুন কবীর, নীহাররঞ্জন রায়, বটকৃষ্ণ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এল পি সুকুল, এ বি এন হবিবুল্লা, ধীরেন্দ্রনাথ সেন, পি সি গুপ্ত, হরিচরণ ঘোষ, রেণু রায়, নিখিল চক্রবর্ত্তী, সরসীকুমার সরস্বতী।

কলিকাতা
২০শে জুলাই ১৯৪১

১. "মিত্র" ছিল—সম্পাদক
২. "প্রশান্তকুমার" ছিল—সম্পাদক

ফ্যাসিবাদের শ্রেণীচরিত্র

জর্জি ডিমিট্রভ

[জার্মানির রাষ্ট্রপতি ১৯৩৩ সালের ৩০ জানুয়ারি হিটলারকে রাইখ চান্সেলরের পদে নিয়োগ করেন। জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি ছিল শক্তিশালী ও সংগঠিত, ১৯৩২ সালের নভেম্বরে রাইখস্টাকের নির্বাচনে কমিউনিস্টরা ৬০ লক্ষ ভোট পেয়েছিল। ফ্যাসিস্টদের প্রধান শত্রু ছিল তারাই। ফলে হিটলার-গোয়েরিং-গোয়েবলস চক্রের প্রথম কাজ হল ছলে বলে কৌশলে কমিউনিস্টদের নিশ্চিহ্ন করা। প্রথমে প্রচার করা হল যে 'কার্ল লীব্‌কনেখ্‌ট' ভবনে অবস্থিত কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে তল্লাশি করে "অতি ভয়ানক ধরনের অনেক কিছু" পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রায় প্রতি সপ্তাহে পুলিশের নিয়মিত তল্লাশি সত্ত্বেও ঐ ভবনে মাটির নিচে ভাঁড়ার তৈরি করা, যাতায়াতের গোপন পথ নির্মাণ ও আস্ত একটি বিদ্রোহ-পরিকল্পনা লুকিয়ে রাখা সম্ভব—এই আষাঢ়ে গল্প প্রায় কেউই বিশ্বাস করে নি।

তারপর ঘটল অভূতপূর্ব ঘটনা। ২৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় রাইখস্টাকে আগুন লাগার সংবাদ দাবানলের মতোই ছড়িয়ে পড়ে। হিটলার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে সমবেত বিদেশী সাংবাদিকদের বলে "এটা ঈশ্বরের নির্দেশ—কমিউনিস্টদের ওপর আমরা আঘাত হানব।" অচিরে সরকারী ঘোষণা জারী করে স্পষ্ট বলা হয় রাইখস্টাকে এ-আগুন কমিউনিস্টরাই লাগিয়েছে।

বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা জর্জি ডিমিট্রভ তখন জার্মানিতে ছিলেন। ঐ রাতে ট্রেনে মিউনিখ থেকে বার্লিন যাচ্ছিলেন। ২৮-এ ফেব্রুয়ারি প্রভাতী সংবাদপত্রে তিনি রাইখস্টাকে আগুন লাগাবার সংবাদ পান। ডিমিট্রভ বোঝেন সংসদীয় নির্বাচনের আগে কমিউনিস্টদের জনপ্রিয়তা খর্ব ও জয়লাভের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করার জন্য হিটলারই রাইখস্টাকে আগুন দিয়েছে।

গোটা জার্মানি জুড়ে হিটলার-পুলিশ ও ফ্যাসিস্ট 'ঝঞ্ঝাবাহিনী'র ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস শুরু হয়।

বলা যায় রাইখস্টাকে অগ্নিকাণ্ড 'মহাভারত'-এর 'জতুগৃহদাহ' পর্ব। তারপর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে ১৯৪৫ সালের ৩ মে তারিখে রাইখস্টাকে রক্তপতাকা

উত্তোলনের মধ্যে কার্যত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান এবং পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক যুগের অভ্যুদয়। ডিমিট্রিভ দুই যুগের অমোঘ সেতু।

১৯৩৩ সালের ৯ই মার্চ জার্মান ফ্যাসিস্টরা বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির দুই সহকর্মী ব্লাগোই পপোভ ও ভাসিল তানেভ সহ জর্জি ডিমিট্রিভকে গ্রেপ্তার করে। কিছুদিন আটক রাখার পর লাইপৎসিকে শুরু হয় বিশ্ববিখ্যাত 'রাইখস্টাক বিচার'।

'সমাজতান্ত্রিক জার্মানি' পত্রিকার সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৭৩ সংখ্যায় এ-প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে:

"লাইপ্‌ৎসিক আদালতে জর্জি ডিমিট্রিভ প্রথম কথা বলেছিলেন ১৯৩৩ সালের ২৩শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে। সেটি ছিল বিচারের তৃতীয় দিন। আদালতে উপস্থিত ছিলেন ৮২ জন বিদেশী সাংবাদিক ও জার্মান পত্রপত্রিকার ৪২ জন সাংবাদিক। কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট ও বামপন্থী বুর্জোয়া পত্রপত্রিকার সাংবাদিকদের আদালতে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। গোড়ার দিকে কোনো সোভিয়েত সাংবাদিক ছিলেন না। পরে, সোভিয়েত গভর্নমেন্ট যখন অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করে সোভিয়েত ইউনিয়নে জার্মান সাংবাদিকদের তৎপরতার ওপরে বিধি-নিষেধ আরোপ করলেন, একমাত্র তখনই জার্মান ফ্যাশিস্ট কর্তারা সোভিয়েত সাংবাদিকদের আদালতে প্রবেশ করতে দিয়েছিল। পুরোপুরি সাজিয়ে ও পাকিয়ে তোলা উত্তেজনা-সৃষ্টির এই মামলায় জয়লাভ সম্পর্কে ফ্যাশিস্টরা এতই নিশ্চিত ছিল যে গোড়ার দিকে আদালতের সওয়াল তারা বেতারে প্রচার করতে থাকে। তারপরেই ২৩শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে ডিমিট্রভের প্রথম ভাষণের পরে বেতারে প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও এই বিচার সম্পর্কে বিশ্বজোড়া যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল তা বন্ধ হয় না। লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে জর্জি ডিমিট্রভের নাম।...লাইপ্‌ৎসিক আদালতে ডিমিট্রিভ গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছিলেন কমিউনিস্ট মতাদর্শের নীতি। আদালতে ঘোষণা করেছিলেন:

" "একথা সত্য যে আমি একজন বলশেভিক, একজন প্রোলেতারীয় বিপ্লবী। একথাও সত্য যে বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহক

কমিটির সদস্য হিসেবে আমি একজন দায়িত্বশীল কর্মী ও নেতা। কিন্তু তাই বলে আমি সন্ত্রাসবাদী বা মতান্ধ নই, হঠাৎ আক্রমণে লিপ্ত চক্রী নই, নই আগুনবাজ।···

"“একথাও সত্য যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির আমি উৎসাহী সমর্থক ও গুণগ্রাহী, কেননা এই পার্টি ভূ-গোলকের এক-ষষ্ঠাংশ জুড়ে বিস্তৃত বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো দেশটি শাসন করছে এবং সাফল্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করছে”।"

রোমাঁ রোলাঁ তাঁর 'শিল্পীর নবজন্ম' গ্রন্থে ১৯৩৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর এ-বিষয়ে লিখেছেন: "আমাদের সময়কার সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর মামলা শেষ হইয়া আসিতেছে।···কিন্তু যে উত্তেজনার সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহার ফলে বিচারশালার আবহাওয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে···। যে মন্ত্রীর হাতে বিচার-বিভাগের ভার ন্যস্ত আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর কথা যাহার সবচেয়ে বেশি এবং ধৃত ব্যক্তিদের নিরাপত্তার জন্য যিনি নিজে দায়ী তিনিই যখন বিচারশালার মধ্যেই দাঁড়াইয়া প্রকাশ্যে আসামীদের ভয় দেখান, রায় যদি তাহার নির্দেশানুযায়ী না হয়, তবে আসামীদের নিহত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

"···এ মহাকাব্যের উপসংহার যাহাই হউক না কেন ডিমিট্রভের বীরমূর্তি ভবিষ্যতের পটভূমিকায় চিরদিন অনন্ত মহিমায় উজ্জ্বল রহিবে।"

তারপর তথাকথিত লাইপ্‌ৎসিক মামলা শেষ হল। 'সমাজতান্ত্রিক জার্মানি'র ঐ সংখ্যায় ঠিকই বলা হয়েছে:

"আদালতের কাঠগড়াকে জর্জি ডিমিট্রভ ব্যবহার করেছিলেন সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের ধ্যানধারণা প্রচার করার জন্য। ফ্যাশিস্ট আদালতের সমস্ত রকমের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টির ওপরে রাইখ্‌স্টাক অগ্নিকাণ্ডের দোষ চাপানো যায়নি এবং জর্জি ডিমিট্রভকে মুক্তি দিতে হয়েছিল।"

সম্প্রতি ডিমিট্রভের ওপর একটি সোভিয়েত তথ্যচিত্র দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছে। রোলাঁ, বারবুস প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত লেখক ও কাশ্যাঁ, ইবারুরি, তোগলিয়াত্তি প্রমুখ অগ্রগণ্য রাজনৈতিক নেতার যৌথ উদ্যোগে জর্জি ডিমিট্রভের মুক্তির দাবিতে যে যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠে—তা শুধু ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনের এক দিকচিহ্নই ছিল না, ছিল যুক্তফ্রন্ট তত্ত্বের ভবিষ্যৎ প্রবক্তার জন্য বিশ্ববিবেকের আগমনী গীত, যথাযোগ্য অর্ঘ।

সোভিয়েত ইউনিয়ন জর্জি ডিমিট্রভকে নাগরিকত্ব দান করে এবং মুক্তির পর তাঁকে হত্যার ফ্যাসিস্ট চক্রান্ত ব্যর্থ করে সোভিয়েত বিমানে বিজয়ী বীরকে "বিশ্বশ্রমিক-প্রিয়" সোভিয়েতভূমিতে নিয়ে আসে।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অবিসংবাদী নেতা হিসেবে ডিমিট্রভের বিপ্লবী জীবন অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি হন মুক্ত সমাজতান্ত্রিক বুলগেরিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী। সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজে মগ্ন অবস্থায়ই ১৯৪৯ সালে এই সৃজনশীল কমিউনিস্টের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

২ও৩ আগষ্ট ১৯৩৫ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ঐতিহাসিক সপ্তম কংগ্রেসে আন্তর্জাতিকের সাধারণ সম্পাদক জর্জি ডিমিট্রভ যে বিশ্ববিখ্যাত রিপোর্ট পেশ করেন এবং আলোচনার যে-উত্তর দেন, 'মনীষা গ্রন্থালয়' সম্প্রতি 'যুক্ত ফ্রণ্ট/ ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম' নামে সেই মহান আন্তর্জাতিক দলিলের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছে। সেই বইয়েরই একটি অধ্যায়—'ফ্যাসিবাদের শ্রেণী চরিত্র' আমরা পুনর্মুদ্রণ করলাম। অধ্যায়ের শুরুতে ছিল "কমরেডগণ" এই সম্বোধন। রচনাটির কয়েক জায়গায় মোটা হরফ ব্যবহৃত হয়েছিল। আমরা বাদ দিয়েছি। বানান ও যতিচিহ্নে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক]

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহী কমিটির ত্রয়োদশ প্লেনাম সঠিক-ভাবেই শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ফ্যাসিবাদকে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল, সবচেয়ে জাতিদাম্ভিক এবং লগ্নী পুঁজির সবচেয়ে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিভূর প্রকাশ্য সন্ত্রাসবাদী একনায়কত্ব বলে বর্ণনা করেছিল।

সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ধরনের ফ্যাসিবাদ হল জার্মান ফ্যাসিবাদ। এর নিজেকে জাতীয় সমাজতন্ত্র বলে অভিহিত করায় ধৃষ্টতা রয়েছে, যদিও সমাজতন্ত্রের সঙ্গে এর কোনই মিল নেই। হিটলারের ফ্যাসিবাদ শুধুমাত্র বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ নয়, এ হল পাশবিক জাতিদম্ভ। এ হল রাজনৈতিক দস্যুতার এক শাসনব্যবস্থা, শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, পেটি-বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লবী অংশের বিরুদ্ধে প্ররোচনা ও নির্যাতনের ব্যবস্থা। এ হল মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও পাশবিকতা, অন্যান্য জাতিদের সম্পর্কে বল্গাহীন আক্রমণ।

জার্মান ফ্যাসিবাদ আন্তর্জাতিক প্রতিবিপ্লবের উদ্যত খড়্গ হিসাবে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রধান প্ররোচক হিসাবে এবং সমগ্র বিশ্বের মেহনতী মানুষের মহান পিতৃভূমি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রবর্তক হিসাবে কাজ করে চলেছে।

ফ্যাসিবাদ অটো বাওয়ারের মত অনুযায়ী "প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া—এই দুই শ্রেণীর উর্ধ্বে অবস্থিত রাষ্ট্রক্ষমতার কোনো একটা রূপ নয়।" অথবা ব্রিটিশ সোশ্যালিস্ট ব্রেলস ফোর্ডের ঘোষণামতো "রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র-দখলকারী পেটি-বুর্জোয়াদের বিদ্রোহ"ও নয়। না, ফ্যাসিবাদ শ্রেণীর উর্ধ্বে কোনো সরকার নয় অথবা লগ্নী পুঁজির উপর পেটি-বুর্জোয়া বা ভবঘুরে সর্বহারার কোনো সরকার নয়। ফ্যাসিবাদ হল লগ্নী পুঁজিরই শক্তি। এ হল শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লবী অংশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী প্রতিহিংসার সংগঠন। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদ হল জাতিদম্ভের নগ্নতম রূপ যা অপরাপর জাতির বিরুদ্ধে পাশবিক ঘৃণার প্ররোচনা যোগায়।

ফ্যাসিবাদের এই সঠিক চরিত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ অবশ্যই করতে হবে; কারণ অনেকগুলি দেশে ফ্যাসিবাদ সমাজবাদী বুলির আড়ালে সেই অগণিত পেটি-বুর্জোয়া জনগণের, যারা সংকটের আবর্তে নিজ নিজ গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের এবং এমনকি সর্বহারাশ্রেণীর সবচেয়ে পশ্চাৎপদ স্তরের কোনো কোনো অংশেরও সমর্থন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ফ্যাসিবাদের প্রকৃত শ্রেণীচরিত্র ও এর সঠিক প্রকৃতি অনুধাবন করলে, তারা কখনই একে সমর্থন জানাত না।

এক-একটি নির্দিষ্ট দেশের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও আন্তর্জাতিক অবস্থান অনুযায়ী ফ্যাসিবাদ ও ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বের বিকাশ বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। কোনো কোনো দেশে, বিশেষ করে যেখানে ফ্যাসিবাদের কোনো ব্যাপক গণভিত্তি নেই এবং যেখানে ফ্যাসিবাদী বুর্জোয়াদের নিজেদের শিবিরে নানা উপদলের সংঘর্ষ খুব তীব্র, সেখানে ফ্যাসিবাদ সরাসরিভাবে সংসদকে অবলোপ করার সাহস রাখে না আর তাই অন্যান্য বুর্জোয়া দল এবং এমনকি সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিকেও কিছু পরিমাণ বৈধতা রাখবার অনুমতি দেয়। অন্য সকল দেশে, যেখানে শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী এক আসন্ন বিপ্লবের আবির্ভাব সম্পর্কে শঙ্কিত, সেখানে তারা হয় তৎক্ষণাৎ অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও উপদলের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও সন্ত্রাসের শাসনকে তীব্রতর করে তার সীমাহীন একচেটিয়া রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এর দ্বারা ফ্যাসিবাদের অবস্থা যখন বিশেষভাবে সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে, তখন এর দরুন কিন্তু ফ্যাসিবাদের পক্ষে নিজের শ্রেণীচরিত্রকে পরিবর্তিত না করেও প্রকাশ্য সন্ত্রাসবাদী একনায়কত্বের সঙ্গে স্থূল ভুয়ো সংসদীয় পন্থার সংযুক্তিসাধন ও নিজের ভিত্তিপ্রসারের প্রচেষ্টায় বাধা হয় না।

ফ্যাসিবাদের ক্ষমতালাভ এক বুর্জোয়া সরকার থেকে অপর এক সরকারে মামুলি উত্তরণ নয়, এ হল বুর্জোয়াদের শ্রেণীকর্তৃত্বের একটি রাষ্ট্রীয় রূপ, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জায়গায় অন্য এক রাষ্ট্রীয় রূপের প্রকাশ্য সন্ত্রাসমূলক একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা। এই পার্থক্যটি উপেক্ষা করা গুরুতর ভুল হবে; এই ভুল বিপ্লবী সর্বহারাদের দ্বারা, ফ্যাসিবাদের ক্ষমতা দখলের বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য শহর ও গ্রামের মেহনতী মানুষের ব্যাপক সমাবেশ ব্যাহত করবে এবং তাদের বুর্জোয়া শিবিরের মধ্যেকার স্ব-বিরোধিতার সুযোগ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করবে। কিন্তু আবার ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা অনুসৃত ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ, যা মেহনতী জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে দমন করে, সংসদের অধিকারকে খর্ব করে ও তা নিয়ে জোচ্চুরি করে এবং বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে দমননীতিকে তীব্র করে, সেগুলির গুরুত্বকে ছোট করে দেখা কিছু কম বিপজ্জনক ও কম গুরুতর ভ্রান্তি নয়।

কমরেডগণ, ফ্যাসিবাদের ক্ষমতালাভকে এই রকম সরলীকৃত ও স্বচ্ছন্দরূপে কল্পনা করা ভুল হবে যে এ যেন লগ্নী পুঁজির কোনো একটি কমিটি কোনো এক নির্দিষ্ট তারিখে ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। বাস্তবক্ষেত্রে, ফ্যাসিবাদ সাধারণত ক্ষমতায় আসে পুরনো বুর্জোয়া পার্টিগুলির অথবা ঐ পার্টিগুলির কোনো নির্দিষ্ট অংশের মধ্যে পারস্পরিক লড়াইয়ের গতিপথে, অথবা কখনও কখনও তাদের বিরুদ্ধে কঠোর লড়াইয়ের গতিপথে, এমনকি ফ্যাসিস্ট শিবিরের মধ্যেই লড়াইয়ের গতিপথে—কখনও কখনও এ লড়াই সশস্ত্র সংঘর্ষে পরিণত হয় যেমন হয়েছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও অপরাপর দেশে। এই সবকিছু কিন্তু এই সত্যটিকে চাপা দেয় না যে, ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার আগে বুর্জোয়া সরকারগুলি সাধারণত কতকগুলি প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করে এবং কতকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা অবলম্বন করে যা ফ্যাসিবাদের ক্ষমতা দখলের পথকে প্রত্যক্ষভাবে সুগম করে। বুর্জোয়াদের এই প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং প্রস্তুতিপর্বে ফ্যাসিবাদের শক্তিবৃদ্ধির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম না করে, সে ফ্যাসিবাদের বিজয়কে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে না, বরঞ্চ সেই বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে।

সোশ্যাল ডেমোক্রাট নেতারা ফ্যাসিবাদের প্রকৃত শ্রেণীচরিত্রকে চাপা দিয়ে জনতার কাছ থেকে তাকে গোপন রেখেছিল, এবং বুর্জোয়াদের ক্রমবর্ধমান

প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থাবলীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তাদের আহ্বান জানায় নি। তারা এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব বহন করছে এই কারণে যে, ফ্যাসিবাদী দেশে মেহনতী জনগণের এক বিশাল অংশ ফ্যাসিবাদের মধ্যে তাদের সবচেয়ে ঘৃণ্য শত্রু, রক্তলোলুপ, লুণ্ঠনকারী লগ্নী পুঁজিকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং ঐ জনগণ তাকে প্রতিহত করতে প্রস্তুত ছিল না।

জনগণের উপর ফ্যাসিবাদের প্রভাবের উৎস কি? ফ্যাসিবাদ জনগণকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় এই কারণে যে, জনগণের সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন ও দাবিগুলির কাছে সে মহাবাগাড়ম্বরে আবেদন করে। ফ্যাসিবাদ শুধু জনগণের মধ্যে গভীরভাবে বদ্ধমূল সংস্কারগুলিকেই উসকিয়ে দেয় না, উপরন্তু তাদের অপেক্ষাকৃত উন্নততর অনুভূতিগুলি, যথা—তাদের ন্যায় বিচারের চেতনাকে, এমনকি কখনও কখনও তাদের বিপ্লবী ঐতিহ্যকেও কাজে লাগায়। কেন জার্মান ফ্যাসিবাদীরা, যারা বড় বড় বুর্জোয়াদের সেবাদাস ও সমাজতন্ত্রের মারাত্মক শত্রু, তারা জনগণের কাছে নিজেদের "সমাজতন্ত্রী" বলে পরিচয় দেয় এবং তাদের ক্ষমতাদখলকে বিপ্লব বলে বর্ণনা করে? তার কারণ জার্মানির অগণিত মেহনতী জনগণের সমাজতন্ত্রের যে আকাঙ্ক্ষা এবং বিপ্লবের প্রতি যে বিশ্বাস রয়েছে তাকেই কাজে লাগাবার চেষ্টা করে।

ফ্যাসিবাদ চরম সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থেই কাজ করে, কিন্তু জনগণের কাছে নিজেকে নির্যাতিত জাতিগুলির রক্ষকের ছদ্মবেশে উপস্থিত করে এবং অপমানিত জাতীয় অনুভূতিগুলিকে নাড়া দেয়, যেমন জার্মান ফ্যাসিবাদীরা করেছিল যখন তারা "ভার্সাই চুক্তির বিরোধিতা"র স্লোগান তুলে পেটি-বুর্জোয়া জনগণের সমর্থন অর্জন করেছিল।

ফ্যাসিবাদের উদ্দেশ্য হল জনগণের উপর বল্গাহীন শোষণ কায়েম করা, কিন্তু লুণ্ঠনকারী বুর্জোয়া, ব্যাঙ্ক, ট্রাস্ট ও ধনকুবেরদের বিরুদ্ধে মেহনতী জনগণের তীব্র ঘৃণা নিয়ে ফ্যাসিবাদ অতি সুকৌশলে, পুঁজিবাদবিরোধী বুলি কপচিয়ে ও রাজনৈতিকভাবে অপরিণত জনগণের কাছে এক-একটি নির্দিষ্ট সময়ে সবচেয়ে লোভনীয় স্লোগান নিয়ে হাজির হয়ে তাদের চিত্ত জয় করে। তাদের এই রকমের স্লোগান হল: জার্মানিতে "ব্যক্তিগত মঙ্গলের চেয়ে সাধারণ মঙ্গল অনেক উর্ধ্বে"; ইতালিতে "আমাদের রাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক নয়, বরং এক যৌথ রাষ্ট্র"; জাপানে "শোষণহীন জাপানের জন্য", মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে "সম্পদের ভাগ নাও" ইত্যাদি।

ফ্যাসিবাদ জনগণকে সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ ও ঘুষখোর লোকেদের হাতে শিকার হবার জন্য তুলে দেয়, কিন্তু জনগণের সামনে হাজির হয় এক "সৎ ও নিষ্কলুষ সরকার"-এর দাবি নিয়ে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সরকার সম্পর্কে জনসাধারণের মোহভঙ্গের উপর বেসাতি করে ফ্যাসিবাদ দুর্নীতির কপট নিন্দা করে [উদাহরণস্বরূপ জার্মানিতে বারমাত এবং স্কলারেকের কাণ্ড, ফ্রান্সে স্ট্রাভিস্কির কাণ্ড এবং অনুরূপ অন্যান্য অসংখ্য ঘটনা]।

পুরনো বুর্জোয়া পার্টিগুলিতে আস্থা হারিয়ে যে জনসাধারণ তাদের পরিত্যাগ করেছে সেই জনসাধারণকে ফ্যাসিবাদ বুর্জোয়াদের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের স্বার্থেই পাকড়ায়। কিন্তু বুর্জোয়া সরকারগুলির বিরুদ্ধে তার আক্রমণের কঠোরতার দ্বারা ও পুরনো বুর্জোয়া দলগুলির প্রতি তার আপসহীন ভাবভঙ্গির দ্বারাই ফ্যাসিবাদ এই জনগণকে প্রভাবিত করে। মানববিদ্বেষ ও ছলনায় বুর্জোয়া-প্রতিক্রিয়াধারাকে ছাপিয়ে ফ্যাসিবাদ তার প্রতিটি দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের এমনকি একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক স্তরের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। অভাব, বেকারত্ব এবং জীবনের অনিশ্চয়তার দরুন হতাশ পেটি বুর্জোয়া জনগণ, এমনকি শ্রমিকদেরও একটি অংশ ফ্যাসিবাদের এই সামাজিক ও জাতিদাম্ভিক বাগাড়ম্বরের শিকার হয়।

সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং বিক্ষুব্ধ জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণের পার্টি হিসাবেই ফ্যাসিবাদ ক্ষমতায় আসে, কিন্তু তবুও সে তার ক্ষমতালাভকে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে "সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে" এক "বিপ্লবী" আন্দোলন হিসাবে এবং সমগ্র জাতির "পরিত্রাণ"-এর প্রতীক হিসাবে প্রতিপন্ন করে [এখানে আমরা মুসোলিনির রোম "অভিযান", পিলসুদস্কির ওয়ারশ "অভিযান", জার্মানিতে হিটলারের ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট "বিপ্লব" এবং অনুরূপ ঘটনা স্মরণ করতে পারি]।

কিন্তু ফ্যাসিবাদ যে কোনো মুখোশই ধারণ করুক, যে কোনো রূপেই নিজেকে উপস্থাপিত করুক এবং যে কোনো পথেই ক্ষমতায় আসুক, তবুও—ফ্যাসিবাদ হল মেহনতী জনগণের উপর পুঁজির সবচেয়ে হিংস্র আক্রমণ;—ফ্যাসিবাদ হল বল্গাহীন জাতিদম্ভ ও আগ্রাসী যুদ্ধ,—ফ্যাসিবাদ হল প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবিপ্লব;—ফ্যাসিবাদ হল শ্রমিকশ্রেণীর এবং সমস্ত মেহনতী মানুষের সবচেয়ে ঘৃণ্য শত্রু।

অনুবাদ: দীপিকা বসু ও পত্রলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়

Le silence de la Mer

ভেরকর

ভূমিকা ও অনুবাদ : বিষ্ণু দে

ফরাসী প্রতিরোধ ও সাহিত্য

জর্মান নাৎসিরা ও তাদের ফরাসী বন্ধুরা যখন ফ্রান্সের বুকে চেপে, তখন সে দমবন্ধ অত্যাচারে ফ্রান্সের জনসাধারণ হার মানে নি, সমুদ্রের মতো মৌন অসহযোগে মুক্তির প্রস্তুতি নির্মাণ করে গেছে। এবং ফরাসী লেখকেরা, শিল্পীরা, সঙ্গীতকারেরা কিভাবে গেস্টাপোর মারণমন্ত্রের মধ্যেই বই লিখেছেন, ছেপেছেন, হাতে হাতে বিলি করেছেন, ছবির প্রদর্শনী করেছেন, সঙ্গীত রচনা করে গোপনে রেকর্ড করেছেন—সে সব কাহিনী উপন্যাসের মতো রোমাঞ্চকর ও স্বদেশপ্রেমের ও মানবমর্যাদার অক্ষয় প্রমাণ।

তথাকথিত উঁচকপালে অবজ্ঞা যদি কেউ প্রকাশ করেন, তাহলে স্মরণ করাতে হয় যে উঁচকপালে ফ্রান্সের চরম উঁচকপালে সাহিত্যিক-শিল্পীরা এই আন্দোলনে সবাই কোনো না কোনো দিক থেকে কর্মব্রত নিয়েছিলেন—হয়তো এক সেলিন, মরাঁ, মঁতেরলাঁ, বেনোয়া, মোরা ছাড়া। মঁতেরলাঁর মতো নামকরা লেখকের পক্ষে দেশদ্রোহের অপরাধের সাফাইটা অতি করুণ। তিনি বলেন, লেখকেরা সব নেহাৎ অর্বাচীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং তিনি নিজে লেখকমাত্র। কিন্তু লেখকবিচার সমিতির মধ্যে দুয়ামেল, ভিলদ্রাক প্রভৃতির মতো প্রবীণ সর্বমাননীয় লেখকেরা কি লজ্জাকর এই অপবাদে ভোলেন ? সারা দেশ যে ব্রত নিয়েছিল, সেখানে অনাচার অসহ্য।

আঁদ্রে মোরেলের ভাষায় :

> মহাব্রত, ত্যাগের ঘোষণা
> রুদ্রব্রত, প্রচণ্ড শোচনা
> নবজন্ম চড়কে করাল
>
> প্রভু ! একি দুরন্ত আকাল
> ছেড়েছি তো সব কিছু মোরা
> ফুলফল জীবনপসরা
> ছেড়েছি তো মাধুরী, পুলক
> ছেড়েছি তো মায়া, দয়া, শোক
> ছিন্ন ভিন্ন শান্তির নির্মোক

দীর্ঘ হল আমাদের ব্রত
সুদীর্ঘ বিবস্ত্র অনাহার
তবু প্রভু কি জানি তোমার
কিবা সাধ রাখি অনাহত !

এ ব্রতে বৃদ্ধ আঁদ্রে জিদ-ও ভিশিতে বসে গোপনে কাজ করে যান, আমেরিকায় বসে কাথলিক ভাবুক মারিতাঁা লেখনীর অস্ত্র ধারণ করেন এবং বিখ্যাত উপন্যাসকার জিরোদু জর্মান আস্তানার বুকেই স্বদেশের গুপ্তচর ব্রত গ্রহণ করেন। কঠিন সে ব্রত, দেশের লোক জানত তিনি বিশ্বাসঘাতক, এদিকে জর্মানরা সত্যটা জানতে পেরে তাঁকে বিষ খাইয়ে মারল। শিল্পীশ্রেষ্ঠ পিকাসোর ফ্যাসিস্ট-বিরোধের গল্প আমরা আগেই শুনেছি : প্যারিসে বসে তিনি অসহযোগী ধৈর্যে ছবির পর ছবি এঁকে গেলেন। আর কি রকম শীতের মধ্যে জর্মানরা যখন তাঁকে কয়লা দিতে চাইল, তখন তাঁর সে একান্ত মূল্যবান দান প্রত্যাখ্যান। তাঁর স্টুডিয়োতে একদিন কমাণ্ডাটুর এল—স্পেনের ফ্যাসিস্ট বর্বর কর্তৃক গেরনিকা ধ্বংসের বিখ্যাত ছবিটির কপি দেখে যখন লোকটা বললে, এটা কার ছবি ? তখন পিকাসোর জবাব এল, তোমাদের। এই ফ্যাসিস্ট-বিরোধেরই পরিণতি হল পিকাসোর কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান।

কিন্তু, উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এ প্রতিরোধে সর্বদলের একতা। তাই 'লেৎর ফ্রাঁসেস' পত্রিকায় কাথলিক বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক লেখেন ; দুয়ামেলের সঙ্গে কম্যুনিস্ট আরাগঁ, এলুয়ার, ভেরকর-ও নিয়মিত লেখক। গোপন প্রকাশক এদিসিয়ঁ দ মিনুই-তে তাই আরাগঁর সঙ্গে হাত মেলান মারিতাঁা, বঁদা, কাসু, ভেরকর, মোরিয়াক। 'লেৎর ফ্রাঁসেস'-এর প্রস্তাবনায় তাই সম্মিলিত ইস্তাহার বেরোয়—মোরিয়াক, দুয়ামেল, আরাগঁ, এলুয়ার, ভিলদ্রাক, গেয়েনো, মারতাঁা দু গার, বঁদা···সকলেরই নামে। অর্ঘ্য দান করেন গেস্টাপো-নিহত শ্যাঁ-পল-রু এবং মাক্স জাকবকে। 'লেৎর ফ্রাঁসেস'-এর প্রতিষ্ঠাতা জাক দেকুরকেও জর্মানরা হত্যা করে। এলুয়ারের তথাকথিত কাব্যলক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসার অক্ষম অনুবাদ এখানে প্রাসঙ্গিক :

অগ্নিময় পাঞ্চজন্যে জেগে ওঠে বন,
হৃদয় শিহরে, গুঁড়ি হাত পত্রপুটে
চরম চরম সুখ ব্যূহ-ঘন-মিলে,
আলো ছোটে দিকে দিকে, তরল মাধুরী,

সারাটা বন যে এক মিতালির বন,
মিলেছে সবাই যেথা সবুজ নির্ঝরে,
জলন্ত বনের আর জীবন্ত সূর্যের।

গারথিয়া লোরকাকে তারা চড়িয়েছে শূলে।

একটি কথায় গাঁথা যেন সারা বাড়ি
জীবন-সর্বস্ব মিলে মেলে ওষ্ঠাধর,
সুকুমার শিশু এক অশ্রুহীন চেয়ে,
অনাবৃষ্টিদগ্ধ তার চোখের তারায়
দীপ্তি পায় ভবিষ্যৎ অক্ষয় ভাস্বর,
বিন্দু বিন্দু ছেয়ে যায় প্রতিটি মানুষ
কানায় কানায় প্রতি চোখের পাতায়।

সাঁ-পল-রুকে তারা চড়িয়েছে শূলে,
মেয়ে তাঁর প্রাণহীন নৃশংস হত্যায়।

কৈলাসের কোণ যেন তুহিন শহর,
স্বপ্নে সেথা ফল দেখি ফুলের মুকুলে,
সারা আকাশের আর সারা পৃথিবীর
অসহায় বস্ত্রহীন কুমারীর দশা,
কোন দ্যূতক্রীড়া এ যে কোথা এর শেষ,
প্রাচীন পথের ভাঙা নিস্তব্ধ দেয়াল,
দূরে রাখি তোমাদের হাসির প্রসাদে,

দেকূরকে চড়িয়েছে শূলে।

দেকূর একটি পত্রিকা স্থাপনে ক্লান্ত হন নি, 'লা পঁসে লিবর' বা স্বাধীন চিন্তা নামক পত্রটিও তিনি দুটি বন্ধুর সঙ্গে শুরু করেন। সে বন্ধু দুটিও জর্মান গুলিতে মারা যান। কিন্তু এই কেন্দ্র থেকেই লেখক সমিতি গড়ে ওঠে এবং এদিসিয়ঁ দ মিনুই-র হয় সূত্রপাত। দেবু-ব্রিদেল ও লেসকুর হলেন মুখ্য কর্মী—লেসকুরের

ভূমিকা থেকে উদ্ধৃতিতে অবস্থা বোঝা যাবে: আরেক যুগে লোককে শাস্তি পেতে হয়েছে রাসিনের চেয়ে য়ুরিপিদিসকে বেশি পছন্দ করায়।...আজ আবার আইনস্টাইনের ফিসিকস, ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব, সলোমানের গান নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ হয়েছে পুনর্মুদ্রণ মেরেডিথের বই; টমাস হার্ডি, ক্যাথরিন ম্যানসফিলড, ভর্জিনিয়া উলফ, হেনরি জেমস, ফকনর...আমাদের প্রিয় সব লেখকের বই... ইত্যাদি। তাই প্রশ্নটা হয়ে ওঠে "মানুষের মনের শুচিতা রক্ষার,যদিচ সে শুচিতার পথ হয়ে ওঠে আরো দুরূহ।"

এই গ্রন্থমালাতেই ভেরকর প্রকাশ করলেন তাঁর প্রথম গল্প 'সমুদ্রের মৌন'। বইটি শেষ হয় ১৯৪১-এর অক্টোবরে এবং ছাপা হয় বিয়াল্লিশের ফেব্রুয়ারিতে। বিয়াল্লিশের শেষদিকে বইটির সমুদ্রযাত্রা, তারপরে 'কায়িয়ের দু সিলঁস' বা 'মৌনায়ন' গ্রন্থমালার প্রথম প্রকাশ এই 'সমুদ্রের মৌন'। মোরিস দ্রুঁও ভূমিকায় লিখেছেন কি করে জেল এড়িয়ে, পুলিশের তোয়াক্কা না রেখে, সৈন্যদলের মুখে তুড়ি দিয়ে, সীমান্ত প্রহরীকে নাজেহাল করে, এইসব মৌনব্রতের পুঁথি আসত। যে কাগজ জোগাত, যে ছাপত, যে লিখত—সবাই জানত মৃত্যু যে কোনো মুহূর্তে উঁকি দিতে পারে, তবু বইয়ের পর বই বেরিয়েছে। স্বনামে ও বেনামে বিখ্যাত ও সাহিত্যজগতে সদ্য আগত সব লেখক। ফরে নাম নিয়েছিলেন ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক, দেবুব্রিদেলের নাম হয়েছিল আর্‌গন। আরাগঁর স্ত্রী, মায়াকফস্কির আত্মীয়া এলসা ত্রিয়োলেৎ প্রতিরোধের বিষয়ে সহৃদয় এক উপন্যাস লেখেন লোরাঁ দানিয়েল নামে। কাব্যেও এ প্রবল প্রাণের বন্যা আরাগঁ ও এলুয়ার প্রভৃতির কবিতায় ফরাসীকাব্যের বাঁধা আবেগে মুক্তি এনে দিলে। এলুয়ার 'কবিদের সম্মান' নামে যে চয়নিকা প্রকাশ করেন, তাতে আশ্চর্য কবিতাগুলির লেখকরা সংখ্যায় একুশ।

সারা ফ্রান্সেই এ আন্দোলন চলেছিল। মধ্য দেশের ও দক্ষিণের ঐশ্বর্য বিস্ময়কর। এলুয়ারের জনপ্রিয় মায়াবী কবিতা 'স্বাধীনতা' দক্ষিণের কাগজেই প্রথমে বেরোয়। আর-একটি কাগজ আরাগঁর এক কবিতা প্রকাশের পরে ভিশির নজরে পড়ে উঠে যায়। 'পোয়েসি ৪০' নামে চয়নিকায় তা সত্ত্বেও এলুয়ার-আরাগঁর সঙ্গে জর্মানহত গী মকে-র লেখাও ছিল। উত্তর-দক্ষিণের যোগাযোগ করতে গিয়েই দুদাক মারা যান। তারপরে এল সোজা আইন উড়িয়ে সাহিত্য। লিওঁতে বেরোল 'লেসোতোয়াল,' টাইপ করা কাগজ, যেখানে যায় সেখানে পাঁচটা করে কাপি হয়, দেখতে দেখতে সারা দেশে ছড়িয়ে গেল—আরাগঁ,

এলুয়ার, কামু···এঁদের লেখা হাতে হাতে মুখে মুখে ছড়াতে লাগল।

প্রত্যক্ষ প্রতিরোধে আরাগঁর ছিল সব কঠিন কঠিন কাজ—কারণ তিনি কম্যুনিস্ট। কিন্তু সেই সব বিশ্রামহীন মরণান্তিক কাজের মধ্যেই আরাগঁর বহু শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্ম—প্রবন্ধ, উপন্যাসেরও। তাঁকে ঘিরেই দক্ষিণের লেখক সংঘ গড়ে উঠল। নাৎসিনিহত প্রেভস্ত, এলসা ত্রিয়োলেৎ, আঁদ্রে মালরো, মারতাঁ দু গার···সবাই এ সংঘে জড়িত। এঁরা শুধু নিজেদের সাহিত্য রচনা ছাপিয়েই ক্ষান্ত হন নি। নিষিদ্ধ ভেরলেনের কাব্যসংকলন এঁদের একটি প্রকাশ, ফ্রান্সে জর্মান কারাগারের মনোবিকার বিষয়ে একটি তথ্যপূর্ণ ডাক্তারি বই আর-একটি।

মালরো এই সময়ে মুক্ত ফরাসী বাহিনীর কর্নেল ছিলেন, তুলুসে নাৎসি তাঁবুতে বন্দী হয়ে দুঃসাহসী পালান এবং আবার বাহিনীতে যোগদান করেন—তাঁবুতে নাকি নাৎসিরা তাঁর অনেক খাতাপত্র নষ্ট করে দেয়। তবু তাঁর বিরাট উপন্যাসের প্রথম খণ্ড বেরিয়ে গেছে—'লা লু? আভেক লাঁজ'—দেবতার বিরুদ্ধে লড়াই। অনেকের মতে এর পরে চীনের, স্পেনের, বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিস্ট-বিরোধের এই যোদ্ধা লেখককেই বর্তমানের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলতে হবে, মানুষের ইতিহাসের চরম ক্ষণগুলি তাঁর দৃষ্টিকেন্দ্র আর বর্তমান মানুষের মনের জটিলতম আবেগ তাঁর উপজীব্য। ব্যক্তিত্ব কেন সমাজ ছাড়া সম্পূর্ণ নয়, ইচ্ছাশক্তি ও কর্মৈষণার দ্বন্দ্ব কেন জীবনকে জটিল করে, ভিতর ও বাহির কেন মানবমর্যাদাকে ছিন্নভিন্ন করে ও দিশেহারা হয়—এই সব প্রশ্ন মালরোর বিপ্লবী পটভূমিতে কণ্টকিত হয়ে ওঠে।

এ প্রশ্ন ফ্রান্সের প্রতিরোধ-ক্ষেত্রেও যে উঠেছিল তা আরাগঁর কাব্যে দেখি। জুল সুপেরভিয়েইর কবিতাতেও নিঃসঙ্গ কিন্তু ঐক্যবদ্ধ দেশপ্রেমের মধ্যে তার একটা প্রকাশ :

আমরা যে আত্মহারা প্রবজ্যায়
বাহুতে যে প্রতিষ্ঠ স্বদেশ,
প্রত্যেকে ধরেছি ইষ্ট সঙ্গোপনে,
ভাবি কেউ পায় না উদ্দেশ

দুর্লভ প্রেয়সী হাতে, কি উদ্বেগ
জন্ম মৃত্যু মুহূর্তে উচ্ছ্বসি—

আবির্ভূতা—একি সেই জন্মভূমি
স্বর্গাদপি সেই গরীয়সী ?

প্রত্যেকে ধরেছি মূর্তি—যথাশক্তি ;
প্রত্যেকের বাহুর তর্পণে
প্রত্যেকে আপন বিম্ব দেখি বুঝি
অনন্ত সে অতল দর্পণে।

—এই দর্পণে ভেরকরও দেখেন ফ্রান্সের অন্তরাত্মা। এনগ্রেভার হয়ে উঠলেন প্রথমশ্রেণীর গল্পলেখক, পলাতকা দেশসেবিকা স্ত্রীও জানতেন না যে 'সমুদ্রের মৌন' তাঁর স্বামীর রচনা। শুনেছি ভেরকরের আসল নাম নাকি ব্রুলে। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় বইও তাঁর বিখ্যাত *nom de plume, nom de guerre*—কলমী নামে যুদ্ধের নামেই বেরিয়েছে। ভেরকরের সাহিত্য তথা প্রতিরোধের যুক্তি আজকে শান্তিতেও অনাহত রয়েছে—আরাগঁর মতো, এলুয়ারের মতো। ভবিষ্যতে তাই তো এঁদের চোখ, যাতে অতীত ভ্রান্তি আবার সর্বনাশের পথে দেশকে বিশ্বকে না টানে। তাই তো আরাগঁ শান্তি-পর্বের পরে ইংরেজ বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে বক্তৃতা দেন :

এবারে যে যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে আমরা—তোমরা ও আমরা—গিয়েছি, সে যেন বৃথাই না যায়। বিপদের মুখে, শাসানির সামনে, আমরা যেন আর চোখ বুজে না থাকি, কি লণ্ডন কি প্যারিস বিপদ সে একই।...শুধু অশ্রুপাতে কিছু লাভ নেই, ভাঙা হৃদয় তাতে কারো জোড়া লাগে না, ছারখার বাড়ি কারো আর ফিরবে না। লণ্ডন যে আমার কত প্রিয় তাও আবার জেনেছি ; লণ্ডনেই হোক বা প্যারিসেই হোক, আমাদের অশ্রু আজ মিশেছে পুণ্য ক্রোধে, ঘৃণায়। কিন্তু, আমার ইংরেজ বন্ধুগণ, তোমরা যারা ১৯৪০-এ আমার কথা বিশ্বাস করো নি, ১৯৪৫-এ আমার কথা শুনবে কি, বিশ্বাস করতে পারবে কি আমার কথা, যখন বলি যে আমরা কোনোমতেই ক্ষমা করতে পারব না, কখনোই করব না ?

সমুদ্রের মৌন

নানারকম ফৌজী তোড়জোড়ের পরে সে এল। প্রথমে হাজির হল দুই পলটন, দুজনেরই কটা রঙ; একজন রোগা নড়বড়ে, আর-একজন গাঁট্টাগোট্টা চওড়া, পাথুরিয়ার মতো কড়া দুই হাত। বাইরে থেকেই তারা আমার বাড়িটা দেখল। তারপরে এক সুবাদার এল, তার সঙ্গে জুটল নড়বড়ে নায়েকটি। তারা ভাবলে যে তারা ফরাসী বলছে, কিন্তু তাদের কথার কিছুই আমি বুঝলুম না। যা হোক, খালি ঘর কটা দেখিয়ে দিলুম, তাতেই তারা থামল।

পরদিন সকালে একটা প্রকাণ্ড ধূসর ফৌজী টুরিং-কার আমার বাগানে ঢুকল। চালক আর ছিপছিপে কটাচুল হাসিমুখ ছোকরা এক সৈন্য দুটো প্যাকিং-কেস নামাল, আর এক ধূসর কাপড়ে মোড়া বড় পুঁটলি। মাল বোঝাই হল সবচেয়ে বড় ঘরটাতে। গাড়িটা চলে গেল এবং কয়েক ঘণ্টা পরে ক্ষুরের শব্দ শুনলুম। তিন সওয়ার হাজির হল, তাদের একজন নেমে একবার সাবেকী পাথরের বাড়িটা ঘুরে ফিরে দেখে নিলে। সে ফিরে আসতে, সবাই, মানুষ আর ঘোড়া, আমার কাজের আস্তানায়, পুরানো আটচালায় ঢুকল। পরে দেখলুম যে তারা দুটো পাথরের মধ্যে বসানো আমার ছুতোরের চৌকি থেকে জোড়টা সরিয়ে দেয়ালের গর্তে মেরেছে, আর দড়ি আটকে ঘোড়া বেঁধেছে।

দুদিন আর কিছু ঘটল না। আমি তো কাউকে দেখি নি। সৈনিকরা সকালে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে যেত, সন্ধ্যায় ফিরত, তারপরে কুঠুরি বোঝাই খড়ের গাদায় ঘুমত।

তৃতীয় দিনের সকালে বড় গাড়িটা ফিরল। সেই হাসিখুশী ছোকরাটি বড় এক অফিসারী ফিল্ড-ট্রাঙ্ক টেনে কাঁধে ফেলে ঘরে রেখে এল। তারপরে সে তার কিটব্যাগটা নিয়ে পাশের ঘরে রাখল। নিচে নেমে এসে সে বেশ ফরাসীতে আমার ভাইঝির কাছে বিছানার চাদর চাইল।

আমার ভাইঝিই টোকা শুনে দরজা খুলতে গেল। সে তখনই আমার কফি এনেছে, আমার ঘুমের জন্য প্রতিদিনই তার এই ব্যবস্থা। ঘরের পিছনে প্রায় অন্ধকারে আমি বসে। ঘরের দরজা সোজা বাগানে খোলে, বাড়ি ঘিরে চারিদিকে একটা লাল টালির পথ, বৃষ্টির দিনে সুবিধা। পায়ের শব্দ শুনলুম,

টালির উপর জুতোর শব্দ। আমার ভাইঝি আমার দিকে তাকাল, পেয়ালা নামাল। আমারটা আমার হাতেই।

তখন রাত্রি, কিন্তু খুব ঠাণ্ডা নয়; সেবার সারা নভেম্বরটাই বিশেষ ঠাণ্ডা পড়ে নি। দেখতে পেলুম একটা বিরাট মূর্তি, একটা চ্যাপটা টুপি, কাঁধের উপর আলোয়ানের মতো একটা বর্ষাতি ঝুলছে।

আমার ভাইঝি দরজা খুলে দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে। দরজাটা একেবারে দেয়ালে টেনে সে দেয়ালের গায়ে দাঁড়িয়ে ছিল সামনে শূন্যচোখে চেয়ে। আর আমি ছোট ছোট চুমুকে কফি খাচ্ছি।

দোরগোড়া থেকে অফিসারটা বললে, যদি কিছু মনে না করেন।

সম্ভাষণের ভঙ্গীতে লোকটি মাথা নাড়ল আর মনে হল সে যেন নীরবতার গভীরতার পরিমাণ করছে। তারপরে ঢুকে এল ঘরে। নিচোলটা হাতে নামাল, পলটনী কায়দায় সেলাম করে টুপিটা খুলল। তারপরে আমার ভাইঝির দিকে ফিরে স্মিত মুখে তাকে কুর্নিশ করলে। তারপরে আমার দিকে ঘুরে আরো নিচু মাথা নামিয়ে করলে আমাকে কুর্নিশ। বললে, আমার নাম ভেরনের ফন এব্রেনাক।

চট করে আমার মনে হল, এ তো জর্মান নাম নয়, হয়তো ওর পূর্বপুরুষ এখান থেকে দেশান্তরী প্রটেস্টান্ট। সে আবার বললে, আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

টেনে টেনে বললে শেষ কথাটা, কথাটা পড়ল নিস্তব্ধতার অতলে। আমার ভাইঝি দরজা ইতিমধ্যে বন্ধ করে দেয়ালে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সোজা সামনে তাকিয়ে। আমি বসেই। আস্তে আস্তে খালি পেয়ালাটা হারমোনিয়মের উপরে রাখলুম, হাতে হাত দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

অফিসারটি বলে চলল, অবশ্য এ ছাড়া উপায় ছিল না। পারলে আমি এটা করতুম না। আমার আরদালি পারতপক্ষে আপনাদের বিরক্ত করবে না, এটুকু বলছি।

সে দাঁড়িয়ে ছিল ঘরের মাঝখানে, বিরাট রোগা শরীর; হাত তুললে কড়ি-কাঠে পৌঁছয়। মাথাটা একটু সামনের দিকে ঝোঁকা—যেন তার ঘাড়টা কাঁধ থেকে ওঠে নি, উঠেছে সটান বুকের উপর থেকে। আসলে লোকটির কাঁধের গড়ন গোল নয়, কিন্তু দেখতে তাই লাগে। সহজেই চোখে পড়ে তার সরু কাঁধ আর পিছনটা। আর মুখটা সুশ্রী, খুব পুরুষালি আর গালে বড় বড় টোল। ভ্রূর ছায়ায় চোখ দুটো ঠিক দেখতে পেলুম না, তবে মনে হল হালকা রঙ; কটা

মসৃণ চুল, পিছনে টেনে আঁচড়ানো, ঝাড়ের তলায় দেখাচ্ছিল রেশমী চকচকে।

অখণ্ড মৌন আরও ঘনিয়ে উঠছিল সকালের কুয়াশার মতো; গাঢ় নিস্তরঙ্গ। আমার ভাইঝির অচল ভাবটায় আর আমারও জড়তায় এ নির্বাক শূন্য যেন আরো ভারী হয়ে উঠল, সীসার মতো কঠিন আর ভারী। বিমূঢ় হয়ে অফিসারটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ, শেষটা তার ঠোঁটে এল একটা হাসির আভাস। গম্ভীর হাসি, তাতে ব্যঙ্গ শ্লেষের চিহ্ন নেই। হাত নেড়ে সে একটা অস্পষ্ট ভঙ্গী করল, যার মানেটা ঠিক বুঝলুম না, স্থির দৃষ্টিতে চোখ রাখল আমার ভাইঝির দিকে, সেই একভাবে সোজা দাঁড়িয়ে। খুঁটিয়ে দেখতে পেলুম পাশ থেকে তার শক্তিমান মুখের গড়ন, সরু টিকলো নাকটা। আধবোজা ঠোঁটের মধ্যে দিয়ে একটা সোনার দাঁতও চোখে পড়ল। তারপরে শেষটা সে চোখ ফেরাল, চুল্লির আগুনে তাকিয়ে রইল, বললে, যাঁরা দেশপ্রেমিক তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি।

হঠাৎ মাথা তুলে জানালার উপরে খোদাই দেবমূর্তির দিকে চেয়ে বললে, এখনই আমার ঘরে যেতে পারি, কিন্তু পথটা ঠিক জানি না।

আমার ভাইঝি পিছনের সিঁড়ির দিকের দরজাটা খুলে অফিসারটির দিকে না তাকিয়ে ধাপে ধাপে উঠে চলল, যেন সে একা। লোকটি পিছু পিছু উঠতে লাগল—নজর করলুম তার একটা পা খোঁড়া। শুনতে পেলুম তারা সিঁড়ির মাথা পার হল, জর্মানটির পদক্ষেপ—একবার ভারী আর হাল্কা, চলনের উপরে প্রতিধ্বনিত হল। একটা দরজা খোলা শুনলুম, আবার বন্ধ হল; তখন আমার ভাইঝি ফিরে এল।

পেয়ালাটা তুলে সে কফি খেতে লাগল। আমি পাইপ ধরালুম। কয়েক মিনিট দুজনেই নীরব। তারপরে আমি বললুম, যাক, ভরসা এই, ভদ্র বলে মনে হয়।

আমার ভাইঝি শুধু কাঁধদুটোয় ঝাঁকুনি দিলে। এবং আমার মখমলের জ্যাকেটটা কোলে নিয়ে তার সেই অদৃশ্য রিফুর কাজ করে চলল।

পরদিন সকালে আমরা রান্নাঘরে প্রাতরাশ খাচ্ছি, অফিসারটি তখন নেমে এল। আরেক সিঁড়ি দিয়ে সেখানে নামা যায়, জানি না জর্মানটি আমাদের আওয়াজ পেয়ে নামল, না এমনিই সেদিকে নেমে এল। দরজায় থমকে সে বললে, রাত্রিটা আমার ভালোই কেটেছে, আশা করি আপনাদেরও আমার

মতোই ভালো কেটেছে।

হাসিমুখে সে প্রকাণ্ড ঘরটার চারদিকে তাকাল। সেবারে আমরা বেশি কাঠ জোগাড় করতে পারি নি, কয়লা তো আরো কম। রান্নাঘরটা তাই আমি নতুন রঙ করেছিলুম আর কিছু আসবাবপত্র, তামার প্যান কটা, পুরানো প্লেট এনে রেখেছিলুম যাতে শীতটা সেখানে বদ্ধসন্ধ হয়ে কাটাতে পারি। সবই তার নজরে পড়ল, তার খুব সাদা দাঁতের কোণের দীপ্তি একটু চোখে পড়ল। আগে মনে হয়েছিল তার চোখ বুঝি নীল, লক্ষ্য করলুম সোনালী পাটল রঙ তার চোখের। শেষটা সে ঘরটা পেরিয়ে বাগানের দরজাটা খুলল। বেরিয়ে দু-পা গিয়ে পিছু ফিরে চেয়ে দেখলে আমাদের লম্বা নিচু বাড়িটা, পুরনো পাটলরঙা টালি ঘেরা আর লতায় ছাওয়া। তার মুখের হাসিটা ছড়িয়ে গেল, বললে, তোমাদের বুড়ো মেয়র বলেছিল আমাকে ঐ প্রাসাদে থাকতে।

বলে সে হাতের পিছন দিকে গাছের ফাঁকে যে জমকদার বাড়িটা পাহাড়ের আরো উপরে দেখা যাচ্ছিল, সেটা দেখাল। বললে, আমার লোকেরা যে ভুল করেছে, তার জন্যে তাদের তারিফ করব। এ বাড়ি অনেক সুন্দর প্রাসাদ।

তারপরে সে দরজা ভেজিয়ে সার্শির মধ্যে দিয়ে সেলাম জানিয়ে অদৃশ্য হয়ে

সেদিন সন্ধ্যায় ঠিক আগের মতো সেই সময়ে সে ফিরে এল। আমাদের কফি চলছে। দরজায় টোকা দিয়ে আর সে আমার ভাইঝির জন্য দাঁড়াল না, নিজেই খুলে ঢুকল।

—আপনাদের বিরক্ত করছি নিশ্চয়ই। যদি চান তো রান্নাঘর দিয়ে আমি আসতে পারি, এ দরজা বন্ধ রাখতে পারেন।

ঘরটা পেরিয়ে সে দরজার হাতলে হাত দিয়ে একটু দাঁড়াল, বৈঠকখানার চারকোণে একবার চোখ বুলিয়ে। তারপরে মাথা নামিয়ে সম্ভাষণ জানাল, আপনাদের শুভরাত্রি কামনা করি। বলে বেরিয়ে গেল।

আমরা দরজাটা কোনোদিনই চাবি বন্ধ করি নি। ভেবে পাই নি এই না করার উদ্দেশ্যটা খুব স্পষ্ট বা সরল ছিল কি না। গভীর একটা বোঝাপড়ায় আমার ভাইঝি আর আমি স্থির করেছিলুম যে আমাদের জীবনযাত্রায় কোনো পরিবর্তন করব না, সামান্য কিছুতেও না, যেন অফিসারটির অস্তিত্বই নেই, যেন সে একটা ছায়ামূর্তি মাত্র। তবে এটাও সম্ভব যে হয়তো আরেকটা

মনোভাবও এই সংকল্পে উহ্য ছিল : আমি কারো এমন কি শত্রুরও অনুভূতিকে পীড়া দিতে পারি না, নিজে কষ্ট না পেয়ে।

অনেক দিন ধরে, এক মাসেরও বেশি হবে, একই দৃশ্য রোজ চলল। অফিসার টোকা দেয় তারপরে ঘরে ঢোকে। আবহাওয়া নিয়ে দু-চার কথা বলে কিম্বা ঐ রকম বাজে কোনো বিষয় নিয়ে। সব কথারই একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে কোনো জবাব দিতে হয় না। প্রতিবার সে মুহূর্তের জন্যে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে এবং ঘুরে ফিরে তাকায়। তার মুখে একটা হাসির ক্ষীণ ছায়ায় মনে হয় যেন সে এই পরীক্ষায় কি একটা সুখ পাচ্ছে, রোজই সেই পরীক্ষা আর সেই এক সুখ। তার চোখ পড়ে আমার ভাইঝির নতমুখের পাশে, অবশ্যম্ভাবী কঠিন ও ভাবহীন। এবং যখন সে চোখ ফেরায়, তখন নিশ্চিত মনে হয় যে ও চোখে আছে স্মিত সমর্থন। তারপরে সেই মাথার নত সম্ভাষণ, আপনাদের শুভরাত্রি কামনা করি।

একটা সন্ধ্যায় হঠাৎ সব পালটে গেল। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা, বৃষ্টিমেশা হালকা তুষার পড়ছে। ভারী কাঠের রসদ জমিয়ে রেখেছিলুম বিশেষ করে এমনি রাত্রির জন্যে, চুল্লিতে তাই জ্বেলেছি। নিজের ইচ্ছাশক্তি সত্ত্বেও কল্পনায় এল, বাইরে ঐ অফিসার কি করছে কি রকম তুষার মেখে সে আসবে। কিন্তু সে এলই না। তার অভ্যস্ত সময় কেটে গেল অনেকক্ষণ। নিজের উপরে বিরক্ত লাগল তার কথা চিন্তা করেছি ভেবে। আমার ভাইঝি ধীরে ধীরে সেলাই করছিল নিবিড় মনোযোগে।

অবশেষে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কিন্তু বাড়ির ভিতর থেকে। চেনা গেল অফিসারের অসম পদক্ষেপ, বোঝা গেল যে সে অন্য দরজা দিয়ে এসেছে এবং ঘর থেকে বেরিয়েছে। নিশ্চয়ই সে ভিজা য়ুনিফর্মে বেমানান চেহারায় আমাদের সামনে আসবে না বলে প্রথমে পোশাক বদলেছে।

পদক্ষেপগুলি, ভারী তারপরে হালকা—সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। দরজাটা খুলে গেল আর দেখি অফিসারটি। সাধারণ নাগরিক বেশ, ধূসর ফ্লানেল পাতলুন আর চড়া পাটল ছিট দেওয়া স্টীলনীল টুইড কোট। ঢিলে ঢালা পোশাক, সহজ স্বাভাবিকভাবে পরা। কোটের তলায় ক্ষীররঙা পশমী পুলওভার। তার রোগা পেশল শরীরে আঁটসাঁট।

—মাফ করবেন—সে বললে, শীত লাগছে বেজায়, একেবারে ভিজে

গিয়েছিলুম, আর আমার ঘরটা বড় ঠাণ্ডা। আপনাদের আগুনের পাশে কয়েক মিনিট গরম হয়ে নিই।

একটু কষ্টেসৃষ্টে সে চুল্লির পাশে নিচু হয়ে হাত দুটো ছড়িয়ে উলটে পালটে গরম করতে লাগল। বললে, বা চমৎকার।

বলে ঘুরে আগুনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসল, হাতের মধ্যে একটা হাঁটু টেনে। বললে, এ তো কিছুই নয়। ফ্রান্সে শীত তো কোমল। আমার দেশে শীত বেজায় কড়া! বেজায় কড়া! গাছ তো শুধু ফার, বরফে চাপা ঘন বন। এখানে গাছগুলো সুকুমার আর তুষার যেন লেসের কাজ। আমার বাড়ির আশেপাশের অঞ্চলটা দেখে মনে হয় যেন একটা পেশীবদ্ধ ষাঁড় প্রাণপণ চেষ্টায় বেঁচে আছে। এখানে সব বুদ্ধি, সূক্ষ্ম কবিস্বভাবের বিহার।

লোকটির গলায় কিছু রঙদার নেই, অনুরণন নেই, কথার ঝোঁক অবশ্য কমই, শুধু ওরই মধ্যে স্থূল ব্যঞ্জনবর্ণগুলোতে একটু লক্ষ্য করা যায়। সবটা শুনে মনে হয় যেন একটা একটানা মাত্রাবৃত্ত চলেছে। উঠে দাঁড়িয়ে সে চুল্লিচোঙার উপর বাহুটা রাখল, হাতের পিছনে কপালটাকে বিশ্রাম দিয়ে। লোকটি এতো লম্বা যে তাকে একটু ঝুঁকে থাকতে হল, যদিচ আমি দাঁড়ালে জায়গাটায় আমার মাথা উঠত না। অনেকক্ষণ সে স্থির ও নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। আমার ভাইঝির সেলাই চলল যন্ত্রের মতো, একবার মুখ তুলে সে তাকালও না। আমি ধূমপানরত, আঁরামকেদারায় আধশোয়া। ভাবলুম আমাদের মৌনের ভার অচল, লোকটি এবার শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নেবে। কিন্তু সেই চাপা গলার গম্ভীর পাঠ আবার চলল। নীরবতা ভাঙল বলা যায় না, কারণ মনে হল যেন এটা নীরবতারই জের।

—চিরকাল ফ্রান্সকে ভালোবেসেছি—স্থির দাঁড়িয়ে লোকটি বললে, চিরকাল! গত যুদ্ধে আমি ছিলুম শিশু, তখন কি ভেবেছি তাতে কি আসে যায়। কিন্তু তারপর চিরকাল ভালোবেসেছি তাকে—শুধু দূর থেকে, লোয়াতেন রাজকন্যার মতো।

একবার থেমে গম্ভীর কণ্ঠে বললে, আমার বাবার জন্যে।

সে ঘুরে দাঁড়াল, কোটের পকেটে দুই হাত, কুলুঙ্গির গায়ে হেলান দিয়ে, থাকটায় তার মাথাটা একটু ঠুকে যেতে লাগল। থেকে থেকে সে হাতের পিছনটা আস্তে আস্তে সেখানে ঘষতে লাগল, হরিণের মতো একটা স্বাভাবিক ভঙ্গীতে। সামনেই একটা আরামকেদারা ছিল, কিন্তু সে বসল না। শেষদিন

পর্যন্ত, সে কখনো বসে নি। ঘনিষ্ঠতায় কোনো ফাঁক তাকে আমরা দিই নি, কখনো সেও তা নিতে যায় নি।

সে আবার বললে, আমার বাবার জন্যে। তিনি ছিলেন একান্ত স্বদেশ-ভক্ত। আমাদের পরাজয় তাঁর পক্ষে দারুণ আঘাত হয়েছিল। তবুও তিনি ফ্রান্সকে ভালোবাসতেন। ব্রিয়াঁকে তিনি পছন্দ করতেন, ভাইমার রিপাব্লিকে আর ব্রিয়াঁর উপরে তাঁর ছিল ভরসা, সেই ছিল তাঁর উৎসাহ। তিনি বলতেন, ওই আমাদের মেলাবে স্বামী স্ত্রীর মতো। তিনি ভাবতেন য়ুরোপে বুঝি শেষটা সূর্য উঠল।

কথা বলতে বলতে সে লক্ষ্য করছিল আমার ভাইঝিকে। পুরুষ যেমন মেয়েদের দেখে, সে দৃষ্টিতে সে দেখছিল না, দেখছিল যেন কোনো ভাস্কর্যের মূর্তি। আর আমার ভাইঝি তো তাই ছিল, জীবন্ত কিন্তু যেন এক প্রতিমা।

—কিন্তু ব্রিয়াঁর হল হার। বাবা দেখলেন যে ফ্রান্স তখনো বনেদী বুর্জোয়াদের রাজত্ব, তোমাদের যতো দ ওয়েনদেলদের মতো লোকেদের, যতো আঁরি বোর্দোদের, তোমাদের বুড়ো মার্শালের। তিনি তাই আমায় একদিন বললেন, শিরস্ত্রাণ আর ফৌজী বুটজুতো ছাড়া তোমার ফ্রান্সে যাওয়া হবে না। আমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিই, তখন তিনি মৃত্যুর মুখে। তাই তো যুদ্ধ যখন ফেটে পড়ল, তখনও সারা য়ুরোপের মধ্যে এক ফ্রান্সই আমার অচেনা।

সে হাসল, বললে, যেন কারণ দেখিয়ে, জানেন তো, আমি সঙ্গীতকার।

একটা কাঠ আগুনে ভেঙে পড়ল; পোড়া কয়েকটা টুকরা চুল্লি থেকে গড়িয়ে এল। জর্মানটি হেলে সাঁড়াশি দিয়ে টুকরাগুলো তুলে বলে চলল, গাইয়ে বাজিয়ে নই, আমি সঙ্গীতরচয়িতা। সেই আমার জীবন। তাই মজার লাগে নিজেকে যোদ্ধাবেশে দেখতে। কিন্তু এ যুদ্ধের জন্য আমার ক্ষোভ নেই। না, আমার বিশ্বাস যে এর মধ্য দিয়ে মহৎ কিছুর সূত্রপাত হবে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, পকেট থেকে হাতদুটো বার করে অর্ধ-উত্তোলিত ভঙ্গীতে সে বলতে লাগল, আমায় ক্ষমা করবেন, হয়তো এমন কিছু বলেছি যাতে আপনাদের আহত করে। নিজের মনের কথাই বলছিলুম, সত্যকার সদ্ভাব থেকেই। ফ্রান্সকে ভালোবাসি বলেই আমার এ ভাব। মহৎ সম্ভাবনা তাই এ যুদ্ধের থেকে, জর্মানির পক্ষে আর ফ্রান্সের পক্ষে। আমার বাবার মতো আমারও মনে হয় এবার বুঝি য়ুরোপে সূর্য উঠল।

দু-পা এগিয়ে গেল লোকটি, ঈষৎ মাথা নামাল; প্রতি সন্ধ্যার মতো বললে,

আপনাদের শুভরাত্রি কামনা করি।

তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। নীরবে আমার পাইপ আমি শেষ করলুম, তারপরে একটু কেশে বললুম, বোধহয় এক-আধ টুকরো জবাবও বেচারাকে না দেওয়াটা নিষ্ঠুরতা হচ্ছে।

আমার ভাইঝি মাথা তুলল। ভ্রূ কপালে উঠিয়ে সে তাকাল, তার চোখে প্রচণ্ড অবজ্ঞা জ্বলছে। আমার মনে হল বুঝি আমি লজ্জায় লাল হয়ে উঠছি।

সেদিন থেকে লোকটির আসা-যাওয়ায় একটা নতুন ছক দেখা দিলে। যুনিফর্মে প্রায় আর তাকে দেখতুম না ; বেশ পরিবর্তন করে সে দোরগোড়ায় এসে টোকা দিত। সে কি শত্রুর যুদ্ধসাজ দেখা থেকে আমাদের বাঁচাতে? নাকি সে কথাটা আমাদের ভোলাতে চায়, তার নিজের ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ চেয়ে? নিশ্চয়ই দু-ই তার মনে কাজ করছিল। এসে দরজায় টোকা দিত, তারপর অপ্রত্যাশিত আমাদের সাড়ার অপেক্ষা না রেখে ঘরে ঢুকত। ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে ঘটত, তারপরে সে আগুন ঘেঁষে নিজেকে গরম করত। সেইটেই সে তার উপস্থিতির উপলক্ষ খাড়া করত—সে ছুতোয় ভুলত না কেউই, এবং সেও এই সুবিধামতো অছিলার মামুলিত্ব ঢাকবার কোনো চেষ্টা করত না।

সে যে রোজই এসেছে, তা নয়, তবে এমন সন্ধ্যা মনে পড়ে না, যেদিন সে ঘরে এসে আমাদের উদ্দেশে কথা বলে যায় নি। আগুনের উপরে হেলে দাঁড়িয়ে, সে শরীরের কোনো না কোনো অংশ গরম করত আর তার গলার একটানা গুঞ্জন আস্তে আস্তে শুরু হত আর বাকি সন্ধ্যাটা চলত এক দীর্ঘ স্বগতোক্তি কয়েকটা বিষয় ঘিরে—তার স্বদেশ, সঙ্গীত, ফ্রান্স, যে কটা বিষয় তার মন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। একবারও আমাদের কাছে কোনো জবাব পাবার চেষ্টা করে নি, বা মতামতে সায়, এমন কি চোখের চাউনি। বেশিক্ষণ কথা বলত না সে, কখনোই প্রায় সেই প্রথম সন্ধ্যার চেয়ে বিশেষ বেশি নয়। কয়েকটা করে বাক্য আসত তার, কখনো থেমে থেমে কখনো বা প্রার্থনার মতো একটানা ভাবে পর পর জড়িয়ে জড়িয়ে। কখনো সে দাঁড়াত নিশ্চল যক্ষমূর্তির মতো চুল্লির তাকে হেলান দিয়ে, কখনো বা কথার স্রোতের মধ্যেই সে এগিয়ে দেখত কোনো কিছু জিনিস, হয়তো বা দেয়ালের কোনো ছবি। তারপরে

আলাপে টানত ছেদ, তারপর সেই কুর্নিশ আর শুভরাত্রি কামনা।

একদিন, যাতায়াতের প্রথম দিকে, সে বললে, ভাবছি কি তফাৎ আমার বাড়ির আগুনে আর এই আগুনে? সেই একই তো কাঠ, সেই শিখা, সেই আধার। কিন্তু আলো যে অন্য রকম। সেটা নির্ভর করে আলো পড়ে যার উপরে, সেই সব কিছুতে—এই বৈঠকখানায় মানুষরা, এই আসবাব, এই দেয়াল, তাকে তাকে সব বই।

—ভাবি কেন এই ঘর এত ভালো লাগে? চিন্তিত স্বরে সে বললে, এমন কিছু সুন্দর নয়—ওহো, অপরাধ নেবেন না।

সে হেসে উঠল, মানে আমি বলছি যে এটা কিছু আর মিউসিয়ম মার্কা দ্রষ্টব্য কিছু নয়···আপনাদের আসবাবই ধরা যাক, দেখে কেউ বলে ওঠে না, আহা, কি চমৎকার! তা নয়, কিন্তু ঘরটার প্রাণ আছে। সারা বাড়িটারই একটা প্রাণের রূপ আছে।

বইয়ের তাকের সামনে সে দাঁড়িয়ে ছিল, তার আঙুলগুলো পেলব স্পর্শে বাঁধাইয়ের উপর বোলাতে বোলাতে বর্ণানুক্রমে বলতে লাগল, বালজাক, বারে, বোদলেয়র, বোমার্শে, বোয়ালো, বুফোঁ···শাতোব্রিয়াঁ, কর্নেই, দেকার্ৎ, ফেনেল, ফ্লোবেয়র, লা ফঁতেন, ফ্রাঁস, গোতিয়ে, হুগো·· কি নামাবলী। আপন মনে হেসে উঠে বললে, তবু আমি তো এচ অবধি এসেছি—এখনো বাকি মলিয়ের, রাবেলে, রাসিন, পাসকাল, স্তঁদল, ভলতেয়র, মনতেয়ন···আরো কত নাম। তাক থেকে তাক আস্তে আস্তে সে ঘুরতে লাগলে অস্ফুট উচ্ছ্বাস করতে করতে, বোধহয় কোনো কোনো নাম দেখে বিস্ময়ে।

তারপরে আবার শুরু হল কথা, ইংরেজদের ধরো, তখনই মনে হবে শেকস্পীয়র, ইতালিয়ানদের দান্তে। স্পেন—সেরভান্টিস, আমাদের কথা ভাবলেই গোয়টে। তারপরে থেমে ভাবতে হয়, কিন্তু কেউ যদি বলে, আর ফ্রান্সের বেলায়? কার নাম জিবের গোড়ায় আসে! মলিয়ের! রাসিন! হুগো! ভলতেয়র! রাবেলে! কিম্বা আর কারো নাম! যেন থিয়েটার-বাড়ির দোরগোড়ায় ভিড় ঠেলাঠেলি, কে আগে ঢুকবে।

সে ঘুরে দাঁড়াল, আবেগে বললে, কিন্তু সঙ্গীতের বেলায় আমাদের পালা : হাণ্ডেল, বেঠোফেন, ভাগনার, মৎসার্ট···কার নাম করি প্রথম?

—আর আজ আমরা পরস্পর লড়াই করছি—আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে সে

বললে। ততক্ষণে সে আগুনের সামনে ফিরে এসেছে, তার চোখ স্মিত হাস্তে ন্যস্ত আমার ভাইঝির মুখের দিকে, কিন্তু এই শেষ যুদ্ধ, আর আমরা এ-ওকে মারব না ; আমাদের হবে বিবাহের বন্ধন !

তার চোখের পাতা কুঁচকে উঠল, গালের হাতের তলায় ঢালুটা হয়ে উঠল লম্বা দুটো লাঙ্গল চালানো রেখা, সাদা দাঁত বেরিয়ে গেল, ক্ষ্যাতর স্বরে সে ঘাড় নেড়ে জোর দিয়ে বললে, হ্যাঁ তাই।

একটু চুপ করে বললে, যখন আমরা স্যাঁতে ঢুকে পড়লুম, সুখ হল যে বাসিন্দারা আমাদের বেশ স্বাগত করলে। সুখী বোধ করলুম, ভাবলুম, যাক ব্যাপারটা সহজেই চুকবে। তারপরে ভুল বুঝলুম, ওটা ভীরুতার জন্যেই হয়েছিল।

গম্ভীরভাবে সে বলতে লাগল, ঘৃণা হল ঐ সব লোকেদের প্রতি। ফ্রান্সের জন্যেই হল ভয়, ভাবলুম, তার কি সত্যই আজ এই দশা ?

সে ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে, না না। আমি তো তাকে পরে আরো দেখলুম। আজ আমি সুখী তার এই কঠিন মুখ দেখেই।

তার চোখ পড়ল আমার চোখে। আমি চোখ ফেরালুম, তার চোখ ঘরের এখানে ওখানে খানিক থেকে আবার আমার ভাইঝির দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবহীন মুখে ফিরল।

—আজ আমার সুখ এখানে আত্মমর্যাদাবান এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক পেয়ে আর এক তরুণী মহিলা নীরবতার মন্ত্র যিনি জানেন। আমাদের এই মৌনব্রত জয় করতে হবে, সারা ফরাসী দেশের নীরবতায় আনতে হবে ভাষা। এ ভেবে আনন্দ পাই।

সে চুপ করল, গম্ভীর স্থির মুখভাবে তখনো একটু হাসির জের, নীরবে সে তাকিয়ে রইল আমার ভাইঝির দিকে, তার দৃঢ়বদ্ধ কঠিন মুখের সুকুমার রেখায়। আমার ভাইঝি অনুভব করলে সেই দৃষ্টি ; দেখলুম সে একটু রাঙিয়ে উঠল, দুই ভুরুর মধ্যে ক্রমশ ফুটে উঠল ভ্রূকুটি। তার আঙুল টানতে লাগল ছুঁচটা, এত দ্রুত আর চেপে চেপে, যে প্রায় সুতো কেটে যায়।

হ্যাঁ, একটানা ধীর কণ্ঠে সে বলে চলল, সেই ভালো। অনেক বেশি ভালো। তাতে মিলনটা হবে পাকা—সেই রকম মিলন যাতে উভয় পক্ষই হয়ে ওঠে মহত্তর।...একটা সুন্দর শিশুদের গল্প পড়েছিলুম, আপনারাও পড়েছেন, সে গল্প সবাই পড়ে। জানি না তার একই নাম কিনা ভিন্ন

ভিন্ন দেশে। আমরা বলি 'ডাস টীর উণ্ড ডী শোয়নে'—পরমাসুন্দরী আর পশু। বেচারা সুন্দরী! পশুর কবলে অসহায় বন্দিনী। অষ্টপ্রহর পশুটা তার যন্ত্রণাকর নিষ্ঠুর ছায়ায় রূপসীকে ঢেকে রেখেছে···রূপের কী গর্ব, কী মর্যাদা, কঠিন সে সুন্দরীর হৃদয়··কিন্তু জন্তুটার মধ্যে নিহিত আছে কিছুটা ভালো। অবশ্যই সে মার্জিত সভ্য নয়, রূঢ় বর্বরটাকে সুকুমার সৌন্দর্যের পাশে দেখায় নেহাৎ বেয়াড়া। কিন্তু তারও একটা প্রাণ আছে, হৃদয় আছে। হ্যাঁ, হৃদয়, যে হৃদয়ে জাগে অভীপ্সা—যদি সুন্দরী মুখ তুলে চায়, একটু অবকাশ দেয়। কিন্তু বহুকাল কাটে, সুন্দরী কি সহজে ধরা দেবে। তারপরে একটু একটু করে সুন্দরী তার ঘৃণিত জেলারের চোখের পিছনে দেখতে পেল আলো—নিবেদনের, প্রেমের আলো। পরুষ হাতের কড়া শাসন, শৃঙ্খলের গুরুভার যেন কমতে লাগল। সুন্দরীর ঘৃণা বুঝি কমে এবার। দানবের নিষ্ঠা সাড়া জাগাল কোমল মনে, সুন্দরী এগিয়ে দিল হাত···তৎক্ষণাৎ পশুটার হল রূপান্তর, যে মায়ায় সে এই পাশবিক জীবন কাটাচ্ছিল, সে মায়ার হল অবসান, আর আবির্ভূত হল সুশ্রী সভ্য এক কুমার—সুকুমার বিদগ্ধ তার মন। সুন্দরীর প্রতি চুম্বনে জেগে ওঠে তার নব নব গুণের দীপ্তি। কী পরম সুখ তাদের মিলনে। আর তাদের ছেলেমেয়েরা, তারা পেল এক সঙ্গে মা-র আর বাপের গুণাবলী, পৃথিবীর সেরা সেই সব শিশু।···এই গল্প ছেলেবেলায় কার না প্রিয় ছিল। আমি তো গল্পটা খুব ভালোবাসতুম, কতবার পড়েছি। কান্না পেয়ে যেত আমার। পশুটাকে আমার ভালো লাগত, কারণ আমি তার ব্যথাটা বুঝতুম। আজও বিচলিত লাগছে গল্পটার কথা বলতে।

সে চুপ করলে, তারপরে দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে মাথা নত করলে, আপনাদের একান্ত শুভরাত্রি কামনা করছি।

* * *

একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার ঘরে গেছি তামাকের খোঁজে, শুনলুম কে হারমোনিয়ম বাজাচ্ছে। বাজছিল (বাখের) অষ্টম প্রেল্যুড ও ফুগ্‌টি। দুর্দিনের আগে অবধি আমার ভাইঝি সেটি শিখছিল। তারপর থেকে স্বরলিপি সেই পৃষ্ঠাতেই খোলা ছিল, আমার ভাইঝি আর কিছুতেই বাজনা চালাতে পারে নি। সে যে আবার আরম্ভ করেছে, তাতে আশ্চর্যই হলুম, খুশীও হলুম; অন্তরের কোন তাগিদে সে হঠাৎ মত বদলেছে! কিন্তু দেখি আমার ভাইঝি বাজাচ্ছে না, সে তার কেদারায় বসে স্থিরভাবে কাজ করছে। চোখাচুখি হল, কিন্তু তার

চাউনির অর্থ বুঝলুম না। চোখ পড়ল বাজনাটার উপরে আনত দীর্ঘ পিঠে, কাঁধ ঝুঁকে আছে, লম্বা লম্বা সুকুমার স্নায়ুক্ষিপ্র হাত, আঙুলগুলো এত দ্রুত পর্দায় পর্দায় চলছে যে মনে হয় যেন তাদের স্বতন্ত্র প্রাণ আছে।

লোকটি বাজাল শুধু প্রেলুড আলাপটি, তারপর উঠে আগুনের কাছে ফিরে এল।

তার সেই বর্ণহীন গলায়, প্রায় চুপি চুপি বললে, এর চেয়ে মহান কিছু নেই। মহান—কথাটা ঠিক বোঝায় না। মানুষের বাইরে—রক্তমাংসের জগতের বাইরে। এতে তবু বোঝা যায়, না, আন্দাজ করা যায়। তাও না, বলা উচিত একটা অন্তরাভাস পাওয়া যায়—মানবাত্মার···নিছক শুদ্ধ মানবাত্মার প্রকৃতির··· অলৌকিক জ্ঞানাতীত স্বভাবের একটা আভাস। হ্যাঁ, অমানুষিক এ সঙ্গীত।

মনে হল স্বপ্নের নিস্তব্ধতায় যেন সে চিন্তার খেই খুঁজছে, লোকটি আস্তে আস্তে ঠোঁট কামড়াতে লাগল।

—বাখ···সে শুধু জর্মান হলেই সম্ভব। আমাদের দেশের সেই চারিত্র্য—ঐ অমানুষিক চারিত্র্য। অমানুষিক বলতে আমি বোঝাতে চাই, মানুষের উপরে কোনো পর্দায় বাঁধা।

একটু থেমে আবার বললে, ঐ সঙ্গীত আমি ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি, অভিভূত হয়ে যাই ঐ ধরনের সঙ্গীতে, ও যেন আমার মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব···কিন্তু ও আমার আপন নয়।

—আমি চাই মানুষেরই পর্দায় সঙ্গীত রচনা করতে ; সত্যের সন্ধানে সেও এক পথ। আমার সেই পথ। আর কোনো পথ আমি নিতে চাই না, চাইলেও পারব না। এখন তা বুঝি, সম্পূর্ণ বুঝছি। কবে থেকে? এখানে থাকার পর থেকে।

সে আমাদের দিকে পিছন ফিরে চুল্লির তাকে হাতজুটো রাখল। আঙুল দিয়ে সেটা চেপে দু-বাহুর মধ্যে দিয়ে মুখটা রাখল আগুনের দিকে, যেন গরাদের মধ্যে দিয়ে। তার গলা আরো নেমে এল আরো একটানা সুরে।

—এখন আমার একান্ত প্রয়োজন ফ্রান্সকে। কিন্তু সে যে অনেকখানি চাওয়া, আমি চাই তার কাছে আহ্বান। বিদেশী হয়ে এখানে থাকা, ভ্রমণকারী বা বিজেতা হয়ে আসা, সে কিছুই নয়। ফ্রান্সের দাক্ষিণ্য তাতে রুদ্ধ হয়ে যায়, কারণ জোর করে তার কাছে কিছুই পাওয়া যায় না। তার ঐশ্বর্য, তার সত্যকার ঐশ্বর্য যা, সে জয় করে পাওয়া যায় না, সে শুধু তার বুকে শিশুর মতো

পান করে পাবার। ফ্রান্সের তাই মায়ের মতো বুক খুলে দিতে হবে, মায়ের ভালোবাসায়···জানি আমি তার জন্য কতোটা নির্ভর করে আমাদের উপরে··· কিন্তু তার উপরেও নির্ভর করে অনেকটা। আমাদের তৃষ্ণার ব্যথা তাকেও বুঝতে হবে, এ পিপাসা মেটাবার করুণা জাগাতে হবে তার হৃদয়ে, রাজি হতে হবে আমাদের মিলনে।

সে দাঁড়িয়ে উঠল, আমাদের দিকে পিছন ফিরেই, পাথরে তখনো হাত চেপে। একটু গলা তুলে সে বললে, আর আমি, আমাকে এখানে থাকতে হবে দীর্ঘকাল। এই রকম কোনো বাড়িতে, এই গ্রামের মতো কোনো গ্রামের বাসিন্দার মতো···নিশ্চয়ই আমি··· ?

সে থেমে গেল। আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়াল, হাসি তার ওষ্ঠাধরে, চোখে নয়, চোখ ফেরানো আমার ভাইঝির দিকে।

বললে, সব বাধাই আমারা কাটিয়ে উঠব। আন্তরিকতার জোরে সব বাধাই কাটবে।

—আপনাদের একান্ত শুভরাত্রি জানাই।

এখন আমার সব কথা মনে নেই, কিন্তু শতাধিক শীতের সন্ধ্যা ধরে যেসব আলাপ শুনেছি, তার সবেরই মূল ধুয়া ছিল একটি ; সে তার ফ্রান্স আবিষ্কারের গৌরচন্দ্রিকা : সে কেমন কাছের থেকে চেনার আগে দূর থেকে ভালোবেসেছিল আর কিভাবে সেখানে থাকবার সৌভাগ্য হবার পর থেকে প্রতিদিন সে প্রেম বিকশিত হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, এর জন্য আমার মনে তার প্রতি সম্ভ্রম জেগে ছিল। হ্যাঁ তাই, কারণ সে কিছুতেই হার মানে নি ; আর সে কখনও মেজাজ খারাপ করে আমাদের এই অমোঘ নীরবতা টলাবার চেষ্টা করে নি।···বরঞ্চ সময়ে সময়ে যখন সে মৌনটাকে সারা ঘর ছেয়ে যেতে দিত, ভারী দম বন্ধ করা গ্যাসের মতো, তখন মনে হত তারই স্বস্তি যেন সব চেয়ে বেশি। তখন সে আমার ভাইঝির দিকে তাকাত, চোখে তার সমর্থনের ভাব, একই সঙ্গে গম্ভীর আর হাস্যস্মিত, সেই প্রথম দিন থেকে একই ভাব ; আর আমার অনুভব হত আমার ভাইঝির মন তারই স্বরচিত কারাগারে বুঝিবা জেগে উঠছে। এটা লক্ষ্য করতুম কয়েকটি লক্ষণে, যার মধ্যে সবচেয়ে সামান্য হচ্ছে তার আঙুলগুলির অস্পষ্ট চাঞ্চল্য। তাই যখন শেষটা ভেরনের ফন এব্রেনাক তার একটানা কণ্ঠস্বরের রকমে স্তব্ধতাটাকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে মিলিয়ে দিত,

তখন সে রুদ্ধশ্বাস আমাকে যেন দিত মুক্তি।

প্রায়ই সে নিজের বিষয়ে বলত, আমার বাড়ি এক বনের মধ্যে ; সেখানেই আমার জন্ম ; বনের ওপারে গাঁয়ের পাঠশালায় যেতুম ; পরীক্ষার জন্যে ম্যুনিখ যাবার আগে কখনো বাড়ি ছেড়ে বেরোই নি, তারপরে যাই সাল্‌ৎস্‌বুর্গে সঙ্গীতের জন্যে। তারপর থেকে সেখানেই থেকেছি বরাবর। বড় বড় শহর আমার ভালো লাগে না। লণ্ডন ভিয়েনা রোম ওয়রশ জানা জায়গা, আর অন্য সব জর্মান শহরগুলোও, কিন্তু কোথাও আমার বসবাস করবার ইচ্ছা হয় নি। একটি মাত্র যে শহর আমার ভালো লেগেছিল, সে প্রাগ ; আর কোনো শহরে ও প্রাণ নেই। সবার উপরে অবশ্য নূরেমবের্গ। জর্মানের পক্ষে ঐ এক শহর বটে, বুক ফুলে ওঠে যেখানে, প্রতিটি পাথরে যেখানে স্মৃতির ঐশ্বর্য, সেকালের জর্মানির গৌরব যাঁদের সৃষ্টি, তাঁদের জন্য স্মরণীয়। আমার মনে হয় ফরাসীদের নিশ্চয়ই এই ভাব জাগে শার্ত্রের কাথিড্রালের বিষয়ে। সেখানে তারাও নিশ্চয়ই আশেপাশে পূর্বপুরুষদের অস্তিত্ব অনুভব করে, তাঁদের মানসের সৌন্দর্য উপলব্ধি করে, তাঁদের নিষ্ঠার মহত্ত্ব তাঁদের ধরনধারণের সুষমা। ভাগ্যের ফেরে শার্ত্রে গেলুম। আহা! সত্যিই যখন পাকা ফসলের উপর দিয়ে দূরে নীল স্বচ্ছ হাওয়ার মতো সুকুমার শার্ত্র চোখে পড়ে, তখন কি আবেগ জাগে। কল্পনা করলুম সেই সব তীর্থযাত্রীর আবেগ, যারা সেকালে কেউ পায়ে কেউ ঘোড়ায় কেউ বা গাড়ি চেপে আসত। তাদের মনোভাব আমিও উপলব্ধি করলুম, ভালোবাসলুম তাদের। ইচ্ছা হয় তাদের ভাই হতুম যদি!

তার মুখ কঠিন হয়ে এল, নিশ্চয়ই এটা সাঁজোয়া গাড়িতে যে শার্ত্রে আসে, তার বিষয়ে বিশ্বাস করা শক্ত, কিন্তু তবু এ সত্য। জর্মানদের মনে, সেরা জর্মানদের মনেও, এতো মিশ্র আবেগ একই সঙ্গে জাগছে, যে, সব আবেগ থেকে মুক্তি পেলে তারা বাঁচে।

সে আবার হাসল, অস্পষ্ট একটা স্মিত হাসি ধীরে ধীরে আভা ছড়াল তার মুখে। তারপরে সে বললে, আমাদের বাড়ির সবচেয়ে কাছে যে বাড়িটা, সেখানে একটি মেয়ে থাকে। ভারি সুন্দর আর মিষ্টি মেয়ে। অন্তত আমার বাবা খুশী হতেন যদি আমি তাকে বিয়ে করতুম। তাঁর মৃত্যুর সময়ে তো আমরা একরকম বাগদত্ত ছিলুম বললেই হয়, আমাদের দু-জনকে নিরিবিলিতে বেড়াতে যেতে দিত সবাই।

আমার ভাইঝির সুতা কেটে গেল, লোকটি অপেক্ষা করল যতক্ষণ না আবার সে সুতা পরাল। নিবিষ্ট মনোযোগে শেষ অবধি সুতা পরানো হল, ছুঁচের মুখটা ছিল বেজায় ছোট।

তারপরে লোকটি আবার বলে চলল, একদিন আমরা বনের মধ্যে গিয়েছিলুম। আমাদের সামনে খরগোশ আর কাঠবেরালি ছুটোছুটি করছিল। নানারকম ফুল ছিল চারদিকে। নারসিস, বুনো হায়াসিনথ, আর এমারিলিস। মেয়েটি খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল। বললে, 'আমি কী খুশী ভেরনের, ঈশ্বরের এই সব দান কী ভালো লাগে, কী ভালোই বাসি।' আমারও নিজেকে সুখী মনে হচ্ছিল। ব্রাকেনের মধ্যে শৈবালের উপরে আমরা শুয়ে ছিলুম, কারো মুখে কথা নেই। মাথার উপরে দেখছিলুম ফার গাছের চূড়া মৃদু মৃদু দুলছে আর সব পাখি ডাল থেকে ডালে উড়ছে। হঠাৎ সে চীৎকার করে উঠল, 'ওঃ চিবুকে কামড়াল নোঙরা একটা কোথাকার খুদে জানোয়ার, জঘন্য মশা একটা।' তারপর দেখি সে খপ করে হাতে কি ধরলে, বললে, 'ধরেছি একটা ভেরনের। ছাখো ছাখো কিরকম সাজা দিই ওটাকে ; এই—দিলুম—একটা টান—ওর—পায়ে—এই—একটা—এই আরেকটা'·· দিলেও সে তাই।

ফন এব্রেনাক বলে চলল, সৌভাগ্যবশত, তার প্রার্থী ছিল অনেক। আমার কিছু মনস্তাপ হয় নি, কিন্তু সেই থেকে জর্মান মেয়েদের ব্যাপারে আমি ভয়ে ভয়ে সরে থাকি।

নিজের হাতের পাটায় সে তাকাল চিন্তিতভাবে এবং বললে, আমাদের রাষ্ট্রনেতারাও ঠিক ঐ রকম। তাই আমি কখনো তাদের দলে ভিড়তে চাই নি। যদিচ আমার বন্ধুবান্ধবেরা লিখত যোগদান করতে। না, তার চেয়ে বরং ঘরে বসে থাকা ভালো। আমার সঙ্গীত-সাফল্যের দিক থেকে তাতে অসুবিধাই ছিল, কিন্তু সেটা গৌণ কথা ; সাফল্যলাভের চেয়ে বিবেকের শান্তি বড়ো জিনিস। আর এটা আমি খুব ভালোই জানি যে আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে, আমাদের ফুয়েরেরের মাথায় অনেক সব বিরাট মহৎ ভাবনা চিন্তা আছে বটে, কিন্তু এও জানি তারা এক-এক করে মশার পা টেনে টেনে ছেঁড়ে। জর্মানরা নিঃসঙ্গ হলেই এ ব্যাপারটা ঘটে : এটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আর ক্ষমতা হাতে পেলে ঐ পার্টির লোকেদের চেয়ে কে আরো নিঃসঙ্গ অসহায় বলো ?

—সুখের বিষয়, এখন আর তারা নিঃসঙ্গ নয় : তারা এখন ফ্রান্সে। ফ্রান্সে তাদের আরোগ্য, আপনাদের একটা সত্যকথা বলছি ; তারাও এটা বোঝে।

তারা বোঝে যে ফ্রান্স তাদের শেখাবে সত্যকার মহত্ত্ব ও হৃদয়ের শুদ্ধতা।

সে দরজার কাছে গিয়ে, যেন স্বগতোক্তিতে কথাগুলো প্রায় গলায় চেপে বললে, কিন্তু তার জন্যে আমাদের প্রয়োজন প্রেমের।

মুহূর্তেক দরজাটা খোলা রেখে, কাঁধের উপর দিয়ে সে তাকাল সেলাই-নত আমার ভাইঝির ঘাড়ের দিকে, যেখানে গাঢ় মেহগনি পাকে পাকে কেশগুচ্ছ উঠেছে পাণ্ডুর তনু গ্রীবার পিছন দিকে। তারপরে শান্ত দৃঢ় স্বরে বললে, যে প্রেমের প্রতিদান আছে।

তারপরে সে মুখ ফিরিয়ে নিলে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল, যেই সে দ্রুতভাবে তার সন্ধ্যার বুলি বললে, আপনাদের একান্ত শুভরাত্রি কামনা করি।

* * *

অবশেষে এল বসন্তের দীর্ঘ দিনগুলি। সুবাদারটি তখন সূর্যাস্তের রশ্মিপাতের সঙ্গে নেমে আসত। তার পরনে থাকত সেই ধূসর ফ্লানেলের ট্রাউসরস, তবে, কাঁধে চড়াত একটা হাল্কা পশমী জ্যাকেট, রঙটা মোটা ঘরের কাজের রঙ, গলাখোলা একটা লিনেন শার্টের উপরে। একদিন সে একটা বই নিয়ে নেমে এল, পাতার মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে, তার মুখ উজ্জ্বল একটা অর্ধস্ফুট হাসিতে, যে হাসি আমরা অন্যকে আনন্দ দেব ভাবলে পূর্বাভাসের মতো আসে। সে বললে, আপনাদের জন্যে এটা আনলুম, ম্যাকবেথের একটা পাতা। হে ঈশ্বর! কি বিরাট প্রতিভা।

বইটা সে খুললে।

—এটা আছে শেষটায়। ম্যাকবেথের ক্ষমতা মুঠি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে অনুচরদের আনুগত্য, তারা এবার বুঝছে ম্যাকবেথের উচ্চাশার কালিমা, সম্ভ্রান্ত সামন্তবর্গ, যারা স্কটলণ্ডের মানরক্ষায় ব্যস্ত, তারা অপেক্ষা করছে ম্যাকবেথের আসন্ন পতনের। তাদের একজন বর্ণনা করছে সে পতনের সব নাটকীয় লক্ষণ···

সে আস্তে আস্তে পড়তে লাগল, করুণ একটা ভারী গলায়:

'···এখন সে মনে মনে ভাবে
গুপ্ত তার হত্যাগুলি জড়ায়ে রয়েছে দুই হাতে;
এখন বিদ্রোহ নিত্য ধিক্কারিছে হারামী যে তার;
যাদের শাসক, তারা চলে শুধু কঠিন শাসনে,
আনুগত্যে নয়; এখন সে মনে মনে ভাবে তার

কাঁধে রাজ্য ঢিলা ঝোলে, যেন এক দৈত্যের পোশাক
ছেয়ে আছে খর্বকায় চোরের শরীরে।'

মাথা তুলে সে হেসে উঠল। বিমূঢ়ভাবে আমি ভাবলুম, সেও কি আমি যে অত্যাচারী দুঃশাসনের কথা ভাবছি, তারই কথা ভাবছে? কিন্তু সে বললে, এরই জন্যে কি তোমাদের এডমিরালের রাতে ঘুম নেই। ও লোকটি তোমাদেরই মতো আমার মনেও অবজ্ঞা জাগায়, তা সত্ত্বেও লোকটির জন্যে করুণা বোধ করি।

'যাদের শাসক, তারা চলে শুধু কঠিন শাসনে,
আনুগত্যে নয়...'

—জনসাধারণের প্রীতি যে নেতা পায় না, সে বেচারা নেহাৎ কলের পুতুল। তবে ..তবে, এ ছাড়া কিই বা আশা করা যায়? এ আসন ঐ রকম দুরারোগ্য সাফল্যবাদী লোক ছাড়া কেই বা পূর্ণ করতে চাইত? এও ঠিক যে এটারও প্রয়োজন ছিল, হ্যাঁ প্রয়োজন ছিল এমন কোনো লোক যে স্বদেশকেই বেচে দেবে, কারণ আজ—আজ এবং দীর্ঘ ভবিষ্যতেও—ফ্রান্স নিজের কাছেই আত্মসম্মান না খুইয়ে স্বেচ্ছায় আমাদের মুক্তবাহুতে আত্মদান করতে পারে না। অনেক সময়ে দেখা যায় অতি জঘন্য ঘটকালিতে অতিসুখী বিবাহিত জীবনের সূত্রপাত। অবশ্য ঘটকটি তা সত্ত্বেও অবজ্ঞার পাত্র, তাতে বিবাহটির সুখে কিন্তু টান পড়ে না—

ফট করে সে বইটা মুড়ে ফেললে, কোটের পকেটে পুরে হাতের চেটো দিয়ে দু-বার অভ্যাসবশে থাবড়াল। তারপর দীর্ঘ মুখ খুশির ছটায় উদ্ভাসিত করে বললে, আমার আতিথ্যকর্ত্তাদের জানাচ্ছি যে দু-সপ্তাটাক আমি থাকব না। ভারী খুশি লাগছে প্যারিস যেতে। এবারে আমার ছুটির পালা এবং এই প্রথম প্যারিসে ছুটি কাটাব। এটা আমার পক্ষে একটা স্মরণীয় দিন। সবচেয়ে স্মরণীয় বলতে পারি, যতদিন না সেই দিন আসে, মনপ্রাণ দিয়ে যেই দিন চাই, মহত্তর সেই দিন। দরকার হয় তো আমি বছরের পর বছর প্রতীক্ষা করতেও জানি। আমার হৃদয় জানে ধৈর্য কি করে ধরতে হয়।

—প্যারিসে আমার খুব সম্ভবত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখাশোনা হবে, তাদের অনেকে ওখানে এসেছে তোমাদের রাষ্ট্রপতিদের সঙ্গে সব কথাবার্তা চালাতে, আমাদের দুই দেশের সেই আশ্চর্য মিলনের জন্যে। তাই এক হিসাবে বলা যায় যে এ বিবাহে আমিও এক সাক্ষী...আমি বলতে চাই যে ফ্রান্সের জন্যে আমি সুখী বোধ করছি, তার ক্ষত সারবে দ্রুত, কিন্তু জর্মানির জন্যে, আমার

নিজের জন্যে সুখী আমি আরও বেশি। ফ্রান্সকে তার মহত্ত্ব, তার স্বাধীনতা ফিরিয়ে জর্মানির যা লাভ—সৎকাজে এতো লাভ আর কার হতে পারে।

—আপনার একান্ত শুভরাত্রি কামনা করি।

সে ফিরে আসার পর তাকে দেখতে পাই নি। আমরা জানতুম যে সে রয়েছে; বাড়িতে অতিথি থাকলে, সে অদৃশ্য হলেও অস্তিত্বের নানা লক্ষণ বোঝা যায়। কিন্তু বেশ কয়েকদিন—এক সপ্তারও বেশি, তার দেখা পাওয়া গেল না।

কথাটা স্বীকার করব? তার উপস্থিতির অভাবে আমার মনে শান্তি ছিল না। তার কথা মনে হত, জানি না কতটা অভাববোধে বা উদ্বেগে। আমি বা আমার ভাইঝি কখনো তার নাম করি নি নিজেদের মধ্যে। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় মধ্যে মধ্যে যখন শোনা যেত উপরতলায় তার অসম পদক্ষেপের চাপা প্রতিধ্বনি তখন আমার ভাইঝি যে হঠাৎ গোঁ ধরে কাজে মন দিত, তার থেকে এবং তার মুখে অস্পষ্ট রেখায় যে কঠিন অথচ প্রতীক্ষমান একটা ভাব আসত, তার থেকে বুঝতুম যে চিন্তা থেকে আমার মতো সেও মুক্ত নয়।

একদিন আমায় কমাণ্ডাটুর-এর কাছে যেতে হল টায়ার বিষয়ে এক ব্যাপারে। তারা একটা ফর্ম দিলে, আমি যখন সেটা ভর্তি করছি, সে সময় ভেরনের ফন এব্রেনাক তার অফিস থেকে বেরিয়ে এল। প্রথমটা সে আমায় দেখতে পায় নি, দেয়ালের লম্বা আয়নার সামনে একটা ছোট টেবিলে এক সার্জেন্ট বসেছিল, তাকে কি বললে। তার বর্ণহীন গলার সেই টানা টানা স্বর কানে এল আর জানি না কেন, বিনা কাজেই আমি খানিক বসে রইলুম, অদ্ভুত মনোভাবে যেন অভূতপূর্ব চূড়ান্ত একটা কিছুর অপেক্ষায়। আরশিতে তার মুখ দেখতে পেলুম, পাণ্ডুর ক্লান্ত লাগল। সে চোখ তুললে চোখাচোখি হল আমার সঙ্গে। দু-সেকেণ্ড পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলুম, তারপরে হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়াল মুখোমুখি। ওষ্ঠাধর একটু খুলে গেল, ধীরে সে হাতটা একটু ওঠাল, আবার তক্ষুনি নামাল। প্রায় বোঝা যায় না, এমনি ভাবে সে মাথাটা নাড়ল একটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে। যেন সে নিজেকেই না বলছে, কিন্তু তার চোখ সেই আমার মুখে। তারপরে তার চোখ নেমে গেল মাটিতে, একবার ঈষৎ মাথা নত করে খুঁড়িয়ে সে অফিসে ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমার ভাইঝিকে এ বিষয়ে কিছু আর আমি বলি নি, কিন্তু মেয়েদের বোধ-

হয় বিড়ালের মতো দিব্যদৃষ্টি থাকে; সারা সন্ধ্যা সেদিন সে কেবল কাজ থেকে চোখ তুলে তাকাতে লাগল আমার দিকে, আমার মুখে যেন কিছু পড়ে দেখছে। আমি এদিকে মুখটা করছি প্রাণপণে ভাবহীন, পাইপ টেনে টেনে। শেষটায়, যেন ক্লান্ত হয়ে সে হাতদুটি নামিয়ে দিলে, জিনিসপত্র মুড়ে জিজ্ঞাসা করলে যে সে সকাল সকাল শুতে যেতে পারে কিনা। কপালে একবার দুটো আঙুল বুলোল, যেন মাথা ধরেছে, তারপর সে শুভরাত্রি জ্ঞাপনে চুমো দিলে আর আমার মনে হল যেন তার সুন্দর ধূসর চোখে ভর্ৎসনার আভাস, একটা কিরকম বেদনার ভার। সে উঠে যাওয়ার পরে আমার একটা হাস্যকর রাগ হল, নিজের হাস্যকরতারই উপরে রাগ আর হাস্যকর এক ভাইঝির জন্য রাগ। এই সব নির্বোধ ব্যাপারের অর্থ কি? কিন্তু নিজের মনেও কোনও জবাব পেলুমনা। নির্বুদ্ধিতাই যদি হয়, তাহলে বলতে হবে তার উৎস অনেক গভীরে।

তিনদিন পরে, তখন আমরা সবে কফি শেষ করছি, কানে এল সেই চেনা অসমান পদক্ষেপের মাত্রা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে এবং এবারে আমাদেরই দিকে আসছে। হঠাৎ মনে পড়ল ছ-মাস আগের সেই সন্ধ্যা যখন প্রথম এই পদক্ষেপ শুনি। ভাবলুম, আর আজও সেই বৃষ্টি পড়েছে। সেদিন সারা সকাল বৃষ্টি হয়েছিল, একটা টানা বর্ষণের গোঁ, যাতে বাইরে সব ডুবে যাচ্ছিল আর বাড়ির ভিতরটা শীতল ঘন আবহাওয়ায় সদ্যস্নাত লাগছিল। আমার ভাইঝি কাঁধ ঢেকেছে এক ছাপা রেশমী রুমালে, তাতে জাঁ ককতোর আঁকা দশটি অস্থির আঙুল পরস্পরের দিকে অবশভাবে ন্যস্ত। আমি আমার পাইপের বাটিটায় হাত গরম করছিলুম—অথচ মাসটা জুলাই!

পদধ্বনিটা সিঁড়ির মোড়টা পার হয়ে ধাপে ধাপে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে নামতে লাগল। মন্থর গতিতে লোকটি নামছিল, ক্রমশ মন্থরতর, দ্বিধায় নয়, যেন তার ইচ্ছাশক্তিতে টান পড়ছিল চরমভাবে। আমার ভাইঝি মাথা তুলে আমার দিকে তাকাল; সমস্তক্ষণ ধরে তার চোখ স্থির রইল আমার উপরে, শিংওলা পেঁচার স্বচ্ছ অমানুষিক দৃষ্টিতে। আর যখন সিঁড়ির শেষ ধাপের আওয়াজ এল আর তারপরে দীর্ঘ এক নিস্তব্ধতা, দেখি তার মুখভাবের কাঠিন্য চলে গেছে, চোখের পাতা তার ভারী হয়ে এল, মাথাটা পড়ল নুয়ে এবং সারা শরীর ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়ল আরামকেদারায়।

নিস্তব্ধতাটুকু কয়েক সেকেণ্ডের বেশি নিশ্চয়ই ছিল না, কিন্তু মনে হল যেন

দীর্ঘকাল। বোধ হল যেন লোকটিকে দরজার ওপাশে দেখতে পেলুম, দরজায় টোকা দেবার জন্য তর্জনী উদ্যত তবু রুদ্ধ, যেন টোকা দিলেই যা কিছু তারপরে ঘটবে, সে মুহূর্তটা পিছিয়ে দিতে চায়।…শেষটা দরজায় আঙুল টোকা দিলে। দ্বিধান্বিত কারো মৃদু টোকা সে নয়, স্নায়ুবিচলিত প্রখর টোকাও সে নয়; তিনবার পুরো ধীর টোকা এল, শান্ত নিশ্চিত করাঘাত, যার সংকল্পে আর প্রত্যাবর্তন নেই। আগের মতো, আমি ভাবলুম যে দরজা তৎক্ষণাৎ খুলে যাবে, কিন্তু খুলল না। আমার মনে একটা প্রবল আলোড়ন হল, নানা প্রশ্নের জগাখিচুড়ি, নানা বিরুদ্ধ ভাবাবেগের দ্বন্দ্ব। সে সব এলোমেলো চিন্তা প্রতি মুহূর্তে আরো গোলমাল পাকাতে লাগল আর মুহূর্তগুলিকেও মনে হল জলপ্রপাতের মতো বেড়েই চলেছে। জবাব দেওয়া উচিত কি? হঠাৎ এই পরিবর্তন কেন? আজই বা সে কেন আশা করল যে আমাদের মৌন আমরা ভাঙব. সে নিজেই তো তার ব্যবহারে এতদিন ধরে এই সুস্থ মৌনব্রতকে তারিফ জানিয়েছে। আজই হঠাৎ এই সন্ধ্যায় সে কি দাবি জানাল আমাদের আত্মমর্যাদার উপরে?

আমার ভাইঝির দিকে তাকালুম যদি তার চোখে কোনো মহড়া, কোনো নির্দেশ পাই। কিন্তু তার মুখের পাশদিক শুধু চোখে পড়ল। সে তখন লক্ষ্য করছে দরজার হাতলটা. সেই অমানুষিক পেচকদৃষ্টিতে স্থিরলক্ষ্য চোখ। বেজায় পাণ্ডুর দেখাচ্ছিল তাকে, দেখলুম তার উপর-ঠোঁট সাদা সুকুমার দাঁতের রেখার উপরে যন্ত্রণায় সংকুচিত। এই হঠাৎ আবিষ্কৃত অন্তর্মুখ নাট্যে, যার তীব্রতার সঙ্গে আমার দ্বিধার সামান্য দ্বন্দ্বের কোনো তুলনাই হয় না, এ নাট্যের মুখোমুখি হয়ে আমি একেবারে অবশ হয়ে গেলুম। ঠিক সেই সময় আবার দু-বার করাঘাত হল, শুধু দু-বার, দুটি দ্রুত কোমল টোকা।

—ও এবার চলে যাবে, আমার ভাইঝি বললে, এতো নিচু গলায় আর এতো করুণ সুরে যে আমি আর থাকতে না পেরে বেশ জোরে বললুম, আসুন, মঁসিয়।

কেন আমি ঐ 'মঁসিয়' জুড়লুম! সেকি এই তাকে জানাতে যে তাকে মানুষ হিসাবেই আসতে বলেছি, শত্রুসৈন্যের অফিসর বলে নয়? নাকি, উল্টোভাবে, এই কথা জানাতে যে আমি বুঝেছি কে করাঘাত করেছে এবং কথাদুটো তাকেই সম্বোধন? জানি না, আর তাতে কিছু আসে যায় না। দাঁড়াল এই যে আমি বললুম, 'আসুন, মঁসিয়' আর সে ঢুকে এল।

আমি ভেবেছিলুম তাকে সাধারণ শহুরে পোশাকেই দেখব, কিন্তু তার পরনে

জঙ্গীসাজ। সে বর্ণনা যথেষ্ট হল না, আমি বলব যে সে চূড়ান্ত রকম জঙ্গীসাজে এল—যদি তাতে স্পষ্ট হয় আমার ধারণাটা যে সে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্যে স্বেচ্ছায় এই সাজ চড়িয়েছিল। সে দরজাটা দেয়াল অবধি ঠেলে দিলে, চৌকাঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল, এতো ঋজু ও কঠিন যে আমার সন্দেহ হল এ সেই লোকই আমার সামনে কিনা, আর সেই প্রথম নজরে পড়ল অভিনেতা লুই জুভে-র সঙ্গে তার কি আশ্চর্য সাদৃশ্য। কয়েক সেকেণ্ড সে ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে রইল, কঠিন ঋজু আর নির্বাক, পাদুটো একটু ফাঁক করে; দু-পাশে দু-বাহু শিথিল, আর তার মুখ এতো শীতল ও এতো নিষ্ক্রিয় যে মনে হল তাতে কোনো আবেগের দাগও থাকতে পারে না।

বসেই ছিলুম তো আরামকেদারাটায় তলিয়ে আর আমার মুখের সামনে ছিল তার বাঁ হাতটা, তাই আমার চোখ গেল সেই হাতে; যেন সেই হাতে লেগে রইল, অনেকক্ষণ রইল, যেন বাঁধা। কারণ সে হাতের যে ভাবটা তাতে লোকটির সারা শরীরের ভঙ্গীটা মিথ্যা হয়ে গেল।···

সেইদিন আমি বুঝলুম যে দেখতে শিখলে হাতের মধ্যে দিয়ে মুখের মতোই স্পষ্ট বোঝা যায় মনের আবেগ—মুখের মতোই বা মুখের চেয়ে ভালো—কারণ হাতদুটোতে ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ আরো কম। দেখলুম হাতের আঙুল কটা খুলছে, মুড়ছে, পাকাচ্ছে, টানছে তীব্র একটা অনাবৃত ভাব প্রকাশে অথচ তার মুখ আর সারা শরীর নিশ্চল, সংযমে কঠিন।

তারপরে তার চোখে যেন প্রাণ ফিরে এল। দৃষ্টিটা একবার আমার উপরে পড়ল, মনে হল যেন একটা বাজপাখি আমায় তাগ করল—কঠিন দুই উন্মুক্ত চোখের পাতার মধ্যে জ্বলজ্বলে চোখ, কঠিন অথচ অনিদ্রারোগীর শুকনো চোখের পাতার মধ্যে। তারপরে চোখদুটি পড়ল আমার ভাইঝির মুখে—এবং সেখানেই রইল।

অবশেষে তার হাতটা স্থির হয়ে এল, আঙুলগুলো বেঁকে মুষ্টিতে বদ্ধ হয়ে গেল। তারপরে তার মুখ খুলল আর ঠোঁটের ফাঁকে একটা আওয়াজ বেরোল যেন খালি বোতলের ছিপি খুলল কেউ, তারপরে অফিসরটি একেবারে নিষ্প্রভ গলায় বললে, আপনাদের গুরুতর একটা কথা বলতে হবে আমাকে।

আমার ভাইঝির মুখ ছিল তার দিকে কিন্তু সে মাথা নামাল। সে আঙুলে গুলিটা থেকে পশম পাকাতে লাগল, গোলাটা কার্পেটে পড়ে গড়াতে লাগল—একমাত্র একটা হাস্যকর কাজ যেটা মনোযোগ বিনা করা সম্ভব আর যাতে

তার অস্বস্তিটাও ঢাকা পড়ে।

অফিসরটি বলে চলল—সুস্পষ্টভাবে একটা আপ্রাণ প্রয়াস করে, যা কিছু বলেছি এই ছ-মাস ধরে যা কিছু এই চারটে দেয়াল শুনেছে···

হাঁপানিরোগীর মতো কষ্টে সে দীর্ঘ নিশ্বাস টানল, মুহূর্তেক ফুসফুস রাখল ভরে, আপনারা অতি অবশ্যই···

···শ্বাস ফেলে আবার বললে, আপনারা অতি অবশ্যই সব ভুলে যাবেন।

আমার ভাইঝির হাতদুটি ধীরে ধীরে ঘাগরার গর্তে নেমে এল আর বালিতে আটকানো নৌকোর মতো অসহায়ভাবে এলিয়ে থাকল। আস্তে আস্তে সে মাথা তুলল এবং তারপরে সেই প্রথম—একেবারে প্রথম—সে অফিসরটির দিকে তার পাণ্ডুর চোখের পূর্ণ দৃষ্টি ফেরাল।

প্রায় শুনতে পেলুম না এমনি অস্ফুটকণ্ঠে লোকটি বললে, আহা, ভেল্‌থ আয়ন লিখট।

এ কি আলো! আর যেন সে আলো সইতে পারছে না, তাই কব্জির আড়ালে চোখ ঢাকল। দু-সেকেণ্ড কেটে গেল, তারপরে সে হাত নামাল কিন্তু চোখের পাতা নামিয়ে। এবারে তারই পালা এল মাটিতে চোখ নামিয়ে রাখার।···

তার ঠোঁটের মধ্যে দিয়ে আগের মতো একটা আওয়াজ বেরোল, তারপরে অপরিসীম ক্লান্ত গলায় বললে, দেখে এলুম ওদের—বিজয়ী বীরদের।

তারপর কয়েক সেকেণ্ড থেমে আরো নিচু গলায় বললে, ওদের সঙ্গে কথাবার্তাও হল।

শেষে চুপিচুপি, ধীরে ধীরে তিক্ত স্বরে, ওরা আমায় নিয়ে হাসাহাসি করল।

আমার দিকে চোখ তুলে সে গম্ভীরভাবে, প্রায় বোঝা যায় না এমনিভাবে তিনবার মাথা নাড়ল। চোখ বুজে তারপরে বললে, ওরা আমাকে বললে, 'তুমি কি এটা বোঝো না যে আমরা ত এদের বাগিয়ে আনছি?' আমরা ওদের ঠকাচ্ছি, তারা এই বললে, ঠিক ঐ কথা। 'ভির প্রেলেন সী।' ওরা আমায় বললে, 'তুমি কি ভাবো আমরা এতই বোকা যে আবার আমাদের সীমান্তে ফ্রান্সকে মাথা তুলতে দেব, তাই ভাবো কি?' তারা সব হো হো করে হেসে উঠল, হৈ হৈ করে আমার পিঠ চাপড়ে আমার মুখের দিকে তাকাল, 'আমরা সঙ্গীতকার নই তো!'

শেষ কথা কটা বলবার সময়ে তার গলায় এসে গেল গূঢ় অবজ্ঞা যেটা হয়তো সহচরদের প্রতি তারই মনোভাবের প্রতিফলন বা হয়তো সেটা তাদেরই কথার সুরের প্রতিধ্বনি।

—তারপরে আমি তাদের অনেক কথাই বললুম, প্রায় এক দীর্ঘ আবেগের বক্তৃতা। তারা বলতে লাগল, 'আরে! আরে!' তারা আমায় উত্তর দিলে এই বলে, 'রাজনীতি তো কবির স্বপ্ন নয় হে। কি জন্যে আমরা যুদ্ধে নামলুম বলো দেখি? ওদের বৃদ্ধ মার্শালের জন্যে নাকি?' আবার তারা হেসে উঠল, 'আমরা পাগলও নই, বোকাও নই: ফ্রান্সকে ধ্বংস করবার এই আমাদের সুযোগ আর তাকে ধ্বংস আমরা করবই। শুধু তার পার্থিব শক্তি নয়, তার আত্মাও। বিশেষ করে তার আত্মা। তার ঐ মনই তো সবচেয়ে বিপজ্জনক। বর্তমানে এই আমাদের কাজ, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ থেক ভায়া। আমরা হাসিমুখ দিয়ে আর ধৈর্য দিয়ে ফ্রান্সে পচন ধরিয়ে দেব। পা-চাটা নেড়ি কুকুর করে দেব।'

সে চুপ করল। মনে হল তার দম ফুরিয়ে গেছে। এমন জোরে দাঁতে দাঁত চেপে ধরল যে তার গালের হাড় দাঁড়িয়ে উঠল আর রগের নিচে একটা শুঁয়োপোকার মতো মোটা আর বাঁকা শিরা দপ দপ করতে লাগল। হঠাৎ তার মুখের সবটা চামড়া একটা মাটিচাপা কাঁপনে কেঁপে উঠল—যেন দমকা হাওয়ায় দীঘির জল বা ফুটন্ত দুধের উপর যখন প্রথম সর পড়ে, সেই বুদ্বুদের মতো। তার চোখ পড়ল আমার ভাইঝির পাণ্ডুর উন্মীলিত চোখে এবং চাপা গলায়—নিচু ও আবেগে চাপা, কথার পক্ষে অত্যধিক ভারী গলায়—সে বললে, কোনো আশা নেই।

তারপরে আরো নিচু, আরো দ্বিধান্বিত এবং বর্ণহীন গলায়, যেন নিজেকে ঐ অসহনীয় কিন্তু প্রকৃত তথ্যে যন্ত্রণা দেবার জন্যে বললে, আশা নেই। কোনো আশা নেই—

তারপরে হঠাৎ তার গলা জোরালো উঁচু হয়ে এল এবং আমার আশ্চর্য লাগল যখন শিঙাধ্বনির মতো স্পষ্ট দানাদার গলায় যেন যুদ্ধের বুলির মতো বললে, আশা নেই।

তারপরে—নিস্তব্ধ।

মনে হল যেন তার হাসি শুনলুম। যন্ত্রণাহত তার কপাল কুঞ্চিত পাকানো দড়ির মতো আর ঠোঁটদুটো কাঁপছিল, পীড়িতের বিবর্ণ অথচ জরাভ দুই ঠোঁট।

—ওরা দোষটা চাপাল আমার ঘাড়ে, আমার উপরে প্রায় চটে উঠল, 'এই তোমার অবস্থা ছ্যাখো! ছ্যাখো একবার তোমায় কি রকম নেশায় পেয়েছে ফ্রান্স। ঐখানেই তো আসল বিপদ! কিন্তু আমরা য়ুরোপকে এই ব্যারাম থেকে মুক্তি দেব। এ বিষ আমরা তাড়াব।' ওরা আমায় সব বোঝাল, ওঃ, ওরা আমার বুদ্ধি একেবারে খোলসা করে দিলে। ওরা তোমাদের সাহিত্যিকদের খাতির করছে, অথচ সেই সঙ্গে বেলজিয়মে হলণ্ডে···যে দেশই আমাদের সৈন্যসামন্ত অধিকার করেছে, ওরা গরাদ তুলছে। এবার ফরাসী বই যেখানে সেখানে যাবে না—এক টেকনিকাল বই, রিফ্রাকশনতত্ত্ব বা সিমেণ্ট তৈরির নিদান ছাড়া।··· সাধারণ সংস্কৃতির বইটই, একটিও না। একেবারে নয়।

দিশাহারা রাতপাখির মতো তার দৃষ্টি ঘরের একোণে ওকোণে ঝাপটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আমার মাথার উপর দিয়ে গিয়ে শেষটা যেন আশ্রয় পেল সবচেয়ে অন্ধকার তাকগুলিতে—যেখানে রাসিন, রঁসার, রুশোর স্থান। সেখানে তার দৃষ্টি রইল, আর প্রবল এক আর্তনাদে তার কণ্ঠ চলল, কিছুই না, কিছু না, কেউ নয়!

এবং যেন তখনও আমরা এ শাসানোর গুরুত্ব ঠিক বুঝি নি, তাই বললে, শুধু তোমাদের আধুনিক লেখক নয়! কেবল তোমাদের পেগুই, তোমাদের প্রুস্ত, তোমাদের বের্গসঁ নয়—একেবারে সব! ঐ উপরের সবও! ঝেঁটিয়ে সব! সমস্ত কিছু।

আবার যেন এক মরিয়া আদরে, তার চোখ ঘুরে গেল গোধূলিতে ঈষৎ চকচকে বাঁধাইগুলোয়।

—ওরা সব আলো নিভিয়ে দেবে, সে বলে উঠল, আর কখনো য়ুরোপ প্রদীপ্ত হবে না এই আলোয়।

তার গম্ভীর কাঁপা গলায় আমার মনে প্রতিধ্বনিত হল এক আকস্মিক চীৎকার, একটা ইংরেজি কথা, যার শেষ স্বরটা কান্নায় গিয়ে মেলায়।

'নেভার মোর'—আর কখনো নয়!

আবার নামল মৌন। আবার কি দুর্জ্ঞেয় অসহ্য আততিতে বাঁধা! আমাদের সব অতীত নীরবতার তলায় আমার মনে হত যেন সমুদ্রতলের জীবন চলছে, সব গুপ্ত আবেগের নানা দ্বন্দ্বের নানা বিরুদ্ধ বাসনা-ভাবনার, সামুদ্রিক

জীবদের মতো অগণন, যাদের যুদ্ধ চলে জলের শান্ত আবরণের তলায়। কিন্তু এ মৌনের তলায়! ভয়ানক এক নিপীড়িত বোধ ছাড়া কিছুই নেই। শেষটা এ মৌন তার কণ্ঠস্বরে ভাঙল, কোমল ব্যথিত সে স্বর।

—আমার এক বন্ধু ছিল। প্রায় ভায়ের মতো। একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি। স্টুটগার্টে এক ঘরে দু-জনে থেকেছি। নূরেমবের্গে তিন মাস একসঙ্গে কাটিয়েছি। পরস্পরকে বাদ দিয়ে কেউ কিছু করি নি। আমি তাকে আমার সুর বাজিয়ে শোনাতুম, সে আমাকে শোনাত তার কবিতা। সুকুমার মন ছিল তার রোমান্টিক। তারপরে সে আমায় ছেড়ে গেল। সে গেল ম্যুনিখে তার নতুন বন্ধুদের কাছে তার কবিতা পড়তে। সেই তো আমায় সর্বদা লিখত তাদের কাছে চলে যেতে, তাকেই তো দেখলুম প্যারিসে তার বন্ধুদের মধ্যে। দেখলুম তারা ওর কি অবস্থাটা করেছে!

ধীরে ধীরে সে মাথাটা নাড়ল, যেন তাকে কোনো সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে হচ্ছে।

—সেই দেখি ওদের মধ্যে চরমপন্থী। তার মধ্যে চরম ব্যঙ্গের সঙ্গে রাগ মিশেছে। একবার সে ক্রুদ্ধ চোখে আমার দিকে তাকায় আর চেঁচায় 'এ বিষ! একে এ বিষ থেকে বাঁচাতে হবে!' আবার পরমুহূর্তে পেটে আঙুলের ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে বলে, 'ওরা ভয়ে ঠাণ্ডা মেরে গেছে এখন, হাহা! ওরা এখন ট্যাক সামলাতেই পেট সামলাতেই অস্থির—ব্যবসাবাণিজ্য কি হবে ভেবেই কাবু! ওরা শুধু এ-ই ভাবে! আর ওদের মধ্যে বাকি কটাকে খোসামোদ করে ঘুম পাড়িয়ে ঠিক করে দেব, হাহা! অতি সহজ ব্যাপার!' আমাকে নিয়ে হাসতে হাসতে তার মুখটা লাল হয়ে উঠল। 'এক হাঁড়ি ফ্যান দিয়ে ওদের আত্মা আমরা কিনে নেব।'

দম নিতে ভেরনের একবার থামল।

আমি তাকে বললুম, তুমি কি কিছু বুঝেছ তোমরা কি করছ? এর অর্থ যে কি তা কি ঠিক ধরতে পারছ? সে জবাব দিলে, 'তাতে আমরা ঘাবড়ে যাব ভাবছ নাকি? না হে, আমাদের এ পরিষ্কার মাথা নিয়ে আমরা ঘাবড়াই না!'

—আমি বললুম, তা হলে তোমরা কবরখানা পাকা করবেই? চিরকালের জন্যেই?

—সে জবাব দিলে, 'এ জীবনমরণের ব্যাপার। জয় করবার সময়ে জোর থাকলেই চলে কিন্তু তাতে যা জয় করা হয় তাকে রাখা যায় না। আমরা বেশ ভালো করেই জানি যে আমাদের আধিপত্য রাখতে গেলে সৈন্যসামন্তে কিছু হবে না।'

—আমি বলে উঠলুম, কিন্তু তাই বলে মানুষের মন বিকিয়ে! একি সর্বনেশে দাম!

—সে উত্তর দিলে, 'মানবাত্মা অমর। কতোবার সে এর অগ্নিপরীক্ষা পার হয়ে গেছে। নিজের ছাই থেকে তার পুনরুজ্জীবন। আমাদের একে গড়তে হবে আগামী হাজার বছরের কথা ভেবে: প্রথমে তাই করতে হবে একে ধ্বংস।' আমি তার মুখে তাকালুম। দেখলুম তার পাণ্ডুর চোখের ভিতর অবধি। আন্তরিক কথাই বলছিল সে। সেটাই সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার।

তার চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল, যেন তারা কোনো বীভৎস হত্যার দর্শক, ওরা যা বলছে তাই করবে!

সে চীৎকার করে বললে—যেন আমরা তাকে বিশ্বাস করছি, ওরা তাই করবে, সব ব্যবস্থা করে অক্লান্ত ওরা। আমি জানি ও শয়তানেরা সহজে থামে না।

বেয়াড়া কানতোলা কুকুরের মতো সে মাথা নাড়ল। চাপা দাঁতের মধ্য দিয়ে একটা গুঞ্জন এল, প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের আর্তনাদ।

সে নড়ে চড়ে নি। কঠিন স্থির একভাবে দাঁড়িয়েছিল সে দোরগোড়ায়; দু-বাহু ছড়িয়ে; যেন দুই সীসার হাত বহন করছে; পাণ্ডুর মোমের মতো নয়, জীর্ণ ভঙ্গুর দেয়ালের চুণকামের মতো, ধূসর, সোরার মতো সাদা ছোপ লাগা।

দেখলুম সে আস্তে আস্তে নুইছে, তারপর হাত তুলে এগিয়ে ধরল, চেটো নিচে রেখে আঙুল একটা বাঁকিয়ে, আমার ভাইঝির আর আমার দিকে। মুষ্টিবদ্ধ করল হাতটা, একটু ওঠাল নামাল আর এদিকে তার মুখভাব আঁট হয়ে উঠল এক প্রচণ্ড শক্তিতে। তার ওষ্ঠাধর ফাঁক হয়ে গেল, জানি না সে কি আবেদন করবে, ভাবলুম: ভাবলুম—হ্যাঁ আমি সত্যই ভাবলুম যে সে আমাদের বিদ্রোহে আহ্বান করতে যাচ্ছে। কিন্তু ঠোঁট থেকে একটা কথাও বেরোতে পেল না। মুখ বুজে গেল আর আবার চোখও বুজে গেল। সে খাড়া হয়ে দাঁড়াল; তার

হাতদুটো দুপাশে ওঠাল, মুখ বরাবর উঠতে দুর্বোধ কয়েকটা মুদ্রা করলে যবদ্বীপের নাচের ভঙ্গীতে, কপালের উপর একবার বোলাল, আঙুল ছড়িয়ে চোখের পাতা দুটো চেপে।

—ওরা আমায় বললে, 'এটা আমাদের দাবি আমাদের কর্তব্য।' আমাদের কর্তব্য!…যে লোক এতো সহজে তার কর্তব্যের পথ খুঁজে পায় সে-ই সুখী!

তার হাতদুটো নেমে গেল।

—চৌমাথায় তোমাকে বলা হল, 'ঐ তোমার পথ।' সে ঘাড় নেড়ে বলে চলল, তবে কিনা ও পথ পর্বতশিখরের উত্তুঙ্গ আলোকে নিয়ে যায় না। নিয়ে যায় কোন ভয়াবহ তেপান্তরে, মিলিয়ে যায় কোন নিরানন্দ অরণ্যের বীভৎস অন্ধকারে।…হে ঈশ্বর! আমার কর্তব্যের পথ কোথায়!

সে বললে, প্রায় চীৎকার করে বললে, এ তো সেই যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, লোকায়তে আর লোকোত্তরে।

করুণ একাগ্রতায় সে তার দৃষ্টি রাখল জানলার উপরে কাঠের দেবমূর্তিটির উপরে—আনন্দস্মিত দিব্য শান্তিতে উজ্জ্বল সে দেবদূতটির উপরে।

হঠাৎ তার মুখভাবের কঠিনতা যেন একটু শিথিল হল, শরীরের ঋজুতা কমল, মুখটা একটু মাটির দিকে ঝুঁকে এল। সে মুখটা তুলে অনেকটা স্বাভাবিক ভাবে বললে, আমার ন্যায্য দাবি ছাড়ি নি, দরখাস্ত করেছি কোনো যুদ্ধক্ষেত্রের ফৌজে বদলি হতে চাই। শেষ পর্যন্ত ওরা দরখাস্ত মঞ্জুর করেছে। কালকে চলে যাবার পরোয়ানা পেয়েছি।

মনে হল যেন তার ঠোঁটে হাসির আভাস দেখলুম, যখন সে টীকা যোগ দিয়ে বললে, নরকে যাবার।

সে পূবের দিকে হাত তুলল, বিরাট সব মাঠের দিকে, য়ুক্রেনে…যেখানে ভাবীকালের ফসল ফলবে অগণন শবদেহের উপরে।

আমার ভাইঝির মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলুম, চাঁদের মতো বিবর্ণ সে মুখ। ঠোঁটদুটি একেবারে খোলা, ওপাল ফুলদানির মুখের মতো, প্রায় গ্রীক ট্রাজেডির মুখোশের মুখব্যাদানে। এবং তার কপালে, যেখান থেকে চুলের রেখা উঠেছে, দেখলুম বিন্দু বিন্দু ঘাম, ধীরে ধীরে নয়, প্রবল বেগে বেরিয়ে আসছে।

জানি না ভেরনের ফন এব্রেনাক লক্ষ্য করল কিনা। তার চোখের তারা আর মেয়েটির চোখের তারা পরস্পরের মধ্যে যেন গেঁথে রইল, তীরের খুঁটিতে স্রোতের মধ্যে নৌকোর মতো, এবং এমন বন্ধনে গ্রথিত যে সে দু-জোড়া

চোখের মধ্যে কেউ একটা আঙুলও তুলতে পারে না। এব্রেনাকের এক হাত দরজার কাঠামোতে। দৃষ্টি একচুল না সরিয়ে, সে ধীরে ধীরে দরজাটা টানল। অদ্ভুত রকম ভাবহীন গলায় বললে, আপনাদের একান্ত শুভরাত্রি কামনা করি।

আমি ভাবলুম যে সে দরজা বন্ধ করে যাচ্ছে। কিন্তু মোটেই তা না। সে তাকিয়েছিল আমার ভাইঝির দিকে। দেখলে তাকে, তারপরে বললে, প্রায় চুপি চুপি বললে, বিদায়।

একটু নড়ল না সে, নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল আর সে বেদনাহত আর নিশ্চল মুখে সবচেয়ে নিশ্চল তার চোখদুটি—কারণ তারা বাঁধা ছিল অন্যের চোখে—বড়ো বেশি আয়ত, বড়ো বেশি পাণ্ডুর, আমার ভাইঝির চোখে। এটা চলল—কতক্ষণ ধরে?—চলল সেই চরম মুহূর্ত পর্যন্ত, যতক্ষণ না মেয়েটির ওষ্ঠাধর একটু নড়ে উঠল। ভেরনেরের চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল। শুনতে পেলুম:

—বিদায়।

কান পেতে না থাকলে কথাটা শোনা যেত না, কিন্তু অবশেষে শোনা গেল। ফন এব্রেনাকও শুনল। সে সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়াল আর তারপরে মনে হল তার মুখের, সারা শরীরের, কাঠিন্য শিথিল হয়ে গেল যেন শীতল দীঘিতে স্নাত হয়ে।

তার মুখে হাসি এল। তাই তার যে শেষ ছবি আমার মনে আছে সেটা হাস্যস্মিত; তারপরে দরজা বন্ধ হয়ে গেল, পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল বাড়ির ভিতরে।

পরের দিন, যখন সকালের দুধটা খেতে নেমে এলুম, তখন সে চলে গেছে। আমার ভাইঝি প্রতিদিনের মতো প্রাতরাশ ঠিক করে রেখেছে। নীরবে সে আমার খাবার ঢালল, নীরবে আমরা খেলুম। বাইরের কুয়াশার মধ্যে দিয়ে বর্ণহীন সূর্য উঠেছে। আমার মনে হল দিনটা ভারী ঠাণ্ডা।

[ভেরকর 'Le Silence de la Mer' লেখেন ১৯৪১ সালে, যে বছর ২২ জুন শুরু হয় ফ্যাসিস্ট জর্মানির আক্রমণ সোভিয়েত ভূখণ্ডের ওপর। রচনাটি প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে—দেশে দেশে তখন ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীরা সংঘবদ্ধ হয়ে লড়াই শুরু করেছেন। বাঙলায়ও গঠিত হয়েছে 'ফ্যাসিবিরোধী

লেখক ও শিল্পী সংঘ'—সূচনাকাল থেকেই বিষ্ণু দে তার প্রথম সারির একজন কর্মী। বাঙলা ভাষায় ভের্করের ফরাসী রচনাটি বিষ্ণু দে-ই 'সমুদ্রের মৌন' নামে ১৯৪৫ সালে অনুবাদ করেন—ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও প্রতিরোধ তখন তুঙ্গে। বঙ্গানুবাদটি প্রকাশিত হয় পুস্তিকাকারে ১৯৪৬ সালে—ফ্যাসিবাদের ডানা ভেঙে যাওয়ার পরে, বিশ্বযুদ্ধের অবসানে। [নীরদ মজুমদারের আঁকা] নীল ঢেউয়ের মলাট নিয়ে পুস্তিকাটি বেরিয়েছিল 'ঈগল পাবলিশার্স'-এর প্রকাশনা-ব্যবস্থায়। ভের্করের রচনার ইংরেজি অনুবাদ *'Put Out the Light'*-এর বিষ্ণু দে-কৃত সমালোচনা 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৪ সালেই। বঙ্গানুবাদ 'সমুদ্রের মৌন'-র নামপত্রে অবশ্য বন্ধনীর মধ্যে লেখা আছে "Translation from '*Silence of the Sea*' by Vercors।" পরে, 'সমুদ্রের মৌন'র স্বাক্ষরিত একটি কপিতে তিনি নিজের হাতে বন্ধনীর ঐ কথাগুলি সম্পূর্ণ কেটে শুধু লেখেন *'Le Silence de la Mer'*।

[নীরদ মজুমদার-অঙ্কিত] প্রচ্ছদটির শাদাকালো প্রতিলিপি সহ ঈগল পাবলিশার্স-প্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য ও প্রায়-বিস্মৃত 'সমুদ্রের মৌন' পুস্তিকাটির পুনর্মুদ্রণ করা হল। বানান ও যতিচিহ্নের ক্ষেত্রে আমরা 'পরিচয়'-এর নিয়ম অনুসরণ করেছি।—সম্পাদক]

দেখা-সাক্ষাৎ

আরাগঁ

[ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকদের অন্যতম লুই আরাগঁ এই গল্পের লেখক। ফ্রান্সে নাৎসী দখলের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিরোধ-সংগ্রামে আরাগঁর ভূমিকা ছিল খুবই সক্রিয়। একদিকে তিনি যেমন কর্মী হিসেবে কাজে নেমেছেন, অন্যদিকে তেমন সাহিত্যিক হিসেবে অবিশ্রান্ত রচনায় স্বদেশবাসীর দুঃখ, ক্রোধ ও সঙ্কল্পকে ভাষা দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে তাদের অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁর কবিতা লোকের মুখে মুখে ফিরেছে তখন। অনেক কবিতাই ফরাসী সাহিত্যের স্মরণীয় ঐতিহ্যের অন্তর্গত হয়ে গিয়েছে, যেমন তাঁর পরবর্তী কালের কবিতাও হয়েছে। আরাগঁ শুধু কবি নন, উপন্যাসেও তাঁর অসামান্য দান এবং প্রবন্ধেও তাঁর চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গি স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। প্রতিরোধ-সংগ্রামের যুগে তিনি কিছু গল্পও লেখেন। তাদের একটি এখানে ফরাসী থেকে অনুবাদ করে দেওয়া হল।

ফ্রান্সের সকল শ্রেণীর খেটে-খাওয়া মানুষদের মধ্যে, সমস্ত সৎ মানুষদের মধ্যে কেমনভাবে হিটলারী দখলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মনোভাব ছড়িয়ে পড়ল, কেমনভাবে তারা আত্মোৎসর্গে উদ্বুদ্ধ হল, কেমনভাবে ভালোবাসা ও ঘৃণার সাধারণ অনুভূতি তাদের এক সূত্রে বাঁধল তার একটা ছবি পাওয়া যায় এই কাহিনীতে। দেশের বাইরে অন্যত্র, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নে, ফাশিজম-বিরোধী যে-যুদ্ধ অমিত তেজে চলছিল—সে সম্বন্ধে চেতনার ক্রমোন্মেষও দেখি। এরই পাশাপাশি রয়েছে নাৎসী অত্যাচারের চেহারা এবং দেশদ্রোহের মুখ। আর সমস্তের পটভূমিতে মানবিক হৃদয়ের অনুভব। বিজেতা নাৎসীদের সঙ্গে সহযোগিতা তখন সরকারী রূপ নিয়েছিল মার্শাল পেঁত্যার মধ্যে। তিনি লাভালকে সঙ্গী জুটিয়ে ভিশিকে রাজধানী করে দক্ষিণ ফ্রান্সে তথাকথিত মুক্ত অঞ্চলে ফরাসী সরকার বানিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এটা জার্মানদের পরিকল্পনা অনুসারে হয়েছিল তাদেরই যোগসাজশে। ফরাসীদের, বিশেষত বালক ও যুবকদের, বিভ্রান্ত করে নাৎসী-বিরোধিতা থেকে সরিয়ে রাখবার জন্যে জাতিসেবা ও দেশসেবার মার্কা মেরে পেতাঁ-সরকারের উদ্যোগে নানা ধরনের সংগঠন তৈরি করা হয়েছিল। যেমন, 'র‍্যালেভ' অর্থাৎ পূর্ববর্তীর পর নিজের হাতে দায়িত্ব নেওয়া পরবর্তীকে দেবার জন্যে; 'কঁপাইয়" অর্থাৎ সাথীর দল, সাথিত্ব নিজেদের মধ্যে এবং দেশবাসীর সঙ্গে। এ ছাড়া ছিল মিলিশিয়া অর্থাৎ দখলদার সৈন্যদের সাহায্য করবার জন্যে আধা-পুলিশ আধা-সামরিক দল। সমস্ত সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য একই ছিল: ফ্রান্সের গণ-সংগ্রাম প্রতিহত করে নাৎসী জয় সুপ্রতিষ্ঠ করা। এ সবের উল্লেখ এই গল্পে আছে।

এখানে বলা দরকার, নাৎসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংগ্রামে কেবল আরাগঁই নন, ফ্রান্সের বহু বিখ্যাত ও অখ্যাত সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা কাজ এবং লেখা দুই দিক থেকেই চরম ব্যক্তিগত বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরাও ছিলেন। বেশ কয়েকজনকে প্রাণও দিতে হয়েছিল। স্বভাবতই কোনো লেখা সে সময়ে কারো স্বনামে বেরোত না এবং ফ্রান্সের মধ্যে তা ছাপানো প্রায়ই সম্ভব হত না। ছদ্মনামে বাইরে থেকে ছাপিয়ে আনতে হত। আরাগঁর এই গল্পে লেখকের নাম ছিল স্যাঁ রোমঁ্যা আরনো। অন্য দুটি গল্পের সঙ্গে এটি একত্রে বই করে বের করা হয় লণ্ডনে। বইয়ের নাম ছিল 'তিন কাহিনী'। খুব সম্ভব এ সব গল্প ফরাসী ছাড়া অন্য ভাষায় এ যাবৎ প্রকাশিত হয় নি।—অনুবাদক]

তার বোন ছিল খবরের কাগজে টাইপিস্ট; মেয়েটার বেশ সাহস আর কর্তব্যজ্ঞান, সেই ইভনের। সুশ্রীই তাকে বলা চলে, যদিও ছোট নাকটা একটু উঁচুতে ওঠানো। চোখ দুটো ছিল বড় বড় আর নীল। আমি তার সঙ্গে প্রেম করতে পারতাম, কিন্তু তার স্বভাবে চপলতা ছিল না, আর আমি, বিয়ে করা··· তাদের একসঙ্গে আমি প্রথম দেখি ভেল দিভ-এ*। আমি খেলাধুলোর ভক্ত নই, তা সত্ত্বেও স্পোর্টস-রিপোর্টারের সঙ্গে আমাকে পাঠাবেই যত সব বড় টক্করে, ফুটবল, রেস ইত্যাদি, ওদের নাকি খেলার আবাহাওয়াটা চাই। "তোমাকে গোটা পঁচিশ লাইনের একটা ভূমিকা লিখে দিতে হবে, ঝ্যলেপ···"

এই নামটা শুনলে আমার গা জ্বালা করে। আমার নাম হল পিয়ের ভাঁদেরম্যলঁ্যা। আমি প্রথমে তামাসা করে সই করেছিলাম ঝ্যলেপ। করেছিলাম যে-সব হাঁদা লেখা আমায় ডাইনে বাঁয়ে লিখতে হত সেগুলোর জন্যে; আমার আসল নামটা রেখেছিলাম ভালো করে লেখা গম্ভীর-সম্ভীর প্রবন্ধগুলোর জন্যে!···কিন্তু হাঁদামিগুলোরই জয়জয়কার হল এবং ঝ্যলেপ হয়ে উঠল বিখ্যাত, আর পিয়ের ভাঁদেরম্যলঁ্যা ক্রমে ক্রমে ঝ্যলেপের সামনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। জীবনটা যে কী!

তা বছর দশেক আগে ভেল দিভেই দেখা। ছয় দিনের মধ্যে একটা সন্ধ্যায় কড়া বেগনি আলোয় সাইকেল-চালিয়েরা ঘুরছিল তো ঘুরছিলই। আমি ঘণ্টাখানেক নিচে মাইক, টেবিল আর সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে বসে ছিলাম।

* প্যারিসে বাইসিকল রেসের মাঠ: Velodrome d' Hiver; লোকে সংক্ষেপে বলে Vel d'Hiv (ভেল দিভ)।—অনুবাদক

মঞ্চের উপর দিকের অংশ থেকে সত্যিকার ক্রীড়ামোদীর দল ঐ ভদ্রলোকদের উদ্দেশে নানা কটুকাটব্য করছিল। তারপর আমি উঠে গেলাম উপরে সাধারণ দর্শকদের জায়গায়। সেটা একেবারে ভরে গিয়েছিল সেদিন। আমার বেঞ্চি থেকে নিচে তাকিয়ে প্রথম সারির কাছাকাছি সেই দানোয়-পাওয়া ছোকরাকে দেখতে পেয়েছিলাম; সে শূন্যে মুঠো ছুঁড়ে রেসের সঙ্গে তাল দিচ্ছিল, চেঁচাচ্ছিল, তার পাশের মেয়েটির দিকে ঝুঁকে পড়ছিল···আবহাওয়ার জন্যে আমার যা দরকার ছিল ঠিক তাই। আমি তাকে ভালোভাবে লক্ষ্য করবার জন্যে যেই এগিয়ে গিয়েছি অমনি পাশের সেই মেয়েটি আমাকে ডাকল: 'মসিয়্যো ঝ্যালেপ!" একেই বলে খ্যাতি। না, তা না। দেখলাম মেয়েটা আর কেউ নয়, সেই ইভন, এবং তার পাশের পাগল ছোকরা হল তার ভাই এমিল দোর্ঁ্যা, ইস্পাত কারখানার এক মজুর। ইভনেরই মতো তার নাকটা উঁচুতে ওঠানো, কিন্তু চোখ অমন সুন্দর নয়; তার বাদামী রঙের চুল থাক হয়ে লেপটে ছিল এবং সেই সময় তার কপালে মুক্তোর মতো ঘাম জমেছিল। চেঁচাতে পারে বটে ছোকরা। সে তার স্ত্রী রোজেৎ-এর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। মেয়েটা ছোটখাট, তার চুল কালো, চামড়া একটু সাদাটে, তাতে জায়গায় জায়গায় লাল ছোপ, চোখ দুটো স্বচ্ছ। যদি সে একটু সাজগোজ করত, তাহলে তাকে বেশ সুন্দরই দেখাত···আর এমিল, সে আবার রেস নিয়ে মেতে পড়েছিল, জলের মধ্যে মাছের মতো সে রেসের অন্ধিসন্ধিতে বিচরণ করছিল। আমি কস্মিনকালে এ রেসের কিছুই বুঝি নি···ও তাদেরই একজন যারা ক্ষেপে গিয়ে বা উৎসাহে উছলে উঠে রেসের পথের উপর টুপি ছুঁড়ে দেয় যদি না ছুঁড়বার জন্যে চাবির গোছাটা হাতে থাকে (ওরা তারপর বাড়িতে যে কি করে ঢোকে তাই ভাবি)।

অতঃপর যেন ইচ্ছে করেই ব্যাপারটা ঘটানো হত: সর্বত্রই ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যেত, এমিলের সঙ্গে। একবার মেত্রোতে, আর একবার ফ্রান্স চক্কর দেওয়ার রেসের শুরুতে পর্ত মাইওতে, কত জায়গায় যে কি বলব! ও ছিল একেবারে সাইকেল-পাগল। যেখানেই দু-চাকা চলছে সেখানেই ওর আবির্ভাব, সাইকেল-রেস দেখতে ওর ক্লান্তি নেই। আমার উপর নজর পড়লেই চিনত: "নমস্কার, মসিয়্যো ঝ্যালেপ।" আমি ওকে বলে দিয়েছিলাম আমাকে ভাঁদের-ম্যল্যাঁ নামে ডাকতে, কিন্তু কোনো ফল হয় নি।

কথাবার্তা হত···ও সে সময় কাজ করত কোত্র্ঁ কারাখানায়, মিস্ত্রির কাজ।

রোজগার ভালোই করত। মানে ও তাকে ভালো রোজগার বলত। দারুণ কাজের লোক। খাটাখাটিতে তার জুড়ি ছিল না। কারখানা থেকে বেরিয়েই ও সাইকেল চেপে চলে যেত প্যারিসের অন্য প্রান্তে লিলা অঞ্চলে। সেখানে জানি না কিভাবে ও একটি মন-মাতানো ছোট্ট বাগান করেছিল, তাতে ও তরিতরকারি আর ফুলের চাষ করত। ও বলত, কোদাল কোপালে ওর বিশ্রাম হয়। রবিবারটা ও পুরোপুরি রেখে দিত সাইকেলটির জন্যে: মাদামকে নিয়ে প্যারিস থেকে ষাট সত্তর কিলোমিটার দূরে চলে যেত। হয়ত বলত পিকনিক করতে যাচ্ছি, নয় বলত বিয়ে করার আগে যে কাফিখানায় তারা একসঙ্গে খেয়েছে সেখানে আবার খেতে যাচ্ছে।

ইভন আমাকে এক সন্ধ্যায় নিয়ে গেল তার ভাইয়ের বাড়ি। মাদাম দোরঁ্যা তখন অন্তঃসত্ত্বা। এক সচিত্র সাপ্তাহিকের জন্যে কি উদ্দেশ্যে জানি না আমার উপর ভার পড়েছিল রাস্তার লোকদের ইন্টারভিউ করার। র‍্যু পিপক্যুস, বুলভার দে জিতালিয়ঁ্যা আর প্লাস মোবের-এ তিন-চার জন মূর্তিমানকে প্রশ্ন করে এমন সব বোকা-বোকা উত্তর পেয়েছিলাম যে আমার বিরক্তি ধরে গিয়েছিল। তখন ইভন, প্রোতোপোপোফ নামে একজন ফোটোগ্রাফার (অবশ্যই সে এক জেনারেলের ছেলে) আর আমি, এই তিনজন ক্যামেরা ফ্ল্যাশলাইট সব নিয়ে উপস্থিত হলাম বুলোঞ-বিয়ঁাকুর-এ সেই ছোট্ট আস্তানাটায়। সেখানে ছিল এমিল, রোজেৎ, যে তখনই বেশ গোলগাল হয়ে উঠেছিল, রোজেতের এক বোন এবং তার স্বামী। লোকটা বেশ লম্বা, কটা চুল, বছর তিরিশেক বয়েস, সে কাজ করত তার স্ত্রীর মতোই র‍্যানো কারখানায়, এক রকম কামারের কাজ। লোকটা একটু চুপচাপ ধরনের। এমিলকে কি বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম আমার মনে নেই, সে কি উত্তর দিয়েছিল তাও মনে নেই, তবে তার জবাবগুলো চমৎকার হয়েছিল। এক পাত্র করে মদ খেয়েছিলাম আমরা। ভায়রাভাইটির সঙ্গে আমি বেশ গলাবাজি করেছিলাম, কেননা লোকটা স্পষ্টতই ছিল কমিউনিস্ট এবং দু-তিনটে ব্যাপারে আমাদের ঠোকাঠুকি লেগেছিল। এমিল আমাকে জানিয়েছিল, বাচ্চাটা যখন জন্মাবে তখন সে একটা দুই-গদিওয়ালা সাইকেল কিনবে কিস্তিতে, তার ও তার স্ত্রীর জন্যে।

ঐ দুই-গদির সাইকেলেই তাদের আমি আবার দেখলাম পরের বসন্তকালে সেনতীরের শাঁপাঞতে দুরন্ত রোদের মধ্যে। "আ, মসিয়্যো ব্ল্যলেপ!" এমিল তার বাহনটির কলকব্জা গুণাগুণ আমাকে ব্যাখ্যা করল—আমি ভদ্রতা

করে তাকে তার ভায়রার খবর জিজ্ঞেস করলাম: ১৯৩৪-এর ফেব্রুয়ারির পর তখন সময়টা বেশ উত্তেজনাময়। কিন্তু এমিল রাজনীতির কথা এড়িয়ে গেল, সে তার গাড়ি নিয়ে বিভোর।

তার সঙ্গে আবার আমার দেখা হল মঁলেরিতে মোটর সাইকেলের রেসে। কিন্তু এ রেস তার মতে একটা মেকি ব্যাপার, এর সত্যিকার কোনো গুণ নেই। তার ইচ্ছে ছিল পারী-নিস সাইকেল রেসটা দেখার, কিন্তু কারখানার কাজ করে সে উপায় নেই। সেটা ১৯৩৫ সাল হবে। তারপর আবার কয়েকটা রাজপথে তার দু-গদির সাইকেলের উপর। এখন তাদের বাচ্চা ছেলেটাকে একটা ছোট্ট চুপড়ির মধ্যে বসিয়ে সেটা সাইকেলের সামনের ডাণ্ডার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে স্বামী-স্ত্রীতে নিয়ে চলেছিল। বাচ্চাটা দেখতে ঠিক এমিলের মতো।

তারপর আর একটা বাচ্চা হয়েছিল, একটা মেয়ে। সেটা ১৯৩৬ সাল, ধর্মঘটের সময়। আমি এমিলকে দেখলাম দখল-করা কারখানার বুকে সেই অবিশ্বাস্য সভা-আসরগুলোর একটাতে। ঐ সব সভা-আসরে নামকরা শিল্পীরা আসত ধর্মঘটীদের সামনে গান গাইবার জন্যে। কোনো বিদ্বেষ নেই, বেশ মজা পাচ্ছে, এই রকম একটা ভাব দেখলাম তার। "এ কি, এমিল, তুমিও ধর্মঘট করলে?" "ও, মসিয়ো ঝ্যালেপ, সকলে যা করছে তা তো করতেই হয়, সাথীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা চলে না।" নিশ্চয় এটা সেই ভায়রা-ভাইয়ের প্রভাব।

আবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ভেল দিভ-এ। সালোঁ দ্য লোতো-তে আবার সামনাসামনি হলাম। কোন একটা পারী-রুবে রেসে তাকে ক্লিশিতে দেখলাম দূর থেকে, আমরা দুজন দুজনকে দেখে হাত নাড়লাম। তারপর দেখা আর এক রেসে। এ রেসের ব্যবস্থা করেছিল আমি যে আহামরি কাগজে কাজ করতাম, সেই কাগজ। আমাকে রাতারাতি রেসের পরিচালক বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রেস শুরু হওয়ার জায়গায় আমি হাতে এক তেরঙা ফিতে বেঁধে একগাদা ব্যাজ উল্টো করে লাগিয়ে পাগলের মতো ছুটোছুটি করছি এমন সময় শুনলাম: "ওঃ, মসিয়ো ঝ্যালেপ!"

এমিল এবং তার স্ত্রী, দুজনেই আগের মতোই রয়েছে। তবে রোজেৎ একটু যেন ক্লান্ত। ওরা একটা স্প্যানিশ শিশুকে দত্তক নেবে বলে ঠিক করেছে, প্যারিসে কি তা নেবার অধিকার আছে?—"তোমরা আবার একটা বিদেশী বাচ্চাকে ঘাড়ে নিচ্ছ কেন, তোমরা তো রাজার হালে নেই?" রোজেৎ হেসে

বলল : "দুজনের জন্যে যখন জুটছে তখন তিনজনের জন্যেও জুটবে।" এবার নিশ্চয় এর পেছনে সেই ভায়রাভাইটি আছে, সে-ই ওদের মাথায় এটা ঢুকিয়েছে। "তার খবর কি? অনেক দিন তাকে দেখি নি—ও, ঝগড়াঝাটি হয়েছে বুঝি?"—"না, তা না, সে স্পেনে রয়েছে, সে হিটলারের বিরুদ্ধে লড়ছে" —এমিলের উচ্চারণ একটু অদ্ভুত, ফরাসীতে যে জায়গায় দুটো শব্দ জুড়ে যায় ও সেখানে আলাদা করে বলে। কিন্তু স্প্যানিশ বাচ্চাদের দত্তক নেবার অধিকার তো প্যারিসবাসীদের দেওয়া হয় নি। পরে ভ্যাঁসেনের বাসে আমি কথাটা এমিলকে আবার বললাম। সে মাথা নেড়ে বলল: "দেওয়া উচিত ছিল—ওরা তো আমাদের জন্যে প্রাণ দিয়েছে"—এইসব লোক দেখি প্রচারকার্যে বেশ টলে যায়।

মিউনিক চুক্তির সময় আবার আমার উপর ভার পড়ল রাস্তার লোকের ইণ্টারভিউ নিয়ে একটা ফিল্ম তৈরি করার। এবারও নিরুপায় হয়ে এমিলের শরণ নিলাম। কিন্তু এবার এমিলের অংশটা ছাঁটাই করে দিল কর্তারা। সে যা বলেছিল তা হজম করা যায় না, এটা স্বীকার করতেই হবে। তাও তো আমি অনেক নরম-সরম করে দিয়েছিলাম। সুতরাং যুদ্ধের জন্যে সৈন্যতলব পর্যন্ত আমি তার কথা আর বিশেষ ভাবি নি। কিন্তু মাঝিনো লাইনের পেছনের সেই ঘাঁটিতে, মেস্ শহরের পাশে এক ছন্নছাড়া গেঁয়ো জায়গায়, তখন আমি এক পদাতিক দলে লেফটেনাণ্ট, একদিন অফিসার-ক্যাণ্টিনে রেডিও চলছিল, মরিস শেভালিয়ে গাইতে আরম্ভ করেছিলেন 'মিমিল', হঠাৎ আমার চোখের সামনে এমিলের মুখ, তার শক্ত চুলগুলো এবং উপরে-ওঠানো নাকটা ভেসে উঠল, আমি কিছুতেই ঠেকাতে পারলাম না দৃশ্যটা। এটা আমার বোকামি তো বটেই। এই সময় এমিল কোথায় রয়েছে? এবং সেই কমিউনিস্ট ভায়রা? স্পেন থেকে ফিরে এসে লোকটা নিশ্চয় খুব ঝঞ্ঝাটে পড়েছিল··· আমাদের দেখাসাক্ষাৎ ঘটার সুযোগ কমে এসেছিল। আর সাইকেল-রেস হত না, ইংলণ্ডের রাজার সফর বা পোশাকের ফ্যাশন নিয়ে রাস্তার লোকের সঙ্গে ইণ্টারভিউও আর হত না।

তবু পুরো যুদ্ধের মধ্যে, মারামারির মধ্যে তাকে আমি আবার দেখলাম, এমিলকে। সেই যাচ্ছেতাই কাণ্ডকারখানার ভেতরে। আমরা যখন এন এবং ওয়াজ-এ লড়াই করে উপরওয়ালাদের হুকুমে সব ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে এসে মনে মনে জ্বলছি, তারপর। তারিখটা ১২ই কি ১৩ই জুন হবে। আমি চোখের

সামনে বরাবর তা দেখতে পাব। আর-এ এক ছোট শহর। চতুর্দশ লুইর আমলের এক কেল্লা রয়েছে, তাতে দীঘি, ফোয়ারা, ছাঁটা গাছের ঘন নিশ্চুপ বীথি, বড় বড় পৌরাণিক মূর্তি। চৌরাস্তার খোলা জায়গাটা যেন চষা হয়ে যাচ্ছে, অনবরত কনভয় চলেছে পেছন দিকে। গির্জার দরজায় করুণ অক্ষর : "ঝ্যের্ৎ ত্যার্ঁ এখান দিয়ে গিয়েছে"..."যার জন্যে, আমরা আঁঝের-এ চলেছি..." আর আমরা সেখানে রয়েছি সাঁজোয়া সৈন্য ও তাদের ট্যাঙ্ক এবং বয়ে-আনা আহতদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে। জার্মানরা এভর‍্যা-র পথে এক কিলোমিটার, বড় জোর পনের শ মিটার দূরে রয়েছে। কতক্ষণ ওদের ঠেকানো যাবে? কনভেণ্টের সামনের রাস্তায় মেয়েদের ইস্কুলটা দখল করে বসেছে ডাক্তার ও নার্সরা; ওদের সঙ্গেই আমাদের দুপুরে খেতে হবে, কেননা ক্যান্টিন... না, ক্যান্টিন বলে আর কিছু নেই। খুব গরম পড়েছিল, গুমোট, সীসের মতো ভারী একটা আকাশ মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁকে তার জুন মাসের রং ফিরে পাচ্ছিল, পর মুহূর্তেই তার মুখ আবার কালো হয়ে উঠছিল। উঠোনের ছোট গাছগুলোর তলায় একটা লম্বা কাঠের টেবিল। সকলে একসঙ্গে খেতে বসেছিল : ডাক্তাররা, কয়েকজন অফিসার এবং এক কোণায় ছোট অফিসাররা, নার্সরা এবং সেই সব আহত সৈন্যরা যাদের বসার ক্ষমতা ছিল এবং যারা অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে অপেক্ষা করছিল। কোনো উঁচু নিচু ভেদ ছিল না। সাদা উলের পোশাকে একটি ছোটখাট নার্স মস্ত একটা ক্যাপ পরে আমাদের মধ্যে ঘুরঘুর করছিল। সে প্লেট আনছিল, রাঁধুনিদের সাহায্য করছিল, অফিসারদের কথায় কথায় সেলাম ঠুকছিল এবং তার ফ্রকটা দুই হাতে তুলে এক কোণে গাদা-করা অস্ত্রগুলো টপকে টপকে হাঁটছিল।

জার্মান গোলন্দাজ-বাহিনী আমাদের মাথার উপর দিয়ে কামান দাগছিল। ওরা নিশ্চয় রাস্তার উপর, বেরুবার পথে গোলাবর্ষণ করছিল।

ওখানে একজন সৈনিক ছিল। সৈনিকই মনে হল। তার খালি গা, বাঁ হাত আর কাঁধ যেমন-তেমন একটা প্লাস্টারে মোড়া এবং আড়াআড়ি একটা কাপড়ের পটিতে ঝোলানো। দিন তিনেক সে দাড়িগোঁফ কামায় নি। সে যখন আমাকে বলল : "মসিয়্যো ঝ্যালেপ", আমি ভীষণ চমকে উঠলাম। আমি এখন লেফটেনাণ্ট ভাঁদেরমাল্যাঁ। লোকটা কে? "আমাকে চিনতে পারছেন না? দোর‍্যাঁ, ইভনের ভাই..." আরে, কি কাণ্ড, এমিল। সে আমাকে বলল, সে সাঁজোয়া বাহিনীর এক কমাণ্ডো দলে আছে; ডানকার্কের পর যথেষ্ট ট্যাঙ্ক

তাদের দেওয়া হয় নি, কেননা প্রথমে সে একটা হচকিস চালাত···"ও তো আর সাইকেলের তুল্য নয়, কি বলো, এমিল ?" সে বিবর্ণভাবে একটু হাসল। তার কাঁধে নিশ্চয় যন্ত্রণা হচ্ছিল, মাঝে মাঝেই সে অন্যমনস্কভাবে ওখানে প্লাস্টারের উপর তার ডান হাতটা বোলাচ্ছিল। সে এসেছিল রাঁবুইয়ে অঞ্চল থেকে। তারা, মানে তাদের কমাণ্ডো দল মেশিনগান নিয়ে রাঁবুইয়ে রক্ষার চেষ্টা করছিল, রাস্তাটা···সৈন্যবাহিনী চলে যাওয়ার পর···"বড় অদ্ভুত লাগছিল···রাঁবুইয়ে··· ঐখান দিয়ে আমরা প্রায়ই তো সাইকেল চালিয়ে যেতাম, আমরা দুজন, আমি রোজেৎ···" রোজেৎ আর বাচ্চা দুটোর কি হয়েছে সে জানে না, হয়তো তারা এখনো পানাম-এ আছে, জার্মানরা এসে পৌঁছচ্ছিল, কিংবা হয়তো, যেটা আরো খারাপ, তারা রাস্তা ধরে বেরিয়ে পড়েছিল এই সব···একটা গোলা ফাটল খুব দূরে নয়। আমি শেষটা আর শুনতে পারলাম না, ডাক্তার-ক্যাপ্টেন আমাকে ডাকছিলেন। সকলের মধ্যে একটা কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল। নানা রকম গুজব। আমেরিকানরা লড়াইতে যোগ দিচ্ছে, রুশরা জার্মানদের আক্রমণ করেছে, এবং প্যারিসকে কমিউনিজম কব্জা করেছে···বিশ্বাস না করেই শোনা কথা লোকে আউড়ে যাচ্ছে এবং একজন আর-একজনের দিকে তাকাচ্ছে, দেখতে চায় ও লোকটা এ সম্বন্ধে কি ভাবছে। এইভাবেই সেদিন প্রথম আমাদের উপর পরাজয়ের চেতনা ছড়িয়ে পড়ল। একটা সেলারে ভালো মদ মজুত করা ছিল, জার্মানদের হাতে তা পড়তে দেওয়া হবে না, ওরা মদ খেতে জানে না। ডাক্তার-ক্যাপ্টেনটি বেশ মোটাসোটা, বয়েস অল্প, বুরুশের মতো গোঁফ আছে, সে বলল: "প্যারিসে শ্রমিকরা এ সবের কি বুঝবে? ভেবে ছাখো, তোরেজ এসে পৌঁছচ্ছে জার্মান বাহিনীর সঙ্গে···"

ঠিক এই সময়ে এমিল তার গলা চড়াল। খুব চড়াল না। একটু যেন চেপে রাখল, তবে বেশ প্রত্যয় ছিল তার গলায়। সে বলল: "আমি যখন রাঁবুইয়ের প্রবেশপথে ছিলাম, সেখানে, জানেন, প্রেসিডেন্টের কেল্লা-বাড়ির সামনে, জানেন মসিয়ো ঝ্যলেপ···আমাদের মেশিনগান আর বন্দুকগুলো রাস্তার দিকে নিশানা করা ছিল···তখনো জার্মানরা এসে পৌঁছয় নি··কিন্তু প্যারিসের বাসিন্দারা অবিরাম আসছে···তাদের সঙ্গে কত রকম যে লটবহর, বুড়োরাও···তারপর সব শ্রমিকদের দল · এক-একটা কারখানার একসঙ্গে··· ও তো দেখলেই চেনা যায়···ওরা যাবার সময় আমাদের সঙ্গে কথা বলছিল। সামসঁ কারখানার দল···তারপর সিত্রঁ কারখানার···তারপর জানেন হঠাৎ কাদের

দেখলাম? আমার ভায়রাভাই আর আমার শালী, একবার ভাবুন দেখি··· হঠাৎ···তারপর ওরা আমাদের সব বলল···কারখানায়, আর র‍্যানো কারখানার ব্যাপার তো অন্য সব কারখানারই মতো, ওরা যখন কারখানায় জানতে পারল যে, জার্মানরা প্যারিসে আসছে, তখন ওরা সমস্ত কিছু ভেঙে ফেলতে চাইল, সব যন্ত্রপাতি, কারখানার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে চাইল···আরে, তখন ওদের ঠেকাবার জন্যে সরকারী রক্ষী পাঠিয়ে দেওয়া হল, তারা ওদের উপর গুলি চালাবার হুমকি দিল···হ্যাঁ, তা, আপনি বলতে পারেন বটে, ওরা কিছুই আর বুঝতে পারছিল না···জার্মানদের জন্যে যন্ত্রপাতিগুলো ঠিকঠাক রেখে দেওয়া, ভেবে দেখুন একবার, অ্যাঁ? কোনো কিছুরই আর মাথামুণ্ডু বোঝা যাচ্ছে না।”

সকলের মতো আমিও ঘুরে এমিলকে দেখলাম: তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে।

এবার যখন অ্যাম্বুলেন্স ওকে নিয়ে গেল, তখন আমি ভাবলাম আর কি কখনো ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে! এর পরই যার সঙ্গে আমার আবার দেখা হল সে ইভন, সেই সুন্দর নীল-চোখ মেয়েটা। মার্সেইতে দফতর সরিয়ে নিয়ে গেছে এমন এক কাগজে সে টাইপিস্ট। অনেক জল ইতিমধ্যে পোলের নিচে দিয়ে গড়িয়ে গেছে। জানলা দিয়ে শোনা যাচ্ছিল ছেলেগুলো গাইছে: “মার্শাল*···এই তো আমরা রয়েছি তোমার সঙ্গে!” কেউকেটা গোছের যুবকরা এক ধরনের ইউনিফর্ম পরে ফুটপাথের উপর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। মুক্ত অঞ্চল তখন পুরোপুরি মোহগ্রস্ত। আমাকে ইভন বলল: “এমিল? সে প্যারিসে ফিরে এসেছিল, তারপর তাকে পালাতে হয়। কারখানায় অন্তর্ঘাত চলছিল···” আমি চেঁচিয়ে উঠলাম: “কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, এমিল অন্তর্ঘাতে হাত লাগাবার লোক নয়!” মনে হল, ইভন তার নীল চোখ দিয়ে আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাচ্ছে। কি রকম একটা অনুভূতি শুরু হল। তাকে ক্রমেই বেশি বেশি তার ভাইয়ের মতো দেখাচ্ছিল। আমি ভাবি কেন সে বিয়ে করে নি কখনো।

বড়দিনের কাছাকাছি সময়ে আমি গেলাম লিয়ঁতে। আমার কাগজটির মালিক সংস্করণের পর সংস্করণ বাড়িয়েই চলেছিলেন। আমাকে যেতে বলা হল কামার্গ-এ, জমিতে মানুষের ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা সবিস্তারে রিপোর্ট করতে হবে। এক সন্ধ্যায় যখন আমি কামার্গ-এর ট্রেনে উঠতে যাচ্ছি, তখন

* মার্শাল পেতাঁর উল্লেখ।—অনুবাদক

পেরাশ-এর প্ল্যাটফর্মে একটা লোকের সঙ্গে আমার ধাক্কা লাগতে লোকটা বলল : "দেখে চলতে পারেন না? আরে···মসিয়্যো ঝ্যালেপ!" আবার আমার এমিল। তার হাত আর কাঁধ? একেবারে সেরে গেছে। বাচ্চারা তাদের দাদুদিদিমার কাছে···আর রোজেৎ? "ও! সে কাজ করছে।"···"সে কি? ছেলেমেয়েকে ছেড়ে? তোমরা তো আবার একটা স্প্যানিশ বাচ্চাকে দত্তক নিতে চেয়েছিলে।" ইভনের মতো ওর চোখেও সেই অদ্ভুত দৃষ্টি : "এই রকম দিনে নিজের বাড়িতে ছেলেপিলে নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময় নেই"···ও কি করে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলল না। আমি তার ভায়রার খবর জিজ্ঞেস করলাম। ও এড়িয়ে যাওয়ার মতো করে একটা উত্তর দিল। ওর ট্রেন ছাড়ল।

বলতে পারা যায়, ১৯৪১-এর গ্রীষ্মকালে লোকের ধারণাগুলো বদলে গেল। কেন জানি না। জার্মানরা মস্কোর সামনে গিয়ে পৌঁছেছিল, কিন্তু মস্কো দখল করতে পারে নি। ট্রেনের মধ্যে লোকের মুখ খুলতে আরম্ভ করেছিল। যেমন বিশ্বাস করা হত প্রত্যেকে কিন্তু তেমন সত্যিই ভাবত না। তার্ব্ অঞ্চলে এক জায়গায় ভিড়-ঠাসা করিডরে বাক্সপেটরা এবং ঘন ঘন শৌচাগারে-যাওয়া মানুষদের মাঝখানে এমন সব কথা হচ্ছিল যা শুনলে গা শিউরে ওঠে আবার হাসিও পায়। আমি গলা শুনেই এমিলকে চিনলাম। সে বলছিল : "সবুর করো না একটু। দেখো কি প্যাঁদাই ওদের দেয় ওরা।" ওর চোখ দুটো যেন জ্বলছিল। ভেল দিভ্-এর এমিলকে, সাইকেল-চালিয়েদের উদ্দেশে যে তার টুপি ছুঁড়ে দিত সেই এমিলকে আমি আবার দেখলাম বটে, কিন্তু ও এখন আর সাইকেল নিয়ে কথা বলছিল না, কথা বলছিল রুশদের নিয়ে।—"গতবারে তুমি আমাকে তোমার ভায়রার খবর বলো নি।" হঠাৎ ওর মুখ যেন এক মুহূর্ত কুয়াশায় ঢেকে গেল। এমিল হাত ঝাঁকি দিয়ে তার কপালের উপর থেকে এক গুচ্ছ শক্ত চুল সরিয়ে আমার দিকে ঝুঁকল। আমি ওর ভঙ্গিটা ভুল বুঝলাম : "তোমাদের বুঝি মন কষাকষি হয়েছে?" ও কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিচু স্বরে বলল : "জার্মানরা··ওরা যখন তাকে মেশিনগান চালিয়ে মারল···তখন তার শরীরটা ওরা পা দিয়ে মাড়িয়ে গেল···তার মুখটা ওরা জুতোর গোড়ালি দিয়ে থেঁতলে দিল···মাথার খুলিটা চ্যাপটা করে দিল···" আমি মোটেই ভাবি নি এমন ঘটনা শুনব। সেই ভায়রাভাই। সেই কমিউনিস্ট। আমি হতভম্বের মতো জিজ্ঞেস করলাম : "কি করেছিল সে?" ও কাঁধ ঝাঁকাল। ও সব কথা বলবার মতো জায়গা এটা ঠিক নয়। যাই হোক, যা ঘটেছিল তা এই : যে-কারখানায়

সে তার পার্টির নির্দেশে আবার কাজ শুরু করেছিল, সেখানে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে···কারখানার উঠোনেই জার্মানরা দশ জনকে গুলি করে মারতে চায়··· তখন অন্য শ্রমিকরা তাদের ছিনিয়ে নেবার জন্যে জার্মানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে···হ্যাঁ, ঝাঁপিয়ে পড়ে খালি হাতে···ভায়রাভাই ছিল তাদের পুরোভাগে ···তারপর ওরা তার শরীরটা পা দিয়ে থেঁতলায়···

এমিল যখন বলছিল "পা দিয়ে থেঁতলায়", তখন আমার মনে হচ্ছিল আমি দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছি। তার চাপা স্বরের মধ্যে সবুজ পল্টনদের * এক জংলী নাচ ছিল, টুপি-পরা জানোয়ারদের এক উন্মত্ততা ছিল। আমি কিছু একটা বলতে চাইলাম: "কি সাংঘাতিক···কিন্তু ধর্মঘট করা কি যুক্তিসঙ্গত?" এমিল প্রথমে কোনো উত্তর দিল না। তারপর আমার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলল: "মসিয়্যো ঝ্যালেপ, আমরা জার্মান নই যুক্তিসঙ্গত? যুক্তিসঙ্গত হবার ব্যাপার এটা নয়···জার্মানদের তাড়াতে হবে···ছত্রিশ সালের কথা আপনার মনে আছে? সেবার আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কেন আমি ধর্মঘট করছি···হ্যাঁ, আজকেও সাথীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা চলে না···এবং একজন যখন পড়ে যায় তখন আর দশজনের উঠে দাঁড়ানো দরকার।" এক দশাসই জার্মান অফিসার আমাদের মাঝখান দিয়ে চলে গেল, তার গা থেকে জার্মান পল্টনী গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল, তার মুখে কোনো ভাবলেশ নেই, যা কোন কায়দায় করা যায় শুধু তারাই জানে। "ওরা সাজপোশাক করে ভালো" বলে এমিল অন্য কথা পাড়ল।

পুরো ১৯৪২ সাল আমি ওকে আর দেখি নি। সব কিছুই একটা অদ্ভুত মোড় নিচ্ছিল। ভিশিকে সমর্থন করার মতো লোক আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। সাংবাদিকের কাজ অসম্ভব হয়ে উঠেছিল: খবরের কাগজ পয়দা করা হত এক শিশি গঁদ আর সরকারী ইস্তাহার দিয়ে। মাঝে মাঝে অবিশ্যি এখানে ওখানে দু-একটা কথা ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করা হত। সেন্সর দফতরে কি যে সব ত্যাঁদোড় লোক ছিল। তবে সুখের বিষয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল খুব সাধারণ। যখন নভেম্বর এল, আমেরিকানরা আলজের-এ ঢুকল, জার্মানরা ফ্রান্সের দক্ষিণ অঞ্চল দখল করে নিল, তখন যাদের মনে সন্দেহ ছিল তারা একেবারে চুপ মেরে গেল। আমাদের কাগজ

* হিটলার-সৈন্যদের পোশাক ছিল সবুজ।—অনুবাদক

বন্ধ হয়ে গেল। মালিক খুব ভড়ংদার লোক, সে আমাদের কিছু কাল যথারীতি মাইনে দিল যেন কিছুই ঘটে নি। আমার জীবনে এই প্রথম আমি ঘটনার গতি লক্ষ্য করতে ও বুঝতে আরম্ভ করলাম। প্রতিরোধ-সংগ্রামীদের পক্ষ থেকে কয়েকবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু আমি তখনো পথ হাতড়াচ্ছি···তারপর এল সেই রাত যখন হিটলার পেত্যাঁর বাহিনীকে খতম করে ভিশির রাজত্বের উপর চরম আঘাত হানল···

অবশেষে আমি পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার কাজ শুরু করলাম। যে-সব কাগজে বন্ধুরা ছিল তাতে আমার প্রবন্ধ নেওয়া হত। যে-লেখাগুলো পাশে বেরুত তা পড়লে খুব সুখ হত না। তবে কাগজে তাঁদেরম্যলঁ্যার নাম বা ঝ্যলেপের স্বাক্ষর আমি দিতাম না। জীবনযাত্রার ব্যয় যা দাঁড়িয়েছিল···পুরো-পুরি কালোবাজারে না খেলেও···রেস্তোরাঁয় একটা বাড়তি পদ নিলেই ওরে বাব্বা যা দামটা হাঁকত! কি করব, আমি যে ভিশির জাতীয় ত্রাণকার্য নিয়ে গল্প বানাতে পারতাম না, পোকামাকড়কে সেলাম করতেও পারতাম না।

আমি যখন জানলাম ইভনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তখন আমার বেশ কষ্ট হল। বেচারা! তাকে প্রথমে রাখা হয়েছিল মঁল্যুক জেলে। শুনি জেলটা খুব খারাপ এবং ঘর-ছাপিয়ে কয়েদী। কি করেছিল মেয়েটা? হায়রে, জেলে আর শিবিরে লাখ লাখ লোক বন্দী যেখানে, সেখানে কি জানা সম্ভব তারা সবাই কে কি করেছে? ইভন ছিল সাহসী মেয়ে, সব সময় মেজাজ ঠাণ্ডা রাখত। নামের বানান ভুল করত এই যা, সেগুলো ঠিক টাইপ করেছে কিনা দেখতে হত···

নিসে যখন এমিলকে দেখলাম, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না ও আমাকে দেখেছে কিনা। তবে আমার মনে হল ওর ভাবটা এমন যেন আমায় দেখতে পায় নি। আমার ইচ্ছে হল ওর পেছনে ছুটি, বিশেষত ইভনের খবর জিজ্ঞেস করবার জন্যে, তারপর···নিশ্চয় অবিবেচনার কাজ হবে বলে ও ভয় পায় নি। ভেতরে ভেতরে এমিল তো এই ঝ্যলেপ ভায়াকে ভালোই বাসে। তা নয়, আমি যে একা ছিলাম না। বুঝতেই তো পারেন। যাই হোক, ও এখনো বেঁচে আছে।

আমি কিছুদিন আমার বাড়িতে এক ইহুদী সাংবাদিককে লুকিয়ে রাখলাম। তাকে ধরবার জন্যে খোঁজ করা হচ্ছিল, যদিও ইহুদি হওয়া ছাড়া আর কোনো অপরাধ সে করে নি। সরে পড়ার জন্যে তার ভুয়ো পরিচয়পত্রের দরকার ছিল। প্রতিরোধ-দলে আমি যাদের চিনতাম তাদের কাছে চাইলাম। সে

যাই হোক, তাকে লুকিয়ে তো রাখলাম ইতিমধ্যে নিজের বাড়িতে। কিছু যে করছি না এতে নিজেরই খারাপ লাগে শেষ পর্যন্ত। ইভনের গ্রেপ্তারের খবর আমাকে কেমন অদ্ভুতভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল।

এদিকে আমার অতিথি নিজের একটা ব্যবস্থা নিজে করে ফেলেছিল। সে নাকি এমন কিছু লোকের সন্ধান পেয়েছিল যারা ভুয়ো কাগজপত্র বানিয়ে মোটা দামে বিক্রি করে। তা যোগাড় করে গ্রামাঞ্চলের কোনো জায়গায় সে পাড়ি দেবে ঠিক হল। হঠাৎ এক সকালে দরজায় ধাক্কা: এক কোম্পানি সেপাই, ফরাসী পুলিশের এক কমিশনার ও তার চেলাচামুণ্ডা এবং গেস্টাপোর দুই পাণ্ডা। এ কাহিনীর বিশদ বিবরণ দেবার ইচ্ছে আমার নেই, এখানে তার কোনো প্রয়োজনও নেই। ওরা আমাদের মারধোর করল। ফরাসীরা আমাকে রেখে দিল। সে ইহুদী বেচারার যে কি হল কেউ জানে না। সে নিশ্চয় গোরুভেড়ার সেই মালগাড়ির মধ্যে ছিল যেটা জার্মানিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ব্রতো থেকে বেরুবার পথে যেটা ভুলে ফেলে রাখা হয়। গাড়িটা তালাবন্ধ ছিল এবং তার ভেতরে সব আওয়াজ পাঁচ-ছয় দিন বাদে থেমে গিয়েছিল। আমি বেঁচে গেলাম: ছয় মাসের জেল, ভাড়াটের নাম না জানানোর জন্যে।

এবার জেলের উঠোনেই এমিলকে আবার দেখলাম। বেড়ানোর সময়। বেড়ানোই বটে! উঁচু কালো দেয়ালগুলোর মাঝখানে একটা কূয়ো, তার চারদিকে সকলের ঘোরা, একজন আর-একজনের পেছনে বেশ দূরত্ব রেখে, কথা বলার অধিকার নেই···ও ছিল আমার পেছনে, আমি ওকে দেখি নি। হঠাৎ শুনি কে যেন ফিসফিস করে বলছে: "আরে! মসিয়ো ঝ্যলেপ···মসিয়ো ঝ্যলেপ!" ভুল হবার উপায় নেই: ও এমিল। আমরা বেশি কিছু বলতে পারি নি। প্রশ্ন আর উত্তরের মধ্যে একবার কূয়ো বেড় করে ঘোরা। "ইভনের খবর?"—"ও এক বন্দী শিবিরে আছে। অবস্থা খুব খারাপ নয়।"—"আর রোজেৎ?" উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে এল না। আমরা ঘুরছিলাম। পাহারাদার আমাদের দিকে দেখছিল। অবশেষে, একটু অন্যরকম গলায়: "সাইলেসিয়াতে···জানুয়ারি মাস থেকে···কোনো খবর নেই···"

আমি যেন একটা চোট খেলাম। আমার সেলের মধ্যে আমি সব সময় রোজেতের কথা ভাবতাম। সাইলেসিয়াতে? কোন জায়গায়? নুনের খনিতে? কে জানে? ছোটখাট মেয়েটা। আমি ভেল দিভ-এ প্রথম তাকে যেমন দেখেছিলাম, সেই রকমই আবার তাকে দেখতে লাগলাম, ছোটখাট

মেয়ে···ভায়রাভাই, ইভন, রোজেৎ···পোড়-খাওয়া পরিবার, ওরা নিজেদের রেয়াৎ করে নি। অথচ ওদের কোনো লাভ ছিল না। আমার সঙ্গে সেলে এক কালোবাজারী আর এক পকেটমার ছিল, তারা আমাকে সন্দেহের চোখে দেখত, কারণ আমি ছিলাম রাজনীতিক কয়েদী: বাস্তবিক এ একেবারে চূড়ান্ত, আমি কিনা রাজনীতিক···

আর-একবার পায়খানায় যাওয়ার সময়। আমি ছিলাম করিডরে। আমার পাশ দিয়ে এমিল গেল। আমাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল: "আপনার নামটা কি যেন, মসিয়্যো ঝ্যালেপ?" আশ্চর্য প্রশ্ন আমাকে! আমি কোনোমতে উত্তরটা দিতে পারলাম। যখন বেড়ানোর সময় আবার তার দেখা পেলাম, তাকে জিজ্ঞেস করলাম: "রোজেৎ কি করেছিল?" ও উত্তর দিল: "কিছু না, তার কর্তব্য···"

কালোবাজারী লোকটা বলত তাদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করা হয়, কেননা এই জেলে গাদা গাদা কমিউনিস্ট রয়েছে, তার চোটটা অন্য সকলের উপরে পড়ে। এবং সে আমার দিকে ইঙ্গিত করত। আমি শেষে তাকে বললাম আমি মোটেই কমিউনিস্ট নই, এমনকি স্ব-গোলপন্থীও নই···সে বলল: "যাই হোক, তুমি তো রাজনীতিক, সুতরাং তোমাকে বেছে নিতে হবে···"

একদিন সন্ধ্যায় জেলের মধ্যে এক অদ্ভুত গোলমাল শুরু হল। দরজার ধড়াম ধড়াম আওয়াজ, লোকজনের যাতায়াতের শব্দ শোনা যেতে লাগল। আমরা তিনজন একটা অস্পষ্ট উদ্বেগ নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কি হল আবার? তারপর করিডরে পায়ের শব্দ, তালা খোলার শব্দ। তখন অন্ধকার। দরজা খুলে গেল, আলো নিয়ে জেলরক্ষী, তার সঙ্গে আর-একজন রক্ষী আর পিছনে তিনজন কয়েদী যারা হুকুম দিচ্ছে মনে হল। এমিলের গলার স্বর: "ঐ যে ও, কোণের দিকে···ভাঁদেরম্যল্যাঁ···" রক্ষী বলল: "ভাঁদেরম্যল্যাঁ, বেরিয়ে আসুন।" ব্যাপার কি? বিদ্রোহ? এমিল ব্যাখ্যা করল: "একসঙ্গে জেল ভেঙে পালানো···" আমার সঙ্গী দুজন খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল, কিন্তু তাদের ওরা ঠেলে দিল সেলের মধ্যে: রাজনীতিক ছাড়া আর কেউ নয়। ওরা গোঙাতে লাগল।

এমন চমৎকারভাবে কিছু সংগঠিত হতে আমি কখনো দেখি নি। জেলের পরিচালক যেন একটি ছোট ছেলে, কয়েকজন রক্ষী বন্দীদের পক্ষে, অন্য রক্ষীদের হাত পা দড়ি দিয়ে বাঁধা। বিদ্রোহীরাই কর্তৃত্ব করছিল। তাদের তালিকাটা

পরিচালকের কাছে। এমিল বলছিল: "শুধু দেশপ্রেমীদেরই বেরিয়ে যেতে দেওয়া হবে..." আমাকেও দেশপ্রেমীদের মধ্যে ধরেছিল। কি বলব, আমার খুব গর্ব হচ্ছিল।

পরের ঘটনাগুলো আমি সবিস্তারে আর বলছি না, সেই রাত্তিরে লরি করে চলা, রেলওয়ে পোলের নিচে সেই ভীষণ দুর্ঘটনা, তারপর এক পাহাড়ী গ্রামে গিয়ে পৌছানো, সেই ভালো সব মানুষ যারা আমাদের লুকিয়ে রাখল, নতুন কাপড়-চোপড় এনে দেওয়া, সকলের সেই আশ্চর্য সহৃদয়তা। তবু আমি আগে কখনো মনে করি নি আমাদের দেশে এত নিষ্ঠা আছে, ভালো লোক এত আছে...অন্য কোনো শব্দ আমি খুঁজে পাই না...ভালো লোক...এমিল আমাদের সঙ্গে আর ছিল না। আমাদের ছোট ছোট দলে নানান জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হল। আমার সঙ্গে ছিল ক্লেরমঁর এক উকিল, দুজন দ্য-গোলপন্থী যাদের একজনকে আমি চিনতাম, একজন সাংবাদিক এবং দ্রোম-এর একজন কৃষক। সবসুদ্ধ আশি জন জেল থেকে পালিয়েছিল, ভাবুন একবার।

অতঃপর আমার নাম আর ভাঁদেরম্যল্যাঁ নয়, এমনকি ঝ্যালেপও নয়। আমার জন্যে যে পরিচয়পত্র তৈরি করা হল তাতে আমার নাম ঝাক গুনি। নিখুঁত পরিচয়পত্র, যে দুর্ভাগা ইহুদীকে আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম তাকে জোচ্চোররা যে পরিচয়পত্র বেচেছিল মোটেই সে রকম নয়। আমার সঙ্গীরা আমাকে জিজ্ঞেস করল আমার যাবার কোনো জায়গা আছে কিনা। প্রথমে আমি বললাম, না। তারপর তারা যখন বলল: "তবে আমাদের সঙ্গে এসো" তখন জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায়?" "কেন, মাকিতে"। * আমি স্বীকার করছি আমি তাতে খুব আকৃষ্ট হই নি। গ্রীষ্মকাল এবং পুরো গরম শুরু হয়েছিল। মাকি। আমি মাকিতে গিয়ে থাকবার কথা মোটেই ভাবতে পারি নি।

গাঁয়ের লোকেরা আমাকে যা যোগাড় করে দিল তাই পুঁজি করে আমি 'এম' পর্যন্ত যেতে পারলাম, সেখানে আমার বন্ধু 'ওয়াই'-দের (আমি তাদের গোলমালে ফেলতে চাই না) একটা সুন্দর কেল্লা-বাড়ি আছে। নতুন অবস্থার

'মাকি' (maquis) শব্দের মূল অর্থ ঝোপজঙ্গল, যেমন ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী অঞ্চলে দেখা যায়। আগে জীবজন্তু এবং চোরডাকাতরা এখানে আশ্রয় নিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান দখলের সময় ফ্রান্সের প্রতিরোধ-সংগ্রামীরা ঐ সব ঝোপজঙ্গলে আত্মগোপন করে ঘাঁটি গাড়ত। ফলে মাকি শব্দ প্রতিরোধ-সংগ্রামেরই এক প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়ায়। এবং এই সংগ্রামে যারা যোগ দিত তাদের বলা হত মাকিজার (maquisard)। —অনুবাদক

সঙ্গে আমার খাপ খাইয়ে নেবার মতো সময় ওরা আমায় দেবে। ওরা আমাকে দেখে যে খুব খুশী হয়েছে এমন মনে হল না। কিন্তু ব্যবহার ঠিকই ছিল। পল 'ওয়াই'-এর অবাক ভাবটা তো কাটছিলই না; সে আমাকে খালি প্রশ্ন করছিল। তার উদ্বেগের কারণ হয়েছিল সেই গ্রাম যেখানে আমরা অমন আন্তরিক অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম। পল বলছিল: "তাহলে পাহাড়ের ভেতর ঐ ছোট্ট জায়গাটায় ওরা সবাই এখন কমিউনিস্ট?" কমিউনিস্ট কেন? মোটেই না। ভালো লোক, এই বলা যায়। ওদের একটা 'জাতীয় মোর্চা সমিতি' আছে···তাতে পল 'ওয়াই' নিশ্চিন্ত হচ্ছিল না। সে বলছিল: "যেভাবে এটা ছড়িয়ে যাচ্ছে তা বেশ ভয়ের ব্যাপার···" আমি কিছু বলি নি, তবে আমি ঠিক করে ফেললাম ওদের বাড়িতে বেশি দিন থাকব না। ওর ভয় জার্মানদের কাছ থেকে আসে না, যে-জার্মানদের মেশিনগান নিয়ে রাস্তা চলতে ওর জানলা দিয়ে দেখা যায় যখন তারা 'এল' মালভূমির উপর বিদ্রোহীদের তাড়া করতে বেরোয়। ও অঞ্চলে নাকি বিদ্রোহীরা আছে।

আমি খুব সন্তর্পণে শহরে গিয়ে ঢুকলাম। আমার বন্ধুরা আমাকে সাহায্য করল। তারপর আমার দেখা হয়ে গেল প্রোতোপোপোফের সঙ্গে, হ্যাঁ সেই প্রোতোপোপোফ, জেনারেলের ছেলে, আমাদের কাগজের সেই ফোটোগ্রাফার যার সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম এমিলদের বাড়ি। দেখলাম ও একেবারে উন্মত্ত হয়ে গেছে। স্তালিন বলতে অজ্ঞান। ও বলল ওর বাবা ছিল আহাম্মক, কোনো কিছুই বুঝত না এবং ওর দুর্ভাগ্য, লাল ফৌজে ঢুকে দেশের জন্যে লড়াই করতে পারছে না। সে আসলে কি কাজ করে আমি জানি না, তবে সে একটা বড় সচিত্র সাপ্তাহিকে আছে এবং প্রধান সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলে সে আমার ছুটকো প্রবন্ধ লেখার এবং তার ফোটোর বিবরণ লেখার বন্দোবস্ত করে দিল। প্রধান সম্পাদক লোকটি বেশ ভালো মনে হল। আমার নিজেকে জাহির করার দরকার নেই, আমি স্বাক্ষর করি ওদেৎ দ্য লুর্সঁ। কেউ ভাবতে পারবে না এই রকম নাম যার, সে লোকটা ব্ল্যাপেপ। আমার কাজ তো আমি করছি।

যেখানে আমার বাস, সে এক ছোট শহর। প্রথমে আমি কারো সঙ্গে কথা বলতাম না। তারপর এখন আমি প্রায়ই পাদ্রী মশায়ের সঙ্গে দেখা করি। এ পাদ্রী এক দশা-ধরা মানুষ। উনি সামরিক ধাঁচের লোকদের সঙ্গে ফিসফিস গুজগুজ করেন। উনি ঐ অঞ্চলের মেয়েদের নিয়ে উলবোনা ইত্যাদি কাজের এক দাতব্য কেন্দ্র খুলেছেন। ঐ অঞ্চলের মেয়েরা মানে ছোটখাট ব্যবসায়ীদের

স্ত্রীরা, কৃষকবউরা, এমন কি শ্রমিক মেয়েরা (আমাদের এখানে একটা লেমনেডের ছোট কারখানা আছে)। এই সব মেয়ে কাদের জন্যে কাজ করে তা কেউ বলে না, তবে তা বোঝা যায়। ১৯৪০ সালে যদি এই কানাকানি হত! এখন সারা দেশটাই এই রকম হয়েছে। আমি কশাইয়ের ওখানে রেডিও শুনতে যাই। সেও এক অদ্ভুত লোক। ভবৎরঙের সব উদ্বাস্তু যাদের কোনো কার্ড নেই, তাদের সে মাংস দেয়। এও লোকে জানে যে ওখানকার ডাক্তার মার্কির লোকদের চিকিৎসা করেন, তাদের আস্তানা কাছেই। সেদিন এক জখম লোকও এসেছিল। ছোট শহরটা বাইরে থেকে খুব শান্তশিষ্ট, কিন্তু যদি বেশ ঠাওর করে দেখা যায়···কশাইয়ের দোকানে মাঝে মাঝে এমন লোকরা আসে যারা পাদ্রীর সঙ্গে গোপনে দেখা-করা লোকদের মতো। তারা সবাই কথা বলে মোটামুটি ভালো, এমিলের মতো তারা কে, কি করে, আমি কিছুই জানি না। যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ইতালিতে লড়াই তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে না। ভিশিতে কি ঘটছে সে সম্বন্ধে লোকে ভেতরের খবর বলে। রুশ রণক্ষেত্রের মানচিত্রে লোকে ছোট ছোট আলপিন এগিয়ে এগিয়ে পোঁতে।

পাশের শহরে ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে ভাল্‌মি-বার্ষিকী * উপলক্ষে এক ধর্মঘট হয়। জার্মানরা তিন শো শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে কোথায় নিয়ে যায় কেউ জানে না। একজন ধর্মঘটী ওদের আঙুল গলে পালায়। পাদ্রী মশায় তাকে লুকিয়ে রেখেছেন। তাকে এক আবাদের কাজে ঢোকানো হবে। সে বলছে গুপ্ত সৈনিকদলে ঢোকাটা তার বেশি পছন্দ। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার, এরা, এই সব লোকরা এই রকম ক্ষেপে উঠেছে। ফরাসী বলে গর্ব হয়।

আমাদের শহরের ছবিতে মাত্র একটি কালো ছায়া। এক মক্কেল থাকে শহর থেকে বেরুবার মুখে, সেই হলদে বাড়িটায়। শুনি, ১৯৪০ সালে জার্মানরা যখন এই পথ দিয়ে গিয়েছিল তখন সে তাদের দুই হাত মেলে অভ্যর্থনা করেছিল, খাদ্য সংগ্রহের জন্যে তাদের গ্রামে নিয়ে গিয়েছিল, সে তাদের সঙ্গে মদ খেত···মোট কথা, তাকে কেউ পছন্দ করে না। তার উপর, তার সাত বছরের ভাইপোটা কশাইয়ের ছেলের সঙ্গে খেলতে খেলতে বলল: "আমি যখন বড় হব, তখন আমার কাকার মতো হব, মিলিশিয়ার লোক হব। কাকার মতো আমি দিনে দেড় শো ফ্রাঁ রোজগার করব কিছু না করেই···" এ নিয়ে লোকে

* ভাল্‌মিতে ১৭৯২ সালে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সৈন্যরা প্রাশিয়ানদের পরাজিত করে। —অনুবাদক

কথা বলাবলি করে। ও সম্ভবত এ কাজের একমাত্র লোক নয়। কিন্তু অন্যরা কারা তা নিশ্চিতভাবে কেউ জানে না। এ লোকটা মাঝে মাঝে ডাক পার্সেলে ছোট এক একটা কফিন পায়, সব লোক তা নিয়ে গোপনে হাসাহাসি করে।

প্রোতোপোপোফ আর আমি একদিন গেলাম গ্র্যনোবল-এর কাছে সরকারী 'কঁপাইয়ঁ' দলের শিবিরে রিপোর্টাজ করতে। বেশ গরম সেদিন। চার ঘণ্টা মোটরবাসে। জায়গাটা খুব সুন্দর। লালচে পাতাওয়ালা গাছ···যাক বর্ণনার কোনো দরকার নেই। যখন দলের নায়করা তাদের সৈনিকদের প্যারেড করাচ্ছিল, মার্চপাস্ট আবার মার্চপাস্ট, ব্যূহ রচনা, যা শতবার আমরা আগে দেখেছি এ কথা বলতেই হবে, এমন সময় দুটো লরি এসে থামল শিবিরের প্রবেশ-মুখে এবং তা থেকে বেশ সুশৃঙ্খলভাবে নামল কিছু অস্ত্রধারী লোক, তারা আমাদের দিকে বন্দুক নিশানা করে ধরল। জন কুড়ি তারা, আর এ দিকে ছিল শ দেড়েক। কিন্তু এদের অস্ত্র ছিল না। এদের নায়কদের মুখগুলো যা দেখতে হয়েছিল! অতি সহজেই 'কঁপাইয়ঁরা' রাজী হয়ে গেল তাদের পোশাক, তাদের জুতো, তাদের সব সরঞ্জাম দিয়ে দিতে। প্রোতোপোপোফ এবং আমি, আমাদের দুজনকে কিন্তু স্পর্শ করা হল না। ওরা সবাই ছিল যুবক, পরনে জ্যাকেট, বড় জুতো, হাফপ্যাণ্ট আর পায়ে জড়ানো পশমের পট্টি, পোশাকে আসাকে তেমন মিল ছিল না, তবে একটু সমতা এনেছিল মাথার "বেরে" টুপি। যারা ওদের পরিচালনা করছিল, তাদের একজন যখন আমাকে বলল : "আরে, আপনি এখানে কি করছেন, মসিয়্যো ঝ্যালেপ!" তখন স্বভাবতই আমি চমকে উঠলাম। আবার এমিল। তাহলে ও এখন প্রতিরোধ-দলে সৈনিক হয়েছে। 'কঁপাইয়ঁ' দলের একটা বাইসিকেল ছিল, সেটা সে নিয়ে যাবেই। যেভাবে সেটা সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছিল, তার মুখে যে খুশি ফুটে উঠেছিল তা দেখবার মতো : "ঠিক আছে, ওটা আমাকে লরিতে উঠিয়ে দাও।" এমিলকে দেখছি কেউ বদলাতে পারে নি। যেমন তারা এসেছিল, তেমনি চলে গেল।

বাড়ি ফিরে ঘটনাটা পাত্রী মশায়ের কাছে বর্ণনা করবার জন্যে আমার মুখ চুলকোচ্ছিল। নৈতিক পরিপ্রেক্ষিত যে কি রকম বদলে যায় তা আশ্চর্য··· কিছু কাল আগে যদি হত, তাহলে আমি এমিলকে মনে করতাম ডাকাত। আজ, চিন্তা করে নয়, সহজ স্বাভাবিকভাবে ব্যাপারগুলোর মানে বদলে গেছে,

তাৎপর্য বদলে গেছে। শুধু আমার কাছেই নয়। যেমন, ঐ কশাইয়ের কাছে। পাদ্রী মশায়ের কাছে। এবং এখানে প্রায় সব লোকের কাছে, যারা সারা জীবন কাজ করেছে আইনকানুনকে সম্মান করতে করতে, শহর-কর্তাকে সেলাম করতে করতে। দীনভাবে। যারা গির্জার উপাসনায় যেত, যারা ধর্মের আচার-বিচার মানত। লেমনেড-কারখানার ঐ মালিক, যার দুই ছেলে জার্মানিতে, কারণ তারা যখন যায় লোকে তখনো সংগঠিত হয় নি, একেবারে গোড়ার দিকে, এবং যে-মালিক এখন তার শ্রমিকদের জার্মানিতে পাঠানো ঠেকায়। রেজিস্ট্রার আর ডাক্তারের স্ত্রীরা। আমি কশাইকে এমিলের ডায়রার কাহিনী বর্ণনা করেছি, যাকে জার্মানরা পা দিয়ে থেঁতলেছিল। শুনে ও বলেছে, "আচ্ছা, মার্শাল টিটো···লোকে যা বলে তা কি সত্যি যে উনি কমিউনিস্ট ?" তাতে ও একটু অস্বস্তি বোধ করে। আমি তাকে তো বলতে পারি না যে আমি যখন জেল থেকে সরে পড়ি তখন আমি এ কথা জিজ্ঞেস করি নি কে আমাকে পালাতে সাহায্য করছে।

১১ই নভেম্বরের * অল্প পরেই ওরা আমাদের শহর ঘিরে ফেলল। জার্মানরা।

* মনে হয় এখানে ১৯৪৩ সালের ১১ই নভেম্বর গ্র্যানোব্‌ল-অঞ্চলে যে-ঘটনা ঘটে তার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান-বার্ষিকীতে গ্র্যানোব্‌ল-এ প্রতিরোধ-যোদ্ধারা বোমা বিস্ফোরণ করে, মিছিল করে এক সংগ্রামী আবহাওয়া সৃষ্টি করে। নাৎসী কাগজের রিপোর্টে বলা হয় যে, ঐদিন ফরাসী শ্রমিকরা, যাদের অধিকাংশ কমিউনিস্ট, এক জার্মান দফতরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, এবং তাদের বহু লোককে গ্রেপ্তার করে জার্মানিতে বন্দীশিবিরে চালান দেওয়া হয়।
ঐদিন গ্র্যানোব্‌ল-এর উত্তরে ওয়াইয়োনা-তে যা ঘটে তা আঁরও চমকপ্রদ। মাকির যোদ্ধারা বেরিয়ে এসে পতাকা ও সামরিক বাদ্যসহ মৃত সৈনিকদের স্তম্ভের সামনে অনুষ্ঠান করে। তারা এই শহরকে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে তাদের আয়ত্তে রাখে।
আর এক ১১ নভেম্বরও স্মরণীয়। সেটা ১৯৪০ সাল। নাৎসী দখলের বিরুদ্ধে সেই প্রথম প্রকাশ্য প্রতিবাদ, যার সংগঠক ছিল প্যারিসের কিশোর ছাত্রছাত্রীরা। তারা সেদিন আর্ক দ্য ত্রিয়ঁফ-এ গিয়ে নীরবে দল বেঁধে দাঁড়ায়। তখন দালাল ফরাসী রক্ষীরা এসে তাদের বাধা দেয়। অতঃপর ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় সঙ্গীত গাইতে আরম্ভ করে। হঠাৎ মেশিনগানধারী জার্মানরা আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে গুলি চালায়। কিশোরকিশোরীরা গান গাইতে গাইতেই প্রাণ দেয়।—অনুবাদক

খুব ভোরে, তখনো বেশ অন্ধকার। লোকমুখে শোনা গেল, ওরা মিউনিসিপাল ভবনে যায়, কিন্তু সর্বপ্রথম যায় সেই হলদে বাড়িতে, সেখান থেকে সেই মিলিশিয়ার লোকটা ওদের সঙ্গে নিয়ে মিউনিসিপাল ভবনে পৌছয়। আমি ডাকবিভাগের একটি মেয়ের বাড়িতে যে-ঘরে থাকতাম, আমার সৌভাগ্য ওরা সেখানে আসে নি। বাস্তবিকপক্ষে, আমার কি-ই বা ভয় ছিল? আমার পরিচয়পত্র তো নিয়মমাফিকই ছিল। ওরা কুড়িজন যুবককে নিয়ে চলে, তাদের মধ্যে একজনের বছর উনিশ বয়েস, সে পালাবার চেষ্টা করলে ওরা তাকে গির্জার পেছনে গুলি করে মারে। যেভাবে ওরা বেচারা বুড়ো পাদ্রীকে গ্রেপ্তার করে, সেটাও খুব সাংঘাতিক···শোনা গেল, ওরা তাঁকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে, তাঁকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারে, তিনি কয়েকবার পড়ে যান, তিনি বলছিলেন: "স্বর্গস্থিত আমাদের পিতা, তোমার নাম পুণ্য হোক···তোমার রাজত্ব শুরু হোক···" যখন ওরা তাঁকে গাড়ির মধ্যে তোলে, তখন সেই মিলিশিয়ার লোকটা নাকি সেখানে ছিল এবং সে তাঁর উদ্দেশে চিৎকার করে বলে: "বিদায়, বদমাশ কমিউনিস্ট···" ঐ দেখুন। এখন পাদ্রীকেও অমন আখ্যা দেওয়া হচ্ছে··· সারা শহরে হলদে বাড়ির লোকটার বিরুদ্ধে ভীষণ ক্রোধ। ওর যদি কিছু ঘটে তবে আমি অন্তত নাকী কান্না কাঁদব না।

লোকে বলে, মানে কশাই আমাকে বলল, এই সমস্ত ঘটনাটা ঘটে এই কারণে যে, কাছেপিঠে একটা প্রতিরোধ-শিবির ছিল, তারা রাতারাতি সরে পড়ে, পাদ্রীই নাকি তাদের আগে থেকে খবর দিয়েছিলেন। ডাক্তার নিশ্চয় জানেন তারা কোথায় গেছে। ইতিমধ্যে আমাদের এখানটা তো টিকটিকিতে ছেয়ে গেছে। রাত্তিরে মোটরসাইকেল ঘুরে বেড়ায়। বিচিত্র সব লোক এসে দেখা দিয়েছে 'যাত্রীনিবাস' হোটেলে, বুরিয় রেস্তোরাঁতে। তারা যে দরজায় আড়ি পাতে তা লোকে দেখে ফেলেছে। আগে ইংরিজী বেতার জোরে চালিয়ে দেওয়া হত, এখন লোকে শোনে শুধু নিচু আওয়াজে। ডাক্তার আর তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে একটা রিপোর্ট গিয়েছিল। গেস্টাপো এল, কিন্তু এবার তাঁদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হল না। এ থেকে এই ধারণাই হয় যে, ওরা দেখতে চায় তাঁরা কাদের সঙ্গে মেলামেশা করেন। শহরে মাঝে মাঝে বোমা ফাটে, বাড়িঘর ভাঙে: একটা কফিখানা, জার্মান অফিসের সামনের অংশটা, 'সিনেমা পালাস'-এ গ্রেনেড। আট দিনের মধ্যে তিনবার রেলওয়ে লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে।

আমার বোকার মতো মনে হয় এ সবই যেন এমিলই করছে। তাকে কি আবার আমি দেখতে পাব? তার বোন কেমন আছে? এখন আমার যখন বয়েস বাড়ছে, আমি মনে মনে বলি, আমি একটা গবেট ছিলাম, আমার উচিত ছিল ইভনকে বিয়ে করা। খুব ভালো মেয়ে সে, চোখ দুটো বড় সুন্দর। একসঙ্গে থাকলে আমরা সুখী হতাম হয়তো···আমি বোধহয় জীবনের সব মানে বুঝতেই ভুল করেছি। পেছন দিকে তো ফিরে যাওয়া যায় না। খালি নিজের কথাই ভেবেছি···

সারা অঞ্চলে সন্ত্রাস। জার্মানরা টহল দিচ্ছে। সবার ধারণা লেমনেড-কারখানায় ওরা হানা দেবে। 'র‍্যালেভ' বলে যাকে ওরা নির্লজ্জভাবে জাহির করে তাতে যোগ দেবার জন্যে ওরা ঝিয়ের স্বামীকে তলব করেছে। লোকটা এখন তার পা প্লাস্টারে মুড়ে ডাক্তারী সার্টিফিকেট দেখাবে···আমি মনে করি ও ভুল করছে। ওর মাকিতে চলে যাওয়া উচিত। সৈন্যদল থেকে সরে পড়ার চেয়ে যোদ্ধা হওয়া ভালো।

আমি আবার এমিলকে দেখলাম। কিন্তু স্বপ্নে। এক শহরে, যেটা গ্র্যনোবলও নয়, প্যারিসও নয়। একটা মস্ত বড় অ্যাভিনিউ, নির্জন, বিষণ্ণ। শীতকাল। জার্মানদের দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু ওরা ছিল সেখানে, পাতাখসা গাছগুলোর পেছনে, দরজার অন্ধকার চৌকাঠের সামনে···আমার হাতে একটা ছোট স্যুটকেস ছিল, আমি তাড়াহুড়ো করছিলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম না চার ঘণ্টা দেরি কার হয়েছে, আমার, না, ট্রেনের। হঠাৎ গুলির আওয়াজ পর পর, যে-মানুষগুলো ওখানে থাকা ছাড়া আর কিছু করে নি তারা পড়তে লাগল···ঐ সব এবং সেই আবছা কাহিনীটাও যা আমি লোকমুখে শুনেছি, একটা লোককে গ্রেপ্তার করে তার কব্জিতে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে তার উপর ওদের কুকুর লেলিয়ে দেয়···ঐ সব···এই সময় এমিল দেখা দিল। একটা চমৎকার ঝকঝকে সাইকেলের উপর ও ছিল। মিউজিক হলের খেলোয়াড়দের যেমন সাইকেল হয় সেই রকম। আমি বুঝতে পারলাম এই সাইকেলটাই ও 'ক্পাইয়ঁ'দের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিল। ও আমার কাছাকাছি এল এবং বলল: "নমস্কার, মসিয়্যো ঝ্যলেপ···" হঠাৎ আমি টের পেলাম আমার পেছনে কিছু ঘটছে। দেখি সেই হলদে বাড়ির বাসিন্দা, সেই মিলিশিয়ার লোকটা। সে এমিলের দিকে বন্দুক তাগ করছিল। আমি চিৎকার করতে চাইলাম। আমার গলায় আওয়াজ আটকে গেল। কিন্তু এমিলই গুলি চালাল, মিলিশিয়ার

লোকটা রাস্তার উপর পড়ে গেল, তার রক্ত ঝরতে লাগল অবিশ্রান্ত…

আমি চমকে জেগে উঠলাম নিজেকেই নিজে ভয় পেয়ে। আমি কি সত্যিই একজন মানুষের মৃত্যু কামনা করছিলাম? লোকে বলে ঐ লোকটাই পাদ্রীর নামে লাগিয়েছিল, জার্মানদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল প্রতিরোধ-যোদ্ধাদের শিবিরে…বাস্তবিক আমি হয়তো জীবনের সব ব্যাপারেই ভুল করেছি। আমি কল্পনায় রোজেৎকে দেখি সাইলেসিয়ার বন্দীশালায়, তার গায়ের রঙে সেই লালের ছোপ। তার হাত, তার চুল এখন কেমন হয়েছে দেখতে? এই তো শীত এসে গেছে। তার নিশ্চয় শীত করছে, ভীষণ শীত। আর সারাদিন খাটুনির ধকল। ভাবলে অসহ্য লাগে। প্রত্যেক দিন একটু বেশি বেশি অসহ্য লাগে।

আমি শহরের মধ্যে গিয়েছিলাম। বাসে সেই হলদে বাড়ির লোকটা ছিল। ভালো পোশাক-পরা। উদ্ধত রকম নতুন…জুতো, ওভারকোট, চামড়ার দস্তানা। বাসটায় ভীষণ ভিড় ছিল। যদি কেউ ঐ লোকটার বুকে ছোরা ঢুকিয়ে দিত, তাহলে ও দাঁড়িয়েই থাকত। অন্যদের চাপে ও সোজা থাকত। ভাবলে শরীর শিউরে ওঠে যে, এমন সব ফরাসীও আছে যারা অন্য ফরাসীদের তুলে দেয় জার্মানদের হাতে। গ্র্যানোবল-এ, ক্লেরমঁ-ফের়াঁয় ওরা হত্যা করতে আরম্ভ করেছে তাদের যাদের ওরা বলে জামীনদার। ওদের খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকে: "মিলিশিয়ার লোকেরা, তোমরা সন্দেহভাজন মানুষগুলোর হদিস রাখো…"

আমি আর এমিলের দেখা পাই না, কিন্তু সর্বত্র মিলিশিয়ার লোকটাকে দেখি। জানি না, আগে তো ওকে এত দেখা যেত না। ও লিয়ঁতে একই ট্রেনে আমার সঙ্গে ছিল। আমার অ্যালার্ম-ঘড়িটা যখন ঘড়ির দোকানে সারাতে নিয়ে গেলাম তখনো সেখানে তাকে দেখলাম। একবার গ্রামাঞ্চলে, সেই ছোট গ্রামটার কাছে যেখানে নীল জানলাওয়ালা একটা মস্ত কারখানা আছে…আমার স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্যে বেড়াচ্ছিলাম। আমরা দুজন একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেলাম। চারদিকের মাঠঘাট জনশূন্য। আমার কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না, হায়রে, আমার কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না।

কশাইকে এখান থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরে রেললাইন পাহারা দিতে মোতায়েন করা হল। একটা পুরো রাত। ও আমাকে বলেছে জার্মানরা এখন পাহারার কাজে তাদের সাহায্য করার জন্যে সাধারণ ফরাসীদের এক-

মিলিশিয়ার লোকদের নিযুক্ত করছে।

আমি যদি জানতাম এমিল কোথায় আছে তাহলে, তাহলে তার কাছে পরামর্শ নিতে যেতাম। সবই এমন ঘটছে যেন এমিল আগের মতোই আমার জীবনে দেখা দিয়ে তার দিক ঠিক করে দিচ্ছে। তাকে কি ওরা মেরে ফেলেছে? আমি তো ঘুরেছি যথেষ্ট। আমি তুলুজ-এ গিয়েছি, মার্সেইতে গিয়েছি। এমিলকে আবার দেখার গোপন ইচ্ছে আমার ছিল। কোনো এক স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, কোনো এক নির্জন রাস্তায় সে কি হঠাৎ দেখা দেবে না? না, দেখা দেয় নি।

মার্শাল টিটোকে নিয়ে কশাই এখনো বিব্রত। শেষ পর্যন্ত সে-ও আমাকে উত্যক্ত করে তুলেছে, ঐ কশাই। টিটো কি তাতে তার কি আসে যাচ্ছে, যখন তিনি হিটলারের বিরুদ্ধে লড়ছেন? ঐ কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমি কেমন কেঁপে উঠলাম। মনে হল আমি যেন এমিলের গলা শুনলাম, ও তার নিজস্ব উচ্চারণে বলছে: "সে স্পেনে রয়েছে, সে হিটলারের বিরুদ্ধে লড়ছে…" তাহলে আমিও তো কশাইয়ের মতো দেখছি; এমনকি আরো খারাপ। এমিল কি বলছে আমি বুঝতে পারছিলাম না, হিটলারের বিরুদ্ধে লড়া। আমার মনোযোগ যাচ্ছিল তার উচ্চারণের দিকে, সে যা বলছিল তার দিকে নয়।

আর সেই ইভন, তার দুই নীল চোখ…সে বন্দীশিবিরে…খারাপ নয় মোটের উপর…খারাপ নয়…এখন ডিসেম্বর। সামনেই বড়দিন। রোজেতের ছেলেমেয়েরা কি দাদুদিদিমার বাড়িতে খ্রীস্টমাসের গাছ পাবে? কত বয়েস হল তাদের? ছেলেটা বড়, তার নিশ্চয় ছ-বছর হল…আর মেয়েটা, মেয়েটা তো জন্মেছিল যখন…

এ বছর শীতটা সাংঘাতিক। আমি আর রেডিও শুনি না, বড্ড বেশি সময় যাচ্ছে, তেমন অদলবদল কিছু হচ্ছে না। গত বছর, এই তিন মাস আগেও আমি মিত্রবাহিনীর অবতরণের জন্যে অপেক্ষা করে ছিলাম। একদিন না একদিন অবতরণ নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু তা আর আমার কাছে অত্যাবশ্যক কিছু মনে হয় না। সেই ভায়রাভাই বা ইভন বা রোজেৎ, ওরা কি মিত্র-বাহিনীর অবতরণের জন্যে অপেক্ষা করে ছিল? হাত লাগাতে হবে। হাত না লাগিয়ে এইভাবে ব্যাপার চলতে দেওয়া যায় না। অস্ত্র, যদি অস্ত্র থাকত। সেই দিন রাস্তায় যখন আমি হলদে বাড়ির লোকটাকে আসতে দেখলাম। আঃ!…অস্ত্র…

আমাকে রোজ সকালে খবরের কাগজ 'প্যাতি দোফিনোয়া' দেয়। সেটা কাগজওয়ালা রেখে যায় আমার দরজার পেছনে, মানে মাছি আটকানোর জাল-মোড়া খোলা পাল্লা আর বন্ধ দরজার মাঝখানে। আমি যখন প্রাতরাশ করি তখন আমার বাড়িওয়ালী কাগজটা এনে আমাকে দেয়। ইদানীং কাগজটা খুব ছোট হয়ে গেছে, সপ্তাহে তিনবার বেরোয়। তারপর আবার গ্র্যানোব্‌ল-এ যখন ঐ সব ব্যাপার ঘটতে থাকে তখন কয়েকবার তো কাগজ আমি পেলামই না। ওরা ওখানে দুজন সাংবাদিককে হত্যা করে। আমি রেডিও আর শুনি না বলে, অন্তত নিয়মিতভাবে আর শুনি না বলে ভিশির মিথ্যে কথায় ভরা এই হাস্যকর কাগজটা সকালে পড়তে কিছু আগ্রহ বোধ করি। কফি গিলতে গিলতে বড় অক্ষরের একটা হেডিং আমার নজরে পড়ল। আবার, তোর নিকুচি···দক্ষিণ ফ্রাঙ্করাইখের জার্মান সামরিক অধ্যক্ষের ইস্তাহার সেটা··· বিজ্ঞপ্তি···তিনজনের প্রাণদণ্ড নিষ্পন্ন···নাৎসী-বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ, ফলে নাৎসী-বাহিনীর ক্ষয়-ক্ষতি···ওরা নাৎসী-বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা শিক্ষা দিত···এবং নাৎসী-বাহিনী যখন ওদের ঘিরে ফেলে তখন ওরা বাধা দেয়। নাৎসী-বাহিনীর এই ভদ্রলোকরা বলছে, তিনজন সন্ত্রাসবাদী। তিনজন সন্ত্রাসবাদীর নাম ওরা দিয়েছে: একজন ছাত্র, যার নামটা যেন আলোয় আলো, দ্বিতীয়জনও ছাত্র, তৃতীয়জন ইস্পাত কারখানার শ্রমিক প্যারিসের এমিল দোর‍্যাঁ।

এমিল···এমিল দোর‍্যাঁ···প্যারিসের···

অস্ত্র···অস্ত্র, আমাকে অস্ত্র দাও! ভগবান সাক্ষী, আমি তো ফরাসী বাহিনীতে লেফটেনাণ্ট ছিলাম। আমি বিদ্রোহীদের অস্ত্র চালানোর শিক্ষা দিতে পারব, আমিও। নাৎসী-বাহিনীর বিরুদ্ধে। নাৎসী-বাহিনীর বিরুদ্ধে। বিদ্রোহী শিবিরের সঙ্গে এখানকার ডাক্তারের যোগাযোগ আছে। লোকের মুখে শুনলাম তিনি এই সেদিন শহরের পাঁচ কিলোমিটার দূরে ফিরে এসেছিলেন। তিনি আমাকে বলতে পারবেন···এমিল···এমিল···নাৎসী-বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি করা···আর ঐ হারামজাদা মিলিশিয়ার লোকদের···আমি লেফটেনাণ্ট ভাঁদেরম্যল্যাঁ, আমি আলুভাতে-মার্কা ঝাক ছনি নই, স্বার্থপর ক্ল্যলেপ নই। এমিল···পাহাড়ে যেখানে বরফ পড়ছে সেখানে আজ বা কাল যে-প্রতিরোধ-দলে গিয়ে সে যোগ দেবে তারা কারা তা নিয়ে লেফটেনাণ্ট ভাঁদেরম্যল্যাঁর একটুও মাথাব্যথা নেই।

কোনো এক মার্শাল টিটো, তিনি ভগবানে বিশ্বাস করুন বা শয়তানে বিশ্বাস করুন কিছু আসে যায় না। তিনি যে হিটলারের বিরুদ্ধে লড়ছেন, হিটলারের বিরুদ্ধে, সেটাই আসল···

প্রিয় এমিল···আজই। তোমার দেখা আমি চিরকালের জন্যে পেয়েছি, এমিল।

আজ লেফটেনান্ট পিয়ের ভাঁদেরম্যলঁ্যা তার জীবন নতুন করে আরম্ভ করছে। সাথীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা চ ল না।

যখন একজন পড়ে যায় তখন আর দশজনের উঠে দাঁড়ানো দরকার।

অনুবাদ ঃ অরুণ মিত্র

দুটি মোমবাতি

সাইমন উইসেনথল

[সাইমন উইসেনথল পোলাণ্ডের গ্যালিশিয়া অঞ্চলের ইহুদি। নাৎসি জহ্লাদেরা তাঁর স্ত্রী ও তাঁকে ছাড়া, তাঁর সমগ্র পরিবারকে বর্বরভাবে হত্যা করে। তিনি ও তাঁর স্ত্রী আটক থাকেন কুখ্যাত দুটি নাৎসি বন্দীশিবিরে। ফ্যাসিস্টদের পরাজয়ের পর উইসেনথল নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়ার কাজে। কুখ্যাত নাৎসি-জল্লাদ আইখ্‌ম্যান গ্রেপ্তার হয় তাঁরই সহায়তায়। রহস্য-কাহিনীর চেয়েও রোমাঞ্চকর ও মর্মন্তুদ তাঁর কিছু অভিজ্ঞতা উইসেনথল সম্প্রতি লিপিবদ্ধ করেছেন 'দি মার্ডারারস অ্যামং আস' গ্রন্থে। এই লেখাটি সেই বইয়েরই 'টু ক্যাণ্ডলস' অধ্যায়ের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। —অনুবাদক]

পোলাণ্ডের কার্পেথিয়ান পর্বতে জ্যাকোপেন নামে একটি শৈলাবাস আছে। আমার শৈশবে ছাত্রাবস্থায় প্রায়ই সেখানে কয়েক সপ্তাহের জন্য যেতাম ছুটি কাটাতে। সময় কেটে যেত কখনো গ্রীষ্মের মনোরম সূর্যালোকে সুদীর্ঘ ভ্রমণে কিংবা কখনো শীতে স্কি খেলে। আজও জ্যাকোপেন আগের মতোই স্কি খেলোয়াড়দের ভিড়ে সরগরম হয়ে ওঠে। এর খুব কাছেই রাবকা নামে একটি ছোট শহর আছে। আর সেই শহরেই সামি রোজেনবাম নামে একটি ছোট ইহুদি ছেলের বাস ছিল। আমি এর কথা প্রথম শুনেছিলাম ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এক সকালে যখন শ্রীমতী রভিৎস নামে জনৈক ভদ্রমহিলা রাবকা থেকে আমার তথ্যকেন্দ্র ভিয়েনায় আসেন। এই সময় জার্মানিতে নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা চলছিল। আর এর জন্য আমার কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন ছিল।

সামি রোজেনবামকে শ্রীমতী রভিৎস বেশ ভালোভাবেই চিনতেন। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী সামি ছিল খুব রুগ্ন আর বিবর্ণ। শীর্ণ মুখ আর কালো বড় বড় চোখে বয়সের তুলনায় তাকে একটু বড়ই দেখাত। সে ছিল সেই সব ছেলেদেরই একজন যারা জীবনের নির্মম সত্যকে অতি অল্প বয়সেই বুঝে ফেলেছিল এবং তাদেরই একজন যারা কখনো প্রাণভরে হাসতে জানত না। ১৯৩৯ সালে সামির বয়স ছিল নয় বছর। আর ঠিক এই সময়েই পোলাণ্ড অভিযানের গোড়ার দিকে জার্মানরা রাবকা শহরে ঢুকে পড়ে ইহুদিদের রাতের ঘুম কেড়ে

নেয়। এর আগে এই শহরের জীবনযাত্রা মোটের উপর স্বাভাবিকই ছিল। অর্থাৎ পোলাণ্ডে একজন দরিদ্র ইহুদির জীবন যতটা স্বাভাবিক হতে পারত ঠিক ততটাই। সামির বাবা পেশায় ছিলেন একজন দর্জি। দিনরাত পরিশ্রম করে সামান্যই আয় হত তাঁর। রোজেনবামদের মতো পরিবারই ছিল নাৎসি অভিযানের মূল লক্ষ্য। আর অভিযান চলেও ছিল পুরো এক বছর ধরে।

একটি পুরনো ধরনের অন্ধকার বাড়ির দুখানা স্যাঁতসেঁতে ঘর আর একখানা ছোট রান্নাঘর, এই ছিল রোজেনবাম-পরিবারের আস্তানা। তবুও ওরা সুখী ও ধর্মানুরাগী ছিল। সামি এই বয়সেই প্রার্থনা করতে শিখেছিল। প্রতি শুক্রবার রাতে বাড়িতে মোমবাতি জ্বেলে রেখে সে তার বাবার সঙ্গে সিনাগগে যেত। আর বাড়িতে তখন তার মা আর তিন বছরের বড় দিদি পলা রান্না করত।

জার্মানরা পোলাণ্ড দখল করার পর এসব কিছুই শুধুমাত্র স্মৃতিচারণার ব্যাপার হয়ে রইল। ১৯৪০ সালে রাবকার আশেপাশের জঙ্গলে পোলদের যে সামরিক ব্যারাক ছিল তার জায়গায় জার্মান ঝটিকাবাহিনীর লোকেরা একটি পুলিশী শিক্ষাশিবির তৈরি করল। এটা কোনো শিক্ষাশিবির ছিল না। এখানে শিক্ষা দেওয়া হত তাদেরই যারা ভবিষ্যতে পাকাপোক্ত জল্লাদ হয়ে উঠবে। ঝটিকা-বাহিনীর অধিনায়কের নির্দেশে বন্দী ইহুদিদের এখানে গুলি করে হত্যা করা হত। দৈনিক এমন খুনের পরিমাণ দাঁড়াত পঞ্চাশ, একশ কিংবা কখনো দেড়শর উপরে। আর এইরকম কঠোর ট্রেনিংয়ের উদ্দেশ্যই ছিল যাতে কয়েক সপ্তাহ কাজের চাপে স্বেচ্ছাসেবকরা স্নায়ুর চাপে ভেঙে না পড়ে। আর দৃষ্টি রাখা হত যাতে রক্তপাত, শিশু আর নারীর আর্তচিৎকার—এ সব কিছু সম্পর্কেই তাদের চৈতন্য লুপ্ত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে নাৎসিদের সর্বাধিনায়কের নির্দেশ ছিল স্পষ্ট—হৈ চৈ কম করো আর দক্ষতার সঙ্গে মানুষ খুন করে যাও।

হামবুর্গের উইলহেল্‌ম রোজেনবাম ছিল এই ধরনের একটি শিক্ষাশিবিরের অধিনায়ক। ঝটিকাবাহিনীর আর দু-দশ জনের মতো সেও ছিল অবিশ্বাসী, হিংস্র আর নিজের "উদ্দেশ্য" সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়যুক্ত। সে যখন একখানা ঘোড়সওয়ারের চাবুক নিয়ে রাস্তায় টহল দিত, রাবকা শহরের সবাই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে আশেপাশের কোনো না কোনো বাড়িতে দরজা বন্ধ করে লুকিয়ে থাকত। ১৯৪২ সালের গোড়ার দিকে একদিন রোজেনবাম নির্দেশ দিল যে রাবকা শহরের সমস্ত ইহুদিদের স্থানীয় শিক্ষাশিবিরে নাম "তালিকাভুক্ত" করাতে হবে।

ইহুদিদের কাছে এমন নির্দেশের মানে ছিল অতি স্পষ্ট। রুগ্ন আর বৃদ্ধদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠিয়ে দেওয়া হত বন্দিশিবিরে। আর অবশিষ্টদের পাঠানো হত নাৎসি বাহিনীর লোকদের নানা ধরনের কাজ করার জন্য।

এইভাবে নাম তালিকাভুক্ত হওয়ার পর ঝটিকাবাহিনীর অধিনায়ক উইলহেল্‌ম রোজেনবাম তার দুজন সহকারী হেরমান ওডার আর ওয়াল্টার প্রোচ্‌কে* নিয়ে একদিন শিক্ষাশিবিরে হাজির হল। রোজেনবাম তালিকাটি পড়ল। তারপর অকস্মাৎ টেবিলের উপর সজোরে কশাঘাত করল। চিৎকার করে উঠল চাবুক খাওয়া মানুষের মতো, "এর মানে কি? ইহুদিদের নাম রোজেনবাম! এই ইহুদি কুকুরগুলো আমার অমন সুন্দর জার্মান নাম রাখার দুঃসাহস পায় কোথা থেকে? আচ্ছা, ঠিক আছে। এদের কি করে উচিৎ শিক্ষা দিতে হয় তা আমি জানি।" নাৎসি অধিনায়ক একটু অনুসন্ধান করলেই বোধহয় একথা জেনে বিস্মিত হত যে তার অমন সাধের জার্মান নাম সাধারণত ইহুদিদেরই হয়। অবশ্য এমনও কখনো দেখা যেত রোজেনবাম নামধারী কাউকে, যে হয়তো ইহুদি নয়।

উইলহেল্‌ম রোজেনবাম নামের তালিকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেদিন থেকে রাবকা শহরের সবাই বুঝল যে রোজেনবাম পরিবারের দিন ঘনিয়ে এসেছে। অন্যত্রও অনেকে গ্রেপ্তার হয়েছে বা প্রাণ হারিয়েছে শুধুমাত্র এইজন্য যে তাদের নাম ছিল হয় 'রোজেনবার্গ' অথবা তারা ছিল ইহুদি। আবার কোথাও একই দশা ঘটেছে শুধুমাত্র নামের শুরুটা এডল্‌ফ কিংবা হেরমান হওয়ার জন্য।

সেই থেকে রাবকা শহরে নাৎসিদের শিক্ষাশিবির সম্পর্কে এক আতঙ্কের গুজব ছড়িয়ে পড়ল। জঙ্গলের মাঝখানে একটি জায়গা পরিষ্কার করে নাকি তৈরি করা হয়েছে বধ্যভূমি। আর সেখানে হাতে কলমে মানুষ খুন করা শেখানো হয়। ঝটিকাবাহিনীর শিক্ষানবীশরা মানুষ খুন করে। আর

* ওডার এবং প্রোচ্‌ উভয়েই ছিল যুদ্ধাপরাধী হিসাবে আমার (লেখকের—অনুবাদক) প্রথম 'মক্কেল'। ১৯৪৭ সালে সাল্‌জবার্গ-এর কাছে স্ট্রোম্‌বার্গ-মন্‌ডসী গ্রামে প্রোচ্‌কে প্রথম দেখা যায়। পরবর্তীকালে বিচারে ওর ছয় বছর জেল হয়। ওডারও ছিল এক অস্ট্রীয়ান। সে লিন্‌জ-এ গ্রেপ্তার হয়। পরে অবশ্য আমেরিকানদের হস্তক্ষেপে সে মুক্তি পায়। বর্তমানে ওডার লিন্‌জ-এ একজন শাঁসালো ব্যবসায়ী। —অনুবাদক

চিকিৎসকের অনাসক্তি নিয়ে রোজেনবাম আর তার সহকারীরা লক্ষ্য করে শিক্ষানবীশদের উপর এই খুনের প্রতিক্রিয়া কেমন হচ্ছে। ইহুদি আর পোলরা হচ্ছে এই ট্রেনিংয়ের জীবন্ত উপাদান আর গেস্টাপো বাহিনীর লোকেরা ঘুরে ঘুরে এদের ধরে আনে। যদি কোনো শিক্ষানবীশ দুর্বলতা দেখায় তৎক্ষণাৎ খুনে বাহিনী থেকে তার নাম কেটে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এ সমস্ত ঘটনাই শ্রীমতী রভিৎস জানতেন। কারণ, তাঁর নামও তালিকাভুক্ত হওয়ার পর তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ঝটিকাবাহিনীর শিক্ষাশিবিরে ঝিয়ের কাজ করার জন্য। তাঁর নিজের কথায়, "ঝটিকাবাহিনীর লোকেরা যখন জঙ্গল থেকে ফিরে আসত আমাকে তাদের জুতো সাফ করতে হত। আর এগুলো সব সময়েই থাকত রক্তমাখা।"

রোজেনবাম পরিবারটিকে গ্রেপ্তার করা হয় ১৯৪২ সালের জুন মাসে এক শুক্রবারের সকালে। এই ঘটনার দুজন প্রত্যক্ষদর্শী বর্তমানে ইস্রায়েলে বাস করেন। ওঁরা বলেন যে সঠিক তারিখটা স্মরণে না থাকলেও সেদিন যে শুক্রবার ছিল এটা তাঁদের স্পষ্ট মনে আছে। এঁদেরই একজন সেদিন শিক্ষাশিবিরের পিছনের খেলার মাঠের মুখোমুখি একটা বাড়িতে কাজ করছিলেন। ঠিক সেই সময় তিনি দেখতে পান যে ঝটিকাবাহিনীর দুজন লোক রোজেনবাম পরিবারটিকে স্বামী, স্ত্রী ও পনেরো বছরের কন্যা সহ ধরে আনছে। আর ওদের পিছনেই ছিল দলনায়ক উইলহেল্‌ম রোজেনবাম।

সাক্ষী শপথ করে বলেন, "মা আর মেয়েকে শিক্ষাশিবিরের এক কোণে নিয়ে যাওয়া হল এবং আমি কিছু গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর আমি দেখলাম নাৎসি রোজেনবাম তার ঘোড়সওয়ারের চাবুক দিয়ে ইহুদি রোজেনবামকে প্রহার করছে আর চিৎকার করছে, 'ইহুদি কুত্তা, আমার জার্মান-নাম নেওয়ার মজা এবার তোকে টের পাইয়ে দেবো!'

এই কথা বলে ঝটিকাবাহিনীর অধিনায়ক রোজেনবামকে গুলি করল। হয়তো দুইবার কিংবা তিনবার। আমার ঠিক মনে নেই, আসলে আমি তখন ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম।"

ঝটিকাবাহিনীর লোকেরা যখন রোজেনবামদের গ্রেপ্তার করতে আসে তখনো তাদের সকালের খাওয়া শেষ হয় নি। সামি তখন কাছেই জাক্রিতিতে একটি বড় পাথরের খাদে কাজ করছিল। তার এই বারো বছর বয়স থেকেই সামিকে বাধ্যতামূলক শ্রমে নিযুক্ত হতে হয়েছিল। সমস্ত সমর্থ ইহুদিকেই

কাজ করতে হত, আর সামিকে এখন পরিণত ব্যক্তি হিসেবেই ধরে নেওয়া হল। কিন্তু দুর্বল আর অপুষ্ট হওয়ার জন্য শুধুমাত্র পাথর বাছাই করা আর ছোট ছোট পাথরের চাঙড়গুলোকে ট্রাকে বোঝাই করা ছাড়া অন্য কোনো কাজই সে করতে পারত না।

সেই খাদ থেকে সামিকে গ্রেপ্তার করে আনার জন্য দুজন নিরস্ত্র ইহুদি পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। শিক্ষাশিবিরে ব্যস্ত থাকার জন্য নাৎসিরা এই রকম বহু নিরস্ত্র ইহুদি পুলিশ পাঠাত অন্যান্য ইহুদিদের ধরে আনার জন্য। এই ইহুদি পুলিশই পরে শ্রীমতী রভিৎসকে বলেছিল সামিকে গ্রেপ্তার করার পর থেকে ঠিক ঠিক কি ঘটেছিল। একটি ছোট ঘোড়ায় টানা গাড়ি নিয়ে সে প্রথম জাক্রিতিতে যায়। গাড়ি খাদের কাছে থামিয়ে সে প্রথম সামি রোজেনবামকে ইশারা করে। অন্যান্য ইহুদি শ্রমিকরা আর তাদের দুজন নাৎসি রক্ষী মুহূর্তের জন্য কাজ বন্ধ করে সেই দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। প্রথমে হাতে ধরে রাখা বড় পাথরের টুকরোখানাকে সামি ট্রাকে রাখল। তারপর সে এগিয়ে গেল গাড়িখানার দিকে। তার পক্ষে অনুমান করা শক্ত ছিল না তার ভবিষ্যৎ এখন কিভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

ইহুদি পুলিশটির দিকে তাকিয়ে সামি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, 'আমার মা, বাবা, দিদি—এরা সব কোথায়?'

রক্ষীটি কোনো কিছুই উত্তর দিতে পারল না, শুধুই মাথা নাড়ল।

সমস্ত ব্যাপারটাই এখন সামির কাছে খুব স্পষ্ট। সে খুব শান্তভাবে বলল, "জানি ওরা আর নেই। বহু দিন ধরেই আমি জানতাম এমনটি ঘটবে। কারণ, আমাদের নাম যে রোজেনবাম।"

সেই রক্ষীটি এবার একটু ঢোক গিলল, সামি যেন কিছুই লক্ষ্য করল না।

"এবার তাহলে আমার পালা", সামির কণ্ঠস্বর নিরুত্তাপ আর আবেগহীন। তারপর সে গাড়িতে উঠে ইহুদি রক্ষীটির পাশে তার জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়ল।

ইহুদি রক্ষীটির পক্ষে কোনো কথা বলাই সম্ভব ছিল না। সে ভেবেছিল সামি হয়তো কান্নায় ভেঙে পড়বে কিংবা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। জাক্রিতিতে আসবার সময় সে সারা পথই ভেবেছে, সে কি ছেলেটিকে জঙ্গলে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেবে। হয়তো সেখানে আত্মগোপনকারী পোলরা তাকে আশ্রয় দিতে পারবে। কিন্তু তখন আর সে সুযোগটুকুও নেই। দুজন

সশস্ত্র ঝটিকাবাহিনীর লোক এখন শ্যেন দৃষ্টিতে তাদের উপর নজর রাখছে।

ইহুদি রক্ষীটি এবার সামিকে সেদিন সকালে কি ঘটেছিল সে-সম্পর্কে সব কিছুই বলল। সামি এবারে তাদের বাড়ির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়াবার অনুমতি চাইল। গাড়ি থামতেই নিঃশব্দে নেমে সে তাদের বসবার ঘরে ঢুকল। সদর দরজা তেমন খোলাই পড়ে রইল। টেবিলের পরে অর্ধেক খালি চায়ের পেয়ালা-গুলো তখনও পড়ে রয়েছে। সামি ঘড়ির দিকে তাকাল। বেলা তখন সাড়ে তিনটের মতো হবে। তার মা, বাবা আর দিদিকে এতোক্ষণ নিশ্চয়ই শেষ করে দেওয়া হয়ে গেছে এবং তাদের স্মৃতির উদ্দেশে নিশ্চয়ই কেউ কোনো মোমবাতি জেলে দেয় নি। এবারে ধীরে ধীরে আর যান্ত্রিকভাবে সামি টেবিলটা পরিষ্কার করে তার উপর গুটিকয়েক মোমবাতি বসিয়ে দিল। তারপর সে তার টুপিটা মাথায় দিয়ে বাতিগুলো জ্বালাতে আরম্ভ করল। তার বাবা মা আর দিদি—প্রত্যেকের স্মৃতির উদ্দেশে সে দুটি করে বাতি জেলে মৃতদের প্রতি সে তাদের ধর্মীয় প্রার্থনা "ক্যাডিশ" আবৃত্তি করল।

সামি ছেলেবেলা থেকেই এই রকম প্রার্থনা করতে শিখেছিল। সে দেখেছিল তার বাবা পিতামহদের উদ্দেশে এইভাবে প্রার্থনা করতেন। আর এখন তো সেই তাদের পরিবারের একমাত্র জীবিত ব্যক্তি। নিষ্পলক দৃষ্টিতে জেলে দেওয়া ছটি মোমবাতির দিকে তাকিয়ে সামি আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল যেন হঠাৎ-ই কোনো কিছু তার স্মৃতিকে আলোড়িত করেছে। তারপর সে আরও দুটো মোমবাতি টেবিলের পরে রেখে জেলে দিল আর প্রার্থনা করল। এটা হয়তো নিজের মৃত্যু সম্পর্কে তার পূর্ব অনুভূতি।

সামি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে গাড়িতে বসল। সদর দরজা খোলাই পড়ে থাকল। ইহুদি রক্ষীটি এতোক্ষণে কাঁদতে শুরু করেছে। সামি কিন্তু একটুও কাঁদল না। কোনোরকমে চোখ মুছে রক্ষীটি এবার ঘোড়ায় লাগাম দিল। এবারে কিন্তু বাঁধভাঙা বন্যার মতো রক্ষীটির দুচোখ বেয়ে কান্নার ধারা নেমে এল। সামি তখনও নির্বাক। সে নিঃশব্দে রক্ষীটির পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। বোঝাতে চাইল যে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার অপরাধ-বোধের পীড়ন থেকে সে রক্ষীটিকে মুক্তি দিতে চায়। গাড়ি ততক্ষণে দ্রুত গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেছে। উইলহেল্‌ম রোজেনবাম আর তার 'চেলা'রা এই ছোট ইহুদি ছেলেটির জন্যই এতোক্ষণ অপেক্ষা করছিল।

এ সমস্ত ঘটনা শোনার পর রাবকার সেই ভদ্রমহিলাকে আমি জানালাম যে

ঝটিকাবাহিনীর এই শিক্ষাশিবিরের কথা ১৯৪৬ সাল থেকে আমি জানি। উইল্‌হেলম রোজেনবাম-এর বিরুদ্ধে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ কয়েক বছর আগে আমি হামবুর্গের কর্তৃপক্ষকে দিয়েছি। এখন তার বিরুদ্ধে নতুন মামলা দায়ের করার সাক্ষ্যপ্রমাণও পাওয়া গেল। আমি আরও জানালাম যে, উইল্‌হেলম রোজেন-বামকে১ ৯৬৪ সালে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং সে হামবুর্গে একজন বিচারাধীন বন্দী হিসেবে রয়েছে।

উইল্‌হেলম রোজেনবামের বিরুদ্ধে শ্রীমতী রভিৎস হলফনামায় সই করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এ কথাটা তাঁর কাছে কিছুতেই বোধগম্য নয় যে এত মানুষ খুন করার পরও কি করে তাদের হত্যাকারী আজও বেঁচে থাকে।

সামি রোজেনবামের সমাধিতে তার স্মৃতির উদ্দেশে আজও কেউ কোনো ফলক রচনা করে নি। রাবকার সেই মহিলাটি আমার তথ্যকেন্দ্রে না এলে তাঁর কথা কেই বা জানত। কিন্তু আজও প্রত্যেক বছর ১লা জুন আমি সামি রোজেনবামের সমাধিতে দুটি মোমবাতি জ্বেলে দিয়ে আসি আর তার স্মৃতির উদ্দেশে প্রার্থনা জানাই।

অনুবাদ : দেবপ্রসাদ ঘোষ

মৃত্যুহীন লেনিনগ্রাদ

আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ

[সাংবাদিক আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থের জন্ম ১৯০১, তদানীন্তন রুশ দেশের রাজধানী পেট্রোগ্রাদে, অর্থাৎ লেনিনগ্রাদেই। বিপ্লবের পর তিনি ইংলণ্ডে চলে আসেন ও সেখানেই বসবাস করেন। ১৯৪১-এর ২ জুলাই প্রথম ইংরেজ সাংবাদিক হিসেবে তিনি বিমানযোগে লেনিনগ্রাদ যান ও সমগ্র যুদ্ধের যুগ (১৯৪১-৪৫), বিখ্যাত 'সানডে টাইমস' পত্রিকার সংবাদদাতা হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নেই থাকেন। সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১৯৬৪তে তিনি একটি অসামান্য গ্রন্থ রচনা করেন : 'রাশিয়া অ্যাট ওয়ার'। সেই বইয়েরই একটি অধ্যায়ের কিছুটা অংশ এখানে অনুবাদ করা হল। যে লেনিনগ্রাদের ৫ লক্ষ মানুষ ফ্যাসিস্টবিরোধী মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন, কিন্তু লেনিনের শহরকে ফ্যাসিস্ট দস্যুদের হাতে তুলে দেন নি—এখানে সেই শহরের অমোঘ বীরত্বের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। —অনুবাদক]

স্মরণে রাখার মতো অন্য একটি ঘটনা হল, ফ্রন্ট থেকে তিন-চার মাইল দূরে শহরে এক অংশ আধুনিক অস্ত্র ও কামানের গোলায় বিধ্বস্ত ট্যামবভ স্ট্রীটের একটি স্কুলবাড়ি পরিদর্শন। এটি পরিচালনা করতেন টিকোমিরভ নামে একজন বয়স্ক ব্যক্তি, যিনি "সোভিয়েত দেশের অন্যতম একজন ভালো শিক্ষক" এই সুনাম অর্জন করেছিলেন। মাত্র ১৯০৭-এ একজন সাধারণ শিক্ষক হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন। চরম দুর্ভিক্ষের দিনগুলিতেও যেসব স্কুল বন্ধ হয়ে যায় নি, এটি তাদের মধ্যে একটি। চার-চার বার স্কুলটি জার্মান গোলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু স্কুলের ছেলেরাই ভাঙা কাঁচের টুকরো সাফ করে, ভাঙা দেওয়াল সারিয়ে জানালাগুলোতে প্লাইউড লাগিয়ে নিয়েছে। গত মে মাসের শেষ গোলাবর্ষণে একজন শিক্ষয়িত্রী স্কুলের প্রাঙ্গণেই মারা পড়েছেন।

স্কুলের ছেলেগুলো লেনিনগ্রাদের ছেলেদের যেমনটি হওয়া উচিত, ঠিক যেন তাই। শতকরা পঁচাশি ভাগ ছেলেদের বাপেরা এখনও ফ্রন্টে লড়াই করছেন। কারো বাবা লড়াইয়ে মারাই পড়েছেন, আবার কারো বাবা হয়তো লেনিন-গ্রাদের দুর্ভিক্ষে অনাহারে মারা গেছেন। আর এদের মায়েরা, যাঁরা এখনও বেঁচে আছেন, তাঁদের প্রায় সবাই হয় লেনিনগ্রাদের ফ্যাক্টরিগুলিতে উৎপাদনের কাজ করছেন, বা যানবাহন পরিচালনা করছেন, বা কাঠের কাজ করছেন,

নয়তো সিভিল ডিফেন্সের কাজে রয়েছেন। জার্মানদের প্রতি এই ছেলেদের রয়েছে প্রবল ঘৃণা। কিন্তু এরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে এই 'বেজন্মা'গুলো লেনিনগ্রাদের বাইরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আমেরিকা ও ব্রিটেনের প্রতি রয়েছে এদের মিশ্র ভালবাসা। এরা জানে যে, লণ্ডন শহরেও বোমা পড়ছে, ইংলণ্ডের রাজকীয় বিমানবহর জার্মানদের উপর বোমা ফেলছে, আমেরিকা লরি দিয়ে লালফৌজকে সাহায্য করছে এবং এরা যে চকোলেট খাচ্ছে, তাও আমেরিকারই দেওয়া। তবুও এরা ক্ষুণ্ণ যে আজ পর্যন্ত দ্বিতীয় ফ্রন্টই খোলা হল না।

হেডমাস্টার কমরেড টিকোমিরভ আমায় বললেন কিভাবে স্কুলটা রক্ষা করেছেন এবং সেটি করেছেন বেশ ভালোভাবেই। "আমাদের কাঠের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। লেনিনগ্রাদ সরকার ধ্বংসস্তূপের কাছেই একটা ছোট্ট কাঠের বাড়ি দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। ভাঙা কাঠের টুকরোগুলো আমরা আগুন জ্বালাবার কাজে লাগাতাম। সেদিনগুলোতে চলত অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ। ছেলেমেয়ে মিলে আমাদের ছাত্রসংখ্যা একশ কুড়ির মতো, তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে গিয়ে আমরা ক্লাস চালাতাম। ক্লাস আমরা একদিনের জন্যও বন্ধ করি নি। খুব ঠাণ্ডা পড়েছে, ছোট্ট স্টোভ সামান্য একটু জায়গা গরম রাখত, আশ্রয়স্থলের বাকি জায়গার তাপমাত্রা ঠাণ্ডায় শূন্য ডিগ্রিরও নিচে নেমে যেত। এক কেরোসিনের কুপি ছাড়া আমাদের আলোর আর কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। তবুও আমরা কাজ চালিয়ে যেতাম। আমাদের ছেলেরা এত বেশি মনোযোগী এবং আগ্রহী ছিল যে, অন্যান্য বারের চেয়েও আমরা অনেক ভালো ফল দেখাতে পেরেছিলাম। অবাক লাগলেও, সত্যি। স্কুলে ছাত্রদের জন্য খাবার ব্যবস্থা ছিল, সেনাবাহিনীর উপর ভার ছিল খাবার যোগানোর। অনাহারে বেশ কিছু শিক্ষক মারা গেছেন, কিন্তু আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, আমাদের তত্ত্বাবধানে যারা ছিল তাদের সবাই মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে। তবে দুর্ভিক্ষের দিনগুলোতে ওদের দিকে তাকালে দুঃখ হত। ১৯৪১-এর শেষের দিকটায় ওদের অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ের মতো দেখাত না— এরা যেন বোবা হয়ে গিয়েছে, ভালো করে হাঁটতে পারত না, কেবলি চাইত বসে বসে থাকতে। কিন্তু এদের কেউই মারা যায় নি, একমাত্র যারা স্কুলে আসা বন্ধ করে বাড়িতে ছিল, তারাই পরিবারের অন্যান্য সকলের সঙ্গে না খেয়ে মারা যায়…।"

এর পর টিকোমিরভ আমায় একটি মূল্যবান দলিল দেখালেন: দুর্ভিক্ষের সময়ের কয়েকটি তথ্য। এতে রয়েছে দুর্ভিক্ষের সময়ে লেখা ছেলেমেয়েদের রচনার কিছু অংশ এবং আরও কিছু তথ্য। লাল রঙের ভেলভেটে মোড়ানো, মার্জিনে রয়েছে জল রঙে ছেলেদের আঁকা সব ছবি—সৈন্য, ট্যাঙ্ক, উড়োজাহাজ ইত্যাদি। পাশে ছোট ছোট টাইপ করা কাগজে লেখা: দুর্ভিক্ষের সময়ে রচিত কয়েকটি বিশেষ রচনা। একজন তরুণী লিখছে:

"২২শে জুন পর্যন্ত আমরা সবাই কাজকর্ম করেছি এবং আমাদের জীবন নিরুপদ্রবভাবেই কেটেছে। ঐ দিনে আমরা কিরভ দ্বীপে বেড়াতে গিয়েছি। সমুদ্র থেকে স্বচ্ছ বাতাস বইছিল এবং সেই বাতাসে ভেসে আসছিল ছোট ছোট ছেলেদের মিষ্টি গান: 'আমার দেশ মহান ও গৌরবময়।' তারপরই শত্রু হানা দিল আমাদের শহরে, আরও কাছে এগিয়ে এল। আমরা বড় বড় ট্রেঞ্চ খুঁড়তে লেগে গেলাম। কাজটা খুবই কঠিন। আমাদের অনেকেরই এত কষ্টসাধ্য কাজ করার অভ্যাস ছিল না। জার্মান সেনাপতি ভন লীব্ আনন্দে যেন মাংসের টুকরো চাটছিল এই ভেবে যে অস্টোরিয়া সহজে দখল করে নিয়েই আহ্লাদে ভোজ খাবে। এখন আমরা বসে আছি নিরাপদ আশ্রয়ে একটা ভাঙা স্টোভ ঘিরে। আমাদের গায়ে কোট, মাথায় ফারের টুপি আর হাতে রয়েছে দস্তানা। আমরা আমাদের সেনাবাহিনীর জন্য উল বুনছি এবং ওদের খবরা-খবর ওদের আত্মীয়বন্ধুদের কাছে পৌছে দিচ্ছি। বাঁচার জন্য আমরা লৌহেতর ধাতুদ্রব্যও যোগাড় করছিলাম··· ।"

ভ্যালেন্টিনা সলোভিতভা, ষোড়শ বর্ষীয়া এক তরুণী লিখছে:

"২২শে জুন, দিনটি আমাদের কাছে কি বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ। আগে ছিল এটা একটা সাধারণ গ্রীষ্মের দিন। আগে আগে এই সময়ে স্ত্রী, মেয়ে, বাচ্চারা আসত গৃহকমিটিতে, সিভিল ডিফেন্স টিম বা অগ্নিনির্বাপক বা গ্যাসনিবারক দলে নাম লেখাতে··· । কিন্তু সেপ্টেম্বরের মধ্যেই আমাদের শহর শত্রু ঘিরে ফেলল। শহরে বাইরে থেকে খাবার আসা বন্ধ হয়ে গেল। লেনিনগ্রাদের মানুষগুলো কোমরবন্ধ আরও শক্ত করে উঠে দাঁড়াল। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে উঠল, কাটা ঝোপঝাড় দিয়ে ট্যাঙ্কের পথ বন্ধ করা হল। শহরের চারদিকে নিরাপদ আশ্রয় তৈরি হল এবং শত্রুকে আক্রমণের পরিকল্পনাও করা হল।

"১৯১৯-এর মতো এবারেও মনে একই সংশয়: 'লেনিনগ্রাদ কি সোভিয়েতের শহর থাকবে, না হাতছাড়া হয়ে যাবে?' লেনিনগ্রাদ আক্রান্ত। কিন্তু, লেনিন-

গ্রাদের শ্রমিকেরা তাকে বাঁচাতে দল বেঁধে এগিয়ে এল। রাস্তায় রাস্তায় ট্যাঙ্ক গর্জে উঠল। সর্বত্র সিভিল গার্ড তৈরি হল···। প্রচণ্ড শীত এসে পড়ল। শত্রুদের বিমান থেকে বোমাবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ইস্তাহার ছড়ানো হল। তাতে লেখা, ওরা লেনিনগ্রাদ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে, আমরা অনাহারে মারা পড়ব। ওরা ভেবেছিল, আমরা ভয় পেয়ে যাব, তা না হয়ে আমাদের মনের জোর আরও বেড়ে গেল···। লেনিনগ্রাদ শত্রুসেনাদের পথ ছাড়বে না। শহর উপবাস করছে, তবু বেঁচে আছে, কাজ করছে এবং লড়াইয়ে তার ছেলেমেয়েদের আরো বেশি বেশি করে পাঠাচ্ছে। ক্ষিদেয় হাঁটু কাঁপছে, তবু শ্রমিকরা কলেকারখানায় কাজ করে চলেছে। বিমান আক্রমণের সংকেতধ্বনির সঙ্গে কারখানার চোঙার শব্দে বাতাস মুখর হয়ে উঠছে···।"

আর একটি লেখা, যখন জার্মান সৈন্যরা লেনিনগ্রাদের দিকে এগিয়ে এল তখন কিভাবে স্কুলের ছেলেরা ট্রেঞ্চ কেটেছে :

"আগস্ট মাস, আমরা পঁচিশ দিন যাবৎ ট্রেঞ্চ কেটেছি। আমাদের উপর মেশিনগানের গুলি চলেছে, আমাদের কেউ কেউ মারাও পড়েছে। কাজটা ভালোভাবে করতে না পারলেও আমরা কাজ বন্ধ রাখি নি। আমাদের কাটা ট্রেঞ্চের সামনেই জার্মান সৈন্যদের থমকে দাঁড়াতে হল···।"

ষোড়শ বর্ষীয়া লুবা ভেরশ্চেনকোভা লিখছে কিভাবে অবরুদ্ধ অবস্থার বিভীষিকাময় দিনগুলিতেও স্কুলে কাজকর্ম হয়েছে :

"জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে ভয়ানক কুয়াশা পড়েছে, হিটলার-বাহিনী সে সুযোগে ঢুকে পড়েছে। কুয়াশার ঘনত্ব ত্রিশ ডিগ্রির কম তো নয়ই। এরই মধ্যে স্টোভ ঘিরে আমাদের ক্লাস চলেছে। আমাদের কারো কোনো নির্দিষ্ট বসবার জায়গা ছিল না, যে আগে আসবে সেই স্টোভের বা পাইপের কাছে বসে পড়াশুনো করতে পারত। স্টোভের মুখোমুখী দরজার দিকটায় বসতেন আমাদের মাস্টার মশাই। বসা মাত্রই তোমার একটা আরাম বোধ হবে। উষ্ণতা যেন চামড়া ভেদ করে হাড়ের মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছে। ক্লান্তিতে তুমি ভেঙে পড়বে। যেন আর কিছু করতে ইচ্ছে করছে না, কেবলি ঘুম ঘুম পাচ্ছে, এবং আরও গরম চাইছে। উঠে দাঁড়িয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে যাওয়াটা খুব কষ্টকর ঠেকবে···। ব্ল্যাকবোর্ডের কাছটা এত ঠাণ্ডা আর অন্ধকার! যেন দস্তানাপরা তোমার হাতটা ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে জমে যাচ্ছে। কাজ করতে পারছ না। হাত থেকে খড়িটা পড়ে যাচ্ছে। লেখাগুলো যেন এঁকেবেঁকে

যাচ্ছে···। তৃতীয় অধ্যায় পড়ানো শুরু হতে দেখা গেল আগুন নিবে এসেছে। স্টোভটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, পাইপের মধ্য দিয়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগল। উঃ, ভীষণ ঠাণ্ডা। তখন ভাসয়া পুগীন্ নামে একটি ছেলে দুষ্টুমি-ভরা মুখ নিয়ে চুপিচুপি বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বিশেষ প্রয়োজনের জন্য জমানো আনা ইভানভনার কাঠের স্তূপ থেকে কয়েক টুকরো কাঠ নিয়ে এল। মাত্র কয়েক মিনিট, তারপরই ম্যাজিকের মতো স্টোভের মধ্য থেকে কাঠের ঘরঘর শব্দ শোনা গেল ··। টিফিনের সময়ও কেউ উঠল না। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় করি-ডোরে যাবার কারও ইচ্ছা ছিল না।”

অপর একটি লেখা থেকে :

“কঠোর ও নির্দয় ভাবে শীত বেশ জাঁকিয়ে এল। জলের পাইপগুলো ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে গেল, বিজলী নেই, রাস্তার ট্রামগুলো চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল। আমি শহরের বাইরে থাকি, তাই সময়মতো স্কুলে পৌঁছুতে হলে আমায় খুব ভোরে উঠতে হত। তুষারঝড়ের পরেপরেই স্কুলে যাওয়াটা আমার পক্ষে ভয়ানক কষ্টের ব্যাপার হত, কেননা রাস্তাঘাটগুলো থাকত বরফে ঢাকা। তবু আমি ঠিকই করে ফেলেছিলাম যে এক বছরের মধ্যে আমি পড়া শেষ করে ফেলব···। একদিন একটানা ছ-ঘণ্টা রাস্তায় রুটির লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম। ফলে ঠাণ্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। (সেই প্রথম দিন, স্কুল কামাই হল, কেননা গত দুদিন আমি রুটি যোগাড় করতে পারি নি।) ঐ অসুখের দিন-গুলো আমার কি বিচ্ছিরি না লেগেছে। শরীর খারাপ বলে নয়, স্কুলে বন্ধুদের হাসিঠাট্টায় মনে জোর পেতাম, তা থেকে বঞ্চিত হলাম বলে···।”

ছেলেমেয়েদের যারা স্কুলে যেত, তাদের কেউ না খেয়ে মারা যায় নি, তবে বেশ কিছু মাস্টার মশাই অনাহারে মারা গিয়েছেন। ‘দুর্ভিক্ষের কয়েকটি তথ্য’ বইয়ের শেষ পরিচ্ছেদে যেখানে লাল জলরঙে আঁকা অংশটায় মৃতদের প্রতি শোক প্রকাশ করা হয়েছে, সে অংশটা লিখেছেন হেড মাস্টার টিকোমিরভ। এই অংশে মৃতদের তালিকায় অনেক মাস্টার মশাইয়ের নাম রয়েছে যাঁরা হয় লড়াইয়ে, না হয় অনাহারে মারা গিয়েছেন। সহকারী প্রধান শিক্ষক ‘লড়াই’-এ প্রাণ হারিয়েছেন। অন্য একজন প্রাণ দিয়েছেন ‘কিংগিসেপের লড়াই’-এ। এটা ভয়ঙ্কর লড়াই, জার্মান সৈন্যরা ব্যূহ ভেঙে এস্তোনিয়া থেকে লেনিনগ্রাদের দিকে এগিয়ে আসে। অঙ্কের মাস্টার মশাই না খেয়ে মারা যান, ভূগোলেরও তাই। সাহিত্যের শিক্ষক কমরেড নিমিরভ হলেন তাঁদেরই একজন, যাঁরা শত্রু-

ব্যূহের মধ্যেই প্রাণ দিয়েছেন। ইতিহাসের মাস্টার মশাই আকীমভ গত জানুয়ারিতে সেনেটোরিয়ামে ভর্তি হয়েও দীর্ঘ অপুষ্টি ও ক্লান্তিতে মারা যান। আর-একজন শিক্ষক সম্বন্ধে টিকোমিরভ লিখছেন: "যতক্ষণ পর্যন্ত হাঁটাচলার ক্ষমতা ছিল, ততক্ষণ তিনি মন দিয়ে কাজ করেছেন। তিনি আমার কাছ থেকে দিন কয়েকের ছুটি নিয়েছিলেন এই আশায় যে পুরো সেরে উঠবেন। বাড়ি বসে ক্লাসনোট তৈরি করেছেন, পড়াশুনো করেছেন আবার পড়াতে আসবেন এই আশা নিয়ে। কিন্তু ৮ই জানুয়ারি কোনোমতে কাটিয়ে, ৯ই তিনি নিঃশব্দে চলে যান।" এই সাদামাটা কথার পেছনে কী মানবিক কাহিনীই না রয়েছে!

অনুবাদ: দেবব্রত মজুমদার

ঘৃণা

ইলিয়া এরেনবুর্গ

[কয়েক খণ্ডে নিবদ্ধ আত্মজীবনীর পঞ্চম খণ্ড *The war 1941-45* গ্রন্থের অংশবিশেষের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ—অনুবাদক]

যুদ্ধের গোড়ার দিকে কয়েকমাস আমাদের সৈনিকরা ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিল। কাজেই বিপক্ষের সৈনিকদের ওরা শত্রু বলে ভাবতে পারত না। ঐ সময় আমাদের সৈনিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় কখনও নিরাশ হয়েছি, আবার কখনও গৌরব বোধ করেছি।

গৌরবের বিষয় এই যে আমাদের সৈনিকরা সৌভ্রাত্রের শিক্ষা পেয়েছে, আর নৈরাশ্য এজন্য যে ফ্যাসিস্ট সৈনিকদের প্রকৃতি না বুঝে ওদের উপর আমাদের সৈন্যরা আস্থা রেখেছিল।

যখন হিটলারের সৈন্য একটার পর একটা শহর অধিকার করে এগিয়ে আসছে, তখনও লালফৌজ ভাবছে জার্মানির শ্রমিক-কৃষক—যারা এই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে—কখনও ফ্যাসিজমকে মেনে নিতে পারবে না। হিটলারের জার্মানি ফ্যাসিস্ট জার্মানি ; সে তুলনায় এই সব সাধারণ সৈনিকদের জার্মানির প্রকৃতি ভিন্ন ; যখনই সুযোগ আসবে, এই সৈনিকরা অস্ত্র পরিত্যাগ করবে। জার্মানির বুর্জোয়া সমাজ আর সামন্তশ্রেণী এই যুদ্ধের দাবানল জ্বালিয়েছে, সাধারণ মানুষ প্রকাশ্যে এর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারছে না। জার্মান সৈনিকরা লুঠতরাজ করতে করতে বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে আসছে, তখনও অনেকেই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করছেন জার্মান সৈনিকরা এর বিরুদ্ধে যাবে। অথচ এই আশা নিমজ্জমান ব্যক্তির একটি তৃণকে অবলম্বন করার মতোই নিষ্ফল ছিল।

এই বিশ্বাসের মূলে ছিল সোভিয়েতের শিক্ষা-নীতি। বিদ্যালয়ে মহাবিদ্যালয়ে এবং রাজনৈতিক বক্তৃতায় সব সময় জার্মান শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির কথা বলা হত। শিল্পোন্নত জার্মানির শ্রমিকদের গুরুত্ব কখনও উপেক্ষা করা যায় না। এই শ্রমিকরা কখনও ফ্যাসিজমের সপক্ষে থাকতে পারে না। ক্রুর-শিল্পপতি এবং সমাজের হঠকারী ব্যক্তিদের সমর্থনে ফ্যাসিস্টরা ক্ষমতা লাভ করেছে, শ্রমিকদের এতে কোনো ভূমিকা নেই। স্মোলেনস্কে এবং ব্রিয়েনস্কে প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত কর্মচারীরা এবং লালফৌজের সৈনিকরাও বলতেন জার্মানির

ক্ষমতাশালী পদস্থ কর্তারা ফ্যাসিস্ট, ওরা মৃত্যুভয় দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধে লিপ্ত করেছে। আমাদের কর্তাব্যক্তিরা ভাবছিলেন ইস্তাহার ছড়িয়ে এবং লাউডস্পীকারে আমাদের বক্তব্য প্রচার করে জার্মান সৈন্যদের ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে নিয়ে আসা যাবে। এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে আমাকে **P. U. R.**-এ (**The Political Department of the Armed forces**) ডেকে পাঠানো হল। ওঁরা আমাকে বললেন হিটলার সত্য গোপন করে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে ওদের সৈন্যদের যুদ্ধমুখী করে তুলেছে।

আমাদের বক্তব্য ওদের কানে পৌঁছে দিতে হবে—লাউডস্পীকারের সাহায্য নেওয়া হবে এবং ইস্তাহার ছড়ানো হবে, আমাকে ওদের জন্য ইস্তাহার লিখতে হবে। তখনও আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষরা ওদের মধ্যে সত্যপ্রচারের স্বপ্ন দেখছেন। এই আশা মরীচিকা মাত্র। দীর্ঘদিন ধরে ওদের সম্পর্কে আমরা এভাবেই ভেবেছি। প্রাক্‌যুদ্ধকালে যদি মস্কোতে থাকতাম এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তৎকালীন বক্তৃতাগুলি শুনতাম, তাহলে আমিও এই মানসিকতা থেকে মুক্ত থাকতাম না।

আমার অভিজ্ঞতা অন্য রকম। ১৯৩২ সালে আমি ফ্যাসিস্ট সভাগুলিতে জার্মান শ্রমিকদের দেখেছি। স্পেনে জার্মান বিমানকর্মীদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, অধিকৃত প্যারিসে আমি ছয় সপ্তাহ বাস করেছি। ফ্যাসিস্ট শ্রমিক এবং সৈনিকদের আমি জানতাম। কাজেই এই ইস্তাহার আর লাউডস্পীকারের উপর আমার কোনো আস্থা ছিল না।

ঐ সময় জার্মান সাঁজোয়া বাহিনীর কিছু কয়েদীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। ওদের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, দ্বিধাশূন্য ভাবভঙ্গি দেখবার মতো। ওরা মনে করত বন্দীদশার এই বেদনা সাময়িক ঘটনামাত্র। যে কোনো দিন ওদের অগ্রসরমান সৈন্যেরা এসে ওদের মুক্ত করবে।

কয়েদীদের একজন আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষকে এমন ইঙ্গিত পর্যন্ত দিয়েছিল যে ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ যদি হিটলারের করুণা প্রার্থনা করে আত্মসমর্পণ করে তাহলে ওদের বন্দীশিবিরে এপক্ষের সৈন্যদের নিরাপত্তা এবং সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা সে অবশ্যই করে দেবে।

সে বলছিল, "বড়দিনের মুখে মুখে এই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, তারপর তোমরা যে-যার ঘরে ফিরে যেতে পারবে।" মস্কোতে পরাজিত হওয়ার পর অনেক ফ্যাসিস্ট সৈন্যরা হিটলারকে অভিশাপ দিয়েছে। কিন্তু ১৯৪২ সালে গ্রীষ্মকালে

জার্মানরা যখন ককেশাস অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়েছে তখন আবার ওরা নিজেদের অপরাজেয় ভেবে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে।

প্রশ্নোত্তরের সময় ফ্যাসিস্ট সৈন্যরা খুবই সতর্ক থাকত; যেমন রাশিয়ানদের তেমনি আপন আপন সহকর্মীদেরও ওরা সমভাবে ভয় করত।

যে কয়েকজন সত্যি সত্যিই হিটলারের নীতিকে ঘৃণা করত তারা ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের, অথবা সুদূর ব্যাভেরিয়ার গ্রামাঞ্চলের কৃষক—একান্তই নিরীহ ঘরমুখী মানুষ। স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত জার্মান সৈন্যদের মানসিকতায় কোনো পরিবর্তন ঘটে নি।

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত আমরা ওদের সৈনিকদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ইস্তাহার ছড়িয়েছি, তাতে যে কয়জন সৈনিক আমাদের অনুবর্তী হয়েছে তাদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়।

যুদ্ধের প্রথম দিকে আমাদের সৈনিকরা ওদের সৈন্যদের ঘৃণা তো করতই না বরং শ্রদ্ধাই করত। কারণ ওদের সৈন্যদের আচরণে সভ্যতার চকচকে পালিশ ছিল। আমরাই আমাদের যুবসম্প্রদায়কে এভাবে ভাবতে শিখিয়েছি। বিশ এবং তিরিশের যুগে আমরা জার্মানদের উন্নত সাংস্কৃতিক মানের কথা বলেছি। আমরা বলেছি ওরা কারিগরী বিদ্যায় সুনিপুণ, শিক্ষা ওদের দেশে বহুল পরিমাণে বিস্তার লাভ করেছে, সমাজ-স্বাস্থ্যের মানও ওদের খুবই উন্নত। সমগ্র দেশ জুড়ে ওরা রেললাইন পেতেছে, এবং ওরা অসংখ্য গাড়ি তৈরি করেছে। পৃথিবীর সুসভ্য জাতিগুলির মধ্যে জার্মানি অন্যতম।

ওদের সৈন্যদের কিটব্যাগে নানারকম বিলাসসামগ্রী দেখে রুশী সৈনিকরা প্রলুব্ধ হত। কত বই, কত ডায়েরি, ঝকঝকে সেভিং সরঞ্জাম, ফটোগ্রাফ, সুন্দর সুন্দর লাইটার আর ফাউণ্টেন পেন! এরই নাম সংস্কৃতি! পেঞ্জার কোনো কৃষক অভিভূত হয়ে রিভলবারের আকৃতি একটি ছোট লাইটার যখন আমাকে তুলে দেখাত আমি তার চোখে লোভের আগুন দেখতে পেতাম।

সেই সময় রণাঙ্গনে আমাদের সৈনিকদের আলাপ-আলোচনাও ছিল নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক। একবার ব্যাটারি কম্যাণ্ডারকে একটি রাজপথ ভেঙে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। অথচ কারও নড়বার লক্ষণ নেই। আমি রেগে যাচ্ছি। তারপর একজন আমাকে বলল: "আমরা পিছিয়ে যাব, সেজন্য এমন রাস্তাটা ভেঙে দিয়ে যাব? জার্মানরা আসুক; আমরা ওদের বুঝিয়ে বলি যে এবার ওদের চেতনা হওয়া উচিত। হিটলারের বিরুদ্ধে ওরা বিদ্রোহ করুক, আমরা ওদের

সাহায্য করব।” অনেকেই ওর বক্তব্যকে সমর্থন করল। অন্য একটি বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ বলে উঠল: “আমরা কাদের গুলি করে মারছি? ওরা তো কৃষক আর শ্রমিক; এইজন্যই ওরা আমাদের শত্রু বলে ভাবছে। আমরা ওদের এরকম ভাবতে দেব না।”

ঐ সময় আমাদের সৈনিকের এই সরল বিশ্বাস আর এই মানসিকতা, যথার্থভাবে বললে—চিন্তার দৈন্য, আমার কাছে শত্রুপক্ষের নিপুণ অস্ত্রসজ্জার থেকেও ভয়ঙ্কর মনে হত। আমাদের যুদ্ধপ্রস্তুতি ছিল অতিশয় দুর্বল। ভয়ঙ্কর ট্যাংকের বিরুদ্ধে আমাদের সৈনিকরা বোতল নিয়ে লড়েছে। একদিকে লাউড-স্পীকারের প্রচণ্ড গর্জন, ওদের নিকট আমাদের প্রচার চলছে; অন্যদিকে জার্মান বৈমানিককে আমরা সম্মানের সঙ্গে সমাধিস্থ করছি।

সমগ্র রণাঙ্গন আমার কাছে কৃত্রিম অবাস্তব বলে প্রতিভাত হত।

যুদ্ধ ভয়াবহ এবং জঘন্যতম ব্যাপার; আবার এস্থলে প্রতিপক্ষ অতিশয় শক্তিমান এবং কুচক্রী; কিন্তু এই যুদ্ধ আমরা শুরু করি নি। আমি বুঝেছিলাম এই ফ্যাসিস্ট সৈন্যদলের মুখোশ খুলে দেওয়া আমার কর্তব্য। এই সৈন্যরা চকচকে কলম দিয়ে ঝকঝকে ডায়েরিতে ওদের শোণিততৃষ্ণার বিষয় লেখে। নিজের জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ওরা অন্ধ, রীতিমতো সংস্কারাচ্ছন্ন; ঐ বিশ্বাস নিয়ে ওরা যেরকম জঘন্যতম কর্মে লিপ্ত হয়, তা দেখে আদিম বর্বরেরাও লজ্জা পেত। বাধ্য হয়ে আমি আমাদের সৈনিকদের সতর্ক করে দিলাম: “জার্মান শ্রমিকদের সঙ্গে আমাদের শ্রমিকদের কোনো বিষয়ে ঐক্য থাকতে পারে না, ওদের সঙ্গে ঐক্যে আস্থা রেখে কোনো ফল হবে না। ওদের বিবেকবোধ জাগ্রত হওয়ার কোনো আশা নেই। হিটলারের সৈন্যদলের মধ্যে সৎ জার্মান বলে কেউ নেই। ঐ সৈন্যদল আমাদের শহর ও গ্রাম ধ্বংস করে আমাদের মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেবার জন্য অগ্রসর হচ্ছে।” এবার আমি লিখলাম: “জার্মানদের হত্যা করো।”

১৯৪২ সালের কঠিন সঙ্কটের সময় এ সম্পর্কে আমি একটি প্রবন্ধ রচনা করলাম ‘The Justification of Hatred’. তাতে ওদের প্রতি আমাদের ঘৃণার কারণ দেখিয়ে বললাম: “অতীতে যে সকল যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, তাদের সঙ্গে এই যুদ্ধের কোনোই সাদৃশ্য নেই। এই প্রথম আমাদের সৈনিকরা মানুষ নয় নিষ্ঠুর ক্রূর দানবের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। সর্বাধুনিক অস্ত্রসজ্জায় এরা নিপুণ, বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় এরা অভিজ্ঞ; আর রাষ্ট্রীয়

চেতনার নাম করে এরা নির্বিচার শিশুহত্যায় আত্মনিয়োগ করেছে।

"ওদের বিরুদ্ধে আমাদের ঘৃণা একদিনে উদ্দীপ্ত হয় নি, আমরা লক্ষ লক্ষ শহর ও গ্রাম হারিয়েছি, লক্ষ লক্ষ প্রাণ বলি দিয়েছি, তারপর ওদের আমরা ঘৃণা করতে শিখেছি। এখন একথা জলের মতো স্পষ্ট যে ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে এই পৃথিবীপৃষ্ঠে অন্য কেউ বাস করতে পারবে না।

"এরা জার্মান নয়, 'নাৎসি'। আর, নাৎসিদের সকলের একই চরিত্র। নাৎসিরা বিশ্বাস করে—যাদের দেহে জার্মান রক্ত নেই, এই পৃথিবীতে তাদের বাঁচবার অধিকার নেই।

"যারা মানবতাকে মূল্য দেবে, দেশ ও দেশবাসীকে ভালোবাসবে, নাৎসিদের তারা ঘৃণা না করে পারবে না।

"ওদের প্রতি আমাদের যে ঘৃণা তার তীব্রতা এবং ন্যায্যতা আমাদের এই চেতনার মধ্যেই নিহিত আছে।

"অন্য যে কোনো মানুষ ও জাতির বিরুদ্ধে নাৎসিদের ঘৃণা জার্মানির সত্তাকে গ্রাস করেছে। এই বিজাতীয় ঘৃণার সহিত আমাদের পরিচয় নেই। প্রতিটি নাৎসি এই মানববিদ্বেষ ও ঘৃণার প্রতিনিধিত্ব করছে।

"এই নাৎসিদল আমাদের শৈশবকে পঙ্গু করেছে, পিতৃমাতৃহীন করেছে; কত নারীকে অনাথা করে অশ্রুজলে ভাসিয়ে দিয়েছে। অসংখ্য মানুষকে বাস্তুছাড়া করে, ফসলের জমিকে রিক্ত করে, কোটি কোটি প্রাণ উৎখাত করে ওরা এগিয়ে আসছে। কাজেই ওদের আমরা ঘৃণা না করে পারি না।

"এরা মানুষ নয়, হৃদবৃত্তিহীন যন্ত্র। আমাদের ঘৃণা ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে, কারণ মানুষের কিছু অভ্যাস অধিগত হলেও মানবের ছদ্মবেশে ওরা দানব। বাহ্যত ওরা মানুষের মতোই হাসে কাঁদে, ঝকঝকে দিনলিপিতে আত্মবিশ্লেষণ করে, পোষা জীবজন্তুকে আদর করে। কিন্তু ওরা মানুষ নয়।

"ফ্যাসিস্টরা যা করতে পারে আমাদের যুবকরা তা করতে পারে না, কাজেই প্রতিশোধ নেবার কথা আমাদের সৈনিকরা স্বপ্নেও ভাবে না, কারণ প্রতিশোধ নিতে গেলে ওদের মতোই দানব হতে হয়। কিন্তু আমাদের তরুণদের এমন শিক্ষা দেওয়া হয় নি যে ওরা ফ্যাসিস্টদের স্তরে নামতে পারে।

"লালফৌজ কখনও জার্মান শিশুকে হত্যা করবে না, সারবুর্গের লাইব্রেরি অথবা ভাইমারে গ্যয়টের বাড়ি পুড়িয়ে দিতে পারবে না। প্রতিশোধ নিতে

গেলে সদৃশ কর্ম করতে হয়, সদৃশ ভাষায় জবাব দিতে হয়। কিন্তু ফ্যাসিস্টদের ভাষায় আমরা কথা বলতে পারব না।

"মানুষের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য জটিলতা আর বিভিন্নতা। এই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়েই মানবসমাজ। প্রতিটি মানুষ ও জাতির এই স্বকীয়তা আমাদের আনন্দ দেয়। প্রতিটি জাতি তার এই স্বকীয়তা রক্ষা করেই এই পৃথিবীতে আপন আপন স্থানে অধিষ্ঠিত থাকবে।

"নাৎসি যুগের এই ঘৃণ্য অপরাধের আড়াল থেকে জার্মান জাতি যেদিন বেরিয়ে আসবে, সেদিন ওরাও মুক্তি পাবে। সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে। হিটলারের কবলমুক্ত ভাবীকালের সেই সুখী জার্মানির বিষয় এখন আমি চিন্তা করছি না। বর্তমানে এ প্রসঙ্গ অবান্তর। ক্রোধান্ধ অগণিত জার্মানদের অত্যাচার যতদিন আমাদের দেশে চলতে থাকবে ততদিন আমি মন খুলে এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারব না।

"প্রতিদিন আমি ওদের সংবাদপত্র, সৈনিকদের প্রতি হুকুমনামা, সৈনিকদের চিঠিপত্র এবং ডায়েরি পাঠ করি। সুতরাং ফ্যাসিস্টদের নৈতিক অধঃপতনের অকাট্য প্রমাণ আমি দলিলপত্র সহ দাখিল করতে পারি।"

রণাঙ্গনে মৃত্যুপথযাত্রী সৈনিকদের জন্য আনন্দের যোগান দিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে হিটলারের সৈন্যদের প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করে ওদের বিদ্রূপ করে কৌতুককর প্রবন্ধ রচনা করতে শুরু করলাম। ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের সমবেতভাবে নামকরণ করলাম 'ক্রিৎস্'। এ জাতীয় প্রবন্ধের প্রথম রচয়িতা বোধহয় আমিই। প্রতিদিন একটা করে এরকম শত শত প্রবন্ধ রচনা করেছিলাম। যেমন 'দার্শনিক ক্রিৎস্', 'পণ্ডিত ক্রিৎস্', 'নার্সিসাস ক্রিৎস্' ইত্যাদি।

মস্কোর উপান্তে প্রায় সমস্ত গ্রাম জার্মানরা পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল। আমাদের সৈনিকরা যখন ঐ গ্রামগুলি পুনরধিকার করেছিল, তখনই ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের প্রতি আমার তীব্র ঘৃণার সূচনা হয়। চারদিকে জলন্ত ধ্বংসস্তূপ; সেই ধ্বংসলীলার আগুনে মহিলা এবং শিশুরা শীত নিবারণ করছে। কর্মরত লাল-ফৌজের মধ্যে যে একটা প্রবল প্রতিশোধস্পৃহা জেগে উঠেছে, এক ভয়ঙ্কর মৌনের ভেতর তা প্রকাশিত। এর মধ্যে একজন বলল, "এই গ্রামাঞ্চল পুড়িয়ে ওদের কি লাভ হল? শহরে অফিস, কাছারি, ছাপাখানা, দুর্গ প্রভৃতি থাকে। ওগুলো জ্বালালে ওদের লাভ হয় বুঝতে পারি। গ্রামগুলি তো নিরীহ চাষীদের বাসস্থান। এগুলো জ্বালিয়ে দেবার অর্থ কি? বাইরে প্রচণ্ড

ঠাণ্ডা, এই গৃহগুলি ব্যতীত শীতের হাত থেকে বাঁচবার কোনো উপায় নেই।"

ভলোকোলমীস্ক গ্রামে ফ্যাসিস্টরা ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করে রেখেছে, আমি ওদিকেই একদৃষ্টে তাকিয়েছিলাম ; সৈনিকরাও ওদিকেই তাকিয়েছিল।

আমি এক অভিনব চেতনার জগতে প্রবেশ করলাম। আর, আমার ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তখনই নির্দিষ্ট হয়ে গেল।

ফ্যাসিস্ট জার্মান এবার যে অগ্নুৎপাত আরম্ভ করেছে, অতীতে সংগঠিত সংগ্রামের সঙ্গে এর কোনো সাদৃশ্য নেই। এবার ওরা মানুষকে পঙ্গু করে দিয়ে হত্যালীলায় মেতেছে। শুধু তাই নয়, মানবজাতির নৈতিক চেতনার জগতটিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

সমস্ত রকম বিবেক থেকে বিচ্যুত করে লক্ষ লক্ষ জার্মানকে ওরা শিখিয়েছে কি করে ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষকে ঘৃণা করতে হয়।

পরিশ্রমী সৎ ও সজ্জন গৃহস্থদের ওরা মশালচী বানিয়ে দিয়েছে। এখন তাদের একমাত্র কাজ হল বৃদ্ধ ও শিশুদের তাড়িয়ে বেড়ানো, আর ঘর জ্বালানো। যুদ্ধক্ষেত্রে বিবেকের স্থান নেই। কাজেই অতীতেও সৈনিকদলে লুণ্ঠনকারী ও ধর্ষকদের দেখা গিয়েছে। কিন্তু হিটলার তার লক্ষ লক্ষ সৈন্যদের সমবেতভাবে দুষ্কর্ম আর জঘন্য অপরাধে লিপ্ত করেছে। কেবল গেস্টাপো আর S. S.-এর লোকেরাই নয়, সমবেতভাবে সমস্ত সৈনিককে ওরা গণহত্যায় প্ররোচিত করেছে।

ক্ষীণকেশ একজন জার্মান ভদ্রলোক ডুসেলডর্ফ-এ কাজ করতেন, পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। তাঁকে দেখলাম। ঘুমের ব্যাঘাত করছিল বলে একটি রাশিয়ান শিশুকে তিনি অনায়াসে কুয়োয় ছুঁড়ে ফেলে দেন।

আমার হাতে একটি সাবান রয়েছে। এর লেবেলে লেখা আছে :

"বিশুদ্ধ ইহুদী সাবান", যে-সব ইহুদীদের ধ্বংস করা হয়েছে তাদের দেহ থেকে প্রস্তুত। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। এর উপর হাজার হাজার বই লিখিত হয়েছে।

রাশিয়ানদের প্রকৃতি মৃদু। প্রচণ্ড আঘাত না পেলে ওদের কখনও ক্রোধ হয় না। আর, একবার যদি ওরা উত্তেজিত হয় তাহলে আবার ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

অবশ্য শান্ত হয়ে যেতেও বেশি সময় লাগে না। কয়েকটি ঘটনায় তার দৃষ্টান্ত দিই। কয়েদীদের মধ্যে যারা অ্যালসেসিয়ান, তাদের তুলে আনবার জন্ত

একদিন জীপে করে যুদ্ধক্ষেত্রে চলেছি। আমার ড্রাইভারটি ছিল বাইলোরাশিয়ান। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়েছে যে জার্মানরা ওর সমগ্র পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

রাস্তায় একদল কয়েদীকে দেখতে পেয়ে ড্রাইভারটি তৎক্ষণাৎ তার টমিগানটি হাতে তুলে নিল। আমি আর বারণ করবার সময় পেলাম না।,

বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমি কয়েদীদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তামাক তখন একেবারেই পাওয়া যাচ্ছে না। ডিভিশনাল অফিস থেকে আগের দিন অনেক কষ্টে দুই প্যাকেট তামাক জোগাড় করেছি। আমার ড্রাইভার আমার কাছে একটু তামাক চাইলে আমি যখন তাকে একটা প্যাকেট দিলাম, তখন সে আমার জন্য খানিকটা তামাক আছে কিনা জানতে চাইল।

একটু পরে সে যথার্থ ঘটনা বিবৃত করল: আমি যখন কয়েদীর সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন অন্য কয়েদীরা ওকে ঘিরে ধরে। ওদের মধ্যে দুজন ছিল ড্রাইভার। আমার ড্রাইভার তাদের তামাক দিলে অন্যরাও চাইতে থাকে। আমার ড্রাইভার তামাকের এই সঙ্কটের সময়েও তার সবটুকু তামাক ওই কয়েদীদের দিয়ে দিয়েছে। আমাদের সৈনিকদের প্রকৃতি এই রকম। শত্রুপক্ষ হলেও ওরা যদি বেঁচে থাকে তাহলে ওদের নেশার যোগান দিতে ওরা দ্বিধা করে না।

আমাদের সৈনিকদের মধ্যে এ রকম সহৃদয়তার পরিচয় আরও পেয়েছি। উপরিউক্ত ঘটনাটি ১৯৪৩-এর। পরের বছর মিনস্কের নিকট ট্রসটিআণ্ডসিতে নাৎসিরা যখন আমাদের নারী ও শিশুদের হত্যা করে চলেছে, তীব্র ঘৃণায় আমাদের সৈনিকরা যখন ওদের হত্যা করতে বদ্ধপরিকর, সেই সময় একজন পদাতিক আমাদের হাতে বন্দী হল। মেজরের নির্দেশে আমি দোভাষীর কাজ করছি। নিকটবর্তী জঙ্গলে ওদের সঙ্গীরা আত্মগোপন করে আছে কিনা জানতে চাইছি। কয়েদীটি বলল, পিপাসায় তার জিভ শুকিয়ে গিয়েছে, তাই সে কথা বলতে পারছে না। ওকে এক মগ জল দেওয়া হল; সে রুমাল নিয়ে মগের কিনারাটা মুছে নিল আর মুখ বিকৃত করে বলল মগটা ভারী নোঙরা। আমি রেগে উঠলাম; তীব্র পিপাসার সময় এত বাবুগিরি কেন?

আমাদের ক্রুদ্ধ সৈনিকরা এতক্ষণ চীৎকার করে বলছিল, ওর সঙ্গে কোনো কথা নয়, ওকে গুলি করে মেরে ফেলা উচিত। আর তারপরই সহসা শান্ত হয়ে গিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে ওকে একবাটি ঝোল খেতে দিয়ে বলল:

"নে শূয়োরের বাচ্চা, খা।"

আমি নিজেও অনেক সময় এরকম ব্যবহারই করেছি। মৃত্যুভয়তাড়িত বন্দীদের বাঁচাবার জন্য একটুকরো কাগজে লিখে দিয়েছি: ওরা অ্যালসেসিয়ান, 'সৎ জার্মান'।

বস্তুত ফ্যাসিজমকে ঘৃণা করেও কত নিরস্ত্র ফ্যাসিস্টকে মুক্তি দিয়েছি। আমি বিশ্বাস করতাম এরকম পরিস্থিতিতে ওরা যা করছে আমরা হলেও তাই করা ছাড়া গত্যন্তর থাকত না।

গোয়েবলসের একটা কল্পিত 'জুজু'র প্রয়োজন ছিল; জার্মান সৈনিকদের নিকট সে উপকথা বানিয়ে ইলিয়া এরেনবুর্গকে জুজুরূপে উপস্থিত করে বলল, "ইলিয়া এরেনবুর্গ একটা রক্তচোষা ইহুদী, জার্মানদের রক্ত পান করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য।"

জার্মানদের বহু বেতারবিবরণ, ইস্তাহার এবং সংবাদপত্রের কাটিং আমার কাছে আছে। আমার সম্পর্কে এরূপ প্রচার করা হত। "ইলিয়া এরেনবুর্গ একটা হোঁতকা, ওর নাকটা হুকের মতো বাঁকা, চোখ ট্যারা, শোণিত-তৃষ্ণায় সে একটা দানব।"

স্পেনের যাদুঘর থেকে আমি দেড় কোটি মার্ক মূল্যের দ্রব্যাদি অপহরণ করে সুইজারল্যাণ্ডে বিক্রি করেছি। হল্যাণ্ডের রানী উইলহেলমিনারের দালালই আমার দালালরূপে নিযুক্ত হয়েছে। ব্রাজিলের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে আমি আমার মূলধন সঞ্চিত রেখেছি। 'Trust D. E.' নামে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে আমি স্ট্যালিনকে সমগ্র ইয়োরোপ ধ্বংস করবার জন্যে দিয়েছি। আর এই উদ্দেশ্যে স্ট্যালিনের সঙ্গে রোজ আমার মোলাকাত ঘটে।

ওডার এবং রাইন নদীর মধ্যবর্তী ভূমিকে মরুভূমিতে পরিণত করাই আমার সংকল্প, আর জার্মান শিশু হত্যা ও নারীধর্ষণের প্রধান পরামর্শদাতা আমিই।

১৯৪৫ সালে হিটলার স্বয়ং আমার সম্পর্কে বলেছিলেন, "স্ট্যালিনের 'পা-চাটা' ইলিয়া এরেনবুর্গ ঘোষণা করেছে যে জার্মান জাতিকে অবশ্যই মুছে ফেলতে হবে।"

এই প্রচার ফলপ্রসূ হয়েছিল। জার্মানরা ইলিয়া এরেনবুর্গকে একটা জন্ম-শয়তান বলে মনে করত। ১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে ইস্ট-প্রাশিয়ার একটা শহর বারস্টেনসিনে আমি ছিলাম, আমাদের সৈনিকরা শহরটিকে কেবলমাত্র অধিকার করেছে। আমাদের সেনানায়ক আমাকে নির্দেশ দিলেন যে একটা

জার্মান হাসপাতালে গিয়ে ওখানকার ডাক্তার এবং রোগীদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে আসতে হবে।

ওখানকার ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারকে আমি যখন সকল ব্যাপারে আশ্বস্ত থাকতে বললাম, তিনি উত্তরে বললেন, "সবই তো ভালো, কিন্তু ইলিয়া এরেনবুর্গ এ সম্পর্কে কি বলছেন ?"

আমার আর কথা বাড়াতে ইচ্ছা করছিল না। আমি বললাম: "নিশ্চিন্ত থাকুন, সে এখন এখানে নেই—মস্কোতে রয়েছে।" ডাক্তার তখন শান্ত হলেন। এই ঘটনা কৌতুককর সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম।

জার্মানরা ওডার ও রাইন নদীর মধ্যবর্তীস্থলে বাস করে, ওরা আমার অন্তরতম কবি হাইনের ভাষায় কথা বলে—সেজন্য আমি ওদের ঘৃণা করি না; আমি ওদের ঘৃণা করি কারণ ওরা ফ্যাসিস্ট, ওরা আমাদের মাতৃভূমিতে অনধিকার প্রবেশ করেছে।

অতি শৈশব থেকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ এবং গোষ্ঠীবাদের বিরুদ্ধে আমি সংগ্রাম করেছি। এজন্য সারা জীবন আমি কত রকম যন্ত্রণাই না ভোগ করেছি। সমগ্র জাতির সৌভ্রাত্রে যখন আমার আস্থা সুস্থিত রেখেছি, তখন এই ফ্যাসিজমকে আমি জন্ম নিতে দেখলাম।

'Trust D. E.' অভিধায় আমার কল্পিত উপন্যাসে লুব্ধ মার্কিন বণিকগোষ্ঠীর সহায়তায় ইয়োরোপের ফ্যাসিস্টগোষ্ঠী ইয়োরোপকে উচ্ছন্নে নিয়ে যাচ্ছে। এ-বিষয়ে উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে আমার কল্পনাকে সুদূরে পরিব্যাপ্ত করতে হয়েছে! উপন্যাসটি যখন লেখা হচ্ছে, জার্মানিতে বিপ্লবের একটি ক্ষীণ আশা তখনও নিভু নিভু শিখায় জ্বলছে। 'রূঢ়'-এ ফরাসী বাহিনী অধিষ্ঠিত আছে। উপন্যাসে দেখানো হয়েছে ফ্যাসিস্ট **Brandevaun**-এর নেতৃত্বে ফরাসী বাহিনী জার্মান-পোল্যাণ্ড এবং রাশিয়ার কিয়দংশ বিধ্বস্ত করে ফেলেছে। আমি যাকে **'Brandevaun'** আখ্যা দিয়েছি, সে অ্যাডলফ হিটলার ছাড়া আর কেউ নয়।

আত্মজীবনীর অন্তর্ভুক্ত না হলেও এবার আর একটি ঘটনার কথা বলব।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে 'নর্ড' দলের সৈন্যাধ্যক্ষ পশ্চাদপসরণকারী সৈন্যদের মনোবল বাড়াবার জন্য এক আদেশ জারী করলেন।

"যে জার্মান পশ্চাদপসরণ করবে সে একটা অমানুষ। কারণ নিজের স্ত্রীর সম্মানরক্ষার জন্যেই তাকে যুদ্ধ করতে হবে। স্তেপ অঞ্চলের জঘন্য প্রবৃত্তিকে

প্ররোচিত করে ইলিয়া এরেনবুর্গ বলেছে, এই হলুদচুলো মেয়েদের আমরা নিয়ে যাব, এশিয়ানদের উপভোগের জন্যেই এরা রয়েছে। ইলিয়া এরেনবুর্গ জার্মান মহিলাদের রক্তপানের জন্য এশিয়ানদের উৎসাহিত করছে।"

এই সংবাদ পাওয়ামাত্র আমি 'রেডস্টার'-এ লিখলাম: জার্মানরা এতদিন রাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র জাল করে হাত পাকিয়েছে। এবার ওরা আমার প্রবন্ধও জাল করছে। আমার নামে ওরা যে উদ্ধৃতিগুলি ব্যবহার করেছে তার থেকেই এর প্রকৃত প্রবক্তা কে তা ফাঁস হয়ে গিয়েছে।

হিটলার সেনাপতির এ-সব কল্পিত কাহিনী তৃতীয় রাইখ এবং নুরেমবার্গের বিচারের পরও সমানে চলেছে। এই সেদিনও জার্মান ভাষায় অনূদিত আমার 'মানুষ সময় ও জীবন' গ্রন্থের মিউনিখবাসী প্রকাশক আমাকে কতগুলি কৌতুক-প্রদ ফটোস্ট্যাট পাঠিয়েছেন। এতে দেখা যায়, ১৯৫০ সালে জনৈক Jurgen Thorwald স্টুটগার্ট থেকে যুদ্ধের একটি ইতিহাস প্রকাশ করেছেন।

তাতে বলা হয়েছে: "ক্রমান্বয়ে তিনবছর ঘৃণায় ফুঁসতে ফুঁসতে ইলিয়া এরেনবুর্গ বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে খোলাখুলিভাবে লাল ফৌজকে নির্দেশ দিয়েছে: "জার্মান মেয়েদের ভোগ করো, ওদের উপর আমাদের আইনগত অধিকার আছে।"

পরে জেনেছি এই জারগন থরভাল্ড আর কেউ নন, স্বয়ং Heinz Bongartz। ইনিই হিটলারের ভূয়সী প্রশংসা করে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, আর এই গ্রন্থটি যুদ্ধাপরাধী অ্যাডমিরাল রিডার-এর নামে উৎসর্গ করেছিলেন।

১৯৬২ সালে পশ্চিম-জার্মানিতে আমার গ্রন্থ যাতে মুদ্রিত না হয় এই জন্য মিউনিখের সংবাদপত্র 'Soldatenzeitung' এক প্রচার-অভিযানের ব্যবস্থা করে। তাতে ঐ সংবাদপত্র আমার সম্পর্কে জার্মান নারীধর্ষণের মিথ্যা কাহিনী নিয়ে যেসব ইস্তাহার তৎকালে প্রচারিত হয়েছিল, সেগুলি ব্যবহার করেছে। মানব-ইতিহাসে আমি একজন কুখ্যাত অপরাধী একথা বলে আমার প্রকাশককে ওরা ভীতি প্রদর্শন করে। Ernst Jurger-এর মতো কিছু লেখক ওই সংবাদ-পত্রকে সমর্থন করেছিল, কিন্তু অন্তরা এতে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ওঠেন।

Kindler প্রমাণ করেছিলেন যে Thorwold গোয়েবলসের মিথ্যা ভাষণগুলি হুবহু পুনরাবৃত্তি করেছে। এমনকি এখনও নাৎসিবাদীরা ঐ গ্রন্থকে বলে নারীধর্ষক ও নরহন্তার গ্রন্থ, তারা ওই নামেই আমাকে জানে এবং আমার গ্রন্থের সমালোচনা করে।

আমি আবার বলছি, আমাকে কে কি বলেছে সেটা কোনো একটা বিষয়ই নয়। কিন্তু এতে এই বুঝতে হয় যে বিগত যুদ্ধে পাঁচকোটি লোকের মৃত্যু হলেও ফ্যাসিজমের মৃত্যু হয় নি। ১৯৪৫ পর্যন্ত 'ফ্যাসিজম' বেঁচেছিল, তারপর ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে কিছুদিনের জন্য নিস্তেজ হয়েছিল মাত্র, কখনও বিনষ্ট হয় নি। যুদ্ধের সময় আমি সর্বদা বলেছি যে ফ্যাসিজমকে বিনষ্ট করতে হলে আমাদের জার্মানি দখল করা কর্তব্য। আমি আশঙ্কা বোধ করছিলাম যে একবার যদি এই নোঙরা রাজনীতির খেলা আরম্ভ হয়ে যায়, প্রবল হয়ে উঠে, তাহলে সোভিয়েতের এই আত্মত্যাগ আর মহৎ কার্যাবলী, পোল্যাণ্ডবাসীর এই দুর্দমনীয় সাহস, ফরাসী আর যুগোশ্লাভদের এই দৃঢ় প্রতিরক্ষা নিষ্ফল হয়ে যাবে।

লণ্ডনবাসীর প্রচণ্ড দুঃখভোগ আর পরমগৌরব, অসউইজের দাহনযন্ত্র আর এই এক নদী রক্ত সমস্ত কিছু বঙ্গবিজয়ের ক্ষণপ্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় ইতিহাসের এক সামান্য ঘটনায় পর্যবসিত হবে।

১৯৪৪-এ আমি লিখলাম, "ফ্যাসিজমের সমর্থনে কতিপয় ডেমোক্র্যাটের প্রয়াস উগ্র ক্যাথলিক ও ফরাসী লেখক জর্জ বার্নানো ক্রোধ ভরে প্রত্যাখান করেছেন। *La Marseillaise*-এ তিনি লিখেছেন: যুদ্ধের পূর্বে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা এবং ফ্রান্সের জনসাধারণের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ফ্যাসিজমকে সমর্থন করেছে এবং এর ভূয়সী প্রশংসা করেছে। কিন্তু তারা ফ্যাসিজমকে শুধু সমর্থনই করে নি, এই দুষ্কর্মে সহায়তা দিয়েছে সহযোগিতা করেছে। ওরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছিল। এই নৈতিক মহামৃত্যুর নিয়ন্ত্রণে প্রতিযোগী ও প্রতিবাদীদের ফেরাতে গিয়ে মিউনিখ কেবল নির্বোধের কার্যই করে নি, উপরন্তু ব্যবসায়ীদের খেলার এক লজ্জাকর ফল-পরিণাম রূপে পরিগণিত হয়েছে।"

আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে অনেকেই কিঞ্চিৎ সংস্কৃতির মিশ্রণে এই মহামারী ব্যাধিকে ঠাণ্ডাঘরে জীইয়ে রাখতে চায় আর এর মধ্য দিয়েই একদিন প্লেগবীজাণু সক্রিয় হয়ে উঠবে। আমাদের মনে রাখতে হবে কিছু লোকের লোভ আর নির্বুদ্ধিতা এবং কিছু লোকের হঠকারিতা আর ভীরুতার জমিতে ফ্যাসিজম অঙ্কুরিত হয়েছিল।

মানবজাতি যদি সেই সময়ের ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত দুঃস্বপ্নকে মুছে ফেলতে চায়, তাহলে ফ্যাসিজমকে ধ্বংস করতে হবে। কোথাও যদি এর বিন্দুমাত্র বর্তমান থাকে, তাহলে দশ থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে পুনরায় রক্তের প্লাবন সুনিশ্চিত হয়ে রইল। ফ্যাসিজম ভয়ঙ্কর ক্যান্সার ব্যাধির তুল্য। একে কখনও সুস্থ করে

তোলা যায় না। একে সমূলে উচ্ছেদ করতে হয়। জহ্লাদদের জন্যে যারা অশ্রুপাত করে সেসব সহৃদয় ব্যক্তিদের উপর আমার কোনো আস্থা নেই। ঐ দয়াবানরা লক্ষ লক্ষ নিরীহ নিষ্পাপ মানুষের জন্যে মৃত্যুশয্যা রচনা করছে।

বিগত যুগের সংবাদপত্রের এই অংশগুলি আমাকে বিচলিত করে। আমি যে ভবিতব্য অনুমান করেছিলাম তা সবই ঘটতে চলেছে। বংশবৃদ্ধি করবার উদ্দেশ্যে ফ্যাসিস্টদের রাখা হয়েছিল। **Reichswehr**-এর চ্যালারা মজুত আছে। তারা চায় জার্মান সৈন্যের হাতে আণবিক অস্ত্র উঠুক, প্রতিহিংসার আগুন জ্বলুক! **Bernanos** যাকে ব্যবসায়ের খেলা বলেছিলেন, তা-ই সমানে চলেছে। কিন্তু এবার খেলায় সেই আদ্যিকালের পুরনো ঘুঁটি বারুদের পিপা, ট্যাংক আর বোমারু বিমান হলে চলবে না। এবার চাই পারমাণবিক বোমা, চাই রকেট। মানুষের সমগ্র সত্তা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে পারে না।

ইতিমধ্যে আমি কুড়ি বছর পরের কথায় পৌঁছে গিয়েছি; আবার যুদ্ধের প্রাক্কালের সেই শীতে ফিরে যাই। আমরা মালোয়ারোস্লাভেট-এ গাড়ি করে চলেছি ওয়ারশ রোড ধরে। চারদিকে উদ্যতফণা রণক্ষেত্র; যে-গ্রামগুলির মধ্য দিয়ে চলেছি সেগুলি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। জার্মান সৈনিকের শব ইতস্তত মাটিতে ছড়িয়ে আছে অথবা গাছের গায়ে আটকে খাড়া হয়ে আছে।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, বরফের রঙ নীল। সূর্য যেন এক জমাট রক্তের চাপ। বাতাসে প্রচুর তুষারকণা। মাঝে মাঝে মৃত মানুষের মুখগুলি ঝলসে উঠছে। মনে হচ্ছে যেন জীবন্ত মানুষের মুখ। সুখের উত্তেজনায় আমার সঙ্গী অফিসারটি চীৎকার করে উঠলেন: "দেখুন দেখুন, কতলোক গিয়েছে। - আর তাদের মস্কোর মুখ দেখতে হবে না।"

স্বীকার করছি ঐ আনন্দে আমিও যোগ দিয়েছিলাম। অনেকে বলতে পারেন এই আনন্দ নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। যথার্থ। একবার যদি ঘৃণা উদ্রিক্ত হয় তবে তা মানুষের আত্মাকে বিনষ্ট করে। ফ্যাসিজমে তাই করেছে, মানুষের হৃৎবৃত্তিকে বিনষ্ট করে তাকে পাষাণ করে দিয়েছে।

অনুবাদ: বীণা মজুমদার

সিংহের থাবা

নিকোলাই তিখনভ

[সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময় নিকোলাই তিখনভের লেখা লেনিনগ্রাদ-কাহিনী শুধু সে দেশে নয়, সারা পৃথিবীতে—এমন কি ভারতবর্ষেও—সেদিন অবিস্মরণীয় প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। কবি-গল্পকার-প্রাবন্ধিক-অনুবাদক-সম্পাদক—সর্বোপরি যোদ্ধা—তিখনভ আকৈশোর ভারতকে ভালোবাসেন। পঞ্চাশের দশকে সোভিয়েত শান্তি কমিটির প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে এসেছেনও এদেশে, লিখেছেন তাঁর স্বপ্নের ভারতের কথা।

মস্কোর প্রগতি প্রকাশন ১৯৭৪ সালে 'পরিচয়' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক, বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক, দীর্ঘকাল মস্কোবাসী ননী ভৌমিক অনুবাদিত নিকোলাই তিখনভের 'গল্পসম্ভার' প্রকাশ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এদেশে জনপ্রিয় *The Lion's Paw* গল্পটির বাঙলা ভাষান্তর সেই সংকলন থেকে পুনর্মুদ্রিত হল।—সম্পাদক]

ইউরা তেমন ছেলে নয়, বড়োরা যাদের হামেশাই বলে: "পায়ের কাছে ঘুরঘুর করবি না বলছি।" না, ছোটো হলেও—বয়স ওর মাত্র সাত—তার গোটা দিন কাটত পার্কে বা রাস্তায় কিংবা চিড়িয়াখানায়। চিড়িয়াখানাটা ছিল তার বাড়ির সামনে রাস্তার ওপারে। প্রায়ই সেখানে যেত সে, ভারি ভালো লাগত জন্তু-জানোয়ার।

কিন্তু এ কথা কবুল করতে তার ভয়ঙ্কর লজ্জা হত যে চিড়িয়াখানায় ঢোকার মুখ টিকিট-ঘরের কাছে স্তম্ভের ওপর দাঁড়ানো প্লাস্টার-অব-প্যারিসের প্রকাণ্ড সিংহটাই তার ভালো লাগত সবচেয়ে বেশি।

প্রথম ওটাকে দেখার পর থেকে সে আর উদাসীন থাকতে পারে নি।

"চিড়িয়াখানা পাহারা দেয় ও, ডাকাতেরা যাতে জন্তু-জানোয়ারের অনিষ্ট না করে, তাই না মা?" মাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল সে।

"হ্যাঁ", অন্যমনস্ক জবাব দিয়েছিল মা, আর এমন একটা গুরুতর প্রশ্নে মা ওর কথায় আপত্তি না করায় ভারি খুশি হয়েছিল সে।

প্রবেশমুখে প্লাস্টারের প্রকাণ্ড সিংহটা সগর্বে উঁচু হয়ে থাকত, আর প্রত্যেক বার ইউরা তাকে বন্ধুর মতো সম্মান করে শুভ-সম্ভাষণ জানাত।

…সাইরেন বাজছিল শহরে, মায়েরা উৎকণ্ঠিত হয়ে, ছেলেপিলেদের জুটিয়ে তাড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল শেলটারে। ভূগর্ভে কুঠরির বেঞ্চিতে বসেছিল ইউরা, হিম হয়ে আসছিল তার ছোট্ট বুকখানা। তার অচেনা ভয়ঙ্কর এক বজ্রনির্ঘোষ পরিষ্কার ভেসে আসছিল এখানে, এই তল-কুঠরিতে। মাঝে মাঝে যেন ভয় পেয়ে কেঁপে উঠছিল জায়গাটা, দেওয়ালের বাইরে থেকে কীসব যেন ঝরে পড়ছিল, শোনা যাচ্ছিল কাচ ভাঙার ঝন্‌ঝন্‌।

"ডাকাতের দল! ফের উড়ে এসেছে," অস্থির হয়ে বলাবলি করছিল মেয়েরা; বিস্ফোরণের আওয়াজটা বেশি জোরালো হলেই ক্রুশচিহ্ন করছিল বুড়িরা।

হঠাৎ বাড়িটায় এমন একটা হ্যাঁচকা টান পড়ল যেন মনে হল গাছ ওপড়াবার মতো করে বাড়িটাকে কে যেন ভিত্তি সমেত তুলে ফেলতে চেয়েছিল, তারপর কী ভেবে তাতে ক্ষান্ত হয়ে কেবল ভয়ানক দুলিয়ে দিলে।

"এটা কাছেই পড়েছে", বললে ইউরার মা, "সম্ভবত সামনেই।"

ভুল হয় নি তার। বিপদ-সংকেত কেটে গেলে সবাই দেখতে ছুটল কোথায় বোমাটা পড়েছে। ইউরাও ছুটল মায়ের সঙ্গে। বোমাটা পড়েছিল চিড়িয়াখানায়, একটা মাদী হাতি মারা পড়েছে, জখম হয়েছে বানর, খোলা পেয়ে একটা ভয়-চকিত নেউল ছোটাছুটি করছে রাস্তায়।

কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে ইউরা বার বার কেবল বলছিল: "মা, সিংহটা!"

ইউরার এই কান্নার মধ্যে এত বেশি হাহাকার ছিল যে মা অনিচ্ছাতেও তাকাল ইউরা যেদিকে দেখাচ্ছিল। অপরূপ তার প্রতিমা, প্লাস্টারের প্রকাণ্ড সিংহটা থাবার উপর বিরাট শাদা মাথাটা নামিয়ে কাত হয়ে আছে। পেছনকার দুটো পা নেই, সামনের একটা থাবা খণ্ড-খণ্ড হয়ে গেছে, কিন্তু কেশর তার এখনো একই রকম রাজোচিত, দৃষ্টি বরাবরের মতোই কঠোর ও অপলক।

"ডাকাতেরা ওকে মেরে ফেলেছে, মা," চেঁচাচ্ছিল ইউরা, "ওদের সঙ্গে লড়েছে…"

স্তম্ভের গোড়ায় ভাঙা টুকরো-টাকরার মধ্যে কী যেন খুঁজতে লাগল সে। খুঁজছে সে, হুহু করে জল গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে। শেষ পর্যন্ত কিছু একটা খুঁজেই পেল সে, ঝট করে পকেটে তা পুরে নিলে।

"ইউরা, কী করছিস ওখানে?" হাঁক দিল মা, "কীসব নোংরা ঘাঁটছিস। ভূত সাজবি কেবল। চলে আয় এক্ষুণি আবর্জনা ছেড়ে…"

ইউরা কিন্তু যেতে পারে না। স্তম্ভটার চারপাশে কেবলি সে ঘোরে, কাত হয়ে শুয়ে থাকা সিংহটা দেখে, যেন বরাবরের মতো মনে করে রাখতে চায় এই নির্বাক হতভাগ্য পশুর চেহারাটা, কয়েক দশক ধরে যে চিড়িয়াখানার গেটের কাছে দাঁড়িয়ে জন্তু-জানোয়ারের শান্তি রক্ষা করেছে। বোমার গর্ত, ভাঙা রেলিং, উল্টে যাওয়া বুথ, টিকিট-ঘর, যার কয়েকটা থামই কেবল টিকে আছে, এইখানে পার্কেই ঝোপের মধ্যে ছোটাছুটি করে বেড়ানো মেরু শেয়াল—কোনো দিকেই দৃষ্টি নেই তার। দেখছে সে কেবল সিংহটাই।

একবার ইউরার মায়ের কাছে এল ধুলোমাখা এক সৈনিক। টেবিলে বসে চা খাচ্ছিল সে, ক্লান্ত চোখে ইউরা তাকিয়ে দেখছিল তাকে, প্রতি মুহূর্তেই চোখ তার বুজে আসছিল। সেদিন এত সে ছুটোছুটি করছিল যে সৈনিকটি কী বলছিল তার কানে বিশেষ ঢুকছিল না। আর সৈনিকটি বলছিল ফ্রন্টের কথা, কেমন যুদ্ধ চলছে, জার্মানদের সঙ্গে কিভাবে লড়ছে, কে কী বীরত্ব দেখাল, মায়ের ভাই পেয়েছে লাল ঝাণ্ডা অর্ডার। মায়ের খেয়াল হল ইউরা ঘুমে ক্লান্তিতে চেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়েছে। তাকে সে শোয়াতে নিয়ে গেল। পোষাক ছেড়ে বিছানায় বসে ইউরা বললে:

"মিশা মামা লাল ঝাণ্ডা অর্ডার পেয়েছে, সত্যি?"

"সত্যি, লড়েছে সে সিংহের মতো। বড়ো হলে তুইও অমনি নির্ভয়ে লড়বি। মিশা মামা এসে তোকে শেখাবে।"

ইউরা বললে, "ওই সিংহটার মতো লড়েছে?"

"ওই সিংহ আবার কোনটা?" বললে মা, "লাল ফৌজীরা যখন লড়ে, তখন লোকে বলে সিংহের মতো লড়ছে…"

"তার মানে, ওই সিংহটার মতোই লড়েছে," মার কথায় কান না দিয়ে বললে ইউরা, "তার মানে ভালোই লড়েছে…আমিও অমনি লড়ব…"

"নে হয়েছে, ঘুমো", বললে মা, "নয়তো ফের সাইরেন বাজবে, তার আগেই ঘুমিয়ে নে।"

সাইরেন এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ইউরাকে সব সময় তল-কুঠরিতে টেনে আনা সম্ভব হয় না। কখনো সে উধাও হয়ে যায় রাস্তায়, নয়তো চিলে-কোঠা দিয়ে উঠে পড়ে চালে, নয়তো হাজিরা দেয় কার্নি

এইড কেন্দ্রে। বিমান-বিধ্বংসী কামান, বাড়ির তুলুনি, বোমা বিস্ফোরণের শব্দে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে।

"কোথায় যাস বল তো তুই?" জিজ্ঞেস করে মা, "খুঁজে খুঁজে কোথাও পাই না। খবরদার, বাড়ি ছেড়ে দূরে যাবি না কক্ষনো, বাবা বাড়ি নেই, হাতে একেবারে স্বর্গ পেয়েছে! আসুক না জাহাজ থেকে ফিরে; দেখাবে তোকে। একেবারে অবাধ্য হয়ে পড়েছে।"

"বাড়ির পেছনে যে আমি ব্যারিকেড বানাচ্ছি…", গুরুত্ব দিয়েই বলল ইউরা।

"ব্যারিকেড?"

"রাস্তায় ব্যারিকেড তুলছে মা, আমি নিজে দেখেছি। আমরাও তুলব। ছেলেপিলেদের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে…।"

তিনদিন পর, প্রচণ্ড একটা হামলার পরে ওকে আনা হল বিস্ফোরণের ঝাপটায় অজ্ঞান অবস্থায়। ফ্যাকাসে হয়ে আলুথালু চুলে কাঁপা কাঁপা হাতে মা তার পোষাক খুলল। চুপচাপ শুয়ে রইল সে, ততক্ষণে জ্ঞান ফিরেছে। হাওয়ার সামান্য ঝাপটা খেয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল সে।

আস্তে করে দোষী-দোষী ভঙ্গিতে সে বললে, "বাড়ির পেছনে ব্যারিকেড বানিয়েছি মা। বেঁচে আছি, মা, ভয় নেই।"

মা তার পকেটে রুমাল খুঁজতে গিয়ে যত রাজ্যের জিনিস বার করল।

"পকেটে এসব কী জঞ্জাল জড়ো করেছিস?" ইতিমধ্যেই ধূসর হয়ে ওঠা প্রকাণ্ড এক টুকরো প্লাস্টার বার করে জিজ্ঞেস করলে মা।

"হাত দিয়ো না মা, ফেলো না", চেঁচিয়ে উঠল ইউরা, "এটা সিংহের থাবা। রেখে দাও, আমার দরকার আছে। ওটা আমার স্মৃতিচিহ্ন।"

অবাক হয়ে মা দেখল প্লাস্টারের টুকরোটা। সত্যিই তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মস্তো একটা বাঁকা নখর।

"এটা দিয়ে কী হবে তোর?" জিজ্ঞেস করলে মা, "ওই আবর্জনা থেকে খুঁজে এনেছিস বুঝি?"

"ওটা মনে রাখার জন্যে," ছোট্ট কপাল কুঁচকে বললে ইউরা।

"মনে রেখে তোর কী লাভ, ইউরা, সোনা আমার," সস্নেহে বললে মা।

"প্রতিশোধ নেব…ওই ডাকাতগুলোর ওপর। পড়ুক-না একবার আমার সামনে। দেখাব…"

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

মৃত্যু কখনও জয়ী হবে না

ভ্যাসিলি গ্রসম্যান

[১৯৪২-৪৩ সালে যখন সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে মানব-সভ্যতার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল, তখন প্রসিদ্ধ সোভিয়েত লেখক তাঁর *People Immortal* উপন্যাসে লালফৌজের মৃত্যুহীন বীরত্বকাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। বইটি মস্কো থেকে ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। এখানে সেই জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থের একটি অধ্যায় বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করা হল।—সম্পাদক]

রুমিয়ান্‌ৎসেভ-এর পর্যবেক্ষণ-ঘাঁটি ছিল ঠিক জার্মান বাহিনীর কাছাকাছি। ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন লেফটেন্যান্ট ক্লেনভকিন। দেখতে পেলেন, গোপন আস্তানা থেকে দুজন জার্মান অফিসার কফি ও ধূমপানরত অবস্থায় বেরিয়ে আসছে। তাদের কথাবার্তা স্পষ্ট শুনতে পেলেন তিনি। দেখলেন, টেলিফোন বিভাগের একজন কর্মী তাদের কাছে রিপোর্ট পেশ করছে এবং অফিসারদের একজন, উর্ধ্বতন নিশ্চয়ই, তাকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছে। নিজের দিকে সিগারেটের ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে ক্লেনভকিন এক পলক ঘড়ির দিকে তাকালেন। খুবই লজ্জার কথা যে, যখন সুযোগ ছিল, তখনও তিনি জার্মান ভাষা শেখেন নি। ওদের প্রত্যেকটি কথা তিনি শুনতে পাচ্ছেন, অথচ মানে বুঝতে পারছেন না। বনের প্রান্তে হাউইৎসারগুলোকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, ক্লেনভকিন যেখানে শুয়ে আছেন সেখান থেকে এর দূরত্ব হাজার মিটার। পদাতিক বাহিনীকেও তৈরি রাখা হয়েছে। আহতদের আনা হয়েছে—তারা কেউ ট্রাকে, কেউ স্ট্রেচারে শুয়ে আছে—যেন সব কিছুই এক মুহূর্তের নোটিসে অগ্রগামী পদাতিক বাহিনীর অনুগামী হতে প্রস্তুত।

টেলিফোন বিভাগের কর্মী মার্টির্নভ, যিনি ক্লেনভকিন-এর পাশেই শুয়েছিলেন, বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে দেখছিলেন জার্মান টেলিফোন কর্মীটিকে। তাঁর মতো একই কাজে রত এই জার্মানটিকে দেখে তাঁর মজা লাগছিল, আবার বিরক্ত হচ্ছিলেন।

"চেহারাটি বেশ ধূর্তের। দেখছ, এটা একটা পাঁড় মাতাল। যদি কখনও আমাদের টেলিফোনের কথাবার্তা শোনে, একটা শব্দও বুঝতে পারবে না। শালা জার্মান!"

কামানের আক্রমণ, অটোমেটিক রাইফেল আর মেশিনগানের গুলিবর্ষণ, ফেটে পড়া বোমার শব্দ সকলেই শুনতে পাচ্ছিলেন। উড়োজাহাজগুলো লালফৌজের মাথার উপর দিয়ে বোঁ বোঁ শব্দ করে জার্মানদের দিকে ঘন ঘন উড়ে যাচ্ছিল। বিমানগুলো যখন জার্মান ট্রেঞ্চগুলোর ওপর নিচু হয়ে বোমা ফেলছিল, তখন নিজেদের আবেগকে সামলে রাখা—উত্তেজিতভাবে হাত-পা নাড়ানো কিংবা উল্লাসধ্বনি না করা—কঠিন হয়ে পড়ছিল।

আর সকলের থেকে বোগারেভ নিজেও কম উত্তেজিত ছিলেন না। তাঁর চোখে পড়ল, রুমিয়ান্‌ৎসেভ ও বেপরোয়া ফূর্তিবাজ কোজলভ অপেক্ষা করে করে তীব্র চাপা উত্তেজনায় অস্থির। আক্রমণ শুরু করার আগের লড়াইগুলোর যে ধাপগুলি সম্পর্কে তাঁরা একমত হয়েছিলেন, তা পার হয়ে গেছে। একসঙ্গে আঘাত হানবার যে সময় সম্পর্কে তাঁদের ঐক্যমত হয়েছিল, তা-ও অতিক্রান্ত। অথচ এখনও কোনো সংকেত জানানো হল না। যুদ্ধের কোলাহল যখন বাড়তে থাকল তখন সামরিক বাহিনীর কম্যাণ্ডাররা আলাপ বন্ধ রেখে মনোযোগের সঙ্গে চারপাশ দেখাশোনা করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও কিছু দেখা গেল না, মাৎসালভ-এর কাছ থেকে কোনো আহ্বান-ধ্বনি শোনা গেল না।

জার্মান বাহিনীর পেছনে যাঁরা ছিলেন, এই লড়াইয়ের আওয়াজ তাঁদের কাছে খুবই অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল। সমস্ত শব্দগুলো ছিল উল্টোমুখী। ফেটে পড়া গোলার শব্দ হচ্ছিল রুশদের তরফ থেকে। গোলন্দাজ বাহিনীর যুগপৎ অস্ত্রবর্ষণ হচ্ছিল জার্মান বাহিনীর দিক থেকে। কখনও এক-একটা বুলেট মাথার উপর দিয়ে শিস্ তুলে চলে যাচ্ছিল—আর এ বুলেট ছিল রুশদেরই। জার্মানদের অটোমেটিক রাইফেল বা মেশিনগানের গুলিবর্ষণের শব্দ বিশেষভাবেই অমঙ্গল ও বিপদকে ধ্বনিত করছিল। এই ধরনের অস্বাভাবিক ব্যাপার, লড়াইয়ের এই এলোমেলো আওয়াজ, রুশদেরও নাড়া দিয়েছিল।

ওরা শুয়ে ছিল গাছের পেছনে—লতাগুল্মের ঝোপে, যে লম্বা শণগুলো এখনও তুলে নেওয়া হয় নি তার মধ্যে। শুয়ে শুয়ে শুনছিল আর ভোরের স্বচ্ছ আবহাওয়ায় উঁকি মেরে দেখছিল ধোঁয়া আর ধুলোতে পরিপার্শ্ব কোথাও কোথাও অন্ধকার হয়ে গেছে।

আহ্, সেই মুহূর্তগুলিতে পৃথিবীকে কী ভালোই না লাগছিল! সেই মানুষগুলোর কাছে কী মূল্যবানই না মনে হয়েছিল এর খাদগুলো, টিলা,

ধুলোমাখা ভাটিফুলে ছেয়ে যাওয়া গিরিখাত, বনের গর্ত। মাটিতে মিশে যাওয়া গলিত জীবদেহ, ধুলো, বনের ভিজে গন্ধ, মাটি আর ব্যাঙের ছাতা, শুকনো চেরি, কখনও বৃষ্টিতে ভেজা কখনও শুকিয়ে খরখরে হয়ে যাওয়া মাটিতে পড়ে থাকা গাছের ডাল—সব মিলে মাটি থেকে কী অপূর্ব সুরভিই না উৎসারিত হচ্ছিল। শিশিরে ভেজা একটা মাকড়সার জালের ওপর হঠাৎ সূর্যের আলোকরশ্মি পড়ে যেন একটা আবছা রামধনু ঝিকমিক করতে লাগল—দেখে মনে হল যেন প্রশান্তি ও নীরবতার এক যাদুময় পরিবেশ।

রোদিমৃৎসেভ মাটিতে মুখ গুঁজে সেখানেই শুয়েছিলেন। তবে ঘুমোচ্ছিলেন না। সরবে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন, টেনে নিচ্ছিলেন মাটির সুগন্ধ। কৌতূহল, আগ্রহ আর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য রাখছিলেন চারপাশের ঘটনাগুলোর দিকে। একটি পিঁপড়ের বাহিনী না দেখা এক রাস্তা ধরে সুশৃঙ্খলভাবে চলেছে এগিয়ে—চলেছে ঘাস আর কুটো টেনে নিয়ে। ওরাও হয়ত যুদ্ধে লিপ্ত—রোদিমৃৎসেভ মনে মনে ভাবলেন, আর এই পিঁপড়ের বাহিনী হয়ত জড়ো হয়েছে ট্রেঞ্চ খুঁড়তে কিংবা দুর্গ তৈরি করতে। অথবা কেউ হয়ত নতুন বাড়ি তৈরি করছে আর এই ছুতোর ও রাজমিস্ত্রীর দল চলেছে কাজের পথে।

কী বিশাল এই পৃথিবী যাকে তিনি দেখছেন, শুনছেন, যার থেকে নিঃশ্বাস টেনে নিচ্ছেন। বনের প্রান্তে এক টুকরো জমি আর বুনো গোলাপের ঝাড়। সেই এক টুকরো জমিই কী বিরাট! পুষ্পবিহীন এই ঝোপ কী শ্রীমণ্ডিত! শুকনো জমির মাঝে বিদ্যুতের সরু রেখার মতো একটা ফাটল। কঠোর শৃঙ্খলার সঙ্গে পিঁপড়েরা সাঁকো পার হচ্ছে—একজনের পর একজন, ফাটলের অন্যদিকের পিঁপড়েরা অপেক্ষা করছে ধৈর্যের সঙ্গে, তাদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। একটা গুবরে পোকা—যেন লাল রঙের পোশাক পরা বেঁটে গোলগাল এক মহিলা—সাঁকো পার হওয়ার জন্য এদিক-ওদিক করছেন। আর ঐ ছাখো, কেউ কোথাও নেই ভেবে একটা মেঠো ইঁদুর—কী চকচকে তার চোখ—পেছনের পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে শুকনো ঘাসে শব্দ করে ঘুরছে। এক দমকা-ঝোড়ো বাতাস। সেই বাতাসে ঘাসগুলো দুলছে, নুয়ে পড়ছে। দুলছে এক-এক রকম ঘাস এক-এক রকম ভাবে—কেউ দ্রুত অথচ নম্রভাবে, কেউ বা উদ্ধত ক্রুদ্ধ কম্পিত; তাদের শিষ ঝরে পড়েছে—যেন ঝরে পড়েছে চড়াই পাখির খাদ্যরূপে। বুনো গোলাপের ঝাড়ে ফলগুলো দুলছে—হলুদ, লালচে—রোদে পুড়ে তাদের রঙ হয়েছে আগুনে পোড়া মাটির মতো। একটা মাকড়সার

জাল—স্পষ্টতই যার স্বত্বাধিকারী তাকে পরিত্যাগ করেছে দীর্ঘদিন আগে—দুলছে বাতাসে। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শুকনো গাছের পাতা, টুকরো গাছের ছাল। একটা ওকফল এর এক জায়গায় পড়ে গিয়ে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে, যেন একটা জালকে জল থেকে তুলে তীরে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে—তার জেলে জলে ডুবে গেছে।

জীবনের অস্তিত্ব বিরাজমান এমন কত দেশ, কত বন, কত অসংখ্য টুকরো জমি রয়েছে এ জগতে! এই রোদিমৎসেভ জীবনে যা দেখেছেন বা শুনেছেন, তার থেকেও সুন্দর কত প্রভাতের আবির্ভাব এ জগতে ঘটে! কত গ্রীষ্মের দ্রুতবর্ষণ, পাখির কলকাকলি, শীতল বাতাস, রাত্রির কুয়াশা। কত কাজ! কী আশ্চর্য ছিল সেই দিনগুলো যখন তিনি ফিরে আসতেন কাজ থেকে আর তাঁর স্ত্রী স-প্রেম উদ্বেগ নিয়ে জিজ্ঞেস করতেন: "যাবে কী তোমার ডিনার খেতে?". সূর্যমুখী ফুলের বীজের তেল দিয়ে মাখা আলুসেদ্ধ খেতে খেতে গৃহের একান্ত সান্নিধ্যে দেখতেন ছেলেমেয়েদের, তাকিয়ে থাকতেন স্ত্রীর রোদে পুড়ে যাওয়া বাহুর দিকে। সামনে এখন জীবনের আর কতটা বাকি আছে? …খুব কী বেশি? সবচেয়ে বড়ো কথা, মাত্র পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যেই সব কিছু শেষ হয়ে যেতে পারে। লালফৌজের শত শত সৈনিকেরা শুয়ে শুয়ে, প্রভাতের সুগন্ধ বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে নিতে, মাটি গাছ ঝোপের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এই একই কথা ভাবছে—মনে করছে বাড়ি স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কথা। তাদের কাছে সারা পৃথিবীতে এর চেয়ে ভালো জায়গা আর নেই।

চিন্তান্বিত ইগ্‌নাতিয়েভ তাঁর কমরেডদের বলছিলেন: "সেদিন আমি বিমানবিধ্বংসী বাহিনীর দুজন লেফটেন্যান্টের কথাবার্তা শুনছিলাম। ভেবে ছাখো, তারা বলছিল—'মনে করো এখানে লড়াই চলছে আর চারপাশ জুড়ে রয়েছে বাগান যেখানে পাখিরা গান গাইছে। যা আমরা করছি তা একটুও তাদের স্পর্শ করছে না' …সে বিষয়েই আমি ভাবছি। তবে ব্যাপারটা তা নয়। বাছাধনেরা ব্যাপারটাকে তলিয়ে দেখছে না। যুদ্ধ সকলকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ঘোড়াগুলোর কথা ভাবো। তাদের কতই না ভুগতে হচ্ছে! কিংবা রোগাচেভ-এ যখন আমরা সাময়িকভাবে ছিলাম তখনকার কথা মনে করছি। সেখানে বিমানহানার সংকেত বাজলেই কুকুরগুলো গুঁড়ি মেরে মাটির তলার আশ্রয়ে চলে যেত। এটাও লক্ষ্য করেছিলাম যে একটা মাদী

কুত্তা তার ছানাগুলোকে গর্তে ঢুকিয়ে রাখল এবং বিমানহানা শেষ হলেই ছানাগুলোকে বের করে নিয়ে বেড়াতে চলে গেল। পাখিদের ব্যাপারটাই বা কী—হাঁস, মুরগি, টার্কিগুলোকে কি জার্মানদের হাতে হেনস্থা হতে হচ্ছে না? আর এখানে—আমাদের চারপাশের বনে আমি লক্ষ্য করেছি—পাখিরা ভয় পেতে শুরু করেছে। যখনই একটা বিমান আসে, আকাশে তার ধোঁয়া দেখা যায়—তখনই পাখিরা কাঁপতে কাঁপতে আর্তস্বরে কেঁদে কেঁদে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠতে থাকে। আর ধ্বংস হয়েছে কত বন, কত বাগান! কিংবা শুধু একথাটাই ভাবছি—লড়াই হচ্ছে এখানে, প্রায় হাজারখানেক সৈন্য বিমান থেকে নামছি দুমদাম করে, এর ফলেই সমস্ত পিঁপড়ে ও মশারা মরছে পায়ের চাপে।"

ঐকান্তিক আশার আনন্দ নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে কমরেডদের তিনি বললেন: "ভাইসব, বড়ো ভালো এই বেঁচে থাকা। এ রকম দিনেই সেটা বুঝতে পারছ মর্মে মর্মে। মনে হয় হাজার বছর ধরেও তোমরা এভাবেই শুয়ে থাকতে পারো, নিঃশ্বাস নিতে পারো!"

বোগারেভ লড়াইয়ের আওয়াজ শুনছিলেন মন দিয়ে। হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দ যেন কানে যেতে লাগল। জার্মান অবস্থানগুলির উপর লালতারকা খচিত বিমানগুলোকে আর উড়তে দেখা গেল না। তবে কী ওরা আক্রমণকে প্রতিহত করেছে? এও কী সম্ভব যে বোগারেভ-এর সঙ্গে মিলে যুক্ত আক্রমণ চালিয়ে জার্মানদের প্রতিরক্ষাকে ধ্বংস করতে মাৎসালভ ব্যর্থ হয়েছেন? বেদনা আঁকড়ে ধরল বোগারেভ-এর হৃদয়কে। মাৎসালভ ব্যর্থ হতে পারেন—এই চিন্তা অসহনীয়, যন্ত্রণাদায়ক। সূর্যের মুখ তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। নীল আকাশ তাঁর কাছে অন্ধকার কালো হয়ে গেল। দেখতে পেলেন না সম্মুখে প্রসারিত উন্মুক্ত প্রান্তর। ঝাপসা মনে হল গাছপালা, মাঠ…সবকিছুই। ঘৃণা—জার্মানদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র ঘৃণায় ভরে গেল তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব। এখানে—এই বনের প্রান্তে—যে অশুভ শক্তি গুঁড়ি মেরে তাঁর দেশবাসীর জন্মভূমির দিকে এগিয়ে আসছিল, তাকে তিনি ছবির মতো স্পষ্ট দেখতে পেলেন। দেশ জনগণেরই! তাঁতি আলেকসেয়েভ-এর ভাষায়—মুর-এর ইউটোপিয়া আর ওয়েনের স্বপ্ন-কল্পনায়, মহান ফরাসী দার্শনিকদের রচনাবলীতে, ডিসেমব্রিস্টদের লেখাপত্রে, বেলিনস্কি ও হার্টজেন-এর প্রবন্ধাবলীতে, ঝ্যেল্যাবভ ও মিথাইলভ-এর পত্রাবলীতে মানুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে এমন এক দেশের

জন্য ; যেখানে দাসত্ব বলে কিছু নেই, যে দেশ সকলের ; যুক্তি ও ন্যায়বিচারের নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জীবন যেখানে পরিচালিত, এমন দেশ—সেখানে যারা কাজ করে আর যারা কাজে নিয়োগ করে তাদের মধ্যেকার চিরকালীন অসাম্য দূরীভূত। হাজার হাজার রুশবিপ্লবী এই লড়াইয়ে ধ্বংস হয়েছেন। বোগারেভ তাঁদের কথা জানতেন ভাই যেমন ভাইয়ের কথা জানে। তাঁদের সম্পর্কিত সবকিছুই তিনি পড়েছেন—তাঁদের শেষ কথা, মা ও সন্তানদের কাছে লেখা শেষ চিঠি, দিনপঞ্জিকা আর গোপন আলাপ—সবকিছুই তাঁর জানা। যে পথগুলি দিয়ে তাঁরা সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে গিয়েছিলেন, যে সব স্টেশনে রাত কাটিয়েছিলেন, যে সব জেলখানায় তাঁদের শেকলে বেঁধে রাখা হয়—সে সবকিছুর কথাই তিনি জানতেন। এই লোকগুলিকে তিনি ভালো-বাসতেন, তাঁর প্রিয়তম ও নিকটতম বলে সম্মান করতেন। তাঁদের অনেকেই ছিল কিয়েভের শ্রমিক, মিন্স্কের ছাপাখানার কর্মী, ভিল্নার দর্জি, বাইলোস্টকের তাঁতি। সব শহরগুলিই এখন ফ্যাসিস্টরা দখল করেছে।

প্রতিটি স্নায়ু দিয়ে বোগারেভ ভালোবেসেছিলেন এই দেশকে—যাকে জয় করা হয়েছিল গৃহযুদ্ধের ঝড় ও লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে, জয় করা হয়েছিল ক্ষুধার যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে। এই দেশ—হোক তা দরিদ্র, হোক কঠোর শ্রম ও কঠোর নিয়মে পরিচালিত এখানকার জীবন···

ধীরে ধীরে মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা সৈনিকদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি, মাঝে মাঝে কোনো কথা বলার জন্য থামছিলেন, আবার এগোচ্ছিলেন।

তিনি মনে মনে ভাবলেন, যদি মাৎ´সালভ এক ঘণ্টার মধ্যে কোনো সংকেত না জানান, তবে নিজের দায়িত্বেই আমি ফৌজ নিয়ে আক্রমণ করতে এগুব, এগিয়ে যাব জার্মান প্রতিরক্ষা ভাঙতে···ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যেই।

দীর্ঘদিনের পিছু হটার পর এই লড়াই তাঁর কাছে মোড় ঘুরে যাওয়া ও পরিণতির প্রতীক বলে মনে হচ্ছিল। "মাৎ´সালভ নিশ্চয়ই সফল হবেন" কোজ্‌লভকে তিনি বললেন : "এ ব্যাপারে আর কোনও পথ নেই কিংবা আমি কোনো পথ দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি না।" ইগ্‌নাতিয়েভ ও রোদিম্‌ৎসেভকে তাঁর চোখে পড়ল। তাঁদের কাছে এগিয়ে গেলেন, বসে পড়লেন ঘাসের ওপর। তাঁর মনে হল, এ মুহূর্তে যে ভাবনা মনকে তাঁর দখল করে আছে—তারাও সেই একই বিষয়ে কথা বলছে, ভাবছে।

"তোমরা এখানে কী নিয়ে কথা বলছ" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

"ওহ্, দেখতেই পাচ্ছেন, আমরা মশা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম" অপরাধীর হাসি নিয়ে বললেন ইগ্‌নাতিয়েভ।

মশা, বোগারেভ ভাবলেন। এই মুহূর্তে সত্যিই কী আমরা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে চিন্তা করছি?

কয়েক কুড়ি মানুষ দেখতে গেল সেই সংকেত—রুশদের ঘাঁটির দিক থেকে লাল রকেট ছোঁড়া হচ্ছিল জার্মানদের দিকে। সেই মুহূর্তেই রুমিয়ান্‌ৎসেভ-এর হাউইৎসারগুলো গর্জন করে উঠল। হাউইৎসারগুলোর গর্জন জার্মানদের একথা জানিয়ে দিল যে রুশ সেনাবাহিনী তাদের পেছনেই আত্মগোপন করে ছিল।

বোগারেভ মাঠের চারদিক এক পলক তাকালেন। ডানপাশে অবস্থানকারী কোজ্‌লভের হাত চেপে ধরে বললেন: "তোমার উপরেই নির্ভর করছি, বন্ধু।" গভীর নিঃশ্বাস টেনে চীৎকার করে বললেন: "আমাকে অনুসরণ করো কমরেড! এগিয়ে এসো!" আর, একজন মানুষও সেই কোমল উষ্ণ গ্রীষ্মের মাটিতে শুয়ে থাকল না।

দৌড়ে এগিয়ে গেলেন বোগারেভ। এক অদ্ভুত আবেগ তাঁর সমগ্র অস্তিত্বকে আবিষ্ট করল। মানুষগুলোকে তিনি টেনে নিয়ে চললেন তাঁর পেছনে, কিন্তু তারাও যেন এক অদৃশ্য চিরন্তন সামগ্রিক বিশ্ববন্ধনে তাঁর সঙ্গে বাঁধা পড়ল, তাঁকে বাধ্য করল সামনের দিকে এগিয়ে যেতে। তিনি শুনতে পেলেন তাঁদের ভারী নিঃশ্বাস পতনের শব্দ। তাদের হৃৎপিণ্ডের দ্রুত উত্তপ্ত স্পন্দন যেন তাঁরও অন্তরে সঞ্চারিত হচ্ছিল। এরাই সেই মানুষ যারা লড়াই করে জন্মভূমিকে এনেছিল স্বাধিকারে। সৈনিকদের ভারী জুতোর শব্দ তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন সমগ্র রুশদেশ এগিয়ে চলেছে আক্রমণ করবার জন্য। ওরা দৌড়চ্ছিল জোরে আরও জোরে, "হুররে" উল্লাসধ্বনি ক্রমশ জোরালো আর আন্দোলিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। মাৎসালভ-এর সৈন্যবাহিনী যখন বেয়নেট আক্রমণে আক্রান্ত হয়ে লড়াই করছিল, তখন রণধ্বনির মধ্যেও শোনা যাচ্ছিল উল্লাসের চীৎকার। শত্রুরা দখল করে আছে দূরের যে-গ্রামগুলি, সেখানকার কৃষকরাও এ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। আকাশের অনেক উঁচুতে যে পাখিরা উড়ছিল—"হুররে" এই ধ্বনি তারাও শুনেছিল। ঐ আওয়াজ কাঁপিয়ে দিয়েছিল নীল আকাশকে এবং পৃথিবীকে করেছিল শিহরিত।

মরিয়া হয়ে জার্মানরা লড়াই করল। সুনিপুণ দক্ষতা ও দ্রুততার সঙ্গে মেশিনগান চালিয়ে তারা এক চক্রাকার প্রতিরক্ষা রচনা করল কিন্তু রুশ পদাতিক বাহিনীর দুটি তরঙ্গ দৃঢ়তার সঙ্গে একে অপরের দিকে এগিয়ে এল। লালফৌজের সৈন্যরা ট্রেঞ্চ ও গর্তগুলিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার কেটে দিল, ট্রাক ও সাঁজোয়া গাড়িগুলোতে গ্রেনেড ছুড়ে মারল। এরা কী সেই মানুষই যারা কিছুদিন আগেও বনের মধ্যে কোনো উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনলে ভয় পেত, কাকের ডাককে জার্মানদের কথা সন্দেহ করে মন দিয়ে শুনত? ইতিমধ্যে মাৎর্সালভ-এর সেনাবাহিনী শুধু যে জার্মান বাহিনীর পেছন থেকে আসা "হুররে" আওয়াজ শুনতে পেল তা নয়, তাদের কমরেডদের ধুলোমাখা ঘামে ভেজা মুখগুলোও দেখতে পেল তারা। স্পষ্ট করে চিনতে পারল যারা বোমা ছুড়ছিল তাদের এবং রাইফেল বাহিনীর সেনাদের। দেখতে পেল গোলন্দাজ বাহিনীর সৈনিকদের পোশাকের কালো রঙের বিশেষ চিহ্ন এবং লেফটেন্যাণ্ট কোজ্‌লভ-এর মাথার তারকাচিহ্নিত টুপি। কিন্তু জার্মানরা তখনও তাদের প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছিল। শুধুমাত্র সাহসই যে তাদের এই একগুঁয়েমিকে পরিচালিত করছিল তা নয়, সম্ভবত নিজেদের অপরাজেয়তা সম্পর্কে যে বিশ্বাস তাদের মোহগ্রস্ত করেছিল—তা এই পরাজয়ের মুহূর্তেও তাদের ছাড়তে চায় নি। হয়তো সাতশ দিন ধরে যে-সৈন্যরা বিজয়ী থাকতে অভ্যস্ত হয়েছিল, কিছুতেই তারা বুঝছিল না বা বুঝতে চাইছিল না যে সাতশ এক দিনে আজ প্রথম তাদের পরাজয় বরণ করতে হল।

কিন্তু রণক্ষেত্রের সৈন্যবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করা হল, ধ্বংস করা হল।

লালফৌজের প্রথম দুজন সেনা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন আর রণক্ষেত্রের গজনের মধ্যে একজনের চীৎকার শোনা গেল: "আমাদের সিগারেট দাও ভাই, হপ্তাকাল খাই নি!" আর, প্রথম যে-জার্মান মেশিনগান চালকরা ঘেরাও হয়ে পড়েছিল, তারা দুহাত উপরে তুলল; এবং এক লম্বা নাকওয়ালা রোগা অটোমেটিক রাইফেল চালক কাঁপতে লাগল। "রুশরা, আমাদের গুলি কোরো না"—এই বলে তার টমিগান সে মাটিতে ছুড়ে ফেলল। ইতিমধ্যে মাথা নিচু করে এক সারি বন্দী সেখান দিয়ে যাচ্ছিল—পদাতিক বাহিনীর ব্যবহৃত বিশেষ টুপি তাদের মাথায় ছিল না, গলার কাছে জামা খোলা, অল্পক্ষণ আগে লড়াইয়ের গরমে বোতাম তারা খুলে ফেলেছিল; উল্টে রাখা হয়েছিল তাদের পকেট—গ্রেনেড বা রিভলবার আছে কিনা দেখবার জন্ত। কেরাণী, টেলিগ্রাম

ও রেডিও বিভাগের কর্মীদের সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আর সেই হিংস্র যুদ্ধকলঙ্কিত মানুষগুলো নীরবে নিষ্পলক তাকিয়ে ছিল এক জার্মান কর্নেলের মৃতদেহের দিকে—গুলি চলে গেছে যার মগজের ভেতর দিয়ে। চকিত দৃষ্টিতে এক তরুণ কম্যাণ্ডার গুনছিল মাঠে পড়ে থাকা জার্মান বাহিনীর বন্দুক মেশিনগান ও ট্যাঙ্কগুলোর সংখ্যা।

"কমিশার কোথায়?" মানুষগুলো পরস্পরকে জিজ্ঞেস করল।

"কোথায় কমিশার?" জিজ্ঞেস করলেন রুমিয়ান্‌ৎসেভ।

"কমিশারকে কে দেখেছে?" কপালের ঘাম মুছে কোজ্‌লভ প্রশ্ন করলেন।

"কমিশার আমাদের সঙ্গে আগাগোড়াই ছিলেন" ওরা বলল: "কমিশার আমাদের সঙ্গে ছিলেন।"

"কমিশার কোথায়?" নোঙরা ধুলোমাখা ছিন্নভিন্ন পোশাক পরিহিত মাৎ´সালভ ভাঙা অস্ত্রপাতির টুকরোগুলোর মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে চীৎকার করে উঠলেন।

তারা তাঁকে বলল: "কমিশার সম্মুখভাগেই ছিলেন, কমিশার আমাদের সঙ্গেই ছিলেন।"

সূর্যের নির্মম উত্তাপে উত্তপ্ত রুশদের দখল করা সেই রণক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে একটি ছোট খাকি রঙের সাঁজোয়া গাড়ি এগিয়ে এল। চেরেদ্‌নিচেন্‌কো তা থেকে নামলেন।

"কমরেড চেরেদ্‌নিচেন্‌কো" মাৎ´সালভ তাঁকে বললেন "যে মালবাহী গাড়িটি এখন আসছে, আপনার ছেলে তার মধ্যে রয়েছে। বোগারেভ তাকে তার সেনাবাহিনী সহ নিয়ে এসেছেন।"

"আমার লেনিয়া" চেরেদ্‌নিচেন্‌কো বললেন: "আমার খোকা?"

মাৎ´সালভ-এর দিকে তিনি তাকালেন। উত্তর না দিয়ে মাৎ´সালভ মাথা নিচু করে রইলেন। চেরেদ্‌নিচেন্‌কো দাঁড়িয়ে রইলেন নির্বাক হয়ে, বন থেকে যে গাড়িগুলো আসছিল, তাদের লক্ষ্য করছিলেন।

"খোকা" তিনি আবার বললেন: "আমার খোকা।" মাৎ´সালভ-এর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন: "কমিশার কোথায়?"

এবারও মাৎ´সালভ নীরব হয়ে রইলেন।

হু হু করে বাতাস বয়ে যাচ্ছিল মাঠের ওপর দিয়ে…

যেখানে আঁগুনের শিখাগুলো ইতিমধ্যেই অল্প অল্প জলছিল সেখান দিয়ে দুজন মানুষকে আসতে দেখা গেল। চিনতে পারলেন প্রত্যেকেই। এঁরা হলেন বোগারেভ ও ইগ্‌নাতিয়েভ। তাঁদের জামাকাপড় থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছিল। তাঁরা হাঁটছিলেন একজন আরেকজনের ওপর ভর দিয়ে, ভারী ও ধীর পদক্ষেপে।

অনুবাদ ঃ ছায়া দাশগুপ্তা

ফ্যাসিবাদ ও বিপ্লব

মোহিত সেন

লেনিন বহুকাল আগে বলেছিলেন, পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন যে ভুলভ্রান্তি করে তার একটি কারণ হল নবাগত দলভুক্তদের প্রশিক্ষণ না-দেওয়া। বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে নতুন নতুন যেসব প্রজাতি আসে তাদের যদি সেই আন্দোলনের বিপ্লবী অভিজ্ঞতার তত্ত্বগত বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ করা না-হয়, তাহলে এই নবাগত শক্তিগুলি প্রায়শই পুরনো ভুলগুলি করে থাকে। আন্দোলনে যাঁরা কিছুটা প্রবীণতর, তাঁদের অবশ্য তরুণদের প্রতি অভিভাবকসুলভ সদয় দাক্ষিণ্যের মনোভাব পোষণ করা উচিত নয়; আবার সেই সঙ্গে তাঁদের এটাও ধরে নেওয়া উচিত নয় যে তাঁরা যা জানেন, তরুণরাও তা জানেন।

আমার মনে হয়, ফ্যাসিবাদের ব্যাপারে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী শক্তির ক্ষেত্রে কথাটা বিশেষভাবে সত্য। যাঁরা ১৯৩০-এর দশক থেকে আন্দোলনে আছেন এবং যাঁরা ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি আন্দোলনে এসেছেন তাঁদের সকলের মনেই ফ্যাসিবাদ এমন স্বতঃস্ফূর্ত বীভৎসতা ও প্রচণ্ড প্রতিরোধের উদ্রেক করে, যা তিন-চার দশক বাদে আজও তাজা এবং সজীব। এঁদের মনে সমান সুস্পষ্ট অন্যান্য যেসব স্মৃতি জাগে, তার একটি হল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রণ্টের লাইন—আগস্ট ১৯৩৫-এ অনুষ্ঠিত কমিনটার্নের সপ্তম কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্টে ডিমিট্রভ যে-লাইন চমৎকার স্বচ্ছতার সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন। সে সময়ে যাঁরা কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যে ছিলেন, এই রিপোর্ট তাঁদের চৈতন্যেরই অংশ হয়ে রয়েছে। তাঁদের মনে এবিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করতেই হবে এবং তাকে পরাস্ত করা যায় একমাত্র অতি ব্যাপক এক যুক্তফ্রণ্ট গড়ে তুলে—যে ফ্রণ্ট উদারপন্থী বুর্জোয়া গণতন্ত্রী পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রসঙ্গত, সেই কারণেই সি পি এম নেতৃত্ব এমন একটা সংকটে পড়েছেন। এমন কি তাঁদের অনেকের কাছেই সংসদীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে প্রয়াসী লোকজনের সাহচর্যে নিজেদের কল্পনা করাটা নিতান্তই বিতৃষ্ণাজনক। সেই কারণেই, সি পি এম নেতৃত্বের মধ্যে যাঁরা জয়প্রকাশ পরিচালিত আন্দোলনে তাঁদের পার্টিকে প্রায় লীন করে ফেলছেন তাঁরা পর্যন্ত তা করছেন এই যুক্তিতে

যে এই আন্দোলনের একটা "গণতান্ত্রিক সারবস্তু" আছে, কারণ তা "আধা ফ্যাসিস্ত" ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে চালিত!

কিন্তু ১৯৭০-এর দশকে যাঁরা কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন সেই লক্ষ লক্ষ নতুন লোকেরা কি এই ধরনের প্রায়-সহজাত দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার? তাঁরা কি জানেন ফ্যাসিবাদ কী? কিংবা তার বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করা হয়েছিল? কিংবা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট কিভাবে সারা পৃথিবীতে বিপ্লবী শক্তিগুলির অগ্রগতিকে সহজতর করেছিল? দুর্ভাগ্যবশত, জানেন না। সেটা মোটেই তাঁদের দোষ নয়। এ দোষ আমার মতো লোকেদের এবং এখনও যাঁরা আন্দোলনে আছেন তাঁদের—এ ব্যাপারে নবাগতদের শিক্ষিত করার জন্য তাঁরা যথেষ্ট করেন নি।

লেনিন ১৯০২ সালে তাঁর অমর রচনা 'কী করতে হবে?'-তে স্বতঃস্ফূর্ততার এই রোগের বিরুদ্ধেই তীব্র আক্রমণ চালিয়েছিলেন। তরুণতর বিপ্লবীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং নিজে থেকে ফ্যাসিবাদের সামাজিক সারমর্ম বুঝতে সক্ষম হবেন না, কিংবা তার বিরুদ্ধে কিভাবে লড়তে হবে তাও বুঝতে পারবেন না।

বাম-ঘেঁষা ছাত্রদের সঙ্গে কথাবার্তা ও তর্কবিতর্ক থেকে কিছুটা যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বর্তমান প্রবন্ধে বিবেচ্য কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছতা থাকা দরকার।

প্রথম, ফ্যাসিবাদ কী? এর শ্রেণীগত সারমর্ম হল—এক প্রকাশ্য সন্ত্রাসমূলক একনায়কতন্ত্রী ধরনে একচেটিয়া পুঁজির সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল, সবচেয়ে উগ্র জাত্যভিমানী ও সবচেয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির শাসন। পুঁজিপতিশ্রেণীর সমস্ত শক্তির শাসন তা নয়, এমন কি সমস্ত একচেটিয়া পুঁজিপতির শাসনও নয়, এ হল তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির শাসন।

তার শাসনের ধরন তার শ্রেণীগত সারমর্মের সঙ্গে সংহতি রেখে চলে। এটা নেহাৎ একটা বুর্জোয়া সরকারকে আরেকটা বুর্জোয়া সরকারে বদলানোর ব্যাপার নয়। এ হল বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনের ধরনের ক্ষেত্রে এক গুণগত পরিবর্তন, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক পদ্ধতি থেকে সন্ত্রাসমূলক একনায়কতন্ত্রী পদ্ধতিতে পরিবর্তন।

সুতরাং, এটা হল বিপ্লবের নিকৃষ্টতম শত্রুদের শাসন এবং এমন ধরনের শাসন যা বিপ্লবী শক্তিগুলির অগ্রগতির দৃষ্টিকোণ থেকে নিকৃষ্টতম।'

তার অর্থ এই যে সকল দেশে এবং সকল সময়ে পুঁজিপতিশ্রেণীকে, এমন কি একচেটিয়া পুঁজিপতি বর্গকেও, সমধর্মী একটা ব্যাপার বলে বিবেচনা করা ভুল। পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যে সমস্ত বিবাদ ও সংঘাত যে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে ও তার বিপ্লবী মিত্রদের কাছে তাৎপর্যহীন তা নয়। এ ধরনের সমস্ত বিবাদই যে উপদলীয় লড়াই তাও নয় এবং শ্রমিকশ্রেণী ও তার বিপ্লবী মিত্ররা বড় জোর তাকে কিছুটা কাজে লাগাতে পারে, নিছক তাও নয়। পুঁজিবাদের সংকট যত বিকাশ লাভ করে, জনসাধারণের অসন্তোষ যত বাড়তে থাকে এবং বিপ্লবী শক্তিগুলি সমবেত হতে থাকে, পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যে সংঘাত তত বিকাশ লাভ করে, পৃথকীকরণের ব্যাপারটা এগিয়ে চলে; শ্রমিকশ্রেণী ও তার বিপ্লবী মিত্রদের তা অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে। এই সংঘাত ও পৃথকীকরণ সবচেয়ে দুষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণের ক্ষেত্রকে ব্যাপক করে তোলার সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে। অবশ্য শ্রমিকশ্রেণীকে কখনোই বুর্জোয়াশ্রেণীর অপেক্ষাকৃত কম প্রতিক্রিয়াশীল বা উদার মহলের লেজুড় হলে চলবে না, এই সব মহলের বুর্জোয়াশ্রেণীর অপেক্ষাকৃত বেশি প্রতিক্রিয়াশীল এমন কি ফ্যাসিস্ত অংশগুলির সঙ্গে আপস করার অন্তর্নিহিত প্রবণতাকেও সর্বদা মনে রাখতে হবে। কিন্তু তাকে থাকতে হবে ফ্যাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সামনের সারিতে এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর কম প্রতিক্রিয়াশীল ও উদার অংশগুলিকে, বিশেষ করে তাদের অনুগামী জনসাধারণকে টেনে আনার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

এছাড়াও এর অর্থ এই যে, এমন কি সবচেয়ে 'গণতান্ত্রিক' বুর্জোয়া গণতন্ত্রেও শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে গুলিবর্ষণ করা হয়, গ্রেপ্তার করা হয়, নানা ধরনের দমনপীড়ন চলে—এই ঘটনার সঙ্গে ফ্যাসিবাদকে মিশিয়ে ফেলা চলবে না। এগুলি ছাড়া কোনো বুর্জোয়া শাসনই থাকতে পারে না। এর বিরুদ্ধে কি লড়াই করতে হবে? নিশ্চয়ই হবে এবং লড়াই করতে হবে সম্ভাব্য সর্বশক্তি দিয়ে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে 'সাধারণ' বুর্জোয়া নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই থামিয়ে দেওয়া তো চলবেই না, বরং আরো তীব্র করে তুলতে হবে আর কিছুর জন্যে না হলেও অন্তত এই জন্যে যে এ ধরনের নিপীড়ন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী গণতান্ত্রিক শক্তি-গুলিকেই আঘাত দেয়। কিন্তু এ ধরনের নিপীড়ন থেকে ফ্যাসিবাদ গুণগত-ভাবেই আলাদা একটা জিনিস।

ফ্যাসিবাদের অর্থ হল সমস্ত নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ। ফ্যাসিবাদের অর্থ হল সমস্ত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, সমস্ত গণতান্ত্রিক বিরোধীপক্ষ ও সমস্ত গণতান্ত্রিক গণসংগঠন নিষিদ্ধ করা। তার অর্থ ধর্মঘটের অধিকারের অবসান। প্রতিবাদ মিছিল, নির্বাচন প্রভৃতির অবসান। ফ্যাসিবাদ শ্রমিকশ্রেণী, তার বিপ্লবী মিত্র ও সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির কাছ থেকে তাদের দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত সবকিছুকে এবং সমাবেশ ও সংগঠনের জন্য তাদের কাছে প্রয়োজনীয় সবকিছুকে কেড়ে নেয়।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। অমর সালভাদর আলেন্দের নেতৃত্বে চিলিতে গণঐক্য মোর্চার বিজয়ের আগে চিলি ছিল এক বুর্জোয়া গণতন্ত্র, সেখানে প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে গ্রেপ্তার, গুলিবর্ষণ প্রভৃতির সম্মুখীন হতে হত। কিন্তু ১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে ফ্যাসিস্ত অভ্যুত্থানের পর চিলিতে এই শক্তিগুলিকেই সম্মুখীন হতে হয়েছে গুণগতভাবে নিকৃষ্ট একটা জিনিসের—দুর্বৃত্ত আর খুনীদের শাসনের, যেখানে কোনো স্বাধীনতা নেই, নেই কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার। আরেকটি উদাহরণ দিই। ১৯৩৩ সালের আগে জার্মানিতে কমিউনিস্ট, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ও অন্যান্যদের সর্বপ্রকারের নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হত, প্রায়শই বহু নেতাকে জেলে যেতে হত। কিন্তু নাৎসিরা যখন ক্ষমতায় এল তখন মৃত্যু বন্দীশিবির আর আত্মগোপন অবস্থা ছাড়া কিছুই আর রইল না।

ফ্যাসিবাদ ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের গুণগত পার্থক্যের কথা সব সময়ে মনে রাখতে হবে।

দ্বিতীয়, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই হবে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর উপরের বিশ্লেষণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। একথা সত্য, ফ্যাসীবাদের বিজয়ের অর্থ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিনাশ। আর বুর্জোয়া গণতন্ত্র সম্বন্ধে কমিউনিস্টদের নিশ্চয়ই কোনো মোহ নেই। তাঁরা এটা পরিষ্কার দেখতে পান যে এটা হল পুঁজিপতিশ্রেণীর শাসনের একটা ধরন এবং তার মধ্যে রয়েছে বিরোধ ও সীমাবদ্ধতা। কিন্তু ফ্যাসিবাদের বিজয়ের অর্থ এই নয় যে পুঁজিপতিশ্রেণীর শাসন শেষ হয়ে গেল। তার অর্থ, পুঁজিপতিশ্রেণীর সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অংশগুলি জয়লাভ করল। তার অর্থ এই নয় যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিরোধ ও সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠে তার জায়গায় গণতন্ত্রের একটা উচ্চতর ধরন এল, শ্রমিকশ্রেণী ও তার বিপ্লবী মিত্ররা যে-গণতন্ত্রকে তাদের আশু দাবির জন্য ও চূড়ান্ত লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য সংগ্রামে আরও ভালভাবে কাজে লাগাতে পারবে।

তার অর্থ, জনগণের অর্জিত গণতান্ত্রিক সাফল্যগুলি এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রে গভীরতর ও ব্যাপকতর সংগ্রামের যে সম্ভাবনা থাকে তাকে পুঁজিপতিশ্রেণীর সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অংশ ধ্বংস করে দিল এবং কেড়ে নিল। ফ্যাসিবাদের বিজয়ের অর্থ শুধুই বুর্জোয়াশ্রেণীর উদার গণতান্ত্রিক অংশগুলির পরাজয়ই নয়। এর অর্থ, সর্বোপরি ও প্রধানত, সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির পরাজয় এবং বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর পরাজয়। শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনকে, তার পার্টিগুলিকে ও তার নেতাদেরই আলাদা করে বেছে নেওয়া হয় বিশেষ হিংস্র ও বিধ্বংসী আক্রমণের জন্য।

সুতরাং, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা উদার বুর্জোয়াদের জন্য 'শ্রমদান' ধরনের একটা কিছু নয়। শ্রমিকশ্রেণী ও তার বিপ্লবী মিত্রদের পক্ষে এটা হল নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার লড়াই। ব্যাপারটা জীবন-মরণের। ফ্যাসিবাদ যদি জেতে তার অর্থ হবে এই যে শ্রমিকশ্রেণী ও তার বিপ্লবী মিত্ররা ভয়ঙ্কর ও মারাত্মকভাবে পরাজিত হল এবং বলাই বাহুল্য, সেখান থেকে সামলে ওঠা সহজ হবে না।

কিছু কিছু বামপন্থী মহলে কখনও কখনও শোনা যায় যে সাময়িকভাবে ফ্যাসিবাদের জয়টা খারাপ হলেও শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা ভালোই, কারণ দক্ষিণপন্থী ও প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলি খুব তাড়াতাড়ি নিজেদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করবে এবং জনসাধারণও তাড়াতাড়ি বামপন্থার দিকে চলে আসবে। উদার বুর্জোয়া গণতন্ত্র যেসব দেশে আছে সেখানে জনসাধারণের মনে প্রচণ্ড মোহ আছে বলে শত্রুর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের কাজটা অনেক বেশি কঠিন।

কিন্তু অভিজ্ঞতা কী দেখায়? পর্তুগালে ফ্যাসিবাদ টিকেছিল পঞ্চাশ বছর এবং এখনও সমস্ত সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে কৃষকরা, বাম অভিমুখী হন নি। স্পেনে ফ্যাসিবাদ ক্ষমতায় রয়েছে ১৯৩৬ সাল থেকে এবং সে দেশের কমিউনিস্ট পার্টি অন্যান্য ব্যাপক গণতান্ত্রিক বর্গের সঙ্গে মিলে প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র না হোক, পুঁজিপতিশ্রেণীর অংশগুলি সমেত এক গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনকে দিয়ে সেই ফ্যাসিস্ত শাসনকে স্থানান্তরিত করার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিবিপ্লব জয়ী হয়েছিল ১৯৬৫ সালে এবং এক দশক বাদেও কমিউনিস্ট পার্টি নিজেকে পুনর্গঠিত করতে পারে নি।

তৃতীয়, ফ্যাসিবাদ যেভাবে ক্ষমতায় আসে, তার সুনির্দিষ্ট লক্ষণ কী? এখানে ডিমিট্রভের কথাগুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

"জনসাধারণের উপরে ফ্যাসিবাদের প্রভাবের উৎস কী? ফ্যাসিবাদ জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতে পারে কারণ তার বাগাড়ম্বরপূর্ণ আবেদনটা থাকে তাদের সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন আর চাহিদার কাছে। জনসাধারণের মনে যেসব কুসংস্কার গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়ে থাকে ফ্যাসিবাদ যে শুধু সেগুলিকেই প্রভাবিত করে তাই নয়, জনসাধারণের শ্রেয়তর হৃদয়বৃত্তিকে, তাদের সুবিচার-বোধকে, এমন কি কখনও কখনও তাদের বিপ্লবী পরম্পরাকেও কাজে লাগায়...

"ফ্যাসিবাদের লক্ষ্য থাকে জনসাধারণকে বল্গাহীনভাবে শোষণ করা, কিন্তু তাদের সামনে সে আসে চতুরতম পুঁজিবাদবিরোধী বুলি নিয়ে; লুঠেরা বুর্জোয়াশ্রেণী, ব্যাঙ্ক, ট্রাস্ট ও ধনকুবেরদের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের গভীর ঘৃণার সুযোগ সে নেয় এবং এমন সব শ্লোগান সে তুলে ধরে যেগুলি সেই মুহূর্তে রাজনৈতিকভাবে অপরিণত জনসাধারণের কাছে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক...

"ফ্যাসিবাদ জনগণকে তুলে দেয় সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত ও অর্থগৃধ্নু শক্তিগলির মুখের গ্রাসে পরিণত হবার জন্য, কিন্তু জনগণের সামনে সে আসে 'সৎ ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার'-এর দাবি নিয়ে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সরকারগুলি সম্পর্কে জনসাধারণের মোহভঙ্গের উপরে ভরসা করে ফ্যাসিবাদ শঠতাপূর্ণভাবে দুর্নীতির নিন্দা করে...

"বুর্জোয়াশ্রেণীর সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রগুলির স্বার্থেই ফ্যাসিবাদ পুরনো বুর্জোয়া পার্টি ছেড়ে চলে-আসা হতাশ জনসাধারণকে পাকড়ায়। কিন্তু জনসাধারণের মনে সে রেখাপাত করে বুর্জোয়া সরকারগুলির উপরে **তার আক্রমণের প্রচণ্ডতা** দিয়ে এবং পুরনো বুর্জোয়া পার্টিগুলির প্রতি আপসহীন মনোভাব দিয়ে।

"অসূয়া আর শঠতায় অন্য সব ধরনের বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াকে ছাপিয়ে গিয়ে ফ্যাসিবাদ তার বাগাড়ম্বরকে প্রতিটি দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এমন কি একই দেশের বিভিন্ন সামাজিক বর্গের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। আর সাধারণ পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর লোকেরা, এমন কি শ্রমিকদের একটা অংশও, অভাব বেকারি ও অস্তিত্বের অনিশ্চয়তা হেতু হতাশাগ্রস্ত হয়ে ফ্যাসিবাদের সামাজিক ও উগ্র জাত্যভিমানী বাগাড়ম্বরের শিকার হয়।

"ফ্যাসিবাদ ক্ষমতায় আসে প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী আন্দোলনের ওপরে **আক্রমণ চালাবার পার্টি হিসেবে,** অস্থির অসন্তুষ্ট জনসাধারণের উপরে আক্রমণ চালাবার পার্টি হিসেবে; অথচ সে তার ক্ষমতায় আরোহণকে

উপস্থিত করে 'সমগ্র জাতি'র পক্ষ থেকে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে 'বিপ্লবী' এবং 'জাতির মুক্তি'র জন্য 'বিপ্লবী' আন্দোলন হিসেবে।" (বড় হরফ মূল রচনার)

যে সুনির্দিষ্ট উপায়ে ফ্যাসিবাদ ক্ষমতায় আসে তা হল এক **ব্যাপক প্রতিবিপ্লবী আন্দোলন** গড়ে তোলা। শুধু সেনাবাহিনী বা আমলাতন্ত্রকে ব্যবহার করে ফ্যাসিবাদ ক্ষমতায় আসে একথা কল্পনা করা ভুল। নিশ্চয়ই সে দুটোরই মধ্যেকার প্রতিক্রিয়াশীলদের কাজে লাগায়। এবং প্রতিবিপ্লবী প্রক্রিয়ার এক বিশেষ মুহূর্তে তার গুরুত্বও বিরাট হয়ে ওঠে। কিন্তু ফ্যাসিবাদ ক্ষমতা দখলের জন্য প্রস্তুতি চালায় যথাসম্ভব ব্যাপক জনসাধারণকে সক্রিয় করে তুলে; দৃশ্যত সেটা স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে, আসলে গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী অগ্রগতির ক্রমবর্ধমান শক্তির বিরুদ্ধে।

চতুর্থ, ফ্যাসিবাদের ক্ষমতায় আসার বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করতে হবে? কিংবা, আরেকভাবে বলতে গেলে, শুধু একা কমিউনিস্টদের চেষ্টা দিয়েই কি ফ্যাসিবাদের ক্ষমতায় আসা রোধ করা যাবে?

বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলনের সাবিক অভিজ্ঞতা অঙ্গুলিনির্দেশ করে এই সিদ্ধান্তের দিকে যে একমাত্র একটা ব্যাপক ফ্যাসিবিরোধী গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠনই ফ্যাসিবাদের বিজয়কে রোধ করতে পারে। কমিউনিস্টরা একার চেষ্টায় তা পারে না। কমিউনিস্টরা যেখানে এ রকম মোর্চা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানেই ফ্যাসিবাদ জয়ী হয়েছে। এর সবচেয়ে মর্মান্তিক উদাহরণ হল ১৯৩৩ সালের জার্মানি।

ফ্যাসিস্তরা যদি কোনো বিষয়কে কমিউনিজম ও কমিউনিজমবিরোধিতার প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হয় তাহলে তাদের জয় অবধারিত হয়ে ওঠে। কারণ ফ্যাসিস্তদের ক্ষমতা দখলের প্রয়াস চলে ঠিক তখনই যখন জনসাধারণের 'র‍্যাডিকালাইজেশন'-এর চাইতে গণ-অসন্তোষ বেশি, যখন কমিউনিস্টরা শ্রমিক-শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ও জনসাধারণের অন্যান্য অংশের সমর্থন লাভ করতে পারে নি, অথচ বুর্জোয়া শাসনের সংকট দেখা দিয়েছে। ফ্যাসিস্তরা যে কমিউনিজম বিরোধিতার ধ্বজা তোলে তার কারণ মোটেই এই নয় যে তাদের মতে কমিউনিস্টদের ক্ষমতা দখল আসন্ন; তার উদ্দেশ্য হল আলোড়ন-ক্ষুব্ধ চলমান অথচ সচেতন লক্ষ্যবিহীন জনসাধারণকে বিপথে চালিত করা, গতিমুখ বদলে দেওয়া এবং বিভেদ সৃষ্টি করা।

যে রণকৌশলগত নীতির প্রয়োগ ফ্যাসিস্ত বিজয়কে রোধ করে তা হল,

সর্বোপরি কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে প্রশ্নটিকে সঠিকভাবে তুলে ধরা, অর্থাৎ **গণতান্ত্রিক অগ্রগতি, না ফ্যাসিবাদ।**

ফ্যাসিস্তদের কমিউনিস্টবিরোধী ধূম্রজালকে এটাই ছিন্ন করে দেয় এবং তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক লড়াই ও সংঘর্ষের জগতে কে কাকে পরাস্ত করবে, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সেটা স্থির হয় কে কাকে বিচ্ছিন্ন করবে, তাই দিয়ে।

ফ্যাসিস্তদের উপরে বিচ্ছিন্নতা চাপিয়ে দেবার রণকৌশলের দুটি অবিচ্ছেদ্য-ভাবে যুক্ত দিক আছে। একটি দিক হল, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলি যাদের কাছে শ্রেয় ও প্রেয়, জনগণের অর্জিত গণতান্ত্রিক সাফল্যগুলিকে যারা রক্ষা করতে চায়—তাদের সকলকেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে টেনে আনতে হবে—তাদের দোদুল্যমানতা ও উৎসহীনতা সত্ত্বেও। অন্যটি হল, যারা আমূল পরিবর্তনকামী, যারা গণতান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর চায়, তাদের সকলকে ফ্যাসিবিরোধী মোর্চায় নিয়ে আসতে হবে। সর্বোপরি এইখানেই কমিউনিস্টদের পালন করতে হবে উদ্যোগ ও ঐক্যবিধানের অপরিহার্য ভূমিকা।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আরেকটি দিকও উপযুক্তভাবে উপলব্ধি করা দরকার—সেটি হল ফ্যাসিস্ত শিবিরে বিভেদ। একথা কল্পনা করা ভুল যে ফ্যাসিবাদের শক্তিগুলি সবাই গোড়া থেকে ঐক্যবদ্ধ। ফ্যাসিস্ত জোট গঠন ফ্যাসিবিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠনের মতোই রীতিমতো একটা প্রক্রিয়া। লেনিনই শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে শত্রুকে "পরাজিত করা যায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে এবং শত্রুদের মধ্যে যে কোনো, এমন কি ক্ষুদ্রতম, বিরোধকে অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, সযত্নে, সমনোযোগে, দক্ষতার সঙ্গে ও **বাধ্যতামূলক** ভাবে ব্যবহার করে" (বড় হরফ মূল রচনায়)।

যেসব কনসেশন ও আপস প্রকৃতপক্ষে ফ্যাসিস্ত শক্তিগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক বনিয়াদকে সুদৃঢ়, এমন কি প্রসারিত, করে এবং ফ্যাসিবিরোধী শক্তিগুলিকে ভিন্নমুখী ও বিভক্ত করে—এমন সব কনসেশন দেওয়া ও আপস করার নীতি থেকে উপরের এই রণকৌশলগত নীতিটিকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে চিহ্নিত করতে হবে। এ ধরনের সীমারেখা টানার প্রয়োজনীয়তার ফলে কিন্তু রণকৌশলগত নীতিটির প্রয়োজনীয়তা বাতিল হয়ে যায় না।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাফল্য চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে ব্যাপক

ফ্যাসিবিরোধী শক্তিগুলি গণতান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আদায়ের জন্য কতখানি ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে, তার উপরে। শুধু 'স্থিতাবস্থা' রক্ষা করে চলার অর্থ ফ্যাসিস্ত বিজয়কে ডেকে আনা। কারণ 'স্থিতাবস্থা'র ভিতরেই এমন কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে যা ফ্যাসিবাদের জন্ম দেয়। একচেটিয়া পুঁজি 'স্থিতাবস্থা'র একটি অঙ্গ। জমিদারিও তাই। কালোবাজারী, মজুতদার, ফাটকাবাজরাও তাই। এমন কি নয়া-উপনিবেশবাদীরাও 'স্থিতাবস্থা'র অঙ্গ। আর যেসব সামাজিক শক্তির অভিব্যক্তি হল ফ্যাসিবাদ—সেই শক্তিগুলিকে উদার বুর্জোয়ারা যে-কনসেশন দেয়, তাদের সঙ্গে যে-আপস করে—সেগুলিও 'স্থিতাবস্থা'র অঙ্গ। গণ-অসন্তোষও তাই।

অতএব, প্রতিবিপ্লবী পশ্চাৎগামিতার ফ্যাসিস্ত প্রচেষ্টাকে ঠেকানো এবং পরাস্ত করা যায় একমাত্র বৈপ্লবিক, গণতান্ত্রিক অগ্রগতির জন্য সংগ্রামের সাহায্যে। সেই জন্যই দরকার এক ফ্যাসিবিরোধী কর্মসূচী গ্রহণ ও রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম। এই কর্মসূচীতে উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বিবেচিত হবে এবং সমস্ত ফ্যাসিবিরোধী শক্তির স্বার্থকে গণ্য করা হবে। উদার বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থকে অবশ্যই গণ্য করতে হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে গণ্য করতে হবে শ্রমিকশ্রেণী কৃষকসমাজ পেটিবুর্জোয়া ও জনসমষ্টির অন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক অংশের স্বার্থকেও।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার। সেটি এই যে বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে ফ্যাসিস্ত শক্তিগুলি নয়া-উপনিবেশবাদী অন্তর্ঘাতের চর। হিটলার শুধু যে তার নিজের দেশে ফ্যাসিস্ত একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছিল তাই নয়, তাকে অন্তর্ঘাতের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছিল এবং পরে যতগুলি সম্ভব দেশে তাঁবেদার ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নগ্ন আগ্রাসনের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছিল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সেই হিটলারের উর্দি গায়ে চাপিয়েছে। অবশ্য খোলাখুলি সামরিক আগ্রাসন আজ অনেক বেশি অসুবিধা-জনক, যদিও তাকে একেবারে বাতিল করা যায় না কোনো মতেই। তাই, সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে সি আই এ-র কার্যকলাপ এবং 'ডি-স্টেবিলাইজিং' বা স্থিতিশীলতা নষ্ট করে দেওয়ার তৎপরতা।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাই একই সঙ্গে, শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিশেষ করে আমাদের মতো দেশগুলিতে নয়া-উপনিবেশবাদী অন্তর্ঘাতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আমাদের জাতীয় স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় ও বিকশিত করার

সংগ্রামের সঙ্গে তা মিশে যায়।

নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অতি-গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হল শান্তির জন্য ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই সংগ্রামের সাফল্য নির্ভর করে পৃথিবীর সমস্ত উপনিবেশবাদবিরোধী শক্তির ঐক্য ও তৎপরতার উপরে। তা নির্ভর করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমস্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের, সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্র ও জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলি এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির একচেটিয়াবিরোধী সংগ্রামের শক্তিগুলির সংহতির উপরে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সমস্ত নয়া-উপনিবেশবাদবিরোধী শক্তির মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ শক্তি, অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঐক্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রীই হল বিশ্বব্যাপী এবং ফ্যাসিবিরোধী ও নয়া-উপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রামের এবং ফ্যাসিস্ত ও নয়া-উপনিবেশবাদী শক্তির হাতে বিপন্ন প্রতিটি দেশের সংগ্রামের আলম্বস্বরূপ।

ফ্যাসিস্ত ও নয়া-উপনিবেশবাদী শক্তিগুলি একথা ভালো করেই জানে। তাই যেসব অস্ত্র তারা খুবই ঘন ঘন এবং অতীব হিংস্রতার সঙ্গে ব্যবহার করে তার একটি হল সোভিয়েতবিরোধিতা। বিশ্বস্তরে ফ্যাসিবাদকে উৎখাত করার ক্ষেত্রে যে দেশটি নিয়ামক ও নেতৃভূমিকা পালন করেছিল, এখন যারা বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কাজ করছে—তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হল সেই দেশটিই।

এ ব্যাপারে, পিকিংয়ের এবং অন্য সব জায়গার মাওবাদীরা পালন করছে ফ্যাসিবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের 'বামপন্থী' অনুচরের ভূমিকা। তাদের উন্মত্ত সোভিয়েতবিরোধিতা ও তার সঙ্গে ছদ্ম 'বিপ্লবী' বুলি, এমন কি 'মার্কসবাদী-লেনিনবাদী' শব্দ-ব্যবহারের লক্ষ্য হল—একদিকে ফ্যাসিবিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত র‍্যাডিক্যাল ও বিপ্লবীদের বিপথগামী ও বিভক্ত করা; অন্য-দিকে, তাদের 'জাতীয়তাবাদী' আবেদনের উদ্দেশ্য হল সর্বোপরি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রগুলি ও জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলির মধ্যেকার ক্রম-বর্ধমান সংহতি ও মৈত্রীকে ভাঙা।

সুতরাং, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত রয়েছে সোভিয়েত-বিরোধিতার বিরুদ্ধে তার সবচেয়ে ক্ষতিকর অভিব্যক্তি—মাওবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

উপরে যেসব কথা বলা হল তা থেকে এটা পরিষ্কার যে ফ্যাসিস্ত আক্রমণের

পরাজয় ছাড়া বিপ্লবী অগ্রগতির কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। একথাও স্পষ্ট যে গণতান্ত্রিক বৈপ্লবিক অগ্রগতি ছাড়া এবং ফ্যাসিবাদের সামাজিক-অর্থ নৈতিক বুনিয়াদের উপরে আঘাত ছাড়া, যারা তাদের সংগ্রামকে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পরেও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে সেই বিপ্লবী শক্তিগুলি সমেত সমস্ত ফ্যাসিবিরোধী শক্তির ঐক্য ও তৎপরতা ছাড়া ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যে-সংগ্রামে এই বিপ্লবী শক্তিগুলি উদ্যোগের ভূমিকা ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে পারে এবং অবশ্যই নেবে—সেই সংগ্রামই সে-কারণে বিপ্লবের পরিপূর্ণ বিজয় ও সমাজতন্ত্র অভিমুখে যাত্রাপথের এক অপরিহার্য উত্তরণকালীন কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে।

ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম

নরহরি কবিরাজ

ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ৩০শ বার্ষিক উদযাপনের মুহূর্তে আজ আমরা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করি সোভিয়েত ইউনিয়নের সেই গৌরবময় ভূমিকার কথা, যা ফ্যাসীবাদী বর্বরতার আক্রমণ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করেছিল। ইতিহাস এই সাক্ষ্য বহন করছে যে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সোভিয়েত রেড আর্মিকে পুরোভাগে রেখে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছিল বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টরা ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক শক্তি। আজ আমরা সেই কমিউনিস্ট যোদ্ধাদের গৌরবমণ্ডিত ভূমিকা সম্পর্কে গর্ব অনুভব করি।

বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিকাশ

স্বাভাবিকভাবেই, এই দুর্জয় সংগ্রামের ফলপরিণাম হিসাবে যুদ্ধোত্তরকালে পৃথিবীর রাজনীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাব দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে।

[১] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পৃথিবীতে একটি মাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই যুদ্ধ শেষ হবার পরে পূর্ব-ইয়োরোপের কয়েকটি দেশে এবং চীনে, উত্তর-কোরিয়া ও উত্তর-ভিয়েতনামে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক কথায়, উপরোক্ত দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে ধনতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার মুখোমুখি একটি সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনাটি পৃথিবীর গতিকে চূড়ান্তভাবে প্রভাবিত করতে আরম্ভ করেছে।

[২] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের যে শক্তি ছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে তুলনায় তার শক্তি বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯১৭ সালে মাত্র একটি দেশে (সোভিয়েত রাশিয়া) কমিউনিস্ট পার্টি বিদ্যমান ছিল, অন্যান্য দেশে ছিল কমিউনিস্ট গ্রুপ মাত্র; ১৯২৮ সালে ৪৬টি দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছিল, ১৯৩৫ সালে ছিল ৬১; আজ কমিউনিস্ট পার্টির

সংখ্যা ৯০। একথা জোরের সঙ্গেই ঘোষণা করা যায় যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন হল এ যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী, সবচেয়ে জঙ্গী আন্দোলন।

[৩] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের যে শক্তি ছিল, তুলনায় তা আজ বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম চলেছিল, সাম্রাজ্যবাদ পশুশক্তির জোরে বেশ কিছুটা তার গতিরোধ করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের শক্তি তুলনায় বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিশ্ব-পরিস্থিতিকে চূড়ান্তভাবে প্রভাবিত করার ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদ চিরতরে হারিয়েছে। ফলে, জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে গত পঁচিশ বছরের মধ্যে প্রায় একশোটি দেশ ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জন করেছে। জোট-নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে তারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি স্বাধীন ও প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে।

বস্তুত, বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিক আন্দোলন, এবং শক্তিশালী জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম—এই তিন স্রোতধারা মিলিত হয়ে বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ার অগ্রগতিকে আজ অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছে।

একাশি পার্টির দলিলে (১৯৬০) বিষয়টির গুরুত্ব নির্ধারণ করে সঠিকভাবেই বলা হয়েছে—"আজ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা, এবং সেইসব শক্তি—যারা সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে—সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের সপক্ষে সংগ্রাম করছে, এরাই সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের প্রধান মর্মবস্তু, প্রধান ধারা এবং প্রধান বৈশিষ্ট্যকে নির্ধারিত করছে। সাম্রাজ্যবাদ যতই চেষ্টা করুক, তারা ইতিহাসের অগ্রগতি রোধ করতে পারবে না।"

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের মধ্যে সম্পর্ক

প্রশ্ন উঠতে পারে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের এই যোগাযোগ কি আকস্মিক, অথবা, এই সম্পর্ক সমাজবিকাশের নিয়মের অঙ্গ?

এই বিষয়ে লেনিনের নির্দেশ শিরোধার্য। লেনিন লিখেছেন—সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে বিশ্ব-পরিস্থিতিতে প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে এক নতুন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির জেহাদ—"একথা যদি আমরা মনে না রাখি, তাহলে আমরা একটিও জাতীয়

ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নকে সঠিকভাবে উপস্থিত করতে পারব না" (কমিণ্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে ঔপনিবেশিক কমিশনের রিপোর্ট)। যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে প্রধান শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, তাই সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা ও সৌহার্দ স্থাপন পরাধীন দেশগুলিতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের অগ্রগতির অপরিহার্য শর্তস্বরূপ হয়ে উঠেছে। লেনিন আরও বলেন—সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সাফল্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে, শুধু তাই নয়, এর ফলে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রক্রিয়াটি গভীরতায় প্রবেশ করার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। লেনিন তাঁর রিপোর্টে বলেন, কমিণ্টার্নকে "তত্ত্বগতভাবে এই প্রস্তাবনার যাথার্থ্য প্রমাণ করতে হবে যে, অগ্রসর দেশগুলির সর্বহারাশ্রেণীর সহায়তায় এই সমস্ত পশ্চাৎপদ দেশ সোভিয়েত-ব্যবস্থায় উত্তরণ করতে পারে এবং ধনতান্ত্রিক স্তরের মধ্য দিয়ে না গিয়েই বিকাশের সুনির্দিষ্ট কতকগুলি স্তরের মধ্য দিয়ে কমিউনিজমে পৌছাতে পারে।" (ঐ প্রবন্ধ)

লেনিনের বক্তব্যের সারমর্ম হল: সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি সর্বতোভাবে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে এসে দাঁড়ালে, এই দেশগুলির সামনে সমাজবিকাশের নতুন বৈপ্লবিক সম্ভাবনা উন্মুক্ত হবে। এই দেশগুলির পক্ষে ধনতন্ত্রের পাথুরে পথ পরিহার করে, কতকগুলি অন্তর্বর্তীকালীন স্তরের মধ্য দিয়ে, সমাজতন্ত্রের অভিমুখে যাত্রা করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

কাজেই বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের মধ্যে বন্ধুত্ব এক আকস্মিক ঘটনা নয়। বিশ্ব-বৈপ্লবিক প্রবাহের বিকাশের নিয়মের দ্বারা এই সম্পর্ক পরিচালিত। সোভিয়েত ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যদি বিশ্ব-বিপ্লবী প্রবাহকে প্রসারিত করতে চায় তাহলে তাদের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। আবার জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম যদি সাফল্যলাভ করতে চায়, যদি গভীরতায় প্রবেশ করতে চায়, তাহলে সোভিয়েত ও সমাজতান্ত্রিক দেশের সহযোগিতা ছাড়া এটি একেবারেও সম্ভব নয়। এটিই হল এ যুগের সমাজবিকাশের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম।

ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রাম ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম: অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক

সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম যে মিত্রশক্তি এটিই বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছিল ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। যেহেতু ফ্যাসিবাদ ছিল সাম্রাজ্য-

বাদের সবচেয়ে বেপরোয়া, সবচেয়ে মারাত্মক রূপ—সেই হেতু ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রাম এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম ছিল একসূত্রে গাঁথা। ইয়োরোপে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দুর্জয় সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি যেমন অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, একইভাবে এশিয়ায় জাপানী সমরবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়েছিল চীন, ইন্দোচীন, কোরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণ। ভারত ও অন্যান্য পরাধীন দেশকে এই সময়ে কমিণ্টার্ন নির্দেশ দেয় যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে তীব্রতর করে তোলাই এইসব দেশের কমিউনিস্টদের হবে প্রধান কাজ। ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামের কর্মকৌশল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডিমিট্রভ তাঁর বিখ্যাত রিপোর্টে (১৯৩৫) বলেন—"এইসব দেশে গড়ে তুলতে হবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণফ্রন্ট। এইসব দেশে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বে যে গণভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন চলছে—তাতে কমিউনিস্টদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে।"

বস্তুত, এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যে যুদ্ধবিরোধী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জঙ্গী আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল—তা ছিল একসূত্রে আবদ্ধ। চীনে, ইন্দোচীনে, ইন্দোনেশিয়ায়, বার্মায় যে জাপবিরোধী আন্দোলন চলছিল—তা যেমন সাম্রাজ্যবাদকে চরম আঘাত হেনেছিল, তেমনি ভারতে ও অন্যান্য দেশে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল, চরম বিচারে, এই দুই আন্দোলনই একই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়েছিল। এরা এশিয়ায় সমরবাদের ও সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে বিশেষভাবে দুর্বল করে দিয়েছিল!

ইয়োরোপের দুর্জয় ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রাম এবং এশিয়ার দুর্দমনীয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম এই দুইয়ে যুক্ত হয়ে পৃথিবীতে এক অভূতপূর্ব অগ্নিগর্ভ বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করল। পূর্ব-ইয়োরোপে জন্ম নিল কয়েকটি দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের একটি নতুন রূপ হিসাবে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এশিয়া ভূখণ্ডে চীনে, ইন্দোচীনের উত্তরাংশে, এবং উত্তর-কোরিয়ায় গড়ে উঠল কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

লেনিনের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রক্রিয়াটি সত্যি-সত্যিই গভীরতায় প্রবেশ করল। ধনতান্ত্রিক পথ সরাসরি পরিহার করে এই রাষ্ট্রগুলি সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করল।

নতুন ধরনের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম

আজকের দিনে এটি একটি নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের মধ্যে যোগসূত্র যতই ঘনিষ্ঠ হবে ততই জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম গভীরতায় প্রবেশ করবে।

রুশ বিপ্লবের আগে, যখন পৃথিবীব্যাপী ধনতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার একাধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন দেশে দেশে যে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল তার প্রধান প্রবণতা ছিল ধনতন্ত্রমুখিনতার দিকে। তখনকার দিনে, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সাফল্যের পরে এইসব দেশে স্বাধীন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে—এটাই ছিল বাঁধাধরা নিয়ম।

রুশ বিপ্লবের সাফল্যের পরে, বিশেষ করে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভবের পরে, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সামনে ধনতন্ত্রের পথ গ্রহণ করা এখন আর আবশ্যিক ব্যাপার নয়। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সামনে ধনতন্ত্রের পথটিকে পাশ কাটিয়ে, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যটি সামনে রেখে অগ্রসর হবার একটি বিকল্প পথ খুলে গেছে এবং জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের শক্তিগুলি এই পথের দিকেই ঝুঁকতে আরম্ভ করেছে।

আজ পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা পাশাপাশি অবস্থান করার ফলে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে নিযুক্ত শক্তিগুলির পক্ষে দুটির মধ্যে কোনটি শ্রেয় তা বেছে নিতে মোটেই অসুবিধা হচ্ছে না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কর্মকাণ্ড জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সামনে প্রধান আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ভিতরকার শক্তিগুলি সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি বেশি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে, বাস্তব ক্ষেত্রে তারা ধনতন্ত্রের বিরোধিতার পথ গ্রহণ করছে।

অবশ্য, সদ্যস্বাধীন দেশগুলির মধ্যে একটি বড় অংশ আজও ধনতন্ত্রের পথ আঁকড়ে ধরে রয়েছে। যারা ধনতন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে সেইসব দেশে বেকারী, দারিদ্র্য, জনগণের অসন্তোষ চিরসঙ্গী হয়ে উঠেছে। সেইসব দেশ সাম্রাজ্যবাদ-সৃষ্ট অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার জের কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

অপরদিকে যে দেশগুলি ধনতন্ত্রের পথ পরিহার করে সমাজতান্ত্রিক প্রবণতার পথ ধরছে, তারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দারিদ্র্য, বেকারীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে অধিকতর সক্ষম হচ্ছে। তারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী, এমন কি ধনতন্ত্রবিরোধী

ভূমিকা গ্রহণ করে সর্ববিধ শোষণব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রসর হচ্ছে।

এই প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব নির্ণয় করে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক বোরিস পনোমারিয়েভ লিখেছেন—"লেনিন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, অনগ্রসর দেশগুলি পুঁজিবাদী বিকাশের স্তরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে পারে, যদি অনেকগুলি অগ্রসর দেশে শ্রমিকশ্রেণী জয়ী হয়ে তাদের সব রকম সাহায্য দেয়। এই ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে, বাস্তব সামাজিক কর্মকাণ্ডে।" তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন—"এশিয়া-আফ্রিকায় এক গুচ্ছ রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে, যারা অ-পুঁজিতান্ত্রিক পথ ইতিমধ্যেই বেছে নিয়েছে। তারা ঘোষণা করেছে—সমাজতন্ত্রই তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এ থেকে প্রমাণিত হয়, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের পুঁজিবাদবিরোধী ধারা কোটি কোটি মানুষ মেনে নিয়েছে।" (পনোমারিয়ভ—বিশ্ব-বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার প্রাসঙ্গিক তাত্ত্বিক সমস্যাদি)।

আজকে সমাজতান্ত্রিক প্রবণতাই জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের অগ্রগতির প্রধান লক্ষণ হিসাবে দেখা দিয়েছে। প্রথমেই কিউবার কথা ধরা যাক। এখানে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম যেহেতু প্রথম থেকেই সমাজতান্ত্রিক প্রবণতায় সঞ্জীবিত ছিল, তাই কিউবার পক্ষে দ্রুত জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম থেকে সমাজতন্ত্রে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। তারপরে চিলির কথা ধরা যাক। আলেন্দের নেতৃত্বে এখানকার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের দিকে যাত্রা করেছিল বলেই এটি সাম্রাজ্যবাদের মনে এত বড় আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে, ইরাকে, সিরিয়ায়, আলজিরিয়ায় শাসকগোষ্ঠী সমাজতান্ত্রিক প্রবণতার পথ গ্রহণ করছে বলেই তাদের পক্ষে দৃঢ় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী, এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রবিরোধী বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।

সাধারণভাবে বলা যায় এইসব সদ্যস্বাধীন দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয়গত ভিত্তি এখনও তৈরি হয় নি। তাই এইসব দেশের পক্ষে সরাসরি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তবে এরা ইচ্ছা করলে ধনতন্ত্রের পথ পরিত্যাগ করতে পারে, এরা সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যটি সামনে রেখে অগ্রসর হতে পারে। আগামী দিনে সমাজতন্ত্র গড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে তার পূর্বশর্তগুলি একটির পর একটি রচনা করে চলতে পারে। এরই নাম সমাজতান্ত্রিক প্রবণতার পথ।

ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে চরম ও পরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আমাদের পূর্বসূরীরা যে নতুন পৃথিবীর ভিত্তি সৃষ্টি করে গেছেন তারই ফসল আজ আমরা

তুলে চলেছি। ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে সোভিয়েতের ভূমিকা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ পরাধীন দেশের মানুষের রাজনৈতিক চেতনা উন্নত করতে বিশেষ সাহায্য করেছিল। এখন থেকে পরাধীন দেশগুলিতে জনগণের মনকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী মানুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সদ্যস্বাধীন দেশের জনগণও—মানবজাতির ভবিষ্যৎ যে সমাজতন্ত্রের দিকে—এই প্রত্যয়ে দৃঢ় হয়ে উঠেছে। তাই দেখি, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার জয়ধ্বনি আজ দিকে দিকে।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে : বন্দীশালার ভিতর থেকে

নলিনী দাস

[বাঙলাদেশের বিপ্লবী জননায়ক নলিনী দাস এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। কৈশোরে বিপ্লববাদী হিসেবে ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে তিনি দীর্ঘদিন জেল খেটেছেন। ১৯৩১-এ হিজলী জেল থেকে পালিয়ে, আবার ধরা পড়ে তিনি চালান হন দ্বীপান্তরে, আন্দামানে। ১৯৩৮-এ গণআন্দোলনের চাপে সরকার তাঁদের দেশে এনে জেলে রাখে—দমদম ও আলিপুর জেলে। সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাদের জেলেই কাটে। প্রবল ছাত্র আন্দোলনের জোরে ১৯৪৬-এ নলিনী দাস ও তাঁর সহযোদ্ধা বন্ধুরা মুক্ত হন। আন্দামানেই নলিনী দাস কমিউনিস্ট কনসলিডেশনে যোগ দিয়েছিলেন। মুক্ত হয়ে তিনি যোগ দেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে। দেশভাগের পর তিনি কাজ করতে থাকেন মাতৃভূমি বরিশালেই। সেখানেও বন্দী হয়ে ৬ বছর পাকিস্তানের জেলে কাটান। পরে মুক্ত হয়ে, আয়ুবশাহীর আমলে আবার ফেরারী হন। আত্মগোপন করে কাজ করে যান ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বছর পর্যন্ত। আন্দামানে ও দেশে বন্দীদশায় ফ্যাসিবাদকে তাঁরা কি চোখে দেখেছিলেন, ও কিভাবে যোগ দিয়েছিলেন বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রামে, তারই সংক্ষিপ্ত চিত্তাকর্ষক বিবরণী নলিনী দাস লিখে পাঠিয়েছেন, 'পরিচয়'-এর এই বিশেষ সংখ্যার জন্য।—সম্পাদক]

১৯৩০-৩১ সালে ধরা পড়ে আমরা বিপ্লববাদীরা যখন জেলে গেলাম—তখন ফ্যাসিবাদ কেন, সাম্রাজ্যবাদ কথাটারও সঠিক মানে বুঝতাম না। আমরা বুঝতাম আমাদের শত্রু বিদেশী ইংরেজ রাজত্ব; তারা শোষক ও লুণ্ঠনকারী। তাদের তাড়াতে হবে, পরাধীনতার শৃঙ্খল চূর্ণ করতে হবে। আন্দামানে দ্বীপান্তরে যখন গেলাম, তখনও এই রকমই মনোভাব।

আন্দমানেই প্রথম শুরু হল সবকিছু তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা। পৃথিবীর নতুন নতুন ঘটনাবলী, নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং দেশকে স্বাধীন করবার উদগ্র বাসনা—সবকিছু মিলিয়ে আমরা অসীম আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলাম, বুঝতে চাইলাম—সাম্রাজ্যবাদ কি, সমাজতন্ত্রই বা কি, মুক্তির পথই বা কি রকম ?

আন্দামানে প্রথম দিকে ওরা আমাদের কাছে খবরের কাগজ, পত্রিকা, বই, কিছুই আসতে দিত না। পরে, অনশন ধর্মঘটে আমাদের তিন জন বন্ধু প্রাণ দেবার পর, জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে দেশী [illegible]বিদেশী খবরের কাগজ, পত্রিকা ও বই আনতে দিল। ফলে পৃথিবীর ঘটনাপ্রবাহ আমরা টাটকা জানতে পারতাম।

তাই যখন পড়লাম যে ফ্যাসিস্ট মুসোলিনী ইতালীয় ফৌজ, কামান, বিমান নিয়ে আফ্রিকার গরীব অনুন্নত দেশ আবিসিনীয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে—তখন আমরা আবিসিনীয়ার পক্ষে, মুসোলিনীর বিরুদ্ধে মত জানালাম। জার্মানিতে হিটলারের তাণ্ডব, অস্ট্রিয়া জবরদখল ও চেকোস্লোভাকিয়া গ্রাসের তোড়জোড়—এসবও আমাদের মনে গভীর ছাপ রেখে গেল।

তবে তিরিশের দশকের যে ঘটনা আমাদের মনকে সবচেয়ে বেশি করে নাড়া দিয়েছিল—তা হল ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কো ও তার সমর্থক ফ্যাসিস্ট জার্মানি ও ইতালির বিরুদ্ধে স্পেনের জনগণ, তাদের পপুলার ফ্রন্ট সরকার ও আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের বীরত্বপূর্ণ লড়াই।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমরা জেলে একটি ছোট প্রাচীরপত্র বের করতাম। নাম ছিল 'আন্দামান বুলেটিন'। তাতে আমরা নিয়মিত স্পেনের খবর দিতাম, মাদ্রিদ কী অপরিসীম বীরত্বের সঙ্গে আত্মরক্ষা করছে, সারা পৃথিবীর সেরা বিপ্লবীরা আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের নামে এসে স্পেনের মাটিতে রক্ত ঢেলে দিচ্ছে—এইসব। কয়েকটি ঘটনা মনে পড়ছে। জওহরলাল নেহরু বার্সিলোনাতে রণক্ষেত্রে গিয়ে স্পেনের মুক্তিযোদ্ধাদের সৌহার্দ্য জানিয়ে আসেন। আমরা তাতে খুব উল্লসিত বোধ করি। দু-চার টাকা করে যে যা পারি জমিয়ে শতাধিক টাকা পাঠিয়েছিলাম জওহরলাল নেহরু পরিচালিত 'স্পেন সাহায্য তহবিল'-এ। আবার যেদিন পাকাপাকিভাবে খবর এল যে ফ্যাসিস্ট দস্যুরা বার্সিলোনা শহর দখল করে নিয়েছে, সেদিন আমাদের সকলের চোখেমুখে শোকের ছায়া। খেতে পারলাম না কেউ কিছুই। পুলিশের শত অত্যাচারেও যেসব বিপ্লবীদের মুখ দিয়ে একটি কথা বেরোয় নি, তাদেরও চোখে সেদিন জলের ধারা। বার্সিলোনার পতন যেন কারাগারের মধ্যে থেকে কোনও পরমাত্মীয়ের মৃত্যুসংবাদ শোনার মতো।

একটি ছেলের কথা বলি। নাম তার হিমাংশু ভট্টাচার্য, মৈমনসিংহের বিপ্লবী। আন্দামানে বন্দী। আমরা যখন অনেকেই কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ

করছি, তখন হিমাংশু ক্ষেপে গেল। সে বলতে লাগল: কমিউনিস্ট মতবাদ ধ্বংস করবার ক্ষমতা দেখিয়েছে শুধু হিটলার। তাই আমি হিটলারেরই ভক্ত, কেননা এইসব কমিউনিস্টদের তবেই শায়েস্তা করতে পারব। আমরা হিমাংশুকে ঠাট্টা করে বলতাম 'হিটু' (হিটলারকে ছোট করে)। পরে আমাদের চেষ্টায় সেই 'হিটু' ফ্যাসিবাদবিরোধী হল, কমিউনিস্ট দলে নাম লেখালো। জেল থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেল মৈমনসিংহে, নেত্রকোনায়, গারো-হাজং অঞ্চলে। সেখানে স্বীয় কর্মক্ষমতার জোরে সে হল স্থানীয় কৃষকদের অতিপ্রিয় সঙ্গী কমিউনিস্ট নেতা। নেতৃত্ব দিল হাজংদের প্রসিদ্ধ সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবের জমানায়। আহত হল 'হিটু' পুলিশের গুলিতে। ফেরারী অবস্থায় আহত অসুস্থ 'হিটু' বরণ করল শহীদের মৃত্যু। স্পেনের আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের গৌরবময় কাহিনীই তাকে শেষ পর্যন্ত টেনে এনেছিল আমাদের শিবিরে—ফ্যাসিস্টবিরোধী করেছিল তাকে। আমৃত্যু একনিষ্ঠ রইল সে ঐ বিপ্লবী আদর্শের প্রতি।

ফিরে আসি আবার আন্দামান-কথায়। বার্সিলোনার পতনের পর আমরা, কমিউনিস্ট কনসলিডেশনের সভ্য ও সমর্থকরা, চাঁদা তুলে কমরেড স্টালিনকে একটি তার পাঠাই: **Please Intervene**। জানি না জেল কর্তৃপক্ষ সে তার কমরেড স্টালিনকে আদৌ পাঠিয়েছিল কিনা। ইতোমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি যে স্পেনের রণক্ষেত্রে বহু দেশের ফাসিস্টবিরোধী সহযোদ্ধা প্রাণ দিয়েছেন—জেনেছি রালফ ফক্স-এর কথা। জেনেছি যে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে ইংলণ্ড থেকে যে কমরেডরা লড়তে এসেছে, তারা একটি বাহিনীর নাম দিয়েছে 'সাকলাৎওয়ালা' ব্যাটালিয়ন—ইংলণ্ডস্থ ভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা প্রয়াত শাপুরজী সাকলাৎওয়ালার সম্মানে। জেনেছি যে ভারতীয় কৃষক নেতা হুন্দার ঐ ব্রিগেডে লড় ছেন, রণক্ষেত্রে গিয়েছেন সাহিত্যিক মুলক রাজ আনন্দ। এ সবকিছুই আমাদের চেতনাকে গভীরভাবে ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী করে তোলে।

জাপানী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে চীনের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রামও আমাদের মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। চীনে কংগ্রেস মেডিকেল মিশন যাচ্ছে শুনে আমরা সামান্য কিছু টাকা কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিই। এইভাবে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের স্বদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী

সংগ্রামের সঙ্গে তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

একঁটা কথা বলা ভালো। আন্দামানে থাকার সময়ই গোপন কায়দায় আমাদের হাতে বাইরের কমিউনিস্ট আন্দোলনের যেসব মূল্যবান রচনা এসে পৌছায়, তার মধ্যে অন্যতম ছিল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে গৃহীত কমরেড ডিমিট্রভের প্রসিদ্ধ ফ্যাসিস্টবিরোধী যুক্তফ্রণ্টের রণনীতি ও কর্মকৌশল। ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বুঝতে পেরে-ছিলাম যে শেষ অবধি ফ্যাসিস্ট দস্যুদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়নের চূড়ান্ত সংগ্রাম হবেই।

১৯৪১-এর ২২-এ জুন হিটলার আক্রমণ করল সোভিয়েত ইউনিয়ন। আমরা পার্টিকে জেল থেকে লিখে পাঠালাম যে এখন পার্টির রণনীতি বদলানো দরকার, কারণ সাম্রাজ্যবাদী অন্তর্যুদ্ধ এখন ফ্যাসিস্টবিরোধী মানবমুক্তির যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছে।

সে সময়ের দু-একটি ঘটনার কথা বলি। মস্কোর দরজার গোড়ায় এসে গেছে হিটলারের দস্যুবাহিনী। জেলখানায় বসে কাঁটা হয়ে রোজ রেডিওর প্রতিটি সংবাদ শুনি। কি হয়, কি হয়। মনে দৃঢ় বিশ্বাস—সমাজতন্ত্রের দেশ অপরাজেয়। কিন্তু হিটলারের বাহিনীকেও তখন অবধি কেউ ঠেকাতে পারে নি। একদিন রাত্রে রেডিওতে খবর এল : হিটলার বলেছে কাল তার ফৌজ মস্কোতে ঢুকবে। আমরা স্তম্ভিত। কিছুক্ষণের মধ্যে রেডিওতে আবার খবর এল, সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রচারমন্ত্রী লজভস্কি বলেছেন : আমরা শেষ মানুষটি অবধি মস্কো রক্ষার জন্য লড়াই করব—ফ্যাসিস্ট দস্যু কিছুতেই পার পাবে না। চোখে জল, আনন্দে আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম।

আর-এক দিন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ দেওয়ালে পিঠ দিয়ে লড়াই করছে স্টালিনগ্রাদ। বিভ্রান্ত বহু স্বদেশী বন্দী আমাদের বিদ্রূপ করে বলছে : আর কি, আপনাদের রাশিয়া তো গেল! আমরা দীর্ঘমেয়াদী অল্প কজন বিপ্লবী বন্দী দাঁতে দাঁত চেপে থাকি। উত্তর দিই না। এমন সময় ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারিতে একদিন রেডিওতে খবর এল—স্টালিনগ্রাদ আর অবরুদ্ধ নেই। বরঞ্চ কয়েক লক্ষ জার্মান সৈন্য সহ সেনাপতি পউলাস ঘেরাও—তাদের ধ্বংস অনিবার্য। সেদিন আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়েছি, শত শত গরীব কয়েদী আমাদের জড়িয়ে ধরেছে—সবাই মিলে গান গেয়েছি, আকাশ ফাটিয়ে শ্লোগান দিয়েছি: সোভিয়েত ইউনিয়ন জিন্দাবাদ! হিটলার-ফ্যাসিবাদ ধ্বংস হোক!

চল্লিশ দশকের ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন ঃ পূর্ববঙ্গ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

১৯৩৯ সনের পূর্বেই পূর্ববঙ্গের ঢাকা ও অন্যান্য শহরে রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন ধ্যানধারণার সূত্রপাত হয়েছিল। বৃটিশ কারাগারগুলোতে যেসব রাজবন্দী ছিলেন তাঁদের অনেকেই জেলে থাকাকালীন মার্কসবাদের দিকে ঝোঁকেন এবং জেলের বাইরে এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সভাকে কেন্দ্র করে নতুন জীবন্ত প্রগতিশীল আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যে লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের একটি গরিষ্ঠ অংশ সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতিশীল চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হন। এঁদের মধ্যে যেমন পুরোপুরি কমিউনিস্ট মতবাদের সমর্থক লেখক ছিলেন তেমনি অকমিউনিস্ট, সাধারণভাবে মানবতাবাদী বা হিউম্যানিস্ট লেখকও ছিলেন। এইসব লেখকদের সহায়তায় ঢাকায় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ স্থাপিত হয় ১৯৩৯ সনেই। ঐ বছরেই, সকলেরই জানা আছে, সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন ও নাৎসী জার্মানির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই বাঙালি লেখকরা ভারতের ও পৃথিবীর নানা দেশের সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের মতোই ফ্যাসিবাদের মারাত্মক আক্রমণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লেখকদের সহযোগে গঠিত আন্তর্জাতিক বিগ্রেড গঠনের ঘটনাটি বাঙালি শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি কর্মীদের বেশ খানিকটা অনুপ্রাণিত করেছিল। স্পেনে গণতন্ত্রীদের পতন হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারলেন যে ফ্যাসিস্টদের নগ্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে আরো জোরদার ও মজবুত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

পূর্ববঙ্গে ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল ঢাকা। প্রধানত সেখানেই লেখকরা সংগঠিতভাবে এই ধরনের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজসাহী, রংপুর এবং অন্যান্য জেলায় প্রধানত কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিক ইউনিয়ন ও কৃষক সভার মাধ্যমে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। কিন্তু শ্রীহট্ট ছাড়া ঢাকা জেলার বাইরে লেখক ও

বুদ্ধিজীবীদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের স্বাক্ষর তেমন পাওয়া যায় না। শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশিত এবং কালীপ্রসন্ন দাশ সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'বলাকা' পত্রিকাটি প্রগতি সাহিত্যের ভাবধারাকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। বলা বাহুল্য, ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে তৎকালীন বাঙালি লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আসা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গোড়ার দিকে ছিল পুরোপুরি একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ; বৃটেনের এই যুদ্ধে হার হলে ভারত তার বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা পেয়ে যাবে এই মনোভাব থেকে অনেকেই নাৎসী জার্মানির আপাতসাফল্যকে খুবই উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন জানাতে শুরু করেছিলেন। তৎকালীন বৃটিশ সরকারের অমানুষিক দমন-পীড়ন এই মনোভাবকে আরো দৃঢ় হতে সাহায্য করে।

১৯৪১-এর ২২ জুন হিটলারের নাজি বাহিনী তার সমস্ত শক্তিতে সোভিয়েত দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে যুদ্ধের আগুন অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে সমস্ত ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি সম্পর্কেও নতুন করে চিন্তা করার প্রয়োজন হয়। ঢাকা শহরে প্রগতি লেখক সংঘের একটি বর্ধিতায়তন সভায় সারা পৃথিবীর সমাজতন্ত্রের তৎকালীন একমাত্র প্রাণকেন্দ্রের সপক্ষে, ফ্যাসিস্ট যুদ্ধবাজদের হঠকারী আক্রমণের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করার সিদ্ধান্তই প্রগতি লেখকরা গ্রহণ করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করবার জন্যেই হিটলারের জঙ্গী বাহিনীকে পরাজিত করা দরকার এ কথাটা সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে প্রগতি লেখকরা বিভিন্ন স্থানে ছাত্র ও যুবদের সভা সংগঠিত করতে শুরু করেন। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রাজশাহী, মুন্সীগঞ্জ এবং অন্যান্য স্থানে বেশ কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন রূপ পেতে থাকে।

চল্লিশ দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন হিটলারের বর্বর বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হবার অল্পকালের মধ্যেই ঢাকা শহরে সংগঠিত হয়েছিল সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি। এই সমিতির তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সমাজ ও সভ্যতার বহুমুখী অগ্রগতির বিষয়টি তুলে ধরবার জন্যে ঢাকা শহরের সদরঘাটের সন্নিকট ব্যাপটিস্ট মিশন হলে একটি সপ্তাহব্যাপী চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। আজ শুনতে অবাক লাগবে যে তখনকার দিনে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজজীবন সম্পর্কিত

চিত্রাবলী সংগ্রহ সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। অল্প সময়ের মধ্যে যেসব বই দ্রুত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল তা থেকেই বিভিন্ন ছবি ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে স্থানীয় চিত্রশিল্পীদের সাহায্যে বড়ো আকারের প্রায় শ খানিক ছবির এই প্রদর্শনী যথাসময়ে উদ্বোধন করা হয়েছিল। ঢাকা শহরে এই ধরনের একটি ব্যাপার তখনকার দিনে একেবারেই নতুন। লক্ষ্য করা গেল, প্রতিদিন সন্ধ্যায় চিত্র প্রদর্শনী গৃহে অজস্র লোকের সমাবেশ। অধ্যাপক, লেখক, সঙ্গীতশিল্পী, ক্রীড়াবিদ, বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, আইনজীবী, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ পর্যন্ত সকলেই উৎসাহের সঙ্গে এই চিত্র প্রদর্শনী দেখতে ভীড় করেছিলেন। হল ঘরের প্রবেশপথে একটি টেবিলের ওপর ন্যস্ত খাতায় ফিরে যাবার সময় অনেক দর্শকই তাঁদের মন্তব্যও লিখে রেখে যেতে ভোলেন নি। মনে পড়ে সেই প্রিয়দর্শিনী কাজলরেখা সেনগুপ্তার কথা যিনি জানিয়েছিলেন এ রকম একটা অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে আগে আর হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছিলেন এবং নাম দিয়েছিলেন 'সোভিয়েট মেলা'। তরুণ লেখক সোমেন চন্দ ছিলেন এই প্রদর্শনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মধ্যে সবচাইতে প্রাণবান ও উৎসাহী। প্রদর্শনী গৃহে দিনের পর দিন ভীড় বেড়েই চলেছিল অথচ চিত্রগুলোর পটভূমি ও তাৎপর্য দর্শকদের বুঝিয়ে দেবার মতো অভিজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবক বা সংস্কৃতি কর্মীর সংখ্যা তেমন বেশি ছিল না। সোমেন ছিলেন চিত্র-ব্যাখ্যা তাদের পুরোভাগে এবং দেখা গেল যেখানেই সোমেন ছবি সম্পর্কে কিছু বলছেন সেখানেই দর্শকরা এসে জড়ো হচ্ছেন, ভীড় বাড়ছে। ব্যাপটিস্ট মিশন হলে সোভিয়েত চিত্র প্রদর্শনীর অসামান্য সাফল্যের পর ঢাকার বাইরে অন্যান্য স্থানেও এই ধরনের কয়েকটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল।

স্থির হয়েছিল সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির পক্ষ থেকে ঢাকায় একটি ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৪২ সনের ৮ মার্চ এই সভায় যোগদানের পথে সোমেন চন্দ নৃশংসভাবে খুন হন। বাঙলাদেশ থেকে অক্টোবর ১৯৭৩-এ প্রকাশিত 'সোমেন চন্দের গল্পগুচ্ছ' বইটির ভূমিকায় এই ঘটনা সম্পর্কে রণেশ দাশগুপ্ত লিখেছেন: "…এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন প্রখ্যাত কমিউনিস্ট শ্রমিকনেতা শামসুল হুদা, অধ্যাপক সুরেন গোস্বামী, জ্যোতি বসু, বঙ্কিম মুখার্জী, সাধন গুপ্ত, স্নেহাংশু আচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা। সম্মেলনের সূচনাতেই ফ্যাসিবাদের একদল উন্মত্ত সমর্থক এবং কিছু সংখ্যক

বিভ্রান্ত যুবা সম্মেলন পণ্ড করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তারা তখন সম্মেলনের দিকে আগতদের উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে। এই সময়ে সোমেন চন্দ লাল পতাকা হাতে রেল শ্রমিকদের একটি মিছিল নিয়ে সম্মেলন মণ্ডপের দিকে আসছিলেন। সম্মেলনের উপর আক্রমণের পরিচালকরা এই মিছিলটির উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সোমেন চন্দকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করে। সোমেন চন্দ অবশ্য লাল পতাকাটি হাত থেকে ছাড়েন নি। এইখানেই সমাপ্ত হয় সোমেন চন্দের অক্লান্ত কর্মী ও শিল্পী জীবনের।…"

সোমেন চন্দের মৃত্যুর পরবর্তী বছরেই আন্তর্জাতিক সংকট তীব্রতর হয়ে পড়ে। ইয়োরোপে লালফৌজ নাৎসী শক্তির প্রতিরোধে তখন অবিরাম রক্ত ঢেলে চলেছে, পূর্ব-এশিয়ায় ক্ষমতাগর্বী জাপান সিঙ্গাপুর বর্মা মালয় পর্যন্ত নিজের সামরিক শক্তির প্রসার ঘটিয়েছে। বর্মা থেকে চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং ভারতবর্ষের বিদেশী শাসক আপদকালীন জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হওয়ায় খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো জনসাধা-রণের হাতের নাগালের বাইরে চলে যায়। ফ্যাসিস্টবিরোধী জনযুদ্ধের মনোভাব জনসাধারণের মনে সঞ্চারিত করতে হলে জনসাধারণকে অন্তত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যুগিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এই সাদামাটা সত্য কথাটি রক্তচক্ষু বিদেশী শক্তি উপলব্ধি না করতে পারায় দিনের পর দিন নতুন নতুন সংকট আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এই অবস্থায় সাংস্কৃতিক কর্মী এবং প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীদের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়।

বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ইউনিট ও কৃষক সভার শাখাগুলোর মাধ্যমে সে-সময় পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রামী মনোভাব স্পষ্ট চেহারা নিতে থাকে, কিন্তু সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই ধরনের আন্দোলন ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করেই জোরদার হয়ে উঠেছিল। এর কারণ চল্লিশ দশকের শুরুতেই এই শহরে প্রগতি লেখক সংঘ বেশ সক্রিয় ছিল এবং ইতিপূর্বেই সংঘের নবীন লেখকরা 'ক্রান্তি' নামের একটি সংকলন প্রকাশ করে নিজেদের সংঘশক্তির পরিচয় রেখেছিলেন। সোমেনের মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পরেই ঢাকা জিলা প্রগতি লেখক সংঘের মুখপত্ররূপে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও অচ্যুত গোস্বামীর সম্পাদনায় 'প্রতিরোধ' পাক্ষিক পত্র আত্মপ্রকাশ করে। ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯। এই সময় সত্যেন সেন, অজিতকুমার গুহ, সরলানন্দ সেন, অসিত সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, মুনীর চৌধুরী, সর্দার

ফজলুল করিম, সানাউল হক, সৈয়দ নরুদ্দিন, রণেন মজুমদার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক 'প্রতিরোধ' প্রকাশের ব্যাপারে নানা দায়িত্ব গ্রহণ করে এই পত্রিকার প্রকাশ অন্তত কয়েকটি বছর অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছিলেন। এখানে 'প্রতিরোধ' সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন যেহেতু সেটা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়।

ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠেছে তখন বোঝা গেল সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করতে হলে কিছু সময়োচিত গণসঙ্গীত রচনা করা দরকার। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ-নজরুল যেমন এখন, তেমনি তখনকার দুর্যোগপূর্ণ সময়েও ছিলেন মুখ্য অবলম্বন। কিন্তু গণসঙ্গীতের প্রবর্তনও দরকার হয়ে পড়েছিল। মনে পড়ছে, এই সময় এগিয়ে এসেছিলেন একজন তরুণ, সাধন দাশগুপ্ত। তিনি নিজে গান লিখতেন এবং গাইতেন। মাত্র দু-চার জন সঙ্গী নিয়ে তিনি সে সময় পূর্ববঙ্গের নানা সভায় লোকসঙ্গীতের সুরে নানা গান পরিবেশন করেন। গ্রামের বিভিন্ন স্তরের লোকের কাছে, ফ্যাসিস্টবিরোধী ও স্বদেশপ্রেমে অনুরণিত এই গানগুলি একসময় খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিল। লোকসঙ্গীতের সুরে তিনি শহীদ সোমেন চন্দকে নিয়ে স্মরণীয় একটি গান লিখেছিলেন। এছাড়া ঢাকায় মুসলিম ওস্তাগরদের ছাদ-পিটানো গানের সুরের অনুসরণে তাঁর 'দে দে ষ্ট্যালিন ভাই, পায়ে পড়ি ছাইড়া দে, আর্য হিটলার মরি লাজেতে' গানটি সে-সময় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সত্যেন সেন এই সময়ই তাঁর গণসঙ্গীতগুলি লেখা শুরু করেছিলেন।

সমগ্র বাঙলায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্যাসিস্টবিরোধী প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকার সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'পরিচয়' ও 'অগ্রণী' এবং 'অরণি' পত্রিকার ভূমিকা এ সময় সুস্থ চিন্তার সহায়ক ছিল। এছাড়া ছিল হাওড়া থেকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্র 'অভিবাদন' এবং ঢাকার 'প্রতিরোধ'। ১৩৪৯-এ প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রতিরোধ'-এর শারদীয় সংখ্যাটি। এই সংখ্যায় ফ্যাসিস্টবিরোধী শিল্পসুষমাযুক্ত যে-কয়েকটি কবিতা ছাপা হয়েছিল সম্পূর্ণ আলাদা করে তাদের উল্লেখ অনিবার্য। কবিতাগুলো লিখেছিলেন বিমলচন্দ্র ঘোষ ('শ্বাপদ') জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ('স্লিট ট্রেনচ'), মনীন্দ্র রায় ('সূর্যের মুক্তি'), সমর সেন ('দুর্দিন'), এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় ('স্টালিনগ্রাদ')। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, ঐ বছরেই শারদীয় 'অভিবাদন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তর ফ্যাসিস্টবিরোধী দীর্ঘ কবিতা : 'সাম্রাজ্যভঙ্গের পূর্বে'। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনের ঐতিহাসিক দলিল হয়ে রয়েছে এই কবিতাগুলো একথা এই তিরিশ বছর পরেও জোর দিয়ে বলা যেতে পারে।

দুর্ভিক্ষের বছরে ঢাকা শহরে নতুন করে দেখা দিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেসব হিন্দু-মুসলিম তরুণ ছাত্র ও লেখক একাত্ম হয়েছিলেন এবার তারাই বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়লেন দাঙ্গার ক্ষয়কারী আবহাওয়াকে প্রতিরোধ করবার জন্যে। এ প্রসঙ্গে 'প্রতিরোধ' পত্রিকার ১লা শ্রাবণ ১৩৪৯-এর 'নানা প্রসঙ্গে' লেখা হয়েছিল: "...যারা সম্প্রদায় ছাড়া সমাজের বড় কোন রূপ কল্পনা করতে পারে না, তারাও জানে না, তাদের নিজ সম্প্রদায়ের কারা সর্বস্ব হারালো।...এই সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ধোঁকাবাজ ছাড়া আর কি হতে পারে? ...ঢাকা শহরের দুর্ভাগ্য যে, সাধারণ লোকের কাছে এখনও এরা প্রতিপত্তিশালী। এইজন্যই, বেছে বেছে ঢাকা শহরটাকে গুণ্ডারা তাদের হত্যাব্যবসায়ের রাজধানী করে তুলেছে। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা জনসাধারণের চিন্তাস্রোতকে ঘোলা করে রাখে জেনেই, গুণ্ডারা জনসাধারণকে নাচাবার সাহস পায়।...আমাদের চিন্তাকে নির্মল করতে হবে। আমাদের চিন্তাকে মুষ্টিমেয় স্বার্থপর লোক যাতে ঘোলা করে না রাখতে পারে, সে ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।" দাঙ্গার ব্যাপারটা উল্লেখ করতে হল এই জন্যে যে যুদ্ধ, দাঙ্গা ও দুর্ভিক্ষ এই তিনের সম্মিলিত কালো হাওয়ায় মুখ রেখেই বিবেকবান দেশপ্রেমিক শিল্পী-সাহিত্যিকদের সে সময় ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছিল। ১৯৪২-এর ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর কলকাতায় যে নিখিল বঙ্গ ফ্যাসিস্টবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘের পক্ষ থেকে ডেলিগেট হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও অচ্যুত গোস্বামী। ২০ ডিসেম্বর রাত্রিতে আসন্ন ফ্যাসিস্ট আক্রমণ ও লেখক সংঘের সমকালীন দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা শেষ হবার পরেই মধ্য রাত্রিতে জাপানী বোমারু বিমান রাত্রির স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করল, দুশমনদের মুখোমুখি হবার সুযোগ মিলল কলকাতার দেশপ্রেমিক সাহিত্যিক ও শিল্পীদের। 'ফ্যাসিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনের পরে' এই শিরোনামায় ১লা ফাল্গুন, ১৩৪৯-এর 'প্রতিরোধ' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল: "কলকাতার সম্মেলনের পর ইতিমধ্যে দু'মাস কেটে গেছে, এই সময়ের মধ্যে সংঘের মুখপত্র প্রতিরোধ সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন স্থানের অধ্যাপক ছাত্র ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের কাছে স্থানীয় প্রগতি লেখকরা উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রগতি

লেখকদের উদ্দেশ্য ও উপস্থিত কার্যসূচী সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে প্রগতি লেখক সংঘের যে সাপ্তাহিক বৈঠক প্রতি রবিবার বসে থাকে তার উপস্থিত অনুরাগীর সংখ্যাও ক্রমশই যে বেড়ে চলেছে এটাকে নিশ্চয় একটা শুভ লক্ষণ বলা যায়। ঢাকার মতো দাঙ্গাবিধ্বস্ত ও পঞ্চমবাহিনী কণ্টকিত শহরে সাহিত্যিকদের আহ্বানে দেশপ্রেমিকরা যে সাড়া দিয়েছেন ও দিচ্ছেন তা স্মরণে রেখেই আমরা কলকাতার 'ফ্যাসিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘকে' দস্যুর আক্রমণের প্রাক্কালে জানাতে চাই যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষার দায়িত্ব তাঁদের মতো আমরাও অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো, সঙ্গে থাকবে আমাদের পাশাপাশি শ্রমজীবী, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী বিপ্লবী জনগণ।"

১৯৪১ থেকে ১৯৪৫-এর প্রথম ভাগ পর্যন্ত এইভাবেই পূর্ববঙ্গে ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন অব্যাহত ছিল। প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, সাম্প্রদায়িক ঐক্য এর ফলে অনেক পরিমাণে গড়ে উঠেছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে দেশবিভাগের পরে আয়ুবশাহীর আমলে বাঙলাদেশের তরুণ সমাজে যে প্রগতিশীল আন্দোলনের সূচনা হয় যুদ্ধকালীন আন্দোলনের সময়কার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির বেশ কিছুটা প্রভাব তার পেছনে কাজ করে থাকলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ঃ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অতন্দ্র প্রহরী

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

"পদানত ও শ্রমজীবী জনতার বিশাল অভ্যুত্থান, সর্বত্র শোষক শাসক শ্রেণীদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছে ; তারা একজোট হচ্ছে এবং এই অভ্যুত্থানকে দমন করার ষড়যন্ত্র করছে। তার ফলেই জন্মলাভ করছে ফ্যাসিবাদ, এবং সাম্রাজ্যবাদীরা রক্তবন্যায় ডুবিয়ে দিচ্ছে সমস্ত আন্দোলনকে। সর্বত্র সংগ্রাম চলছে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে, পুরাতন ও নতুন সমাজব্যবস্থার মধ্যে। এই সমস্ত সংগ্রামের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ও সবচেয়ে মৌলিক হচ্ছে একদিকে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ এবং অপরদিকে কমিউনিজমের মধ্যে লড়াই। এ লড়াই চলছে সাড়া বিশ্ব জুড়ে।..." [জওহরলাল নেহরু : বিশ্ব ইতিহাস পরিচয়]

১৯৩১-এর মার্চ মাসে জাপানী ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে কার্যত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করল। সেদিন আক্রান্ত চীনের আর্ত আহ্বানে গণতন্ত্রের ভেকধারী পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা কেউ সাড়া দেয় নি। বরঞ্চ রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে ইংরেজ প্রতিনিধি সার জন সাইমন নির্লজ্জভাবে বলেন : ভারতবর্ষে আমাদের যেমন অধিকার আছে, মাঞ্চুরিয়াতেও জাপানের তেমনই অধিকার আছে। জাপানী রাষ্ট্রদূত ব্যারন মাৎসুকা ঐ বক্তৃতার পর সাইমনকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের সপক্ষে এত ভালো ওকালতি তিনিও করতে পারতেন না। রাষ্ট্রসংঘের সেই অধিবেশনেই একটিমাত্র বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল—ফ্যাসিস্ট জাপানের নগ্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে ও বিপন্ন চীনের পক্ষে। সে স্বর সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাক্সিম লিটভিনভের। তিনি বলেছিলেন : একটা দেশে যুদ্ধের আগুন জ্বলতে দিলে ক্রমে সে আগুনে সারা পৃথিবীই পুড়বে। আক্রমণকারীকে শায়েস্তা করার একমাত্র রাস্তা যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আসুন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমরা একজোট হয়ে দাঁড়াই। এইভাবেই ফ্যাসিবাদের দানবীয় যুদ্ধ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রথম দিন থেকেই রুখে দাঁড়িয়েছিল সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন। অন্ধ-কমিউনিস্টবিরোধিতায় আচ্ছন্ন ইঙ্গ-ফরাসী "গণতন্ত্র" সেদিন ফ্যাসিবাদ রোখার এই যৌথ নিরাপত্তার প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য

করেছিল, বরঞ্চ তোয়াজ করেছিল ফ্যাসিবাদকেই। তার ফলে সমগ্র পৃথিবীর জীবনে নেমে এসেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ও ফ্যাসিস্ট তাণ্ডবের অভিশপ্ত ৬টি বছর (১৯৩৯-৪৫)—যাতে প্রাণ হারিয়েছিল ৫ কোটি নরনারী, পঙ্গু হয়েছিল প্রায় ২০ কোটি, বিধ্বস্ত হয়েছিল লেনিনগ্রাদ, কিয়েভ, ওডেসা, বুদাপেস্ট, বার্লিন, ড্রেসডেন, রটারডাম, লণ্ডন, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, স্যাংহাই, নানকিং সহ অসংখ্য শহর; ইয়োরোপ ও এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিণত হয়েছিল ধ্বংসস্তূপ ও মহাশ্মশানে।

কিন্তু ফ্যাসিবাদের এই সাময়িক বিজয়-তাণ্ডব অনিবার্য বা অপ্রতিরোধ্য ছিল না। তার পথ রুখে দাঁড়াবার কায়দা দেখিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন—প্রতি পদে, প্রতি ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে। ১৯৩৩-এর সূচনাতেই নাৎসি নায়ক হিটলার জার্মানিতে ক্ষমতা দখল করে ও একটি নিষ্ঠুর স্বৈরতন্ত্র কায়েম করে। ঐ বছরই ৬ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব করে যে আক্রমণাত্মক যুদ্ধকে সবাই মিলে ধিক্কার জানানো হোক। ছোট বড় অনেক দেশই সোভিয়েত প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়, কিন্তু ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি এ্যান্টনি ইডেন প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন। ফলে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় না। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন উদ্যোগ নিয়ে এই যুদ্ধবিরোধী নীতির উপর দাঁড়িয়ে ১৯৩৩ ও ৩৪-এ তুরস্ক, রুমানিয়া, ইরান, আফগানিস্তান, পোল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া, ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করে—প্রাণপণ চেষ্টা করে ফ্যাসিবাদী আক্রমণাত্মক অভিযানের পথরোধ করার।

"গণতন্ত্র"র ধ্বজাধারী ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে এর সরকারী প্রতিক্রিয়া কি হয়? হিটলার জার্মানিতে ক্ষমতা দখল করার কয়েক মাসের মধ্যেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ফ্যাসিস্ট ইতালি ও জার্মানির সঙ্গে এক চতুঃশক্তি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করে (১৫ জুলাই ১৯৩৩), যার বিঘোষিত নীতি ছিল—প্রয়োজনবোধে ভার্সাই সন্ধির সংশোধন করা, আর যার অঘোষিত মূল উদ্দেশ্য ছিল—সোভিয়েত ইউনিয়নকে ইয়োরোপে একঘরে ও কোণঠাসা করা। তাতে হাল ছেড়ে না দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৩৪-এর ডিসেম্বরে আলাদা আলাদা ভাবে ফ্রান্স ও চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে আক্রমণাত্মক যুদ্ধবিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর করল। উদ্দেশ্য হল হিটলারের রাক্ষুসে হাঁয়ের থেকে চেকোস্লোভাক স্বাধীনতাকে ও মধ্য ইয়োরোপে শান্তিকে নিরাপদ করা। ১৯৩৫-এর মে মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্রান্সের সঙ্গে নিরাপত্তা ও মৈত্রীর আর একটি ব্যাপকতর চুক্তি স্বাক্ষর করে। ঐ একই মাসে চেকোস্লো-

ভাকিয়ার সঙ্গেও একটি ব্যাপকতর মৈত্রী-চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

১৯৩৫-এর ২ অক্টোবর ফ্যাসিস্ট ইতালি আবিসিনিয়া আক্রমণ করল। সোভিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চ থেকে ফ্যাসিস্ট দস্যু অভিযানকে তীব্র ধিক্কার জানাল এবং লিটভিনভের উদ্যোগে ৫০টি সদস্য-রাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট প্রস্তাব গৃহীত হল যে ইতালির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ফ্যাসিবাদকে তোয়াজ করার নীতি অব্যাহত রেখে নিজেদের মধ্যে চুক্তি করল যে ইতালি যদি যুদ্ধ বন্ধ করে, তাহলে তাকে আবিসিনিয়ার এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে দেওয়া হবে। ইতিহাসে এই জঘন্য চক্রান্ত হোর-নাভাল চুক্তি নামে কুখ্যাত।

১৯৩৬-এর মধ্যভাগে স্পেনের প্রজাতন্ত্র ও 'পপুলার ফ্রন্ট' সরকারের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট প্রতিবিদ্রোহ শুরু হয়। সেই ফ্যাসিস্ট চক্রান্তকে সর্বপ্রকারে সাহায্য যোগায় মুসোলিনি ও হিটলার। কোনোদিকে হস্তক্ষেপ করা চলবে না—এই বাগাড়ম্বরের আড়ালে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সরকার কার্যত স্পেন প্রজাতন্ত্রের বাইরের সাহায্য পাওয়া বন্ধ করল, কিন্তু ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোকে জার্মানি ও ইতালির সাহায্য যোগানো অব্যাহত রইল। ১৯৩৬-এর অক্টোবর মাসে সোভিয়েত পররাষ্ট্র দপ্তর সাফ জানিয়ে দিল যে হস্তক্ষেপ না করার নীতি ধাপ্পাবাজিতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বশক্তি দিয়ে স্পেনের প্রজাতন্ত্রী সরকারকে সাহায্য করবে। ১৯৩৬-এর অক্টোবর থেকে ১৯৩৭-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন স্পেনীয় পপুলার ফ্রন্ট সরকারকে ২৩ জাহাজ ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে। ১৯৩৬-এর অক্টোবর মাসে স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ঘোসে দিয়াজের কাছে প্রেরিত এক তারবার্তায় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড স্তালিন জানান : "স্পেনের বিপ্লবী জনগণকে সাধ্যমতো সাহায্য করে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ তাদের কর্তব্য করছে মাত্র। তারা জানে যে ফ্যাসিস্ট প্রতিক্রিয়ার শোষণের কবল থেকে স্পেনকে মুক্ত করা শুধু স্পেনীয়দেরই কর্তব্য নয়, সারা পৃথিবীর সমস্ত প্রগতিশীল মানুষেরই কর্তব্য।"

'দে শ্যাল নট পাস' নামে নিজের আত্মজীবনীতে স্পেনের প্রতিরোধ-সংগ্রামের অবিস্মরণীয় নেত্রী ডলরেস ইবারুরি (লা পাসিওনারিয়া) মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন কেমন ভাবে সোভিয়েত রাষ্ট্রের জঙ্গী বিমান ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ি এবং আন্তর্জাতিক ব্রিগেড স্পেনের জনতার পাশে দাঁড়িয়ে প্রথম ফ্যাসিস্ট

আক্রমণকে প্রতিহত করেছিল, রক্ষা করেছিল রাজধানী মাদ্রিদকে।

১৯৩৭-এ জাপানী ফ্যাসিবাদ চীনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান সুরু করল। তখনও একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই চীনের পাশে এসে দাঁড়াল, জাপানের বিরুদ্ধে ব্যাপক চুক্তির প্রস্তাব করল। ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতায় সোভিয়েত প্রস্তাব কার্যকরী হতে পেল না, কিন্তু চীনের কমিউনিস্টবিরোধী নেত্রী মাদাম চিয়াং কাইশেক পর্যন্ত সখেদে স্বীকার করেন যে জাপানের আক্রমণের মুখে চীনের পাশে এসে মিত্রের মতো দাঁড়িয়েছে একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই।

মাঞ্চুরিয়া, চীন, স্পেন ও আবিসিনিয়াতে সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্ভীক ফ্যাসিস্টবিরোধী ভূমিকা দেখে ফ্যাসিস্ট শক্তিরাও সুনিশ্চিত হল যে তাদের বিশ্বজয়ের পথে প্রধান বাধা সোভিয়েত রাষ্ট্রই। তাই ১৯৩৬-এর ২৫ নভেম্বর জার্মান ও জাপানী ফ্যাসিস্টরা স্বাক্ষর করল এক কমিউনিস্টবিরোধী চুক্তি, যার গোপন ধারায় বলা হল যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করাই হবে তাদের মূল লক্ষ্য। ১৯৩৭-এ ফ্যাসিস্ট ইতালিও এই চুক্তিতে সই করল, এবং তখন থেকেই এই তিন ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের মৈত্রী রোম-বার্লিন-তোকিও অক্ষশক্তি নামে পরিচিত হল। পশ্চিমী গণতন্ত্রের নির্বোধ রাষ্ট্রনায়করা এই ভেবে প্রীত হল যে ফ্যাসিস্ট রণদানবের মূল শত্রু তাদেরও মূল শত্রু—অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলন। সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাজিত হলে যে ফ্যাসিবাদের হাতে ধনবাদী গণতন্ত্রগুলিরও মৃত্যু অবধারিত, তা ইঙ্গ-ফরাসী রাষ্ট্রনায়করা সেদিন বুঝলেন না। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতা জওহরলাল নেহরু অবশ্য তখন কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে বার বার ঘোষণা করছিলেন যে ফ্যাসিবাদের যুদ্ধাভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের একমাত্র জোরাল দুর্গ সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র।

১৯৩৮-এর ১২ মার্চ জার্মান সেনাদল প্রায় বিনাবাধায় অস্ট্রিয়া দখল করে নিল—ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পূর্বাহ্নেই গোপনে জানিয়ে দিয়েছিল যে এতে তাদের কোনও আপত্তি নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই নির্লজ্জ অভিযানকে তীব্র ধিক্কার জানাল, কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী তোয়াজ-নীতির ফলে হিটলারের চক্রান্তকে প্রতিহত করতে পারল না। সাফল্যে উত্তেজিত হিটলার এবার চেকোস্লোভাকিয়া গ্রাস করতে উদ্যত হল। সোভিয়েত ইউনিয়ন স্পষ্ট ঘোষণা করল যে চেকোস্লোভাকিয়া একলাও যদি সাহায্য চায়, তাহলে সোভিয়েত সেনাদল

হিটলারের বিরুদ্ধে অভিযান করবে। কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের নেতৃবর্গ —চেম্বারলেন ও দালাদিয়ের মিউনিখে গিয়ে হিটলার ও মুসোলিনির সঙ্গে মিলিত হলেন এবং একত্রে চেকোস্লোভাকিয়ার মৃত্যু পরোয়ানা জারী করলেন। তৎকালীন চেক রাষ্ট্রপতি ডাঃ বেনেসও সোভিয়েতের সাহায্যে ফ্যাসিবাদকে রোখার চেয়ে হিটলারের কাছে জাতীয় স্বাধীনতাকে বিক্রি করা শ্রেয় বলে মনে করলেন। ফ্যাসিবাদের প্রশ্রয়দাতা ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন সোল্লাসে মহাকবি শেক্‌সপীয়রের লাইন উদ্ধৃত করে বললেন : "কাঁটা ও বিপদের মধ্য থেকে আমরা নিরাপদে ফুল তুলছি।" পরদিনই, সোভিয়েত সরকারের মুখপত্র 'ইজভেস্তিয়া' প্রত্যুত্তরে লিখল যে শেক্‌স্পীয়র চেম্বারলেন-উদ্ধৃত লাইনগুলির পরই আরও লিখেছিলেন : "তোমরা যে পথে পা বাড়াচ্ছ, তা বিপজ্জনক ; যাদের তোমরা বন্ধু মনে করছ, তারা একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয় ; সময়টা ভুল বাছা হয়েছে ; তোমাদের পরিকল্পনা দিয়ে প্রবল প্রতিপক্ষকে তোমরা কোনোমতেই ঘায়েল করতে পারবে না।" ইংরেজ নেতা উইনস্টন চার্চিল হাড়েমজ্জায় সাম্রাজ্যবাদী হলেও চেম্বারলেনের মতো নির্বোধ ছিলেন না, বরং ব্রিটিশ পুঁজি ও সাম্রাজ্য রক্ষার স্বার্থেই তিনি হয়ে উঠলেন অগ্রগণ্য ফ্যাসিস্ট-বিরোধী এবং আজন্ম কমিউনিস্টবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একমত হয়ে ঘোষণা করলেন : মিউনিখের চুক্তি আমাদের জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাৎসি সেনাপতি কাইটেলের বিচারের সময়, চেকোস্লোভাক কৌঁসুলী তাঁকে প্রশ্ন করেন : "মিউনিখ ঘটনাবলীর সময় ফ্রান্স যদি দৃঢ়ভাবে সোভিয়েত প্রস্তাবকে সমর্থন করত, তাহলেও কি জার্মানি চেকোস্লোভাকিয়া দখল করতে ভরসা পেত ?" কাইটেল জবাব দেন : "না, পেত না। আমরা তখন দুটি জিনিস চাইছিলাম : সময়, যাতে আমাদের অস্ত্রসজ্জা পরিপূর্ণ হতে পারে ; আর দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়ন যাতে ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে কোণঠাসা হয়। ইংরেজ ও ফরাসী সরকারের সমর্থন পেয়ে দুটি উদ্দেশ্যই আমাদের সফল হয়েছিল।"

১৯৩৯-এর ৭ এপ্রিল মুসোলিনির সৈন্যদল আলবেনিয়াতে ঢুকল ও অচিরে সে দেশটি দখল করে নিল। ১৯৩৯-এর ১৫ মার্চ হিটলার চেকোস্লোভাকিয়ার সমগ্র ভূখণ্ডই দখল করে নিল। ২৪ মার্চ হিটলার পোল্যাণ্ডের কাছে ডানজিগ বন্দর দাবি করল। পৃথিবীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠল। এই

সময়ই সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে জে ভি. স্তালিন বলেন: "যুদ্ধবাজ নাৎসি দস্যুদের তোষণ করার নীতি গ্রহণ করে পশ্চিমী শক্তিবর্গ নতুন যুদ্ধের আগুন জ্বালছে। তারা চাইছে ফ্যাসিস্ট আক্রমণকারীদের সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে।..."

১৯৩৯-এর ১৭ এপ্রিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়াবার ও ফ্যাসিস্ট দস্যুদের রুখবার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন আবার চেষ্টা করল—প্রস্তাব দিল যে আক্রমণ-কারীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে একটা ত্রিপাক্ষিক যৌথ নিরাপত্তাচুক্তি স্বাক্ষরিত হোক। কিন্তু ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দীর্ঘসূত্রতার নীতি অবলম্বন করে কার্যত সে প্রস্তাবকেও বানচাল করে দিল। বরঞ্চ গোপনে তারা উসকানি দিতে লাগল যাতে ফ্যাসিস্ট রণদানব সোভিয়েত ইউনিয়নেরই ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই মারাত্মক ও ভ্রান্ত নীতির নিদারুণ মাশুল দিতে হল ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে।

১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে উঠল। ১৯৪০-এর মে মাসে ফ্রান্স হিটলারের দস্যুবাহিনীর হাতে পরাজিত ও পদানত হল। উত্তর মেরুর সীমানায় নরওয়ে থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগরীয় দেশ গ্রীস পর্যন্ত, প্রায় সমগ্র ইয়োরোপই জার্মান ফ্যাসিবাদের পদানত হল। হাজার হাজার জার্মান বোমারু বিমানের বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত হল ইংলণ্ড। দেরিতে হলেও জাগ্রত হল ফ্যাসিস্টবিরোধী জনগণের ক্রোধ। সেই ক্রোধানলে ভস্মীভূত হল নির্লজ্জ তোষণ নীতি, ক্ষমতাচ্যুত হলেন নেভিল চেম্বারলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন ফ্যাসিস্টবিরোধী উইনস্টন চার্চিল। তোষণনীতির প্রবক্তারা হিটলার-পদানত ফ্রান্সে তাঁবেদার হয়ে টিকে রইল। দেশপ্রেমিক সমস্ত ফরাসীরা জমায়েত হল কমিউনিস্ট পার্টি, জেনারেল চার্লস দ্য গল ও অন্যান্য ফ্যাসিস্ট-বিরোধীর নেতৃত্বে।

১৯৪১-এর ২২ জুন পৃথিবীর বৃহত্তম সেনাবহর নিয়ে হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সোভিয়েত ইউনিয়নও শুরু করল মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার ও বিশ্বমুক্তির ঐতিহাসিক সংগ্রাম। দুই সহস্র মাইল বিশাল রণাঙ্গন জুড়ে চার বছর ধরে সে সংগ্রাম চলল। ইংরেজ রাষ্ট্রনায়ক চার্চিল ১৯৪৩-এ বলেছিলেন: "স্তালিনগ্রাদের রণাঙ্গনেই আজ স্থির হতে চলেছে ফ্যাসিবাদ না গণতন্ত্র, কে বিজয়ী হবে।" মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টও

বলেছিলেন : "ভোলগা নদীর তীরেই আজ নির্ধারিত হচ্ছে মানবতার ভাগ্য।" চরম মূল্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন সেদিন ফ্যাসিবাদকে রুখেছিল, তাকে চূর্ণ ও নিশ্চিহ্ন করেছিল, রক্ষা করেছিল শুধু নিজের দেশ নয়—মানব সভ্যতার ভবিষ্যতকেও। সেই ফ্যাসিস্টবিরোধী মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সওয়া দুই কোটি নরনারী। শ্মশানে পরিণত হয়েছিল লেনিনগ্রাদ ও স্তালিনগ্রাদ শহর সহ ইয়োরোপীয় রাশিয়ার অর্ধেক অঞ্চল। কিন্তু রুদ্ধ হয়েছিল ফ্যাসিস্ট রণদানবের জয়রথ, চূর্ণ হয়েছিল তার দম্ভ। রাইখস্ট্যাগের ধ্বংসস্তূপে, হিটলারের শবাধারের উপরে, সোভিয়েতের বীর নওজোয়ানেরা উড়িয়ে দিয়েছিল মানবমুক্তির প্রতীক—কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্নিত রক্তনিশান। ১৯৪৫-এর মে মাসে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়োরোপ ও এশিয়ার অগণিত শহর ও গ্রাম জুড়ে, বিভীষিকার রাজত্ব নাৎসি বন্দীশিবিরের সত্যমুক্ত মানুষের মুখ থেকে, লণ্ডন নিউইয়র্ক পীকিং পারী হ্যানয় কলকাতা কায়রো থেকে—কোটি কোটি কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল কৃতজ্ঞতার একটি বিশাল ধ্বনি : "সোভিয়েত ইউনিয়ন জিন্দাবাদ"। ফ্যাসিস্ট রণদানবের পরাভবের ত্রিংশতম বার্ষিকী বৎসরে কৃতজ্ঞতার সে ঋণ যেন আজ আমরা ভুলে না যাই।

হিটলার ও নাৎসি-প্রকোপ

সুশোভন সরকার

[প্রধানত 'পরিচয়' পত্রিকায়ই সুশোভন সরকার ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা লেখেন। ১৯৩৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'অধ্যাপক' সুশোভন সরকার রচিত 'মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে। বলা বাহুল্য, 'মহাযুদ্ধ' এখানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

কমিউনিস্টদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে তখন 'অগ্রণী' মাসিকপত্র প্রকাশিত হত। এই পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় ১৯৪০ সালের মে মাসে 'পুস্তক-পরিচয়' বিভাগে ঐ বইয়ের একটি দীর্ঘ ও অস্বাক্ষরিত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সঙ্গে একটি নোটে সম্পাদক জানান: "এটী লেখা হ'য়েছিল গত অক্টোবর মাসে কিন্তু অনিবার্য কারণে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এখনও পুস্তকটির প্রয়োজনীয়তা আছে ব'লে এটা প্রকাশ করা হ'ল।" সমালোচনার শেষ প্যারাতে বলা হয়েছে: "ঠিক এইরূপ একখানি বইয়ের জন্য আমরা প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের আলোকে তিনি য়ুরোপের সমরোত্তর ঘটনামালাকে অতি সহজে আমাদের সম্মুখে উদ্‌ভাসিত করিয়াছেন তাহাতে আমরা বিস্ময় বোধ করিয়াছি। যে বৈজ্ঞানিক অনাসক্তি ও বহির্দৃষ্টি থাকিলে সামাজিক সদবুদ্ধি-প্রণোদিত ব্যক্তি নির্মল অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া সর্বব্যাপী সমষ্টি জীবনে আসক্ত হইয়া ওঠে, তাহাই এই শক্তিমান লেখকের মানস-সম্বল। বুদ্ধিজীবী এই ঐতিহাসিকের বুদ্ধির আভিজাত্য কিংবা নূতনত্বের গলদঘর্ম প্রয়াস নাই, কোনো বিশিষ্ট মতবাদের কাঠামোয় ফেলিয়া কোনো ঘটনার যান্ত্রিক অপব্যাখ্যাও তিনি করেন নাই। পরিচ্ছন্ন প্রাঞ্জল ভাষায় অনমনীয় যুক্তির সাহায্যে ঘটনামালার পরিষ্কার গতিপথের যে নির্দেশ তিনি দিয়াছেন, তাহাতে মত-বিরোধী অতি-তার্কিক পাঠকেরও কিছুই বলিবার থাকে না। অথচ বুদ্ধিমান পাঠকের বুঝিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না লেখক কোন ভাবের ভাবুক ও কোন পথের পথিক। এইখানে জন ষ্ট্রাচির লেখার সহিত অধ্যাপক সরকারের একটা সাদৃশ্য দেখা যায়। আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রিক জীবনে এই স্বল্পায়তন পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তার সীমা নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচারের কামনা করিয়া নিরস্ত থাকিব না, ইহার প্রচারের জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

অধুনা প্রায় বিস্মৃত ও দুষ্প্রাপ্য ঐ গ্রন্থেরই একটি অংশ এখানে প্রকাশ করা হল। বইয়ে প্রকাশিত অংশের সাব-হেডিং ছিল 'হিটলার ও নাৎসি প্রকোপ।' প্রবন্ধের শিরোনামা তাই-ই রাখা হল।

দৃশ্যতই যেগুলি ছাপার ভুল তার সংশোধন এবং বানান ও যতিচিহ্নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়েছে।—সম্পাদক]

লক্ষ্য এক থাকলেও অন্যের উপর কর্তৃত্বের লোভ ছাড়া সহজ না। তাই সোশ্যালিস্টদের আটকে রাখার কাজে নাৎসি দলের কৃতিত্ব বহু-স্বীকৃত হলেও, প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গের পার্শ্বচরেরা সহজে হিটলারকে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিতে রাজী হন নি। হিটলার চান্সেলর হবার পরও হুগেনবার্গ প্রভৃতি ন্যাশনালিস্ট নেতারা ভেবেছিলেন যে তাঁকে হাতে রাখতে পারবেন। কিন্তু হিটলারের পিছনে তখন প্রভূত শক্তি—নাৎসি-দলের অগ্রগতি তখন অপ্রতিহত। অন্তর্বিভক্ত নিশ্চেষ্ট জার্মান শ্রমিক-সমাজ কর্তব্য স্থির করবার আগেই রাষ্ট্রিক ক্ষমতা হিটলারি-দলের হাতে সম্পূর্ণভাবে এসে পড়ল। নূতন আভ্যন্তরিক সচিব নাৎসি নেতা ডক্টর ফ্রিক শাসনযন্ত্রের সর্ববিভাগে নাৎসি কর্তৃত্ব স্থাপন করলেন। গোয়রিং প্রাশিয়ার অধ্যক্ষ হয়ে পুলিশ-বিভাগকে নিজেদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে ফেলেন। নাৎসি দলের ঝঞ্ঝাবাহিনী একেবারে সরকারি সৈন্যদলের পদমর্যাদা ও অধিকার লাভ করল; সমাজতন্ত্রী কাগজগুলির প্রকাশ নানা অছিলায় বন্ধ করা হল। অনেক শ্রমিকনেতা বিনাবিচারে আটক হলেন। মার্চে সাধারণ নির্বাচনের ঠিক আগে (১৯৩৩) ব্যবস্থাপক সভা রাইশ্‌স্টাকের বাড়ি হঠাৎ ভস্মীভূত হয়। রব উঠল যে এর কারণ সাম্যবাদী চক্রান্ত—সে-উত্তেজনাতেই হিটলারের দল লক্ষ লক্ষ ভোট সংগ্রহ করে নূতন পরিষদে নিজেদের সংখ্যাধিক্য জোগাড় করতে পারল। ইংল্যাণ্ডের ১৯২৪-এর নির্বাচনে দক্ষিণপন্থীরা রুশ-বিপ্লবী জিনোভিয়েভ-এর নামে এক জাল চিঠি হঠাৎ প্রচার করে শ্রমিক দলকে অপদস্থ ও পরাস্ত করেছিল। রাইশ্‌স্টাকে অগ্নিকাণ্ড আসলে তারই অনুরূপ ব্যাপার। বিচারে এক অর্ধোন্মাদ লোকের আগুন লাগাবার অপরাধে প্রাণদণ্ড হলেও, সাম্যবাদী দলের দায়িত্বের কোনো প্রমাণই পাওয়া গেল না। বিদেশী জনমত উত্তেজিত হওয়ায় লাইপজিগে বন্দীদের প্রকাশ্যে বিচার করতে হয়েছিল—আদালতে অভিযুক্ত সাম্যবাদীরা তখন ডিমিট্রভের নেতৃত্বে সকল অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; এমন কি শেষ পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ডটি নাৎসি দলেরই গুপ্ত কীর্তি এ-সন্দেহ অন্তত বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ততদিনে নাৎসিদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছিল। ষড়যন্ত্রের সন্দেহ মাত্র সাম্যবাদী দল বেআইনী ঘোষিত হয়, জার্মানির প্রতি অঞ্চলে এক-একজন নাৎসি অভিভাবকের পূর্ণ কর্তৃত্বও এই উপলক্ষে স্থাপিত হয়েছিল। মার্চের শেষে নূতন রাইশ্‌স্টাক চার বৎসরের জন্য শাসনকার্যের সমস্ত অধিকার হিটলারের হাতে সমর্পণ করে অবসর গ্রহণ করল। প্রতিনিধিসভার এইভাবে নির্বাণ লাভ

হয়—বলা বাহুল্য যে তারপর হিটলারি কর্তৃত্বের মেয়াদ বিনা বাক্যব্যয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

নাৎসি-কর্তৃত্ব স্থাপনের ইতিহাস হল এই। এর পরবর্তী কালের নাৎসি-শাসনের কথা বোধহয় সুবিদিত। সাম্যবাদীদের উচ্ছেদ সাধনের পর নিরীহ সোশ্যাল ডিমক্রাসিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। এই দলের এতদিনকার নিয়মানুগত্য ও বিপ্লবে পরাঙ্মুখতা দক্ষিণপন্থী হাতে কোনো পুরস্কারই পায় নি। বিশাল শ্রমিক-সঙ্ঘগুলি এদের আয়ত্তে থেকে এতদিন নিশ্চেষ্টভাবে হিটলারের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা হতে দিয়েছিল। এখন সঙ্ঘগুলি সব সহসা ভেঙে দেওয়া হল। মার্কসের মতবাদ তাঁর স্বদেশে এইভাবে দণ্ডনীয় হয়ে পড়ে, কোনো মার্কসীয় মণ্ডলীর প্রকাশ্য অস্তিত্ব আজ সেখানে অসম্ভব। শ্রমিক-বিপ্লবের ধারণা পর্যন্ত দমন করাই জার্মান ফাসিজম-এর প্রধান উদ্যম। শক্তিশালী সশস্ত্র দলের সাহায্যে শাসন-যন্ত্রের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন, সেই ক্ষমতা ব্যবহারের ভিতর দিয়েই বিরোধীদের উচ্ছেদ সাধন, দেশব্যাপী প্রোপাগাণ্ডার উত্তেজনায় জনসাধারণের চিত্তাকর্ষণ—নাৎসি বিপ্লবের স্বরূপ হল এই। এরপর যে-উগ্র বৈদেশিক নীতি অবলম্বিত হয়েছে, তার উদ্দেশ্য খানিকটা জনপ্রিয়তা অর্জন, আর বাকিটা বিস্তারের মধ্য দিয়ে আর্থিক দুরবস্থা কাটিয়ে ধনিকদের লাভের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। নাৎসি-অভিযানের মূল রূপকে অবশ্য আবৃত করে রেখেছে অনেক অবান্তর উত্তেজনা; জার্মানির মতন উন্নত দেশকে দাবিয়ে রাখা কষ্টসাধ্য বলেই, সেখানে ডক্টর গোয়েবলস-এর একনিষ্ঠ নাৎসি-প্রোপাগাণ্ডার এত প্রয়োজন। নূতন জার্মানির বৈদেশিক নীতিতে তাই এত ন্যায়ধর্ম, আত্মসম্মান ও জাতিপ্রীতির ছড়াছড়ি; ভের্সায়ির অবিচার আজ প্রায় অতীতের কথা হয়ে দাঁড়ালেও তাই নিয়ে এইজন্য এত অভিযোগ ও আস্ফালন চলেছে। ইয়োরোপে নানা দেশের মধ্যে য়িহুদিদের প্রতি বিদ্বেষ মধ্যযুগ থেকে লোক ক্ষেপাবার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে; জনসাধারণের মজ্জাগত সেই বিদ্বেষে আহুতি দিয়ে জার্মানিতে এখন প্রচারিত হল যে মার্কসবাদ আসলে শ্রমিকদের ঠকাবার জন্য য়িহুদি ষড়যন্ত্র মাত্র। বলা হল যে নাৎসিদের মতামতই নাকি খাঁটি সোশ্যালিজম, যদিও মূল সূত্র ধরলে দুয়ের মধ্যে বিন্দুমাত্র মিল নেই। কয়েকটি য়িহুদি ধনিক ও ততোধিক য়িহুদি দোকানদারকে নির্যাতিত করতে পারলেই প্রমাণ হল যে নাৎসি-আমল ধনিকতন্ত্র নয়। আর্যামির অহঙ্কার য়িহুদিবিদ্বেষবুদ্ধির অপর দিক। নগণ্য জনসাধারণ পর্যন্ত যে বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি এই স্তোকবাক্য হিসাবেই নর্ডিক-মাহাত্ম্য কীর্তনের

সার্থকতা। ইটালি ও জাপান নর্ডিক নয়—তবে সেখানকার ফ্যাসিস্টদেরও গৌরব করবার উপলক্ষের অভাব সহজে হবে না; ইটালির আছে প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্য, জাপানের আছে মধ্যযুগের ক্ষত্রিয় (সামুরাই) গুণাবলী। অনুরূপ অবস্থায় সকল দেশেই অতীত-গৌরববাহিনী অথবা বর্তমান বৈশিষ্ট্য-প্রচারিণী এই জাতীয় অহঙ্কারের আশ্রয় পাওয়া যায়।

মুসোলিনির ইটালির মতন হিটলারের আমলে জার্মানিরও অনেক বাহ্যিক উন্নতি হয়েছে। পরাজিতের যে-মনোভাব যুদ্ধান্তে জার্মানদের পেয়ে বসেছিল, তার আজ সম্পূর্ণ তিরোধান ঘটেছে। হ্বাইমার-যুগে যে-দলাদলি দেশকে অভিভূত করেছিল—তার বদলে এসেছে নূতন আশা, জাতীয় ঐক্যের আদর্শ, ভবিষ্যতের ভরসা। মহাশক্তিদের মধ্যে জার্মানি আবার প্রবল হয়েছে; অস্ত্রবল সম্ভবত তারই আবার সর্বশ্রেষ্ঠ; আত্মরক্ষা, রাজ্যবিস্তার ও অন্যদের উপর অত্যাচার করবার ক্ষমতা আবার ফিরে এসেছে। কর্মহীন শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে দেশের দরকারী কাজে লাগানো ও সমস্ত জাতির কর্মকুশলতার বৃদ্ধি সাধন…এ-সকলই উপস্থিত শক্তির পরিচায়ক। কিন্তু এ-সমস্তই সাময়িক বিচার মাত্র, ইতিহাসে তার চেয়েও ব্যাপক একটা বিচারের প্রয়োজন এসে পড়ে, যদিও সে-বিচারে সর্বস্বীকৃত মাপকাঠির অভাব আছে। বর্তমান আর্থিক বিধিব্যবস্থা পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন থাকলে স্বীকার করতেই হবে যে জার্মানিতে সে-সমস্যা সমাধানের কোনো চেষ্টাই হয় নি, ইটালির কর্পোরেটিভ রাষ্ট্রের মতন নাৎসি-আমলে জার্মান-রাইশের তথাকথিত তৃতীয় অবস্থাতেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই সম্পর্কে কোনো স্থায়ী আশার চিহ্ন মাত্র নেই। তখন প্রশ্ন ওঠে যে তা হলে জার্মান জাতির নাৎসি-প্রভুত্ব সহ্য করবার সার্থকতা কি? অথচ ইয়োরোপ ও সারা জগতের পক্ষে হিটলারি-জার্মানি যে বিষম ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সে-কথাও এ প্রসঙ্গে মনে পড়তে বাধ্য।

শ্রমিক দমন ছাড়াও অবশ্য হিটলারের জার্মানিতে অন্য ব্যাপার চোখে পড়ে। উৎপীড়নের ফলে জার্মানির জগদ্বিখ্যাত সংস্কৃতিরও সমূহ ক্ষতি হল—বহু বিখ্যাত লোককে এজন্য দেশত্যাগী হতে হয়। তা ছাড়া শত শত সাধারণ লোক এখন পর্যন্ত বিনা বিচারে আটক রয়েছে। সর্বগ্রাসী স্টেটের বন্দনা ও নেতার আনুগত্যের আধ্যাত্মিক মূল্যকীর্তন এখন প্রবলতর হয়েছে। ইটালির মতন সমস্ত জার্মান-জাতির এক ধর্ম না থাকায়, ফ্যাসিস্ট-স্টেট ও বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠানের দ্বন্দ্ব জার্মানিতে দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। একদিকে

জার্মান ক্যাথলিক জনসাধারণ খাঁটি নাৎসিদের মতন অতখানি স্টেট-উপাসক হতে পারে নি—অন্যদিকে প্রটেস্টান্ট যাজকদের মধ্যেও একটা অপ্রত্যাশিত স্বাতন্ত্র্যের স্পৃহা দেখা গেছে। তার উত্তরে ফ্যাসিস্ট নেতারা কেউ কেউ এক নূতন ধর্মের প্রশ্রয় দিচ্ছেন—প্রাচীন টিউটন ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে এত শতাব্দীর পরে তার যোগের চেষ্টা অবশ্য নিতান্তই হাস্যাস্পদ। কিন্তু হিটলারি আমলে নূতন নূতন সাফল্য ও বিজয়ের নেশা জার্মানিকে পেয়ে বসেছে—ঐতিহাসিকের চোখে তাই প্রাক্-সামরিক জার্মানির চিত্র যেন আজ আবার সজীব হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গেই মনে পড়া স্বাভাবিক যে সাম্রাজ্যবাদের পরিচালনায় জার্মানির অদৃষ্টে সেবার দুর্গতিই জুটেছিল। এই নেশায় জার্মান জাতি হিটলারকে এখন পর্যন্ত পূর্ণ সমর্থন করছে। হিটলার তাই মাঝে মাঝে ভোট নিয়ে জগতকে তাঁর ক্ষমতার প্রভাব দেখান। এই জনপ্রিয়তার জন্য হিটলার ও তাঁর অনুচরদের প্রতাপ হয়ে উঠেছে অপ্রতিহত। পুরাতন ন্যাশনালিস্টদের অবস্থা এখন খানিকটা হঠাৎ-নবাবদের গরীব আত্মীয়ের মতন। হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যুর পর হিটলার প্রেসিডেন্ট ও চান্সলার উভয় পদ নিজের হাতে রেখে রাষ্ট্রনেতা আখ্যায় পরিচিত হন। ফন পাপেন এখন নূতন শাসকদের অনুগত ভৃত্য। কিন্তু প্রভুত্ব যেই করুক, ধনিকতন্ত্র অব্যাহতই থাকছে; ধনিকপ্রবর, জমিদারগোষ্ঠী ও রাইশওয়েরের সেনানীবৃন্দের প্রকৃত কোনো স্বার্থহানির লক্ষণ এখনই দেখা যায় নি। ১৯৩৪-এর জুনে যে-আকস্মিক হত্যাকাণ্ড হয়েছিল, তার কোনো প্রকৃত অর্থ থাকলে সংস্কার-চেষ্টার দমনের মধ্যেই তাকে খুঁজতে হবে। রোয়েম, আর্নস্ট, হাইনস প্রভৃতি নিহত নাৎসিনেতারা ঝঞ্ঝাবাহিনীর মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সংস্কারক হিসাবেই গণ্য হতেন—তাঁদের কেউ কেউ হয়ত ভাবছিলেন যে নাৎসি-আমলে কোনো প্রয়োজনীয় পরিবর্তন হচ্ছে না। স্ট্রেসার ১৯৩২-এর আগে পর্যন্ত নাৎসিদলকে ঘোর সংস্কারক বলে বরাবর বর্ণনা করতেন; এখন তাঁর হত্যায় সংস্কার-সংকল্পই শক্তি হারাল। হিটলার যখন তাঁর কোনো কোনো সঙ্গীকে এমন নির্মমভাবে ধ্বংস করেন, তখনকার গণ্ডগোলের সুবিধা নিয়ে হয়ত ব্যক্তিগত কারণেও কারো কারো প্রাণনাশ হয়। কিন্তু সেনাপতি শ্লাইশারের অপঘাত-মৃত্যুতে হিটলারেরই এক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর লোপ হল। এরপর সম্প্রতি রাইশওয়ের-এর কোনো কোনো নেতার পদচ্যুতি হিটলারের ব্যক্তিগত প্রতাপের পরিচয় হলেও তাতে নাৎসি-শাসনের প্রকৃতির কোনো বদল হয়েছে মনে করবার বৈধ কারণ নেই।

হিটলারের আত্মসাধনার স্বরচিত বিবরণের সম্পূর্ণ ভাষান্তর বিদেশে পাওয়া দুর্লভ—সমগ্র গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদের প্রচলন জার্মান সরকার বন্ধ করবার চেষ্টা পর্যন্ত করেন। অথচ এই বই জার্মানিতে এখন নাকি শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। হিটলারের মতে জার্মানির প্রধান কর্তব্য অন্য সকলের চাইতে বেশি সামরিক শক্তি অর্জন, অস্ত্রবলে সমকক্ষ কারো অস্তিত্ব জার্মানির সহ্য করা উচিত নয়। প্রতিদ্বন্দ্বী বিনাশের প্রধান উপায় যুদ্ধ, আর যুদ্ধ নাকি কিছু অমঙ্গলের আকর না। রাজ্যবিস্তার জার্মানির ধর্ম, কিন্তু লক্ষ্য শুধু ১৯১৪ সালের সীমান্ত ফিরিয়ে পাওয়া নয়। প্রসারের উদ্দেশ্য এমনকি শুধু সকল জার্মানভাষীদের একত্র করাও না, উদ্দেশ্য জার্মান নীতির আর্থিক ও রাষ্ট্রিক পূর্ণ পরিণতি সম্ভব করে তোলা। মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপে বিস্তারলাভ নাকি জার্মানির ভাগ্যলিপি ও বিধাতার বিধান। তাই রাশিয়ার কাছ থেকে জার্মানদে এ-অঞ্চলে ভূখণ্ড কেড়ে নেওয়া অবশ্যম্ভাবী। এর জন্য আবশ্যক ফ্রান্সকে একক অবস্থায় দুর্বল করে রাখা—অতএব ইটালি ও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে প্রথমে সখ্যবন্ধন প্রয়োজন। কিন্তু সে-ব্যবস্থাও সাময়িক —পরিণামে সারা জগতে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে জার্মানির প্রভুত্ব স্থাপিত হওয়াই স্বাভাবিক।—এই প্রত্যেকটি মত হিটলারের গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত আছে, এবং হিটলার নিজে এখন পর্যন্ত এর কোনোটি প্রকাশ্যে প্রত্যাহার করেন নি। তাছাড়া ফেডার বলেছিলেন যে বিদেশে প্রত্যেক জার্মানকে জার্মানির প্রজা করতে হবে—সেই সঙ্গে যে সহস্র সহস্র বিদেশী জার্মানির পদানত হয়ে পড়বে সে-কথা তুচ্ছ ভেবেই তিনি উল্লেখযোগ্য মনে করেন নি। রোজেনবার্গের মতে নর্ডিকদের ভোগের জন্য নিকৃষ্ট জাতির জমি ছেড়ে দিতেই হবে।

এই দুর্দম প্রসার-প্রবৃত্তির পিছনে সাম্রাজ্যতন্ত্রের চালক শক্তিই রয়েছে মনে হয়—তারও প্রকৃতি এইভাবে কূল ছাপিয়ে পড়া। নাৎসি বৈদেশিক নীতি এই প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলেছে আর এক্ষেত্রেও ইংরাজ মন্ত্রীরা অনাগত ভবিষ্যতকে অবজ্ঞা করে শুধু মুহূর্তের সুবিধা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। শুভাদৃষ্টে বিশ্বাস ইংরাজদের বোধহয় মজ্জাগত। তাই অধ্যাপক কেনস পর্যন্ত লিখেছেন যে কোনওক্রমে এখন যুদ্ধের আশঙ্কা এড়াতে পারলেই হল—অর্থাৎ ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতই ভাববে। শান্তিবাদীদের আবার এক স্থির নীতি, যে, কোনো-ক্রমেই যুদ্ধ করা উচিত না। অতএব এদের মতে ইটালির উপর আবিসিনিয়া-প্রসঙ্গে আর্থিক চাপ দেওয়া অন্যায় হয়েছিল, আর জার্মানি যা চায় তাই তাকে ছেড়ে দিলেই গোল চোকে। কয়েক বৎসর ধরে ইংল্যাণ্ডের আচরণ এই চমৎকার

যুক্তির নানাদিকে প্রচলন সঙ্কটকে বাড়িয়েই চলেছে। সম্মিলিত চেষ্টায় শান্তি-রক্ষার সকল ব্যবস্থা তাই আজ ধূলিসাৎ। এতে করে জগতে শান্তির সম্ভাবনা বেড়েছে এ-বিশ্বাসের সমর্থক এত প্রচণ্ড শুভবাদী বোধহয় কেউ নেই।

ইংল্যাণ্ডে শাসকশ্রেণী এবং এমনকি ফ্রান্সেও লাভাল, টার্দিউ, ফ্লাঁদ্যা প্রভৃতি নেতারা, অর্থাৎ উভয় দেশেই প্রচ্ছন্ন ফ্যাসিস্টগণের মনে হিটলারি-আন্দোলনের সঙ্গে একটা গোপন সহানুভূতিই নাৎসি-অগ্রগতির সাফল্যের অন্যতম কারণ। সে অগ্রসর নীতির সংক্ষিপ্ত উল্লেখই শুধু এখানে সম্ভব। কিন্তু তার স্বরূপ বোঝার পক্ষে সেই বিবরণটুকুই যথেষ্ট। নাৎসি আমলের আগেই জার্মানি অস্ত্রবর্জনের সভা ত্যাগ করেছিল। হিটলারের হাতে রাজ্যভার আসা মাত্র জার্মানির সমর-সজ্জার বিস্তৃত আয়োজন আরম্ভ হল। তারপর জাপানের অনুসরণে জার্মানিও বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে পদত্যাগ স্থির করে (১৯৩৩)। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে জার্মানির যুদ্ধান্তে বিস্তর অসদ্ভাবের কারণ ঘটে, কিন্তু পোল্যাণ্ডে প্রবীণ নেতা পিলসুড্স্কির কল্যাণে এক অর্ধফ্যাসিস্ট শাসক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। এই ঝোঁক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে ফ্রান্সের উপর আগের মতন নির্ভর করার চাইতে জার্মানির সঙ্গে একটা আপস নিষ্পত্তির ইচ্ছার উদয় হয়। হিটলার তাই পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সহজেই সখ্যস্থাপন করলেন (জানুয়ারি ১৯৩৪), যদিও পোলেরা বুদ্ধিমান বলে এখনও সম্পূর্ণ ধরা দেয় নি। পূর্ববৈরীদের এই মিলন অবশ্য সাধারণ শত্রু রাশিয়ার বিরুদ্ধেই চক্রান্ত।—১৯৩৪-এর জুলাই মাসে নাৎসিরা চেষ্টা করল অস্ট্রিয়া দখলের। এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটিতে কিছু দিন আগে সোশ্যালিস্ট-প্রাধান্য সম্ভবপর হওয়াতে ফ্যাসিস্ট-প্রতিক্রিয়ার উদয় হয়। তখন কিন্তু সোশ্যালিস্ট নেতা বাওয়ারের সুবিদিত শান্তিপ্রিয় সোশ্যাল ডেমক্রাটিক কার্যপদ্ধতি দক্ষিণপন্থীদের বিনা বাধায় শক্তি-বৃদ্ধি করতে দিয়েছিল। ক্রমে খর্বাকৃতি ডক্টর ডলফুস অস্ট্রিয়ায় একনায়কত্ব স্থাপন করলেন (মার্চ ১৯৩৩)। পর বৎসর (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪) শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়, সোশ্যালিস্টেরা তখন বিধ্বস্ত ও ভিয়েনার নবনির্মিত বিখ্যাত শ্রমিকনিবাসগুলি গোলাবর্ষণে ধ্বংস-প্রাপ্ত হল। কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের মধ্যেও বিবাদ ছিল—তাই বিদেশী অর্থাৎ জার্মান-নাৎসিদের বিরুদ্ধে স্বদেশী পিতৃভূমি দল গড়ে ওঠে। ডলফুস এই সঙ্ঘর্ষে নাৎসিদের হাতে প্রাণ হারান (জুলাই ১৯৩৪); কিন্তু ইটালির সাহায্য-প্রতিশ্রুতি পেয়ে তাঁর বন্ধু শুসনিগ তখনকার মতো জার্মানির হাত থেকে অস্ট্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পেরেছিলেন।—নাৎসিদের এর পরবর্তী কীর্তি

হল, পূর্ব-ইয়োরোপে লোকার্নোর চুক্তি অনুযায়ী শান্তিরক্ষার এক চুক্তিতে যোগ দিতে অস্বীকার করা (১৯৩৫)। হিটলার বললেন (মে ১৯৩৫) যে যুদ্ধকে ছড়াতে দেওয়া উচিত না, অতএব পরস্পরকে সাহায্যের কোনো অঙ্গীকার না করাই মঙ্গল। এর প্রকৃত অর্থ অবশ্য সহজেই বোঝা যায়। এই বৎসরের প্রথমে সার-অঞ্চল, পনের বছর পর, জনগণের মত গ্রহণের ফলে জার্মানির সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়। ১৯৩৫-এর মার্চ মাসে হিটলার ভের্সায়ির সন্ধি অগ্রাহ্য করে উপযুক্ত বয়স্ক সকল জার্মানকেই অস্ত্রশিক্ষা নিতে আইনত বাধ্য করলেন। নাৎসিদের সন্ধিভঙ্গের সাফাই হিসাবে মাঝে মাঝে বলা হয় যে ভের্সায়ির ব্যবস্থা জার্মানি স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নি। কিন্তু এ যুক্তি অবান্তর, কারণ পরাজিত পক্ষ কখনোই স্বেচ্ছায় সন্ধি স্বাক্ষর করে না। স্ট্রেসার-বৈঠকে জার্মানির এ-আচরণ অন্য শক্তিদের দ্বারা মুখে নিন্দিত হল বটে, কিন্তু ইংরাজ মন্ত্রীরা তারপর জার্মানিকে প্রকারান্তরে উৎসাহই দিলেন। নৌবল নির্ধারণের এক ইংরাজ-জার্মান চুক্তিতে (জুন ১৯৩৫) ইংল্যাণ্ড স্বীকার করে যে জার্মানি ইংরেজ নৌবহরের শতকরা ৩৫ ভাগ পর্যন্ত রণতরী রাখতে পারবে। এই চুক্তিও এক হিসাবে ভের্সায়ির ব্যবস্থা ভঙ্গের বন্দোবস্ত—সুতরাং ইংরাজদের এ-আচরণকে নাৎসিদের প্রশ্রয় দেওয়াই বলা চলে। ফরাসীরা এতে উদ্বিগ্ন হয়ে আবিসিনিয়ার ব্যাপারে ইটালির বিরুদ্ধে ইংরাজদের পূর্ণ সহায়তা করল না, অন্যদিকে ইংল্যাণ্ডও তখন কোনো দেশ জার্মানদের দ্বারা আক্রান্ত হলে তৎক্ষণাৎ সাহায্য পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করে।

১৯৩৬-এর মার্চে জার্মানি লোকার্নো-চুক্তি অগ্রাহ্য করে রাইনল্যাণ্ডে আবার সৈন্যস্থাপন করল। লোকার্নো-সন্ধি অবশ্য জার্মানি স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করেছিল, কিন্তু এত দিনে সন্ধিভঙ্গ যেন একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে পড়ে। এই সময় হিটলার এক শান্তির প্রস্তাব আনেন। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে জার্মানি পশ্চিমে কোনো দেশ আক্রান্ত হলে তার সাহায্যে প্রস্তুত থাকলেও, পূর্বের দেশ-গুলির বেলায় (অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, লিথুয়ানিয়া ইত্যাদি) সে-অঙ্গীকার দিতে রাজী নয়। এই পার্থক্য মনে সন্দেহই আনে, এবং তা ছাড়াও বলা যায় যে, নাৎসি-জার্মানির পক্ষে কোনও সন্ধির শর্ত পালন ক্রমে দুরাশায় পরিণত হচ্ছে। ১৯৩৬-এর শেষের দিক থেকে জার্মানি স্পেনে ফ্রাঙ্কোর সাহায্যে প্রবৃত্ত হয়েছে, আর সেখানে অল্প দোষে গণতান্ত্রিক পক্ষের উপর মাঝে মাঝে চণ্ডনীতির প্রয়োগ জার্মান জাতির সুনাম বাড়ায় নি।

এরপর জার্মানি ও ইটালির মধ্যে সখ্যস্থাপন হয়েছে, বার্লিন ও রোমের এই সদ্ভাবকে এখন বিশ্বরাষ্ট্রলীলার মেরুদণ্ড হিসাবে কল্পনা করা হচ্ছে। স্পেনে এ-সখ্যই ফ্রাঙ্কোকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে দিয়েছে, অন্যদিকে সাম্যবাদের বিরোধী দলসংগঠনের প্রয়াস হিসাবে জাপানের সঙ্গেও এ দুই শক্তির মৈত্রী স্থাপিত হয়েছে। পৃথিবীর এই তিনটে ফ্যাসিস্ট ভাবাপন্ন মহাশক্তির মধ্যে বন্ধুত্ব আন্তর্জাতিক শান্তিভঙ্গের আশঙ্কাস্থল, কারণ তিনটি রাজ্যই প্রসারোন্মুখ। তারপর হিটলার ও মুসোলিনির সহযোগে অষ্ট্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য লোপ হল। অষ্ট্রিয়াতে সোশ্যাল-ডেমক্রাট ও সাম্যবাদী দলের মিলনের পরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে নাৎসি-প্রভাবও বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত শুস্‌নিগ্‌কে সরিয়ে অষ্ট্রিয়াকে জার্মান রাজ্যভুক্ত করা সহজেই সম্পন্ন হল (১৯৩৮)। তারপর থেকে নাৎসিরা চেকোস্লোভাকিয়ার উপর দৃষ্টি দিয়েছে—এ রাজ্যে সুদেৎ প্রদেশে অনেক জার্মানের বাস। চেক-রাজ্য আজ তাই সমূহ বিপন্ন।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি নির্বাচিত হন এবং ১৯২৩-২৪ সালে ভিয়েনার অধিবেশনে বিশেষ যোগ্যতার সহিত ইতালির প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে তিনি ভেনিসে ডেপুটি নির্বাচিত হন এবং মাত্তেওত্তির মৃত্যুর পর পার্টির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। বিরোধী-দলের সম্মেলনে তিনি রাজনৈতিক ধর্মঘট ঘোষণার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব বাতিল হইয়া যায়। তিনি তাঁহার সংখ্যালঘু-দল লইয়া পার্লামেন্টে ফিরিয়া আসেন এবং একদিকে ফ্যাশিজম-এর বিরুদ্ধে ও অপরদিকে 'লাভাস্তি'র নিরাকার প্রতিরোধের বিরুদ্ধে একসঙ্গে সংগ্রাম চালান। শ্রমিক বিপ্লবের ভয়ে 'লাভাস্তি' দল তখন বিনা সংগ্রামেই পলাতকা-নীতি গ্রহণ করেন। যদিও তাঁহাদের এই কার্যে মুসোলিনিই লাভবান হইলেন, তথাপি দার্শনিক মহামতি আমেন্দ্যা মুসোলিনির প্রতিহিংসার কবল হইতে রক্ষা পাইলেন না। এই বিষণ্ণ দার্শনিকের রাজনীতি খাপ খাইত না ; তথাপি কেমন করিয়া যেন রাজনীতিতে তিনি ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন।

গ্রামসির কাছে দর্শন ও রাজনীতি বিচ্ছিন্ন ছিল না। তিনিও ডুচের কবল হইতে রক্ষা পাইলেন না। কিন্তু তিনি পতিত হইলেন যুদ্ধ করিতে করিতে। ১৯২৬ সালে নভেম্বরের প্রথম দিকে রোমে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং যদিও তিনি একজন ডেপুটি ছিলেন তথাপি তাঁহাকে উস্তিকা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। কয়েক মাস পরে ঐ দ্বীপেই আবার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির অন্যান্য সদস্যের সহিত স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে অবৈধভাবে তাঁহার বিচার হয়। ইহা বিশেষ আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্বেকার ঘটনা। তিনি নেতা ছিলেন বলিয়া তাহারা তাঁহাকে বিশ বৎসরের কারাদণ্ড দিয়া সম্মানিত করে।

যে লোক মেরুদণ্ডের যক্ষা, ফুসফুসের ক্ষত, রক্তের চাপবৃদ্ধি প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতেছেন তাঁহার পক্ষে এ দণ্ডাজ্ঞার অর্থ ই মৃত্যু। তুরি দি বারি-র কারাগারে কয়েকদিন ধরিয়া বার বার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন এবং গায়ে তাঁহার চব্বিশ ঘণ্টা জ্বর রহিয়াছে ; তার উপর ভালো সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা সেখানে নাই। রোম হাসপাতালের ফ্যাসিস্ত অধ্যাপক উম্বের্তো আর্কাঞ্জেলি ১৯৩৩ সালের মে মাসে তাঁহাকে দেখিয়া যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাহাতে তিনি স্বীকার করেন : "এ অবস্থায় তিনি বেশি দিন বাঁচিতে পারেন না এবং যদি তাঁহাকে শর্তাধীনে মুক্তি দেওয়া সম্ভব না হয় তবে তাঁহাকে কোনো

বেসামরিক হাসপাতালে অথবা ক্লিনিকে স্থানান্তরিত করা উচিত।”

শর্তাধীনে স্বাধীনতার প্রস্তাব তাঁহার নিকট করা হইয়াছিল। শর্ত ছিল ক্ষমা প্রার্থনা ও মতবাদ প্রত্যাহার। ইহাকে আত্মহত্যা করার শামিল বলিয়া এ-শর্ত তিনি কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার জন্য ও তাঁহার পক্ষ লইয়া মার্জনা ভিক্ষা করিব না। যিনি আজীবন পরম নিষ্ঠার সহিত আদর্শের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন তাঁহার তো মার্জনা চাহিবার কিছু নাই।

তাই তিনি মরিতে চলিয়াছেন। মরিয়া তিনি হইবেন ইতালীয় সাম্যবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ শহিদ। তাঁহার ছায়ামূর্তি তাঁহার রাখিয়া-যাওয়া প্রদীপ্ত দীপশিখা ইতালির কমিউনিজমকে ভবিষ্যৎ সংগ্রামে পরিচালিত করিবে।

অনুবাদ : সরোজ দত্ত

সংগ্রাম, ভালোবাসা আর জয়ের প্রতীক আর্নেস্ট থেলমান

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[মস্কোর 'পীস পাবলিশার্স' প্রকাশিত *Lives Given To Freedom* গ্রন্থের 'আর্নেস্ট থেলমান' অধ্যায়ের বীণা মজুমদার কৃত অনুবাদ থেকে এই প্রবন্ধ রচনায় প্রভূত সাহায্য নেওয়া হয়েছে।—সম্পাদক]

জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির অবিসংবাদী নেতা আর্নেস্ট থেলমান ১৯৩৩ সালের ৩ মার্চ বার্লিনের সার্লটেনবুর্গ অঞ্চলে গ্রেপ্তার হন। রাইখস্টাকে আগুন দিয়ে হিটলার তখন গোটা জার্মানিতে নরকের শাসন চালাচ্ছেন।

এসময় থেকে অন্ধকূপ সদৃশ ফ্যাসিস্ট বন্দীশিবিরে থেলমানের দীর্ঘ কারাজীবনের সূত্রপাত। গুরুত্বপূর্ণ বন্দীদের অবস্থান পুলিশ গোপন রাখত। বার্লিনের মোয়াবিট কারাগারে তাঁকে সলিটারি সেলে দীর্ঘকাল আটকে রাখা হয়। অনেক পরে পত্নী ও বিপ্লবী সহকর্মী রোজা থেলমান স্বামী সন্দর্শনের অনুমতি পান।

লাইপ্‌ৎসিগের মামলায় ডিমিট্রভ ও তাঁর সহকর্মীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হওয়ায় নাৎসি কর্তৃপক্ষ জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির নেতার প্রতি তীব্র বিদ্বেষ প্রকাশ করে বলেছিল: "থেলমানের ক্ষেত্রে আর আমরা লাইপ্‌ৎসিগের পুনরাবৃত্তি হতে দেবো না।"

নাৎসিরা এবার আটঘাট বেঁধে নামতে চাইল। থেলমানের বিরুদ্ধে সাজানো হল ভয়ঙ্কর সব অভিযোগ। মেরে, সম্মোহিত করে, এমনকি উৎকোচ প্রদানের মতো অপমানকর প্রস্তাব দিয়ে এক মিথ্যা স্বীকারোক্তিনামায় তারা কোনোক্রমে থেলমানের একটি মহার্ঘ স্বাক্ষর আদায়ের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল। কিন্তু আর্নেস্ট থেলমান জানতেন মধ্যাহ্নে তমসার সেই দিনে 'কমিউনিস্ট' এই অক্ষরসমষ্টির শুদ্ধতা রক্ষার অমোঘ দায় এই মুহূর্তে ইতিহাস তাঁরই ওপর ন্যস্ত করেছে। ফলে নাৎসিদের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হল। আর তার জ্বালা মেটাতে সেই মানবেতর প্রাণীগুলো লোহার রড দিয়ে নির্বিচারে পিটিয়ে হাতে পায়ে বেড়ি লাগানো অবস্থায় দু-দুজন সশস্ত্র প্রহরীর চব্বিশ ঘণ্টা পাহারার মধ্যে

আহত থেলমানকে ছোট্ট সেলে আটকে রাখল।

স্ত্রীকে তিনি মাত্র এইটুকুই লিখলেন: "সম্প্রতি যে-ধরনের অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে তাতে আমার স্বাস্থ্যটা ভেঙে পড়েছে।" গেস্টাপো পাহারায় স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসে রোজা থেলমান কন্যাকে লিখছেন: "দরজা খুলে এস. এস. গুণ্ডারা তোমার বাবিকে ভেতরে নিয়ে এল। বড় কষ্টে তিনি হাঁটছিলেন, বসতে পারছেন না। দাঁত নেই, সমস্ত মুখ ফুলে গেছে। শরীরে কালশিরের দাগ। আতঙ্কে শিউরে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—"ওরা তোমাকে কি করে দিয়েছে!"

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নেতার ওপর নাৎসি অত্যাচারের এই সংবাদে গোটা পৃথিবী কেঁপে উঠল। দেশে দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ 'থেলমান কমিটি' গড়ে তাদের অপরিসীম ক্রোধ ও উদ্বেগ প্রকাশ করল। মস্কো, প্যারিস, প্রাগ, লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি শহরের হৃদয় মহাসমুদ্রের মতো মানব-মিছিলের তরঙ্গে উদ্বেল হয়ে উঠল। ইয়োরোপ এবং আমেরিকার প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা হিটলারের রক্তাক্ত একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। আর্নেস্ট থেলমান তখন প্রতীকে পরিণত। রোলাঁ লিখলেন: "হিটলার গভর্নমেণ্ট পৃথিবীর চোখকে ফাঁকি দিয়া অন্ধকারে বিনা আপিলের, বিনা উকিলের, বিনা সাক্ষ্যের গুপ্তবিচারে থেলমানকে টুঁটি টিপিয়া মারিতে চাহিতেছে। রাজনৈতিক অপরাধের কাপুরুষতাকে এইভাবে বিচারব্যবস্থার পর্যায়ে উন্নীত করা হইয়াছে। এই গোপন বিচারের জন্য গোপনে অনুষ্ঠিত অপরাধের কৈফিয়তও দেওয়া হয় নাই" ('শিল্পীর নবজন্ম' থেকে উদ্ধৃত, বানান ও যতিচিহ্নের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে)। বিশ্ববাসীকে ডাক দিয়ে রেঁালা বললেন: "কমিউনিজম ও থেলমানকে বাঁচাতে সকলে তৎপর হও" [দ্র. *Lives Given To Freedom*]। ম্যাকসিম গোর্কি ঘোষণা করলেন: "এমন সময় আসবে যখন সমগ্র মানবাত্মার শিখা একই সঙ্গে প্রদীপ্ত হয়ে ফ্যাসিজমের দূষিত ক্ষতকে পুড়িয়ে দেবে। থেলমান ও তাঁর কমরেডরা ফ্যাসিবাদের যে-কবর খুঁড়েছেন, তা থেকে তাকে উদ্ধার করার সাধ্য কারো নেই।"

ফ্রিডরিশ রেটারকে নাৎসি কর্তৃপক্ষই আসন্ন বিচারে থেলমানের পক্ষে কৌসুলি নিযুক্ত করেছিল। সাজানো অভিযোগপত্র হাতে বন্দীশালায় ঢুকে রেটার থেলমানের মধ্যে সত্যের মুখ দেখলেন। নাৎসি পাপে সহযোগিতা করা

তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হল না। অভিযোগপত্রের একটি কপি সহ তিনি গোপনে দেশত্যাগ করলেন। পরে প্যারিসে জুরিদের এক সভায় রেটার এই জাতীয় কথা বলেন: থেলমান মানবিক মূল্যমানসম্পন্ন সরল ও নির্ভীক কর্মী—দৃঢ় প্রতিরোধশক্তি এবং আত্মমর্যাদবোধের জোরে বিনা অপরাধে দুঃসহ শাস্তি ভোগ করছেন। কিন্তু কেউ তাঁকে নত করতে পারবে না। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ যদি সত্যিই নির্ভীক হন, তাহলে, থেলমানের একনিষ্ঠ কর্তব্যজ্ঞান ও দুর্জয় চেতনাকে তাঁরাও শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হবেন।

রেটারের এই বক্তব্য থেলমানের মুক্তির দাবিকে আরও শক্তিশালী করে তুলল। ফলে নাৎসিরা তাঁকে আদালতের কাঠগড়ায় তুলে বিচারের প্রহসন করার সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলল। কারণ 'লাইপ্‌ৎসিগ ট্রায়াল'-এর পুনরাবৃত্তি তারা হতে দিতে পারে না। ফলে সেই মানবেতর যূথ 'মানুষ' এই অভিধার জীবন্ত প্রতিরূপকে গোপনে মোরাবিট থেকে বানোভারে সরিয়ে দিল। ভাবল, থেলমানকে আটকে রাখতে পারলেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রদীপটিও তেলের অভাবে এক ফুংকারে নিভে যাবে।

কিন্তু জার্মান শ্রমিকদের মহান কমিউনিস্ট পার্টি, আর্নেস্ট থেলমানের হাতে গড়া দল, সেই নাৎসি নরকের অন্ধকারেও উইলহেলম পীক, উলব্রিখট, ফ্লোরিন প্রমুখের নেতৃত্বে নাৎসি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র প্রতিরোধের মশাল জ্বালাবার চেষ্টা অব্যাহত রাখল। অনেককে দেশ ছাড়তে হল। হিটলার-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বাইরে থেকেই তাঁরা সংগ্রাম করতে লাগলেন। কেউ বা আত্মগোপন অবস্থায় জার্মানির ভেতরেই প্রায় অলৌকিক শক্তিধর নাৎসি রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে এক অসম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল।

নাৎসিরা সেদিন অধিকাংশ কমিউনিস্টকেই গ্রেপ্তার করতে পেরেছিল। ৩৫ হাজার পার্টিকর্মী, থেলমানেরই যোগ্য সহকর্মী তাঁরা, তৃতীয় রাইখের মানব-কল্পনা-পরাস্তকারী বধ্যভূমি হিটলার-জার্মানিতে মাথা উঁচু রেখে শহিদের মৃত্যু বরণ করেছিলেন। অপরাজেয় মানবমহিমা, আদর্শের প্রতি প্রেমিকের বিশ্বস্ততা ও বীরত্বের যে নিষ্কলঙ্ক ইতিহাস এই ৩৫ হাজার বীর তৈরি করে গেছেন—তা পৃথিবী গ্রহেরই গৌরব। অভিভূত মোমারস্কি তাই বলেছেন: এইসব ক্যাডারকে তৈরি করার জন্য জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে আমার অন্তহীন শ্রদ্ধা জানাই। এঁদের নেতা থেলমান এইসব কর্মীর জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ইতিহাসের পাতায় এই কর্মিবৃন্দের

নাম সোনার অক্ষরে লেখা হবে।

থেলমান হয়ে উঠলেন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক। এই নেতা ও শিক্ষক যখন হিটলারের জেলে, স্পেনের গৃহযুদ্ধে তখন ইনটারন্যাশনাল ব্রিগেডের অংশ হিসেবে মুসোলিনি ও হিটলারের সাহায্যপুষ্ট ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে লড়াই করছে 'থেলমান বাহিনী'। পৃথিবীর নানা ভাষায় কত গান, কত গাথা, কত কাহিনীই না রচিত হল তাঁকে নিয়ে!

মহীয়সী স্ত্রী ও কন্যা মারফত (কারণ থেলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অধিকার মাত্র এই দুজনেরই ছিল) বন্দীশালা থেকেই তিনি ছেঁড়া কাগজের টুকরোয় নানা বিষয়ে লিখিতভাবে তাঁর মতামত ও নির্দেশ পাঠাতেন। জীবন, এমনকি সম্ভ্রম, বিপন্ন করেও এই দুই রমণী থেলমানকে একটি শ্লেট পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাতে নানা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও বক্তব্যের আদানপ্রদান হত। সিগারেটের বাক্স কেটে তার কাগজও থেলমান লেখার কাজে ব্যবহার করতেন। অনেক সময় লেখার উপায় থাকত না। ইশারা আর চোখমুখের নানা ভঙ্গিতে তখন থেলমান নিজের বক্তব্য বোঝাতেন। স্ত্রী তাঁর বন্দী স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকতেন—সারা শরীরে যাঁর নাৎসিদের দাঁত আর নখের চিহ্ন। কন্যা দেখতেন পিতাকে—সমগ্র অবয়বে যাঁর ফ্যাসিস্ট থাবার ছাপ। গরাদের ভেতর থেকে দীর্ঘদিনের বন্দী থেলমান চোখ মেলতেন তাঁর স্ত্রী তাঁরই কন্যার দিকে। জানা ছিল প্রত্যেকেরই মাথার ওপর মৃত্যুর খাঁড়া ঝুলছে। তবু, বেশ কয়েক দিন অন্তর পাওয়া আর সংক্ষিপ্ত সেই সাক্ষাৎকারগুলিতে নানা ইশারা, মুখচোখের নানা ভঙ্গিতে থেলমান নিজের দরকারী বক্তব্যগুলি বোঝাতেন, নির্দেশ দিতেন। জীবন যাঁর প্রতীকে পরিণত, তাঁর নিজ মানেই তো মানুষ জাতি। মৃত্যুর বেড়া-আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে এইভাবে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্রীর দেখাসাক্ষাৎ হত।

একদিন থেলমান তাঁর কন্যাকে লিখলেন: "তোমাকে এবার আমার লেখা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কুড়িটি নোটবুক দিচ্ছি। সাবধানে আর গোপনে হামবুর্গ নিয়ে যাবে। মনে রেখো, এর গুরুত্ব অপরিসীম; আর এগুলি নষ্ট হলে চলবে না।"

গোটা জার্মানিই তখন বন্দীশিবির। কিন্তু থেলমান-দুহিতা তাঁর কর্তব্য পালন করেছিলেন। পরবর্তী কালে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিষয়ে মামলায় ঐ নির্দেশ এবং বক্তব্য অনুসারে পার্টির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এদিকে বন্দী থেলমানের ওপর নাৎসি ঝটিকাবাহিনী বিরতিহীন অত্যাচার চালাতে থাকে। হ্যানোভারের কারাগারে তাঁর জন্য বিশেষ একটি কুঠরি তৈরি হয় যাতে আলো, এমনকি বাতাস পর্যন্ত, ঢোকে কম। খেতে হত এক ধরনের বিশেষ জলো খাদ্য। শরীর যখন আর বইছে না, তখন মনের ওপর শুরু হয় নতুন উৎপাত। যে ফ্ল্যাটটিতে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা থাকতেন—নাৎসিরা তা একেবারে তছনছ করে দিয়ে রমণী দুজনের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায় এবং সমস্ত ঘটনাটাই থেলমানকে সবিস্তারে জানতে বাধ্য করে।

মানসিক যন্ত্রণাদানের সূক্ষ্ম ও স্থূল পদ্ধতি আবিষ্কারে নাৎসিদের ছিল অকল্পনীয় দক্ষতা। থেলমানের ওপর সে-সবের নিরন্তর প্রয়োগ চলে। পুরাণের কোনো বীরকে যাঁর সমকক্ষ মনে হয় না এমন যে গোটা মানুষ আর্নেস্ট থেলমান, এই নাৎসি মানবেতররা তাঁকে তাদের খাঁচার গিনিপিগ জ্ঞান করে। এরই মধ্যে থেলমানকে বোঝাবার চেষ্টা হয় তাঁর বন্ধুরা তাঁকে উপেক্ষা করছে। এবং অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ সমুপস্থিত ভেবে তাঁকে বলা হয়: "একটি কাগজে লেখো এবার তুমি নতুন জীবন আরম্ভ করেছ, পুরনো জীবন ঝেড়ে ফেলেছ।" তীব্র যন্ত্রণায় চীৎকার করে থেলমান বলে ওঠেন: "তোমার জানা উচিত আগাপাশতলা একটা শয়তানের কথায় এ ধরনের কোনো বিবৃতি আমি মরে গেলেও দেবো না।"

হিটলার থেলমানের প্রাণপ্রিয় সোভিয়েতভূমি আক্রমণ করলে গেস্টাপো কারারক্ষীরা ডগমগ আনন্দে বন্দীবীরকে সে-খবর জানিয়ে বলল মস্কোর মাটি ছুঁতে ফ্যাসিস্টবাহিনীর বড়জোর দু-একটা দিন লাগবে। অবিচল বিশ্বাসে থেলমান উত্তর দিলেন ফ্যাসিস্ট সৈন্য শুধু কবরে পা দেওয়ার জন্যই মস্কো যাচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাদে প্রায় গোটা ইয়োরোপ পদানত করার অহংকারে উন্মাদ সেই রক্ষীদল উপেক্ষায় হেসে উঠল। থেলমান বললেন: "ফ্যাসিস্টদের এই ঝটিকা আক্রমণই ওদের কবর খুঁড়ছে।"

বহির্বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, ফ্যাসিস্ট নরকে সুদীর্ঘকাল বন্দী আর্নেস্ট থেলমানের কণ্ঠে সেদিন পৃথিবীর বিবেক কথা বলেছিল।

লালফৌজের হাতে মানবসভ্যতার ক্যান্সার হিটলারের চূড়ান্ত পরাজয় যতই অনিবার্য আর আসন্ন হতে থাকে, সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় ফ্যাসিস্ট অত্যাচার ততই মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। পরে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকালে, শত সহস্র পাতার দলিলে তার কতটুকুইবা লিপিবদ্ধ করা গেছে!

থেলমান বুঝেছিলেন ওরা তাঁকে সহজে ছাড়বে না। সহযোগী এক বন্দীকে তিনি এই সময়েই চিঠিতে লেখেন: "এই কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে বিশাল পৃথিবীর বুকে আর কি পা দিতে পারব? না, নিজে থেকে ওরা কখনোই আমাকে মুক্তি দেবে না। বরং এখন যা ধারণাও করা যায় না এমনই ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে। সোভিয়েতবাহিনী যত এগুবে, নাৎসি সামরিক শক্তি যত ডুববে, থেলমানকে শায়েস্তা করতে তত ওরা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছবে।"

থেলমান জানতেন সোভিয়েতের জয় মানেই পৃথিবীর মুক্তি। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর অবধারিত মৃত্যু। থেলমান জানতেন যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে তিনি আরও কিছুদিন বাঁচবেন। দীর্ঘ কারাবাস তাঁর মন ভাঙতে পারে নি, বাঁচতে থেলমান নিশ্চয়ই ভালোবাসতেন। তাই মনেপ্রাণে চাইতেন সোভিয়েতের জয়, ফ্যাসিবাদের ধ্বংস, পৃথিবীর মুক্তি।

অবশেষে চূড়ান্ত মুহূর্ত এসে যায়। ১৯৪৪ সালের ১৮ আগস্ট ওরা আর্নেস্ট থেলমানকে গোপনে হত্যা করে কুখ্যাত বুখেনভাল্ড বন্দীশিবিরে মাটিচাপা দেয়। ১৪ সেপ্টেম্বর এক মিথ্যে সংবাদ প্রচার করে জল্লাদরা বলে ব্রিটিশ ও মার্কিন বিমান আক্রমণে ২৮-এ আগস্ট বুখেনভাল্ডে রাইখস্টাকের প্রাক্তন ডেপুটি ব্রেটসিড ও থেলমান নিহত হয়েছেন।

পৃথিবী বিজয়ের স্বপ্ন দেখত যে, বহু দেশ দল ও ব্যক্তিকে যে অনায়াসে পায়ের তলায় পেয়েছিল—সেই য়্যাডলফ হিটলার নিজের সুরক্ষিত দুর্গে, জার্মানিতে, অমিত রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করেও একটি মানুষকে পরাস্ত করতে পারে নি।

অবশেষে তাঁকে হত্যা করেও ফ্যাসিবাদ পার পায় নি। সেই রাইখস্টাকেই লাল পতাকা উড়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। নাৎসিবাদ থেকে সমাজতন্ত্র—মানবসভ্যতার ইতিহাসে দুরূহতম পরীক্ষায় আজ সেখানে জয়ের পর জয় অর্জিত হচ্ছে। এই রাষ্ট্র আজ সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পরিচালিত বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম গৌরব।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় থেকে থেলমানের যে-নাম ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছিল, সেই নামই আজও ঐ রাষ্ট্রের, গোটা পৃথিবীরই, হৃদয়ে সংগ্রাম ভালোবাসা আর জয়ের প্রতীকরূপেই অনির্বাণ বেঁচে আছে।

ফাঁসির মঞ্চ থেকে

জুলিয়াস ফুচিক

[রাভেনসব্রুকের বন্দীশালায় আমারই এক বন্দী সাথীর কাছ থেকে শুনেছিলাম, আমার স্বামী জুলিয়াস ফুচিক বার্লিনের এক নাৎসি আদালতে ১৯৪৩ সালের ২৫-এ অগাস্ট প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।
তাঁর অদৃষ্টে পরে কি ঘটল সে প্রশ্ন শুধু বন্দীশিবিরের চারদিক ঘেরা উঁচু দেয়ালে তুলেছে প্রতিধ্বনি।
১৯৪৫ সালের মে মাসে হিটলার-জার্মানির পরাজয় হল। যেসব বন্দীকে ফ্যাসিস্টরা নির্যাতনে নির্যাতনে তখনো মেরে ফেলতে পারে নি, তারা পেল মুক্তি। আমি তাদেরই একজন।
আমার মুক্ত স্বদেশে ফিরে এসে স্বামীর খোঁজ করলাম। এমনি হাজার হাজার মানুষ তাদের স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, পিতা মাতার খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল। বিজেতা জার্মানির অসংখ্য নির্যাতনের নরকে এরা সব ছিল বন্দী।
শুনলাম, ১৯৪৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর, তাঁর দণ্ডাদেশ হবার চৌদ্দ দিন পরে, তাঁকে হত্যা করা হয়।
এ কথাও জানলাম যে প্রাহার প্যানক্রাটস বন্দীশালায় জুলিয়াস ফুচিক কিছু লিখেছিলেন। কোলিনস্কী নামে একজন চেক রক্ষী কাগজ আর পেন্সিল তাঁর সেলে এনে দিয়েছিল, তারপর সে-ই গোপনে এক একখানা করে কাগজ নিয়ে যেত বাইরে। আমি সেই রক্ষীটির সঙ্গে দেখা করে আমার স্বামী প্যানক্রাটস-এ বসে যা কিছু লিখেছিলেন সংগ্রহ করলাম। বহু বিশ্বস্ত মানুষের সঙ্গে থেকে তিনি যে কয়েকখানি পাতা লিখেছিলেন—আজ পাঠককে তাই-ই দিলাম উপহার—এই জুলিয়াস ফুচিকের জীবনের সৃষ্টির শেষ অধ্যায়।
—অগাস্তিনা ফুচিক]

পয়লা মে-র ভোর।

জেলখানার গম্বুজের ঘড়িতে বাজল তিনটে। এই প্রথম আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। এখন আমি পূর্ণ সচেতন। খোলা জানলা দিয়ে বিশুদ্ধ হাওয়া আসছে, মেঝেয় পাতা গদির চারদিকে খেলে বেড়াচ্ছে, হাঁ, অনুভব

করতে পারছি খড়গুলো লাগছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, আমার দেহের প্রতি জায়গায় যেন হাজার বেদনা জড়িয়ে আছে। হঠাৎ জানালা খুলে দিলে যেমন সব স্পষ্ট দেখা যায়, তেমনি স্পষ্ট বুঝলাম আমার অন্তিমকাল এসেছে। আমি মরছি।

অনেক দেরি করে এলে মরণ। একসময়ে আশা ছিল, বহু বহুদিন পরে তোমার সঙ্গে হবে আমার পরিচয়। স্বাধীন মানুষ হয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম। কত কাজ করতেও তো চেয়েছিলাম, চেয়েছিলাম ভালোবাসতে। ভেবেছিলাম ঘুরে বেড়াব পৃথিবীতে, আনন্দে গান গাইব। তখন আমি পূর্ণ বয়স্ক, দেহে ছিল অমিত শক্তি। আর তো শক্তি নেই। উবে যাচ্ছে।

জীবনকে আমি ভালোবেসেছিলাম, তারই সৌন্দর্যের সন্ধানে আমি নেমেছিলাম সংগ্রামে। তোমাদের ভালোবেসেছি, হে জনগণ। যখন তোমরা ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছ, খুশী হয়েছি। যখন আমাকে ভুল বুঝেছ, দুঃখও পেয়েছি। যদি কারো ক্ষতি করে থাকি, ক্ষমা কোরো। কাউকে যদি আনন্দ দিয়ে থাকি, ভুলে যেও। আমার নামের সঙ্গে যেন বিষণ্ণতা না জড়িয়ে থাকে। তোমাদের কাছে এই আমার শেষ অনুরোধ। বাবা, মা, বোন, আমার গাস্তা আর কমরেডরা—যাদের আমি ভালোবাসি তাদের কাছে আমার এই অনুরোধ। যদি মনে করো চোখের জল বিষাদের ম্লান ধুলো ধুয়ে দিতে পারবে, তবে ক্ষণেকের জন্য কেঁদো, কিন্তু দুঃখ কোরো না। আমি আনন্দের জন্যই বেঁচেছিলাম ; আজ আনন্দের জন্য, মানুষের সুখের জন্য মরছি। আমার কবরের উপর আজ বিষাদের দূতকে ডেকে আনলে তো অবিচারই হবে।

পয়লা মে! এমনি ভোররাত্রে আমরা শহরতলীতে জেগে উঠে তৈরি হতাম। এই মুহূর্তে মস্কোর পথে পথে প্রথম দলটি প্যারেডের জন্য তাদের জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে লাখো লাখো মানুষ আজাদীর জন্য লড়ছে শেষ লড়াই, হাজার হাজার প্রাণ দিচ্ছে সংঘর্ষে। তাদের একজন হতে পারায় সুখ আছে, হাঁ শেষ লড়াইয়ের একজন সৈনিক।

কিন্তু মরণে তো আনন্দ নেই। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ছাড়তে পারছি না নিঃশ্বাস। গলায় ঘড়ঘড় শব্দ শুনতে পাচ্ছি, আমার আশেপাশের কয়েদীদের হয়তো জাগিয়ে দেবো। একটু জল খেলে বোধহয় আরাম পাব…

কিন্তু পাত্রে তো জল নেই। আমার থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে কুঠরির ঠিক কোণে শৌচের জল রাখবার পাত্র, ওতে প্রচুর জল আছে। সে জল গড়িয়ে খাবার মতো শক্তি হবে কি?

বুকে ভর করে, আস্তে আস্তে চলেছি—যেন কাউকে না জাগানোর ভিতরেই রয়েছে মৃত্যুর সমস্ত মহিমা। শেষে পৌছালাম এসে। লোভীর মতো শৌচের জল পান করছি।

কতক্ষণ লাগল জানি না, বুকে ভর দিয়ে ফিরে যেতেই বা কত দেরি হল তাও জানি না। আবার চেতনা লোপ পাচ্ছে। কব্জি চেপে ধরে নাড়ি খুঁজছি, কিন্তু পাচ্ছি না। প্রাণ যেন গলায় এসে ঠেকেছে, লাফাচ্ছে; আবার নিস্তেজ হয়ে পড়ল। আমিও পড়লাম অবশ হয়ে, কতক্ষণ পড়ে রইলাম কে জানে।...

মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া হয়েই ছিল। আমরা জানতাম, গেস্টাপোর হাতে পড়া মানেই সমাপ্তি। তাই ধরা পড়বার পরে আমাদের নিজেদের মধ্যে এবং অন্যদের সম্পর্কেও যথাবিহিত কাজ করে যেতাম।

আমার জীবননাট্য এখানে উপসংহারের দিকে চলেছে। সে তো লিখতে পারব না, সে কেমন হবে তা জানি না। না, এ আর নাটক নয়। এই তো জীবন।

সত্যিকারের জীবনরঙ্গে তো দর্শক নেই: সবাইকেই ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়।

শেষ অঙ্কের যবনিকা উঠেছে।

বন্ধুগণ, তোমাদের আমি ভালোবাসতাম। হুঁশিয়ার থেকো।

৯ জুন ১৯৪৩

অনুবাদ: অশোক গুহ

বন্দীমুক্তি

সুধী প্রধান

[সুধী প্রধান 'জনযুদ্ধ' (২৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাছাড়া প্রথম পর্বের 'অগ্রণী' ও সাপ্তাহিক 'অরণি'র সঙ্গেও তাঁর নিকট সম্পর্ক ছিল।

'নবান্ন' নাট্যপ্রযোজনার সঙ্গে যাঁরা বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন, সুধী প্রধান তাঁদের অন্যতম ; এ-নাটকে নিজে তিনি অভিনয়ও করেছেন। বাঙলায় গণনাট্য আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান কমিউনিস্ট সংগঠক।

তাঁর নেতৃত্বে বেতারশিল্পীরা চল্লিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ঐতিহাসিক আন্দোলন করেন এবং 'বেঙ্গল আর্টিস্টস য়্যাসোসিয়েশন'-এর প্রাথমিক সংগঠকও তাঁকেই বলা যায়।

'বন্দীমুক্তি' রচনাটি সাপ্তাহিক 'জনযুদ্ধ'র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা (১ মে ১৯৪২, ১৮ বৈশাখ ১৩৪৯, শুক্রবার) তথা 'মে দিবস সংখ্যা'য় প্রকাশিত হয়। পাক্ষিক 'জনযুদ্ধ'র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায়ও (১ এপ্রিল ১৯৪২, ১৮ চৈত্র ১৩৪৮, বুধবার) 'বন্দীদের মুক্তি চাই' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

রচনাটির বানান ও যতিচিহ্নে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক]

ফ্যাশিস্টদের যাঁহারা সবচেয়ে বড় শত্রু, জাপানীদের হামলাকে যাঁহারা শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়া রুখিবেন—সেই রাজনীতিক বন্দীরা আজিও ছাড়া পাইলেন না। লম্বা মেয়াদের ও অল্প মেয়াদের সাজা-পাওয়া কয়েদীরা সাজা খাটিয়াই চলিয়াছেন। বিনা বিচারে যাঁহাদের জেলখানার ভিতরে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে, তাঁহারা ঠিক সেইভাবেই নজরবন্দী হইয়াই রহিয়াছেন। জেলের বাহিরে যাঁহাদের নানা জায়গায় আটক করিয়া রাখা হইয়াছে—তাঁহারাও আটকই রহিয়া গিয়াছেন। যে-সকল মজুর, কৃষক ও ছাত্র নেতাকে আপন আপন কাজের জায়গা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে—তাঁহাদের উপর হইতেও হুকুম তুলিয়া লওয়া হয় নাই। এক কথায়, জাপানীরা বাড়ির দরজায় আসিয়া হাজির হইলেও পুলিশের হুকুমদারি এই দেশে সমানভাবেই চলিতেছে এবং এটি পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে মন্ত্রীদের কোনো ক্ষমতা নাই।

ফ্যাসিজম ও বুদ্ধিদ্রোহ

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

[অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বাঙলায় প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের প্রথম পর্বের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ও মুখ্য সংগঠক ছিলেন [দ্র. পৃষ্ঠা ১৪-১৫]। ১৯৩৮ সালের ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর কলকাতায় 'আশুতোষ মেমোরিয়াল হল'-এ নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে একটি লিখিত অভিভাষণ পাঠান ; উদ্বোধনী বক্তৃতা হিসেবে সেটি সম্মেলনে পঠিত ও ২৫ ডিসেম্বরের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। সংঘের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ড. আবদুল আলীম প্রগতি লেখকদের এই দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনের রিপোর্টের শেষে লেখেন সম্মেলনের সাফল্যের মূলে ছিল অধ্যাপক এস. এন. গোস্বামী, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং অধ্যাপক হীরেন মুখার্জির অক্লান্ত প্রয়াস (দ্র. *New Indian Literature,* No. 1, 1939]

১৯৪১ সালের ২২-এ জুন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 'জনযুদ্ধ'য় পরিণত হয়। কলকাতায় অত্যল্প সময়ের মধ্যে গড়ে ওঠে 'সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতি'। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে, অসুস্থ। সমিতির পক্ষে কবির সঙ্গে দেখা করে সুরেন্দ্রনাথ এই উদ্যোগে তাঁর আশীর্বাদ তথা সমর্থন চান। রবীন্দ্রনাথ 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি'র পৃষ্ঠপোষক হয়ে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর সুদূরপ্রসারী আন্দোলন ও ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রামকে এক নতুন তাৎপর্য দান করেন। ১৯৪২ সালের ২৮ মার্চ 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'র পাঁচ জন সদস্যবিশিষ্ট যে-সংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী তারও সদস্য ছিলেন।

দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ও প্রখ্যাত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী সুরেন্দ্রনাথের জীবন-দীপ অকালে (১৯৪৪) নির্বাপিত হয়। কিছু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ তিনি লিখে গেছেন, কিন্তু তাঁর রচনার পরিমাণ বেশি নয়। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধই 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হয়েছে। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একযোগে তিনি 'প্রগতি' সম্পাদনা করেন [দ্র. পৃষ্ঠা ১৫]। একটি সাহিত্যসভায় সভাপতি হিসেবে পঠিত তাঁর লিখিত অভিভাষণ 'প্রগতি' সংকলনে 'সাহিত্যে বাস্তব ও কল্পনা' নামে প্রকাশিত হয়। ছোট এই প্রবন্ধটি তাঁর মনীষার উজ্জ্বল স্মারক। 'ফ্যাসিজম ও

বুদ্ধিদ্রোহ' ছাপা হয় 'অগ্রণী' পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায়।
নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের কলকাতা সম্মেলনের মাত্র কয়েকদিন পর জানুয়ারি ১৯৩৯ সালে কয়েকজন কমিউনিস্টের উদ্যোগে "বামপন্থী মাসিক পত্রিকা" 'অগ্রণী' আত্মপ্রকাশ করে। মনে রাখা দরকার 'পরিচয়' পত্রিকার মালিকানাবদল হয় তারও অনেক পরে, ১৯৪৪ সালে। প্রথম পর্যায়ে 'অগ্রণী' ১৯৪০ সালের জুন মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। 'অগ্রণী' প্রকাশের বছর ১৯৩৯ সালেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে স্বচ্ছ কোনো ধারণা ছিল না. দেশপ্রেমীরা অনেকে হিটলারের সাহায্যে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখতেন। সেই বিভ্রান্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে 'অগ্রণী' ঘোষণা করেছিল: "সাম্রাজ্যতন্ত্র-বিরোধের সঙ্গে ফ্যাশিস্ট বিরোধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।" অবশ্য, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে 'পরিচয়'-এও সুশোভন সরকার প্রমুখ আগেই কলম ধরেছিলেন।
পুনর্মুদ্রণকালে 'ফ্যাসিজম্ ও বুদ্ধিদ্রোহ' প্রবন্ধটির বানান ও যতিচিহ্নে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক]

আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় মার্কসবাদ সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখবার কোনো দরকার আছে বলে মনে করেন না। বুদ্ধিজীবীসুলভ কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে অনেকে হয়তো হিটলার মুসোলিনি প্রমুখ সংস্কৃতিবিধ্বংসী মহাপুরুষদের জীবনী ও বর্তমান ইতালি ও জার্মেনির রাষ্ট্রিক ও আর্থিক পরিকল্পনার প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন করেন; কিন্তু যে মার্কসীয় চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির সাহায্যে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার মতো পৃথিবীর ইতিহাসে অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটল, তার প্রতি অতি-বুদ্ধি-প্রসূত একটা ঔদাসীন্যের ভাব আমাদের দেশের উচ্চ-শিক্ষিত মহলে বেশ মজ্জাগত। এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম যে একেবারেই নাই তা অবশ্য নয়; কিন্তু মার্কসবাদ নিয়ে চিন্তা বা আলোচনা করেন, এমন লোকের সংখ্যা অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় এদেশে অতি নগণ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। এরও অবশ্য ঐতিহাসিক ও সামাজিক ভিত্তি আছে আর কি কি কারণের সংঘাতের ফলে আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা মার্কসীয় চিন্তাধারার সঙ্গে অপরিচিত থাকবার নিশ্চিন্ত আনন্দে অভ্যস্ত হয়ে কালযাপন করেন, তাও মার্কসবাদী বিশ্লেষণের সাহায্যে সহজেই বোধগম্য হয়। আত্মানুশীলন নাকি আমাদের দেশের সনাতন সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য; তাহলে অন্য কোনো কারণে

না হোক, অন্তত প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা বজায় রাখবার জন্যও আমাদের আত্মানুসন্ধিৎসু ও কৃষ্টি-অভিমানী শিক্ষিত মহলের পক্ষে মার্কসবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

অধ্যাপক জর্জ এচ. স্যাবাইন তাঁর ***History of Political Theory*** বই-খানার এক জায়গায় বলেছেন যে মার্কসীয় সাম্যবাদের একটা দার্শনিক ভিত্তি বহু মনীষীর চিন্তার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু ফ্যাসিজমের সে রকম কোনো ভিত্তি নাই ; এখান-ওখান থেকে নানা রকম টুকরো টুকরো দার্শনিক তত্ত্ব জুটিয়ে একটা জগাখিচুড়ি পাকানো হয়েছে মাত্র। ফ্যাসিজম ও কম্যুনিজম শীর্ষক এক পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "The philosophy of communism has behind it a long history of intellectual development, the outcome of three generations of investigation and discussion, which has given it a considerable measure of coherence and continuity of growth. In it thought in a measure preceded action, in the sense that neither Marx nor Lenin made his philosophy to fit the exigencies of an occasion. The philosophy of fascism has been largely *ad hoc* and has been patched together from the existing fund of ideas either to justify what had already been done or to meet situations that were immediately in prospect. The philosophy of communism at least puts a value on intellectual consistency and objectivity of investigation. ...The philosophy of fascism is fundamentally irrationalist, offering a myth created by intuition and made "true" by the very act of willing or believing it." (*A History of Political Theory.* Pages 773-4)

কিন্তু দার্শনিক ভিত্তি থাকুক আর না থাকুক, আমাদের দেশের পণ্ডিতদের ঝোঁক তবু ফ্যাসিজমের দিকেই শেষ পর্যন্ত যেয়ে দাঁড়ায়। অযৌক্তিক ফ্যাসিজমই আমাদের যুক্তি-অভিমানী বুদ্ধিজীবীদের বেশি আকৃষ্ট করে। অলীক রূপকথার ব্যাপারী মুসোলিনি বা হিটলারের লেখা এ দেশে যত আগ্রহ ও ঔৎসুক্য জাগায়, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে লিখিত দার্শনিক বা সমাজতত্ত্বের বই তার কাছে ঘেঁষতে পারে না। এটা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির দৈন্য ছাড়া আর কিছুই সূচিত করে না। আর্যরক্ত বা রোমক গৌরবের কাহিনী যতই হাস্যকর হোক না কেন, আমাদের বুদ্ধিজীবীর ঝোঁকটা সেই দিকেই বেশি। মুসোলিনি বা হিটলার আমাদের দেশে এখনও বীরপূজা লাভ থেকে বঞ্চিত হন নাই। এটা খুবই

আশঙ্কার বিষয় ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাঁদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে, তাঁরা এতে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠবেন। অধ্যাপক শ্যাবাইনের যে মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে তা যে এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয়, তা হিটলার, মুসোলিনি, জেণ্টিলে, রোজেনবের্গ প্রভৃতি ফ্যাসিস্টদের লেখার সঙ্গে যাঁর একটু পরিচয় আছে, তিনিই স্বীকার করবেন। ১৯২২ সালে নেপলসে এক বক্তৃতায় মুসোলিনি বলেছিলেন, **"We have created our myth. The myth is a faith, it is passion. It is not necessary that it shall be a reality. It is a reality by the fact that it is a goad, a hope, a faith, that it is courage. Our myth is the nation, our myth is the greatness of the nation !"**

ঠিক এই স্বরেই জার্মান আর্যরক্তবিলাসী রোজেনবের্গ বলেছেন, **"The life of a race or a people is not a philosophy that is logically developed and consequently is not a process that grows according to natural laws ; it is the construction of a mystical synthesis, or of activity of soul, which cannot be explained by rational inferences or made comprehensible by exhibiting causes and effects."**

এই বুদ্ধিদ্রোহী অযৌক্তিক মনোবৃত্তির ফলেই মানুষের অপকৃষ্টতম আদিম ও বর্বর প্রবৃত্তিগুলি অনবরত উত্তেজিত হয়ে যুদ্ধের বিভীষিকা উৎপাদন করছে। ফ্যাসিস্টরা আদিম ধ্বংসপ্রবৃত্তিগুলিকে কি রকম উত্তেজিত করেছে মুসোলিনির লেখা থেকে উদ্ধৃত কথাগুলির দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় ; যথা—

"Three cheers for the war ! May I be permitted to raise this cry. Three cheers for Italy's war, noble and beautiful above all. Three cheers also for war in general." আর-এক জায়গায় তিনি বলেছেন, **"Peace is absurd, or rather, it is a pause in war."** জার্মান পণ্ডিত স্পেঙ্গলারের লেখায় **'beasts of prey'**-র কথা এ প্রসঙ্গে মনে হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে ঘুম পাড়াতে না পারলে, তাকে নৃশংস বর্বরতার আদিম অরণ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না ; কাজেই বুদ্ধির পরিবর্তে হৃদয়ের অর্থাৎ ক্ষয়িষ্ণু ধনিকশ্রেণীর নির্মম হৃদয়ের জয়গান করা দরকার। তাই নাৎসি ইভার্স বলেছেন, **"The philosophy of the Swastika defends the instincts of the heart against the insolence of reason."** অবশ্য এই বুদ্ধিদ্রোহী মতবাদ হঠাৎ একদিনেই গজিয়ে ওঠে নি। প্রতিক্রিয়াপন্থী পূর্বগামী সমাজের যুক্তিদ্রোহী দার্শনিক ও সামাজিক মতবাদগুলি থেকেই

এর জন্ম; সোপেনহাওয়ার, নীটশে, জেমস, সোরেল, ট্রাইটস্কে, বার্গসন, গোবিনো, চেম্বারলেন প্রভৃতির মতবাদ থেকে সুবিধামতো যোগ-বিয়োগ করে এই ন্যায় ও যুক্তি বিধ্বংসী মহামারী হৃদয়-দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে। সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকদের মধ্যে যাঁরা অগ্রগণ্য এমন বহু মনীষীকে এই হৃদয়বাদীরা দেশ থেকে তাড়িয়েছে ও তাঁদের অমূল্য গ্রন্থাবলী আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। জাপানী কবি নোগুচির মতো জার্মান দার্শনিক হাইডেগার এই সর্বনেশে বর্বরতার প্রশ্রয় দিচ্ছেন ও তার সপক্ষে প্রচারকার্য চালাচ্ছেন। জার্মান দর্শনের দুরবস্থা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে তা হাইডেগারের সত্য সম্বন্ধে একটি ঘোষণা থেকেই বুঝতে পারা যায়; তিনি ১৯৩৩ সালে নির্বাচনের সময়ে হিটলারের সমর্থনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের এক ইস্তাহারে বলেছিলেন, "Truth is the revealation of that which makes a people certain, clear and strong in its action and knowledge." রোজেনবের্গ এক জায়গায় বলেছেন, "The most completely developed knowledge possible to a race is implicit in its first religious myth." আমাদের এই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ও সাধু-মহাত্মাদের দেশের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব, শাস্ত্রের অভ্রান্তত্ব ও অপরোক্ষানুভূতির দার্শনিক মতবাদ দেশ-বিদেশে প্রচারের মনোবৃত্তির সঙ্গে এই জাতীয় মনোবৃত্তির আশ্চর্য মিল আছে।

যেখানে সত্য ও জ্ঞান সম্বন্ধে এই রকম মতবাদ গায়ের জোরে চালানো হয়, সেখানে বিজ্ঞানকেও যে কোণঠাসা হয়ে থাকতে হবে সেটা খুবই স্বাভাবিক। রোজেনবের্গের দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী বিজ্ঞানের যে দুরবস্থা হওয়া অবশ্য-ভাবী, তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৩৬ সালের ৩০ জুন তারিখে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত জার্মান শিক্ষামন্ত্রী বার্নার্ড রুস্ট-এর হাইডেলবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসবের বক্তৃতায়। তিনি বলেছেন, "The old idea of science based on sovereign right of abstract intellectual activity has gone for ever. The new science is entirely different from the idea of knowledge that found its value in an unchecked effort to reach the truth. The true freedom of science is to be an organ of a nation's living strength and of its historic fate and to present this in obedience to the law of truth"

এর উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের এখনো চৈতন্য হবে কি?

সোভিয়েত যুদ্ধের তিন মাস

গোপাল হালদার

['সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি' (*Friends of the Soviet Union*) তার বিপুল কর্মকাণ্ডের আদিপর্বে 'সোভিয়েট সিরিজ'-এ চারটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। "শ্রীগোপাল হালদার প্রণীত" 'সোভিয়েট যুদ্ধের তিন মাস' এই সিরিজের পুস্তিকা 'নং ২'। সমিতির পক্ষে প্রকাশক লেখক স্বয়ং। মূল্য দুই আনা। হালকা হলুদ রঙের কভার পেপারে ছোট একটি ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে—কাস্তে-হাতুড়ি লাঞ্ছিত নক্ষত্র। পুস্তিকাটি ডাবল ক্রাউন সাইজের। তৃতীয় কভার পর্যন্ত বিস্তৃত প্রবন্ধটির পৃষ্ঠাসংখ্যা সতেরো। চতুর্থ কভারে আছে :

সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি

—০—

—আমাদের উদ্দেশ্য—

দেশবাসীর মধ্যে সোভিয়েট রাষ্ট্র ও তার নানা দিক্‌কার অপূর্ব সংগঠনের কথা, বিশেষ করে এশিয়াস্থ সোভিয়েট জাতিদের উন্নতির কথা, জানানো.—

বর্তমান সোভিয়েট যুদ্ধের মূল কি, যুদ্ধ কিরূপ চল্‌ছে, এই যুদ্ধের ফলাফল সকল দেশ ও জাতির পক্ষে কি হতে পারে, দেশবাসীকে তা বোঝানো—

ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায়, তার জাতীয় স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে সরাসরি যতটা সম্ভব সোভিয়েট রাষ্ট্রে আমাদের সাহায্য পৌঁছানো—

সোভিয়েট সুহৃদ সমিতিতে যোগদান করুন

Join the Friends of the Soviet Union

—আমাদের প্রকাশিত—

—সোভিয়েট দেশ—

এগারো জন বাঙালা লেখকের

সোভিয়েটের এগারোটী দিক সম্বন্ধে

লেখা গ্রন্থ—

দাম, দেড় টাকা

The Land of the Soviets

A Symposium

On the Soviet Achievement

By Indian Men & Women

Rs. 2/-

মনে হয়, ওপরের এই আবেদন ও বিজ্ঞপ্তি গোপাল হালদারেরই লেখা। সুহৃৎ সমিতি (পরবর্তীকালে বিজ্ঞাপনে 'সুহৃদ' ও 'সুহৃৎ'—দুই বানানই ব্যবহৃত হয়েছে) সে-যুগে সোভিয়েত রাষ্ট্রে সরাসরি কোনো সাহায্য পাঠাতে পেরেছিলেন কিনা—এ তথ্য জানাটা আজ খুবই জরুরী। সাপ্তাহিক 'জনযুদ্ধ'র পুরনো ফাইল ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে এ সম্পর্কে একটি চমৎকার তথ্য চোখে পড়ল। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৭ই জুন ১৯৪২ সালের 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় তাঁর 'সোভিয়েট সুহৃৎ আন্দোলন' রচনায় লিখছেন "সোভিয়েটে এ দেশ থেকে যে টাকা পাঠানো হয়েছে, তার প্রথম কিস্তি গিয়েছিল সমিতির সভ্য চিরঞ্জীলাল ঘ্রফের মারফৎ। তারপর নানা উপলক্ষে আরও কিছু টাকা গিয়েছে, মলোটফ্ আর মাইস্কির কাছে তার পাঠানো হয়েছে—কিন্তু এ সব নিয়ে কাগজ গরম করার চেয়ে সোভিয়েট সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য চালানোই আমরা বেশী জরুরী মনে করে এসেছি।" আজকের পাঠকের কাছে ছোট্ট এই সংবাদটুকুর গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু কে এই চিরঞ্জীলাল ? ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর এই দূত সম্পর্কে আমরা আরো খবর জানতে চাই।

পুস্তিকার কোথাও প্রকাশকাল দেওয়া নেই। তবে, অনুমান করা যায় ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে বা অক্টোবরের গোড়ায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। সে-বিচারে প্রায়-বিস্মৃত ও দুষ্প্রাপ্য এই পুস্তিকার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। আমরা এখানে পুস্তিকার প্রথম ছটি পৃষ্ঠা প্রকাশ করলাম। সাব-হেডিংগুলি বড় হরফে ছিল, আমরা ছোট হরফ দিলাম। তাছাড়া বানান (যেমন সোভিয়েট=সোভিয়েত, ইউরোপ=ইয়োরোপ, ফ্যাশিজম=ফ্যাসিজম, ২২শে জুন=২২-এ জুন প্রভৃতি) ও যতিচিহ্নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক]

সোভিয়েত যুদ্ধের আজ তিন মাস। ২২-এ জুন হঠাৎ জার্মানি সোভিয়েত-ভূমি আক্রমণ করে—আজ ২২-এ সেপ্টেম্বর। এই তিন মাসে যুদ্ধ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে, যুদ্ধও আর জার্মানি ও রাশিয়ার যুদ্ধ নেই, যুদ্ধ আজ ইয়োরোপীয় ফ্যাসিজমের সঙ্গে সোভিয়েত-সংঘের। প্রথমেই এই কথাটা মনে রাখা দরকার।

যুদ্ধের মূল কথা

স্পেন থেকে আরম্ভ করে ফিনল্যাণ্ড ও রুমানিয়া পর্যন্ত সমস্ত ইয়োরোপ আজ নাৎসিদের দলে ; এসব দেশের শাসকদল প্রকাশ্যেই হিটলারের তাঁবেদার, জনগণ

আজ ফ্যাসিজমের পদতলে নিষ্পিষ্ট। ইয়োরোপীয় ফ্যাসিজমের তাই যোদ্ধার অভাব নেই; টাকাকড়ির অভাব নেই; জিনিসপত্রের অভাব নেই। স্পেন থেকে যাচ্ছে ফ্রাঙ্কোর 'স্বেচ্ছাসৈনিক', মুসোলোনির মুখ উজ্জ্বল করতে যাচ্ছে ইতালির সৈনিকরা; পরাজিত ফ্রান্স থেকেও সৈন্য যাচ্ছে নাৎসিদের সাহায্য করতে। ফিনল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি, রুমানিয়ার লাখ লাখ সৈন্যও যাচ্ছে বলি হতে। এদিকে রুমানিয়া থেকে আসছে ফ্যাসিস্তদের তেল ও শস্য, হল্যাণ্ড-ডেনমার্কের লুঠ করা খাদ্য আসছে নাৎসিদের জন্য—স্পেনের, ফ্রান্সের, লোরেনের ও সুইডেনের লোহার খনি ফ্যাসিস্তদেরই হাতে। আবার চেকোস্লোভাকিয়ার 'স্কোডা' প্রসিদ্ধ অস্ত্র-কারখানাও হিটলারের হাতে, ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ কারখানাগুলিতে তৈরি হচ্ছে এখন নাৎসিদেরই বিমান, কামান, ট্যাংক—সমস্ত ইয়োরোপই আজ ফ্যাসিজমের অস্ত্রাগার। তাই, যুদ্ধ জার্মানি-রুশিয়ার নয়, যুদ্ধ আজ ইয়োরোপীয় ফ্যাসিজমের 'জেহাদ'—সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। এইটিই এই যুদ্ধের মূল কথা।

যুদ্ধক্ষেত্র

ষোল শ (১৬০০) মাইল জুড়ে এই যুদ্ধের রণক্ষেত্র। মেরুসমুদ্র থেকে কৃষ্ণসমুদ্র পর্যন্ত তার বাঁকাচোরা লাইন বিস্তৃত। আর সে লাইন শুধু রেখামাত্র নয়, দু শ মাইল চওড়া সৈন্যের ও যুদ্ধ-যন্ত্রের হিংস্র অরণ্য। পৃথিবী, সমুদ্র, আকাশ—সকল দিকেই এই রণক্ষেত্র প্রসারিত। যুদ্ধ চলেছে সবখানেই। এর মধ্যে কোথায় কোথায় এখন যুদ্ধ জমে উঠছে—তাই শুধু দেখবার। মোটের উপর তা দেখতে অসুবিধা নেই—যদিও তার খুঁটিনাটি জানা সম্ভব নয়, তা সম্পূর্ণ বোঝাও সহজ নয়।

কীব[১]-এর যুদ্ধ

প্রথমত, যুদ্ধ এই মুহূর্তে সব থেকে বেশি প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে কীব-এর দিকে। আর একবার কীব-এর কাছে মাস দেড়েক আগে যুদ্ধ এগিয়ে এসেছিল; কিন্তু সেবার ফ্যাসিস্ত সৈন্য পরাহত হয়ে ফিরে যায়। এবার তারা—জার্মান, রুমানিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান···সবাই মিলে—কীব অধিকার করেছে। পশ্চিম দিক থেকে ফ্যাসিস্তবাহিনী এগিয়ে আসে, উত্তর থেকেও এগিয়ে আসে আর কীবের

১. Kiev। পরবর্তী রচনায় লেখক একই শহরের নাম বলেছেন 'কিয়েভ'। বাংলা ভাষায় এটিই অবশ্য চালু নাম।—সম্পাদক

চারদিকে দেড় শ মাইল জুড়ে সোভিয়েত বাহিনীকে তারা ঘেরাও করে ফেলে। তারপর হঠাৎ আক্রমণ হয় কীব-এর দক্ষিণ দুয়ারে, সেই আকস্মিক আক্রমণে কীব-এর নগর-সীমা তারা অতিক্রম করে। ফলে কীব-এর পতন হয়েছে। এদিকে যুদ্ধের সংবাদ থেকে মনে হচ্ছে—কীব-এ ফ্যাসিস্তরা প্রবেশ করেছে, তার বাইরে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলেছে, অবরুদ্ধ সোভিয়েত সৈন্যেরা শত্রুব্যূহ ভেদ করে যাচ্ছে। ভয়াবহ এই সংগ্রাম।

খুব সম্ভব তাদের পরাজয় প্রায় অনিবার্য, যদিও কীব-এর পরিবেষ্টিত দেড় শ মাইলের মধ্যে সোভিয়েতবাহিনী এখনো অপরাজিত। যদি বাইরের সাহায্য না পায়, তারা হয়ত নিঃশেষে মরবে, আর কিছু হবে আহত ও বন্দী। কারণ এখানে ফ্যাসিস্তরা সংখ্যায় অগণিত, তাদের সাজ-সজ্জা অপর্যাপ্ত[২]। স্বয়ং হিটলার উক্রেইনে তাঁর শিবির স্থাপন করেছেন, আর হুকুম দিয়েছেন—উক্রেইন অতিক্রম করে অবিলম্বে ককেশাস অধিকার করা চাই।

প্রধান যুদ্ধকেন্দ্র এখন উক্রেইনে। নীপারের তীর ধরে জার্মান বাহিনী নেমে যায় কৃষ্ণসমুদ্র পর্যন্ত, ওডেসা অবরোধ করে। কিন্তু তাদের রুমানীয় অনুচরেরা সহস্রে সহস্রে সেখানে বলি যাচ্ছে ; ওডেসা এখনো অবিজিত। তিন সপ্তাহ ধরে নীপারের তীরে জার্মানবাহিনী ঠেকে ছিল, নদী পার হতে পারছিল না। এবার তারা কয়েক জায়গায় নদী পার হয়েছে, নদীর পূর্ব তীরে ক্রেমেন্‌চুগ শহরও তাদের অধিকৃত হয়েছে। ইতিপূর্বে পশ্চিম-উক্রেইনের বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র ছাড়াও জার্মানবাহিনী দখল করেছিল লৌহখনির কেন্দ্র ক্রিবোয়ারোগ ও নীপারের বাঁকের প্রসিদ্ধ শিল্পকেন্দ্র নীপার-পেট্রোবস্ক। দখলই তারা করেছে, কিন্তু উক্রেইনের ক্ষেতে পেয়েছে পোড়ামাটি, আর সে কারখানার চূর্ণবিচূর্ণ স্তূপ। ক্রেমেন্‌চুগের অবস্থাও তাই। সেখানেই বহু ময়দার কল, সিগারেট কারখানা ও ছোট-বড় অন্যান্য সব শিল্প নিঃশেষ করে তবে সোভিয়েত সৈন্য তা পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু সামরিক গুরুত্ব ক্রেমেন্‌চুগের তথাপি যথেষ্ট। রেল লাইন এখান দিয়ে গিয়েছে একদিকে উত্তর-পূর্বে রুশভূমির ব্রিয়ান্‌স্ক-এর দিকে, অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্বে পূর্ব-উক্রেইনের প্রসিদ্ধ শিল্পকেন্দ্র খারকব-এর দিকে। এই দুই রাস্তা দিয়ে ফ্যাসিস্তবাহিনী এবার ফিরে ধরতে চাইবে পশ্চিম-উক্রেইন—তার কৃষিক্ষেত্র, ডোনেটজের খনি-অঞ্চল ও খারকব ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শিল্পাঞ্চল। এদিকে আবার কৃষ্ণসমুদ্রের পথে রুমানিয়ার বন্দর থেকে আক্র

২. ছিল 'অপ্রতুল'।—সম্পাদক

বুলগেরিয়ার বন্দর থেকে জার্মানির নৌবহর তখনি ওডেসা ও ক্রিমিয়া প্রদেশের সোভিয়েত নৌ-অঞ্চলের উপর আক্রমণ চালাবে। এই জল-স্থল-আকাশের আক্রমণে উক্রেইনের চার অঞ্চলে তাই যুদ্ধ চলবে—কীব-অঞ্চলে, ওডেসায়, পূর্ব-উক্রেইন আর শেষে স্থল ও জলপথে কৃষ্ণসাগরের তীরে ক্রিমিয়ায়। উক্রেইন একবার অধিকৃত হলে জার্মানরা অগ্রসর হতে পারে একেবারে তেলের দেশ ককেশিয়ায়।

উক্রেইনের আক্রমণ তাই এখন প্রচণ্ড হচ্ছে। সবাই জানে উক্রেইন সোভিয়েত সংঘের সবচেয়ে ঐশ্বর্যভরা অঞ্চল। তা সোভিয়েত হারালে তার ক্ষতি হবেই। তাই এখানকার যুদ্ধও দুর্জয় হচ্ছে। হয়ত এখানেই প্রচণ্ডতম যুদ্ধ এবার হবে—এখন সবে তার আয়োজন।

লেনিনগ্রাদের যুদ্ধ

দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ চলেছে এখন লেনিনগ্রাদের চারদিকে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, ফ্যাসিস্তরা প্রায় লেনিনগ্রাদ অবরোধ করেছে। কিন্তু সম্ভবত সে অবরোধ সম্পূর্ণ নয়, বাইরে থেকে এখনো লেনিনগ্রাদে মালপত্র আসছে। তবে মনে হয় লেনিনগ্রাদের দূরস্থ রক্ষা প্রাকারে জার্মানরা এসে পৌছেচে। আর শীঘ্রই হয়ত লেনিনগ্রাদ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হবে।

প্রচণ্ড যুদ্ধই এখানেও হচ্ছে। কারণ, লেনিনগ্রাদ রুশজাতির প্রিয় শহর, তাছাড়া সোভিয়েতের তা গৌরবের বস্তু। এখানেই সাম্যবাদী বিপ্লব শুরু হয়, এখানেই তার এক প্রধান সংস্কৃতিকেন্দ্র, এখানেই আবার তাদের অন্যতম প্রধান শিল্পকেন্দ্র। সামরিক হিসাবে আবার সোভিয়েত বাল্‌টিক বহরের আড্ডা লেনিনগ্রাদে ও ক্রোন্‌স্টাড নৌ-দুর্গে, আর সোভিয়েতের ওসেল বা হাঙ্গো প্রভৃতি সুরক্ষিত দ্বীপে। এখন পর্যন্ত ওসেলে 'প্যারাশুট'-এ জার্মানরা সৈন্য নামাতে চেষ্টা করছে, হাঙ্গোর উপর হানা দিয়ে লাভ হয় নি, বাল্‌টিক নৌবল ও নৌ-বিমান এই সমুদ্র উপকূলে পাহারা দিচ্ছে। সমুদ্রতীরে কোপোরেৎ, সেখান থেকে দেৎস্কোয়ে সেলো পর্যন্ত ৪৫ মাইল রণক্ষেত্র। লাল পল্টন দৃঢ়ভাবেই আগলে আছে এই দক্ষিণ-পশ্চিমের যুদ্ধভূমি। মাঝখানে বন আর বাদা, আর ছোট পাহাড়। তার মধ্যে মধ্যে মাইল পনের চওড়া একের পর এক সোভিয়েতের ছোট বড় রক্ষাকেন্দ্র, কংক্রীটের রক্ষাগার ও অসংখ্য আয়োজন। এইখানেই দক্ষিণে প্রথম দুর্গ পড়ছে ক্রাস্‌নোগ,কার দেইস্‌ক, এখনো তা সোভিয়েতের হাতে। এরই পরে শহরের দিকে আছে পুল্‌কোভোর সুরক্ষিত

চূড়া। দক্ষিণ-পূর্বে ও পূর্বে জার্মানরা এখন লাডোগা হ্রদের তীরে স্লুসেলবুর্গের সন্নিকটে, তারও পরে রয়েছে কোলদিনিন তার পনের মাইল উত্তর-পশ্চিমে। এর মাঝখানে লেনিনগ্রাদ পর্যন্ত আবার জলাভূমি। উত্তরের পথে ফিনরা অগ্রসর হবার কথা, কিন্তু তা বোধহয় ধর্তব্যের মধ্যে নয়। মোটের উপর এ-ই লেনিন-গ্রাদের পথ। আর এখানে তুমুল সংগ্রাম চলেছে, কামানে-কামানে বিমানে-বিমানে যন্ত্রে-মানবে।

লেনিনগ্রাদ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না—এ কথা যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই সোভিয়েতভূমি জানত। আর ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধের প্রধান কারণই ছিল তাই। কিন্তু বিনা যুদ্ধে লেনিনগ্রাদের এই পথের একটি ধূলিকণাও ফ্যাসিস্তরা পাবে না। আর যদি শেষ পর্যন্ত সেনাপতি ভরোশিলভ ও লেনিনগ্রাদের শহরবাসীদের পরাজয় ঘটে, তাহলে সংখ্যাতীত জার্মান-জীবনের বিনিময়ে ফ্যাসিস্তরা পাবে এক ধ্বংসস্তূপ যেমন তারা পেয়েছিল স্মোলেনস্কে।

উত্তরে লেনিনগ্রাদ ও দক্ষিণে উক্রেইন, এই দুইটিই এখন যুদ্ধের প্রধান কেন্দ্র। যুদ্ধের তৃতীয় প্রধান কেন্দ্র অবশ্য মধ্যস্থলে। সেনাপতি তিমোশেঙ্কো বিপুল বিক্রমে সেই মধ্যস্থলে জার্মানদের প্রতি-আক্রমণ করছেন, উত্তরে বিয়ারসেবা ও দক্ষিণ-য়িলনিয়া থেকে জার্মানবাহিনী পশ্চাৎপদ হয়েছে, স্মলেনস্কের মাইল কুড়ি দূরে আবার এসে গেছে সোভিয়েতবাহিনী। এই স্মলেনস্কের কাছে ক্রমাগত দু-মাস ধরে পৃথিবীর বৃহত্তম সংগ্রাম চলে। শেষে স্মলেনস্কের ভস্মরাশি জার্মানির হস্তগত হয়। কিন্তু যে মস্কোর জন্য এই সংগ্রাম—লাখ দশ-পনের জার্মানের এই ভয়াবহ মৃত্যু—সেই মস্কো আজ অজেয় হয়ে রইল। বরং এখানকার আক্রমণ তীব্রতর হলে ফ্যাসিস্তদের তার টাল সামলাবার জন্য লেনিনগ্রাদে ও উক্রেইনেও খানিকটা থমকে দাঁড়াতে হবে।

এই তিন কেন্দ্র প্রধান। কিন্তু তা ছাড়াও যুদ্ধ চলছে একেবারে উত্তরে মুরমান্স্কে। সেখানে ফিনেরা চাইছে সে বন্দর দখল করতে, সোভিয়েতের পক্ষে আর যাতে ব্রিটেন বা আমেরিকার সাহায্য সে পথে পাওয়া সম্ভব না হয়। তেমনি যুদ্ধের আয়োজন চলছে বুলগেরিয়ায়। হয়ত সেই পথে যুদ্ধ বিস্তৃত হবে কৃষ্ণসাগরে—প্রথমত সোভিয়েতভূমির বিরুদ্ধে, পরে হয়ত বা তুর্কীরও বিরুদ্ধে। এদিকে সোভিয়েতের পক্ষে যুদ্ধের রক্তপথ বন্ধ হয়েছে ইরানে—অর্থাৎ দক্ষিণ-এশিয়ায়। তবে যে কোনো দিন সেই পথ জাপান 'সুদূর প্রাচ্য'-এ খুলে দিতে পারে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে—মাঞ্চুকুর সীমান্তে বা সাইবেরিয়ায়।

জাপানের স্বাক্ষর

হিরণকুমার সান্যাল

[১৯৪২ সালের ৮ মার্চ সোমেন চন্দ নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডে দল-মত-বয়েস ও প্রতিষ্ঠা নির্বিশেষে বাঙলার সারস্বতসমাজ উদ্বেল হয়ে ওঠে। ২৮-এ মার্চ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পীদের "প্রথম সম্মেলনে" 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'র একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয় (সভাপতি : অতুলচন্দ্র গুপ্ত, যুগ্ম-সম্পাদক : বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়)। স্থির হয় 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ' এখন থেকে 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' নামে পরিচিত হবে এবং আগের মতোই 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'র শাখা হিসেবে কাজ করবে।

উপরোক্ত সাংগঠনিক কমিটির আহ্বানে ১৯৪২ সালের ১৯-২০ ডিসেম্বর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনসটিট্যুট-এ বাঙলার ফ্যাসিস্টবিরোধী শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রথম রাজ্যসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন পরিচালনার জন্য যামিনী রায়, বুদ্ধদেব বসু, হবিবুল্লাহ বাহার (তৎকালের বিখ্যাত লেখক ও মুসলিম লীগের নেতা) এবং আবু সয়ীদ আইয়ুবকে নিয়ে একটি সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয় ; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তার চেয়ারম্যান (যামিনী রায়ের অনুপস্থিতিতে 'যুগান্তর' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সভাপতিমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হন)। সম্মেলন উদ্বোধন করার কথা ছিল মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের, তিনি উপস্থিত হতে না পারায় অতুলচন্দ্র গুপ্ত সে-কাজটি সম্পন্ন করেন। এই সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য যে-অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়, হিরণকুমার সান্যাল ছিলেন তার চেয়ারম্যান। ছোট্ট একটি লিখিত অভিভাষণ পাঠ করে তিনি সমবেত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান। অভিভাষণটি পরে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

হিরণকুমার জাপানী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে একটি পুস্তিকা লেখেন আরও কয়েক মাস আগে এবং 'জাপানের স্বাক্ষর' নামে তা 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থমালা'য় ঐ বছরেরই ১ জুন তারিখে প্রকাশিত হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত এই 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থমালা'য় কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল :

১. জাপানী সমাজ ও শাসন/বিনয় ঘোষ
২. জাপানের স্বাক্ষর/হিরণকুমার সান্যাল
৩. ভারত ও চীন/বিনয় ঘোষ
৪. জাপ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ/সুধী প্রধান

এই চারটি পুস্তিকারই মুদ্রিত প্রকাশ-তারিখ : ১ জুন ১৯৪২।

প্রতি পুস্তিকার দ্বিতীয় কভারে সংক্ষিপ্ত লেখক-পরিচিতি আছে। তৃতীয় কভারে আছে 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থমালা'র অন্যান্য পুস্তিকার তালিকা। চারটি পুস্তিকার তালিকায়ই পঞ্চম পুস্তিকা হিসেবে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'স্বাধীনতার শত্রু জাপান'-এর উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুস্তিকার তালিকায় মণিকুন্তলা সেন রচিত 'জাপানী মেয়েরা' নামে ষষ্ঠ একটি পুস্তিকার উল্লেখ আছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুস্তিকা দুটি দেখার সুযোগ আমাদের হয় নি।

চারটি পুস্তিকারই প্রকাশক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। প্রাপ্তিস্থান : 'অরণি' কার্যালয় (১২২ বহুবাজার স্ট্রীট, কলকাতা)। তিনটি পুস্তিকা ছাপা হয়েছে যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক ১২২ বহুবাজার স্ট্রীটেরই 'আর্থিক জগৎ প্রেস' থেকে। শুধু দ্বিতীয় পুস্তিকাটির মুদ্রক 'সমবায় প্রেস' (৩৩/২ শশীভূষণ দে স্ট্রীট, কলকাতা)।

'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' প্রকাশিত দুটি পুস্তিকা 'জাপানী শাসনের আসল রূপ' এবং 'সভ্যতা ও ফ্যাশিজম্' আর 'ফ্যাশিবাদ-বিরোধী জনসংঘ' প্রকাশিত স্নেহাংশু আচার্য রচিত পুস্তিকা 'আজকের কর্তব্য'র চতুর্থ কভারে প্রাসঙ্গিক বই-পুস্তিকার যে-তালিকা আছে, তাতে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতার শত্রু জাপান' পুস্তিকাটিকে বলা হয়েছে "ফ্যাশিবাদ-বিরোধী জনসংঘের দ্বারা প্রকাশিত"। এই তিন তালিকার কোনোটিতেই 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থমালা'র অন্যান্য পুস্তিকার উল্লেখ নেই।

'আন্তর্জাতিক গ্রন্থমালা'র চারটি পুস্তিকারই কভারে মোটা কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে, তবে ব্লক নয়। কোনো পুস্তিকাই নিউজপ্রিন্টে ছাপা হয় নি। পুস্তিকা চারটি প্রকাশের সময় সুধী প্রধান 'অরণি' ও 'জনযুদ্ধ'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বিনয় ঘোষ ছিলেন 'অরণি'র সহ-সম্পাদক, আর—হিরণকুমার সান্যাল ছিলেন 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক।

প্রথম প্রকাশকাল থেকে আজ পর্যন্ত 'পরিচয়'-এর সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে যুক্ত, প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও লেখক-শিল্পীদের ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রামের

শরিক হিরণকুমার সান্যাল রচিত অধুনা দুষ্প্রাপ্য ও প্রায়-বিস্মৃত পুস্তিকা 'জাপানের স্বাক্ষর'-এর অংশবিশেষ এখানে প্রকাশিত হল। বানান ও যতিচিহ্নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক]

নিজেদের সম্মুখে স্ফীত ধারণা অল্পবিস্তর সকল জাতিরই আছে, কিন্তু এই স্ফীতির পরিমাণ যখন পৃথিবী ছাপিয়ে একেবারে স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছায় তখন তা একটু হাস্যকর হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গত মহাযুদ্ধের[১] সময়ে জার্মান সম্রাট কৈসর উইলিয়মের উক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। পরাক্রান্ত জার্মান সৈন্যদলকে শত্রুনিপাতের উদ্দেশ্যে রণক্ষেত্রে পাঠানোর সময়ে কৈসর তাদের লক্ষ্য করে এই বাণী প্রচার করেন যে তারা যে মহৎ কাজে অগ্রসর হচ্ছে সে কাজ ঈশ্বর-প্রণোদিত, কেননা তিনি অর্থাৎ জার্মান সম্রাট স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধি।

এইভাবে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব দাবি করা মোটেই নতুন জিনিস নয়—মধ্যযুগে রাজরাজড়াদের মধ্যে তা খুবই প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এই মধ্যযুগীয় সংস্কারের পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা একটু বিসদৃশ লাগে, বিশেষত জার্মানির মতন বিজ্ঞান-আলোকিত দেশে। যাই হোক, কৈসর দ্বিতীয় উইলিয়মের ভাগ্যে কী রকম লাঞ্ছনা ঘটেছিল তা পৃথিবীসুদ্ধ লোক আজ জানে, অবশ্য ঠিক কী কারণে তিনি তাঁর মহৎ প্রতিনিধি-পদ থেকে বরখাস্ত হয়েছিলেন সে রহস্য তিনি নিজে কোনোদিন ফাঁস করেন নি।

কৈসরের যোগ্যতর উত্তরাধিকারী হিটলার জার্মান জাতি সম্বন্ধে যে-সব দাবি প্রচার করেন তা কৈসরের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। হিটলার কৈসর অপেক্ষা অনেক বেশি সুবিধাবাদী, তাই সুবিধা মতন কখনও তিনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন, কখনও বা এমন ভাব প্রকাশ করেন যে মনে হয় ঈশ্বরই তাঁর শরণাপন্ন হতে বাধ্য হবেন। মোটের উপর জার্মান জাতি যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি ও এই জাতির সেরা পুরুষ যে হিটলার—এই বিষয়ে হিটলার ও তাঁর অনুচরেরা নিঃসন্দেহ। সম্প্রতি রুশ-জার্মান যুদ্ধের ফলে হয়তো এ সম্বন্ধে একটু সন্দেহের কারণ ঘটেছে, কিন্তু ঘটলেও তাঁরা নিজেদের মনে তা গোপন রেখেছেন, বাইরে এখনো তাঁদের দম্ভের শেষ নাই।

এই দম্ভ শুধু জার্মানির একচেটে নয়। হিটলারের পরম সুহৃৎ মুসোলিনির

১. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

দম্ভও একেবারে গগনস্পর্শী। তবে কিছুকাল থেকে মুসোলিনি যেন একটু মনমরা হয়ে আছেন। একদিকে বন্ধুবর হিটলারের চাপ, অপরদিকে পূর্ব-আফ্রিকার সাম্রাজ্য-নাশ, তার উপর সাধের ভূমধ্যসাগরে নিজেদের খাস জমিদারির এলাকার ভিতরেই ব্রিটিশ নৌবহরের কাছে ইটালীয় নৌবহরের একাধিকবার লাঞ্ছনা—ইত্যাদি অপ্রীতিকর ব্যাপারের স্মৃতি মুসোলিনি বোধহয় মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না। বোঝা যায় তাঁর বয়স হয়েছে।

অক্ষশক্তিপুঞ্জ ও জাপান

ইয়োরোপে জার্মানি ও ইটালির সহযোগিতার ফলে যে-অভিনব রাজনৈতিক অক্ষদণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে, তার আর-এক প্রান্ত গিয়ে ঠেকেছে একেবারে প্রাচ্যের সুদূরতম প্রান্ত জাপানে। এই জ্যামিতি-বিরোধী অক্ষদণ্ডের এশিয়াস্থ সহযোগী জাপানের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। জাপান আজ শুধু আমাদের দরজার গোড়ায় নয়—একেবারে মাথার উপরে হানা দিয়েছে। ইতোমধ্যেই ভারতবর্ষে ও সিংহলে জাপানের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে। বোধহয় বেতারে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে-প্রীতি দিনের পর দিন টোকিও প্রচার করছে, সেই প্রীতিরই নিদর্শনস্বরূপ। এই জাতীয় প্রীতির নিদর্শন ভারতীয়দের মাথার উপর আরও অনেক বর্ষিত হবে তার বিশেষ আশঙ্কা আছে। শুধু তাই নয়, জাপান কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত হবার যে-সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তা কার্যে পরিণত হলে ভারতবাসীর ভাগ্যে যে কী আছে—তারও আভাস পাওয়া যায় জাপানের কার্যকলাপ থেকে।

আম্‌লেটো ভেস্‌পার বই

এই কার্যকলাপ সম্বন্ধে অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ একটি বই কিছু দিন আগে প্রকাশিত হয়েছে। বইটির নাম 'জাপানের গুপ্তচর'। লেখক আম্‌লেটো ভেস্‌পা এক সময় জাপানের গুপ্তচর বিভাগে কাজ করে যে-সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, বইটিতে তারই রোমাঞ্চকর বিবরণ দিয়েছেন। পড়লে একেবারে চমকে উঠতে হয়। যে জাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি বলে দাবি করে, যাদের সম্রাট মিকাডো নাকি খোদ ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি, দেবতার প্রবল অনুগ্রহে যারা ক্রমশ মহীয়ান হয়ে উঠে আজ সারা এশিয়ার শাসনাধিকার দাবি করছে—তাদের শাসন-বিভাগের অভ্যন্তরীণ কাহিনী, তাদের নেতৃবর্গের প্রকৃত স্বরূপ, এ

বইটিতে যেভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা অতি বড় জাপ-শত্রুরও কল্পনার অতীত ছিল।

কিন্তু আম্‌লেটো ভেস্‌পা-বর্ণিত ঘটনাগুলি যে কল্পিত নয়, একাধিক বিশেষজ্ঞ বইখানি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে এই মত দিয়েছেন। এই নিবন্ধে বর্ণিত ঘটনা ও তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সবই আম্‌লেটো ভেস্‌পার বই থেকে। এসব ঘটনার অনেকগুলিই পৃথিবীসুদ্ধ লোক জানে। কিন্তু কী ভাবে এই ঘটনাগুলি ঘটেছে, এদের প্রকৃত উৎস দৈব অনুগ্রহ না মানুষের কারসাজি, তা হয়তো অনেকেই জানে না।

মার্শ্যাল চ্যাং-সো-লিন-এর মৃত্যু : জাপানের সেরা চাল

দৃষ্টান্তস্বরূপ মার্শ্যাল চ্যাং-সো-লিন-এর মৃত্যুর উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ছিলেন মাঞ্চুরিয়ার সামরিক নেতাদের অন্যতম, তাছাড়া শাসনকার্যেও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। কিন্তু জাপানের তিনি ছিলেন চক্ষুশূল। হবারই কথা। কেননা যুদ্ধবিগ্রহে তাঁর অভিজ্ঞতা, চীনাদের উপর তাঁর প্রভাব ও তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব জাপানের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে বিশেষ বাধা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দৈব অনুগ্রহে হঠাৎ এই বাধা অপসারিত হল—রেলপথে মুকডেন যাবার সময় মার্শ্যাল চ্যাং-সো-লিন-এর কামরাটি একেবারে চুরমার হয়ে উড়ে গেল। মার্শ্যাল চ্যাং, জেনারেল উ-সু-চ্যান ও তাঁদের প্রায় বিশজন সহযাত্রী সঙ্গে সঙ্গে নিহত হলেন।

দৈব অনুগ্রহের এ রকম নমুনা ইতিহাসে বিরল। কিন্তু আরো বিরল দৈবশক্তিকে বশ মানাবার জন্যে জাপানের কর্তৃপক্ষ যে সকল রহস্যজনক উপায় অবলম্বন করেছিলেন, সামান্য দু-একটি ঘটনা থেকে এই উপায়গুলি সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়।

টোকিও শহরে মার্শ্যাল চ্যাং-সো-লিন-এর একজন প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁর নাম মিস্টার রাইনহার্ট। ১৯২৮ সালের ৩১এ মে তারিখে অর্থাৎ ঐ ট্রেনের ঘটনাটির কয়দিন আগে তিনি মার্শ্যাল চ্যাং-সো-লিনকে জানান যে মুকডেন যাবার পথে ট্রেনে তাঁকে (অর্থাৎ মার্শ্যালকে) হত্যা করবার ষড়যন্ত্র হয়েছে এই নিশ্চিত খবর তিনি পেয়েছেন। মার্শ্যাল এ খবর মোটেই বিশ্বাস করেন নি। তবু মাঞ্চুরিয়াস্থ জাপানী সদর ঘাঁটির এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে কথায় কথায় তিনি তা জানান। ঐ কর্মচারীটি মার্শ্যালকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে তিনিও মার্শ্যালের সঙ্গে একই কামরায় মুকডেন যাবেন। কার্যতও তিনি তাই

করেন, কিন্তু মুকডেন পৌঁছানোর মিনিট দশেক আগে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন টুপি ও তলোয়ার আনবার জন্যে তাঁকে একবার পাশের কামরায় যেতে হবে। কিন্তু আসলে পাশের কামরায় না গিয়ে তিনি গিয়ে হাজির হলেন ট্রেনের একেবারে সবার পিছনকার গাড়িতে—না গিয়ে উপায় ছিল না, কেননা তার আশ্বাস সত্ত্বেও তিনি উঠে যাবার পরেই মার্শ্যাল-এর কামরাটি বিধ্বস্ত হল।

এর পর অবশ্য আর সন্দেহ করা চলে না যে জাপানীরা বাস্তবিকই একেবারে খাঁটি দেবতার জাতি। তাই বোধহয় জাপানের গুপ্তচর-বিভাগের দেবোপম প্রধান কর্মচারী চ্যাং-সো-লিন-এর মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে সগর্বে বলেছিলেন "চালের মতন চাল বটে"। এটা যে সত্যি উঁচুদরের চাল হয়েছিল, ঐ ট্রেনের ড্রাইভার ও প্রধান খালাসীর সাক্ষ্যও তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে। আরো তা প্রমাণ করে মাঞ্চুরিয়াতে এই ব্যাপারটির জের।

মাঞ্চুরিয়ার মর্মভেদী অভিজ্ঞতা

শোনা যায় পৌরাণিক যুগে দেবতারা কোনো ব্যক্তিবিশেষের উপর বিরক্ত হলে তার বিনাশের জন্য একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হতেন। জাপানীরা ঠাণ্ডা-মাথা, তার উপর নীরব কর্মী। কোনো ব্যক্তিবিশেষের উপর চটার মতন দুর্বলতা তাদের দেবদুর্লভ চরিত্রে কদাচিৎ দেখা যায়। তবে যদি কোনো দুঃসাহসী লোক দেবোত্তর জাপানী সভ্যতার প্রসারে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তবে জাপানীরা তার বিনাশ যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে পারে না। কিন্তু তারা সেকেলে দেবতাদের মতন ক্ষিপ্তপ্রায় হয় না—অত্যন্ত সঙ্গোপনে ধীরভাবে নিজ নিজ কার্যসিদ্ধির পথ খোঁজে। কেননা সবসময়েই তাদের প্রধান লক্ষ্য নিজেদের মহত্তর উদ্দেশ্য সাধন, অর্থাৎ জাপানী সভ্যতার প্রসার। ব্যক্তিবিশেষের বিনাশ উপলক্ষ মাত্র। মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারেও তাই প্রমাণ হয়। চ্যাং-সো-লিন জাপানী সভ্যতার প্রসারে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে সরাতে হল। অতঃপর জাপান নিজমূর্তি ধারণ করল। জাপানী সভ্যতার বাহন হয়ে এল দলে দলে সৈন্য। অদ্ভুত সব গুজবের সৃষ্টি হল লোকের মুখে মুখে এই দেব-বাহিনীর আগমনে। সারা দেশ উঠল আতঙ্কিত হয়ে। অসংখ্য লোকের প্রাণদণ্ডের, হাজার হাজার রুশ ও চীনাদের উপরে অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী সর্বত্র প্রচারিত হল লোকের কানাঘুষোয়। আম্‌লেটো ভেস্‌পা লিখছেন :

"১৯১২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি সকালে দেখলাম জাপানী অশ্বারোহী সৈন্য-

দলের ঘাঁটির অল্প দূরে দুটি চীনা তরুণীর মৃতদেহ পড়ে আছে। প্রথমে অত্যাচার করে পরে টুঁটি চেপে ওদের মারা হয়েছিল। একজন চীনা ভদ্রলোক সাহস করে গিয়ে পুলিশে খবর দেন যে আগের দিন রাত্রে সৈনিকেরা মেয়েদুটিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে উনি তা স্বচক্ষে দেখেছেন। ফলে ভদ্রলোকটি হলেন গ্রেপ্তার, তারপর তাঁর আর কোনো হদিশই পাওয়া গেল না।"

দেড় লক্ষ জাপানী সৈন্য, ১৮০০০ সশস্ত্র পুলিশ, ৪০০০ গুপ্তচর মাঞ্চুরিয়াতে হাজির হয়েছিল। এইভাবে জাপানীরা সমগ্র মাঞ্চুরিয়া দখল করে শাসনের ভার নিল পুরোপুরি নিজেদের হাতে। তাছাড়া ছিল এক লক্ষ 'পরামর্শদাতা'। শাসনযন্ত্রের প্রতি বিভাগকে একজন করে 'পরামর্শদাতা' পুষতে হয়েছিল।

এই 'পরামর্শদাতারা' বাস্তবিকই রহস্যময় জীব। নাকামুজা নামে এই জাতীয় একটি জীবের বিবরণ ভেস্‌পার বইতে পাওয়া যায়। সে সনাতনী রুশধর্ম গ্রহণ করেছিল আর তার কাজ ছিল চুলদাড়ি কামানো। কিন্তু নাপিতের পেশায় তার বিশেষ উৎসাহ ছিল না। দোকান একটা ছিল, কিন্তু তা একটি ছলমাত্র। তার আড়ালে আড়ালে চলত তার আসল ব্যবসা—আফিং প্রভৃতি মাদক জিনিস বিক্রি আর বেশ্যালয় পরিচালনা।...

জাপানী বর্বরতা প্রতিরোধের উপায়

জাপানের অমানুষিক অত্যাচার থেকে বড়লোক, গরীবলোক, পুরুষ বা নারী ...কারও রক্ষা পাবার উপায় নেই। ভেস্‌পা এদের সাহায্য করেও এদের হাতে যেভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন, তাতে বেশ বোঝা যায় যদি জাপানীরা অল্পদিনের জন্যেও এ দেশে আড্ডা গাড়ে তাহলে আমাদের কপালে কী আছে—তাদের পক্ষ সমর্থন করলেও। যাঁরা এখনো এই স্বপ্ন দেখছেন যে জাপানীরা এসে আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে আমাদের জীবনযাত্রার পথ আরো সুগম করে দেবে —আশা করি এর পর তাদের চোখ ফুটবে।

জাপানের আদিম বর্বরতা থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় সমগ্র দেশের লোকের সমবেত শক্তিতে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করা, যেভাবে চীনেরা করছে। যদি আমরা বদ্ধপরিকর হই যে জাপানের আসুরিক শক্তির কাছে হার মানব না, তাহলে আমরা নিশ্চয় সাফল্যলাভ করব ও চীন, সোভিয়েট রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার সহায়তায় জাপানী রণদানবকে পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্যে নির্মূল করতে পারব।

সংগ্রাম ও শিল্পী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

[১৯৪২ সালের ১৯-২০ ডিসেম্বর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনসটিটুট-এ অনুষ্ঠিত 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'র প্রথম সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একটি লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। হাওড়া থেকে শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অভিবাদন' নামে যে "একমাত্র দ্বিমাসিক" পত্রিকাটি প্রকাশিত হত, তার প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (পৌষ-মাঘ ১৩৪৯) "ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সৌজন্যে" সে-অভিভাষণ 'সংগ্রাম ও শিল্পী' নামে প্রবন্ধ হিসেবে ছাপা হয়।

তারাশঙ্কর ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাঙলার প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৪ সালের ১৫-১৭ জানুয়ারি 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'র যে-দ্বিতীয় সম্মেলন হয়, তারাশঙ্কর ছিলেন তার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশন হলে প্রথম দিন তিনি যে-ভাষণ দেন, 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় (২৬ জানুয়ারি ১৯৪৪) তার সারমর্মটি প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন: "আমরা মানব জাতির পক্ষে। যে শক্তি মানুষকে পদানত করার জন্ম উদ্যত হইয়াছে, ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ তারই বিরুদ্ধে। আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নানাভাবে ভাষা পাইয়াছে—দেশের এই সংকটও বাংলা সাহিত্যকে যথেষ্ট নাড়া দিয়াছে। আমরা ভুলি নাই যে যখন গত কয়েক মাস ধরিয়া লক্ষ লক্ষ লোক অন্নহীন ও বস্ত্রহীন অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তখন অনেকগুলি দেশী মিল কাপড় ও চাউলের ব্যবসায় লক্ষ লক্ষ টাকা সুপার ইনকাম ট্যাক্স দিয়াছে। এই সমস্ত মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহিত্যিক কর্তব্য পালন করিব আর এই সংকটের মধ্যে আমাদের দুঃস্থ দেশ কর্ম্মীকে সান্ত্বনা, আশা ও নূতন জীবনের ভরসা শুনাইব। অনাগত মুক্তির বাণী বহন করিবার ভার লইয়াছে এই লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ।" ১৯৪৫ সালের ৩-৮ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত তৃতীয় যে-সম্মেলনে 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' পুনরায় 'প্রগতি লেখক সংঘ' হয়, তারাশঙ্কর ছিলেন সেই সম্মেলন পরিচালনার জন্য নির্বাচিত সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য।

'অভিবাদন'-এর প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা থেকে আমরা ইতিহাসগত কারণে মূল্যবান তারাশঙ্করের দুষ্প্রাপ্য রচনাটি ঈষৎ সংক্ষেপিত আকারে বানান ও যতিচিহ্নের প্রয়োজনীয় সংশোধন সহ প্রকাশ করলাম।—সম্পাদক]

…তারপর অকস্মাৎ ইয়োরোপে ইটালির আবিসিনিয়া আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে আমি এক প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল মানুষের জীবনে বর্বরতার আর মনুষ্যত্বের এক টাগ অব ওয়ার আরম্ভ হয়ে গেল এই বিংশ শতাব্দীতে। মানুষ যখন সর্ব বর্বরতাকে সমাহিত করে বৃহত্তর কল্যাণের দিকে চলেছে ঠিক সেই সময়েই মানুষের আত্মস্বার্থপন্থী পদ্ধতি সকল মুখোশ খুলে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করে দিয়েছে। জার্মানিতে ইহুদি নির্যাতন দেখে শিউরে উঠলাম। ফ্রয়েড আইনস্টাইনের দুর্দশা ও অপমান, মেয়েদের অধিকার লোপ, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, চীনের বিরুদ্ধে জাপানের অভিযান দেখলাম। মনে মনে বার বার প্রশ্ন করেছিলাম—মানুষ কি এই সহ্য করবে, এক-এক সময় প্রত্যাশা করতাম—ওই ওই দেশের মানুষেই এই বর্বরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মনুষ্যত্বের এই চরম অপমানের অবসান করবে। তারপর আরম্ভ হল পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানির অভিযান। তখন সবচেয়ে দুঃখ হয়েছিল জার্মানির জনসাধারণের জন্যে। তাদের আজ সর্বস্ব অপহৃত হয়েছে বিনা যুদ্ধে, মাদকতায় মাতাল করে তাদের সব অপহরণ করেছে একদল স্বার্থান্ধ লোক। তারপরই লাগল ইংরেজের এবং ফরাসীদের সঙ্গে জার্মানির। বিস্মিত হই নি। ধীরে ধীরে যুদ্ধ প্রসারিত হল সমগ্র বিশ্বব্যাপী হয়ে। ফ্যাসিবাদীরা আক্রমণ করলে তাদের প্রাচীনতম শত্রু রাশিয়াকে। রাশিয়াকে বাদ দিয়ে সমগ্র বিশ্ব অধিকার করেও সে নিরাপদ নয়। কারণ মানবকল্যাণের সর্বোত্তম ধর্ম এক বিরাট মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে সেখানে। সেই তার সবচেয়ে বড় ভয়। অন্ধকার যে ভয় করে আলোকে, পাপ যে ঘৃণা করে পুণ্যকে—সেই ভয় সেই ঘৃণা তার রাশিয়ার ধর্মকে। এ দিকে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান পড়ল ঝাঁপ দিয়ে। সে আজ ভারতবর্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত।

ভারতবর্ষের জনশক্তি, তার নেতৃবৃন্দ, তার বুদ্ধিজীবীগণ তার সংবাদপত্র কোনো দিনই তার সত্য কর্তব্য করতে বিস্মৃত হয় নি। তার শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ফ্যাসিবাদের উদ্ভবকাল থেকেই ওই আদর্শকে হীন বলে ঘোষণা করে এসেছেন। ভারতের জাতীয় সংবাদপত্র ফ্যাসিবিরোধী নীতি এবং আদর্শকে

জনসাধারণের মধ্যে আন্তরিকতার সঙ্গে প্রচার করে এসেছেন। ভারতের জনসাধারণ, তার শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান, তার সংবাদপত্র, তার সাহিত্যিক, তার মনীষিবর্গ কেউই চায় না ফ্যাসিবাদী জার্মানিকে, জাপানকে অথবা ইটালিকে। কিন্তু তবু আমাদের সম্মুখে এক অদ্ভুত সমস্যা। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের দমননীতি, ভেদনীতি কূটনীতি ভারতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত জনশক্তির উদ্যত হাত পঙ্গু করে দিয়েছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান আজ বিপর্যস্ত, নেতারা বন্দী। উন্মত্ত জনসাধারণ সমগ্র দেশে তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছে —তার ফলে জনশক্তির ব্যর্থ অপচয় হয়ে চলেছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে।

আজ সেই একটি সংকটপূর্ণ মুহূর্তে বাঙলার এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতের প্রতি প্রদেশেই সাহিত্যিক এবং পণ্ডিতমণ্ডলী যে সংঘবদ্ধ হয়ে শুভ এবং নির্ভীক সত্যবাদী উচ্চারণে উদ্যত হয়েছেন, এতে যাঁরা সুখী আমি তাঁদেরই একজন।

প্রবাদ শুনে আসছি, পলাশির যুদ্ধের পূর্বে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল তাতে রানী ভবানী বলেছিলেন—রাঘব বোয়াল বিনাশের জন্য খাল কেটে কুমির এনে ঢুকিয়ো না। প্রবাদটা ঐতিহাসিক প্রমাণে সত্য হোক আর নাই হোক, কথা হিসাবে এত বড় সত্য আর নাই। সে দুর্মতি যদি কারও থাকে, তার সে মতির ধ্বংসই কামনা করি। তবে এটা ঠিক কথা, ভারতের জনসাধারণ একটা শিকল খসাবার জন্য আর-একটা শিকল পরতে চায় না এবং চাইবে না। ভারতের ইতিহাসে এই ভুলের বহু পুনরাবৃত্তি হয়েছে। সে-ভুলের মাশুল দিতে দিতে আবার সেই ভুল আমরা করব না। একদল লোক মুষ্টিমেয় হলেও আছে, যারা বলে—আমরা তো গোলামী করতে আছিই, গোলামী আমরা করব। হয় এর নয় ওর। তাদের আমি বলি ক্লীব। এই ক্লীব জাতির মধ্য হতে বিলুপ্ত হোক। এদেরই সমগোত্রীয় একদল সুবিধান্বেষী কৌশল-তান্ত্রিক আছে, তারা বলে—ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারছে। প্রদীপের নিচেই অন্ধকারের মতো এই অতি-বুদ্ধিমানদের বিষয়বুদ্ধির মধ্যে প্রকাণ্ড বোকামির ফাঁক রয়েছে, সেটা তারা বুঝতেই পারে না। ষাঁড়ের শত্রুকে বাঘে যদি মেরেই ফেলে তবে ষাঁড় নাচে কি আশ্বস্ত হয় কোন আনন্দে কোন আশ্বাসে? কারণ বাঘের চেয়ে বড় শত্রু ষাঁড়ের আর কে আছে? এই ফ্যাসিবাদের স্বরূপ তারা বোধ করি কল্পনা করতে পারে না। নির্মম ক্রূর স্বার্থান্ধ এক যূথবদ্ধ মানব-সম্প্রদায়। দৈহিক এবং সর্বপ্রকার আসুরিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ এক বিশেষ জাতি। অন্তরলোকে উগ্র স্বার্থবুদ্ধির হিংস্র ক্ষুধা। আসুরিক শক্তিতে হিংস্র ক্ষুধায় তারা সমস্ত পৃথিবীকে জয় করে পদানত করবে; তারা

হবে প্রভু, কর্তা; দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা; আর সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তাদের গোলামী করবে; যে ধারায় তারা চিন্তা করতে বলবে সেই ধারায় মানুষকে চিন্তা করতে হবে—যে-রীতি যে-নীতি তারা প্রবর্তন করবে সেই রীতি-নীতি অনুযায়ী সমাজকে চলতে হবে, সামরিক নিষ্ঠুর হিংস্র বিধিবিধানে তার ক্ষীণতম প্রতিবাদের দণ্ডবিধি নির্দিষ্ট হবে। মানুষের স্বাধীন চিন্তা, স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণময় সার্থকতার আকাঙ্ক্ষা, কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, এক কথায় সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের সাধনার পথ রুদ্ধ হবে। এই ফ্যাসিবাদের অধীনে যে সাহিত্য যে শিল্প রচিত হবে তার কথা চিন্তা করতে গেলে আমার মনে পড়ে জেলখানার সতরঞ্চির কথা, ছোবড়া-পাকানো দড়ির কথা; যার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে পাকে পাকে নির্যাতিত মানবাত্মার অভিশাপ। এমন কূট কৌশলে রচিত ধনবণ্টন-ব্যবস্থার উপর এদের নববিধান রচিত হবে যে, এক পুরুষ কি দু-পুরুষ পরে মানুষ আর কল্পনাই করতে পারবে না যে, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতায় তাদের অধিকার আছে। উন্নততর জীবন, বৃহত্তর কল্যাণ, মহত্তর কল্পনা, সুন্দরতর সম্ভাবনার সাধনার কথা মনে করতে তারা শিউরে উঠবে। এক কথায় মানুষের জীবনের সুদীর্ঘ গৌরবময় উর্দ্ধমুখী প্রেরণা এবং আত্মদানের যজ্ঞের বিরুদ্ধে এতবড় আসুরিক অভ্যুত্থান আর পৃথিবীর ইতিহাসে হয় নি। পঙ্গপাল আসে, একটা ঋতুর ফসল একদিনে ধ্বংস করে দিয়ে চলে যায়; বুনো কুকুরের দল তাদের পথে চলে, চলার পথের অধিবাসীদের টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে রক্ত মাংসে উদরপূর্তি করে চলে যায়, তারা থাকে না। নব-ঋতুতে আবার ক্ষেত্র শস্য-সমৃদ্ধ হয়। কুকুরের দল চলে গেলে, যারা থাকে তারা আবার সংহত হয়, শান্তি ফিরিয়ে আনে। কিন্তু এই ফ্যাসিবাদ যদি জয়ী হয়, তবে সে হবে পৃথিবীর মানুষের জীবন-ক্ষেত্রে পঙ্গপালের স্থায়ী স্থিতি। ফ্যাসিবাদের জীবননৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ বহু পণ্ডিতজনে করেছেন, করবেন। তাছাড়া মুষ্টিমেয় ক্লীব এবং সুবিধাবাদীদের যুক্তির প্রতিবাদে অধিক কথা বলার কোনো প্রয়োজনও আছে বলে মনে করি না। কিন্তু আজ ভারতবর্ষে যে-বিক্ষোভ উঠেছে, সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্রের ভ্রান্ত দম্ভভরা শাসন-পদ্ধতির প্রতিক্রিয়ায় সেই বিক্ষোভই একমাত্র অন্তরায় হয়ে উঠেছে জনশক্তির সংহতি গঠন এবং প্রেরণা উদ্বোধনের পথে। কেমন করে উন্মত্ত জনশক্তিকে তাণ্ডব থেকে সংহত করে আজ এই বিশ্বমানবের এবং মানবতার বিরুদ্ধবাদী ধ্বংসকামী আসুরিক শক্তির বিপক্ষে উদ্যত করা যায় সেই হয়েছে সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যার বিষয়।

এ বিষয়ে আমি এই সাহিত্যিক এবং শিল্পী সংঘেরই মুখের দিকে চেয়ে আছি আপনাদের কণ্ঠোচ্চারিত বাণীর সঙ্গে আমিও আমার কণ্ঠস্বর মিশিয়ে দেব। ভারতের জনগণকে বুঝতে হবে—এ সংগ্রাম শুধু তোমার মুক্তি-সংগ্রাম নয়, সমগ্র বিশ্বের জনগণের মুক্তিসংগ্রাম। এই সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য বাংলার মহাকবি যে-বাণী উচ্চারণ করে গিয়েছেন তা আজও আকাশে বাতাসে ধ্বনিত রয়েছে—তারই প্রতিধ্বনি আমাদের তুলতে হবে:

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

ফ্যাসিজমের চিরশত্রু রোমাঁ রোলাঁ

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

[প্রগতিশীল সাংবাদিক হিসেবে প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় ১৯৪১ সালে সাপ্তাহিক 'অরণি' প্রকাশিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যত 'অরণি'ই ছিল বাঙলার কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মতামত প্রচারের অঘোষিত মুখপত্র। বাঙলার প্রগতি সাহিত্যের আন্দোলন, শিল্পী ও সাহিত্যিকদে ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন, গণনাট্য আন্দোলন এবং ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর আন্দোলন…চল্লিশের দশকের বাঙলা সংস্কৃতির যুগান্তকারী এই পদক্ষেপগুলির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর 'অরণি'র পাতায় পাওয়া যাবে। বিজন ভট্টাচার্যর 'নবান্ন' ও সুকান্ত ভট্টাচার্যর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'অরণি'ই ছেপেছিল। অবশ্যই 'অরণি'রও নানা সীমাবদ্ধতা ছিল। কিন্তু এই পত্রিকার ইতিবাচক ভূমিকা বিস্মৃত হবার নয়।

এই পত্রিকায় 'কথাপ্রসঙ্গে' নামে একটি ফীচার খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। 'অনামী' ছদ্মনামে ফীচারটি লিখতেন স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য। তৎকালে তিনি শক্তিমান গল্পকার ও সাংবাদিক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। 'ছোট বড় মাঝারি' নামে তাঁর ন-টি গল্পের এক সংকলন চৈত্র ১৩৫৭ সনে 'সারস্বত লাইব্রেরী' থেকে প্রকাশিত হয় (দাম : দু-টাকা, পৃষ্ঠা : ৪ + ১১২, প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়)। 'অরণি'র ফীচারের কিছু লেখা 'পূরবী পাবলিশার্স' 'কথা প্রসঙ্গে' নামেই গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে (দাম : দেড় টাকা, পৃষ্ঠা : ৪ + ১৪৩, প্রকাশকাল দেওয়া নেই)। দুটি গ্রন্থই বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

স্বর্ণকমল 'অরণি' পত্রিকার সম্পাদনার কাজে সত্যেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। সেদিনের সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর ছিল নাড়ির যোগ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯৪৫ সালের ৩-৮ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে স্থির হয় 'ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' আগের মতোই আবার 'প্রগতি লেখক সংঘ' নামে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'র বাঙলা শাখা হিসেবে সক্রিয় থাকবে। প্রগতি লেখকদের এই তৃতীয় সম্মেলনে যে

নতুন কমিটি নির্বাচিত হয় তার সভাপতি ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, যুগ্মসম্পাদক : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য।
শেষ জীবনে 'সোভিয়েত দেশ' পত্রিকায় চাকরিসূত্রে স্বর্ণকমলকে দিল্লী থাকতে হয়। তাঁর মৌলিক রচনার সংখ্যাও কমে আসে।
নানা পত্র-পত্রিকায় ছড়ানো স্বর্ণকমলের রচনাগুলি আজ প্রায় বিস্মৃত। কিছু বা হারিয়েই গেছে। এখানে 'কথাপ্রসঙ্গে' গ্রন্থের একটি রচনার অংশ-বিশেষ প্রকাশিত হল। বানান ও যতিচিহ্নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক]

...মানব সভ্যতার এই মহা সংকটের দিনে এ প্রসঙ্গে আজ বন্দী রোলাঁর কথা বার বার মনে পড়ে। দুনিয়ার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সমাজের রোলাঁই প্রতিনিধি। রোলাঁই বাইরের জগতের সাহিত্যিক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম রুশ বিপ্লবের বন্দনা গেয়েছিলেন। বিপ্লবের পরেও যখন দেশে দেশে বুদ্ধিজীবীদের মুখে আর কলমে কটূক্তি ও কুযুক্তি বর্ষিত হচ্ছে—সোভিয়েত পরিকল্পনার কল্পিত অনাচার ও মনগড়া ব্যর্থতা নিয়ে যখন নানা দিকে বিদ্বেষ ও বিদ্রূপের ঝড় উঠেছে, রোলাঁ সেই মূঢ় আন্দোলনে তাঁর কণ্ঠ মেলাতে পারেন নি। রুশ বিপ্লবের অনিবার্য রক্তাক্ত অধ্যায় তাঁরও স্পর্শকাতর শিল্পী মনে অভিযোগের গাঁজলা তুলেছিল। কিন্তু রোলাঁ অকুণ্ঠ ভাষায় সকলকে সেদিন এই কথা জানাতে ভুল করেন নি : "One must live, first of all. Live, at any cost. One can restore afterwards the reasons for living, the eternal values. ...This new order is entirely blood-stained, entirely soiled, like the human fruit that is torn from the womb of its mother. Inspite of the disgust... I go to the infant, I pick up the newborn, he is the only hope, the wretched hope of humanity. It is yours..."

* * * *

এই শিশু সোভিয়েত যাতে করে শক্তিশালী হয়ে উঠতে না পারে তার জন্যে দেশে দেশে গুপ্ত চক্রান্ত শুরু হয়ে গেল। এই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের নানা দিকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেক লেখক অনেক সাংবাদিক পুঁজিপতিদের অনুচরের দলে নাম লিখিয়েছিলেন। শঙ্কিত রোলাঁ সকলকে, বিশেষ করে

লেখক সমাজকে, সময় থাকতে সাবধান হতে বললেন, "…throughout the world an insolent mobilisation of public opinion against revolutionary Russia, under the daily excitation of a Press attached to international commerce,…is frantically endeavouring to blow out the inconvenient torch of the Russian Revolution." সেই সাবধানবাণী সেদিন অনেকে শুনেছিলেন, অনেকে আবার শুনেও শোনেন নি—অনেকে সতর্ক হয়েছিলেন। আবার অনেকে তা গ্রাহ্যই করেন নি।

ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের পুঁজিবাদীদের সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়ে, জনসাধারণের অজ্ঞতা ও বুদ্ধিজীবীদের উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে ধীরে ধীরে ইয়োরোপে ফ্যাসিজম শক্ত শিকড় গেড়ে বসল। রোলাঁ প্রমাদ গণলেন। তাঁর অশ্রান্ত লেখনী দিনের পর দিন জানাতে থাকে "…fascism is installed everywhere in Europe, either victoriously, axe in hand —or, where it is not seen, like a snake in the grass."

* * * *

প্রতি রাষ্ট্রে "গুপ্ত সর্প গূঢ় ফণা" রোঁলা পরিষ্কার বুঝেছিলেন, বিপদ ঘনিয়ে আসছে। সে বিপদ একলা সোভিয়েতের নয়, সে বিপদ সারা শোষিত দুনিয়ার —সে সংকট মানুষের সভ্যতার ও সংস্কৃতির। এই সর্বনাশ প্রাণ দিয়ে রুখতে হবে—রুখতে হলে সবার সঙ্গে সাহিত্যিককে, চিন্তাবীরকে, প্রতিভাকেও সামনে এসে দাঁড়াতে হবে। রোলাঁ তাঁর সংকল্প স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করলেন: "As for me, here is my hand. If the U. S. S. R. is threatened, whoever her enemies may be, I range myself by her side. Europe, if you start the monstrous struggle, I will march against you, against your despotism, and your rapacity, for my brethren of India, of Indo-China, of China and of every oppressed and exploited nation."

রোলাঁর কাছে সোভিয়েতের কথায় ভারতের, চীনের, ইন্দোচীনের, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের, পরপদানত সকলেরই জাতীয় স্বার্থের কথা অঙ্গাঙ্গিভাবে এসে যায়। এশিয়ায় ও আফ্রিকায় অবাধ শাসন ও শোষণ কায়েম রাখতে গেলে ইয়োরোপ ও আমেরিকার মূলধনতন্ত্রের পক্ষে এবং ইয়োরোপ-আমেরিকার

'সর্দার-পোড়ো' জাপানের কাছে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে "inconvenient torch"। কৃষক ও শ্রমিকের এই একমাত্র মশালের ক্রমবর্ধমান শিখায় আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সব ধাপ্পা সব জারিজুরি দিনের মতো পরিষ্কার হয়ে পড়ছিল। দুনিয়ার সকল দেশের জনগণের সেই ভরসার দুর্গ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র আজ বিপন্ন। সোভিয়েত-জার্মান সংঘর্ষের ফলাফলের সঙ্গে ভারতের ইষ্টানিষ্টের কী সম্পর্ক রয়েছে, সে কথা ভারত-বন্ধু রোলাঁ বহু আগে বুঝে বুঝিয়ে গেছেন। আমার হাতের কাছে এখন টেবিলের উপর রোলাঁর *'I Will Not Rest'*। এই গ্রন্থ কেবল রোলাঁরই ব্যক্তিগত মানসজীবনের দ্বন্দ্বদোলার ইতিহাস নয়, শুধু তাঁরই ব্যক্তিগত জীবনের দুরূহ প্রশ্নাবলীর মীমাংসা-দর্শন ওতে লিপিবদ্ধ নয়—*'I Will Not Rest'* পৃথিবীর যত মুক্তিকামী কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিকদের সংকটকালীন ইতিকর্তব্য নির্ধারণের একখানা সুন্দর 'গাইড'।

* * * *

রোলাঁর সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব বহু সালের। মহাত্মা গান্ধী, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের চরিতকথা রচয়িতা হিসাবে আমাদের কাছে তাঁর এক পরিচয়। আবার *'I Will Not Rest'*-এ আমরা তাঁর আর একটা দিকের পরিচয় পাই। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের ধর্মঘটে কোন বছর ক' হাজার মজুর যোগদান করেছিল, গিরনি কামগড় ইউনিয়ন গঠিত হল কবে এবং কাদের চেষ্টায়, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় কত লক্ষ টাকার শ্রাদ্ধ করে কতদিনে কী রহস্য উদ্‌ঘাটিত হল তার ইতিহাস—ভারতে ব্রিটিশ শাসনে পুঞ্জীভূত কেলেঙ্কারি, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কত তথ্য কত না খুঁটিনাটি দূরে থেকেও রোলাঁর যেন নখদর্পণে। শুধু জানার জন্যেই জানা নয়। ভারতের জনশক্তির ধূমায়িত বহ্নি-বেদনাকে দরদী রোমাঁ রোলাঁ অভিনন্দিত করেছেন—উল্লসিত হয়েছেন পিছিয়ে থাকা ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের সুনিশ্চিত সম্ভাবনায়।

সেই ভারতবন্ধু আজ রুদ্ধকণ্ঠ। নাৎসি দস্যুহাতে বন্দী। অথচ ভারতে আমরা কেউ বড় একটা দুঃখপ্রকাশও করলাম না—প্রতিবাদসূচক মন্তব্য বা প্রবন্ধও কোথাও একটা চোখে পড়ল না। কেন?

যাঁরা একদিন এ দেশে রোলাঁকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে সেই সুযোগে নিজেরাই পাঠক সমাজের কাছে সুপরিচিত হয়েছিলেন, যে-সব সাময়িক পত্রিকা মাসের পর মাস রোলাঁর লেখা বুকে নিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করে সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত দু-পয়সা লাভও করেছেন, রোলাঁ প্রসঙ্গে যে অভিজাত

মহল কথায় কথায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠে নিজেদের 'কালচার'-এর পরিচয় দিতেন, তাঁরা সকলেই একে একে রোলাঁ সম্পর্কে রহস্যময় তূষ্ণীভাবের আশ্রয় নিয়েছেন। বর্তমান মহাযুদ্ধ বাধার বহু আগে—১৯৩৩/৩৪ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে রোমাঁ রোলাঁ ভারতে তাঁর সমাদরের প্লাটফর্ম প্রায় সব কয়টিই হারিয়ে ফেলেছেন। এর কারণ কী? রোলাঁ আর সে রোলাঁ নেই—আগের মতো তাঁর ভারতীয় বন্ধুদের নিজেদের মনের মতোটি নেই, সেই অপরাধে? ভারতের বন্ধু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেরও অকৃত্রিম বন্ধু, তার অকুণ্ঠ সমর্থক তিনি। রোমাঁ রোলাঁর এতকালের ভারত-হিতৈষণার তাই কি এই সকৃতজ্ঞ প্রতিদান?

* * * *

ভারতবন্ধু রোলাঁকে তাঁর ভারতের প্রাক্তন বন্ধুরা ভুলতে চাইলেও শোষিত ভারত তাঁকে ভুলবে না। তারা রোঁলার উদার উদাত্ত কণ্ঠে এগিয়ে চলার বাণী শুনেছে: "Life will be nothing to me if it is not movement —straight ahead, of course! And that is why I am with the peoples and classes who are making out its course for the river of humanity, with the masses of the organised proletarian workers and their Union of Soviet Republics. They are being carried forward by the irresistible surge of historical revolution. The rest of the army will follow—though, it may be, at a distance and with desertions and withdrawals more than once, . . . The marching column never stops."

ধনতন্ত্রের ফ্যাসিস্ট মূর্তি

সরোজ আচার্য

[প্রখ্যাত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী সরোজ আচার্যর একদা বহুল পঠিত গ্রন্থ 'মার্কসীয় যুক্তিবিজ্ঞান' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে প্রকাশিত হয়। গোপাল হালদার লিখেছেন "জ্ঞান, কর্ম ও আবেগকে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে এই দিকে আর দ্বিতীয় কোনো বই—অন্ততঃ বাঙলায়—আমাদের জানা নেই।"
'মার্কসীয় যুক্তিবিজ্ঞান' দীর্ঘকাল ছাপা ছিল না। সম্প্রতি 'গ্রন্থায়তন' প্রকাশনী বইটি পুনঃপ্রকাশ করেছেন। গোপাল হালদার এই নতুন সংস্করণের ভূমিকায় সরোজ আচার্য প্রসঙ্গে লিখেছেন "···আজ প্রায় ছয় বৎসর আমরা তাকে হারিয়েছি।
"···একমাত্র দু-চারখানি বিশিষ্ট গ্রন্থের মধ্য দিয়ে সেই স্বচ্ছ সমুজ্জ্বল মনীষা আংশিক প্রকাশের অবকাশ লাভ করেছিল। আর ঠিক তাঁর অবাধ আত্মপ্রকাশের সুযোগ সমাগত হতে না হতেই তিনি বিদায় গ্রহণ করেন। সেই বুদ্ধিদীপ্ত জীবন-দ্রষ্টার ও সরস সাহিত্য-স্রষ্টার পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে গেল।"
'ধনতন্ত্রের ফাশিস্ট মূর্তি' অধ্যায়টি 'মার্কসীয় যুক্তিবিজ্ঞান' গ্রন্থ থেকে পুনঃপ্রকাশিত হল। বানান ও যতিচিহ্নে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে।
—সম্পাদক]

বণিক, শিল্পপতি, মূলধনী—ধনতন্ত্রের তিন মূর্তিরই মোক্ষ হইল মুনাফার রাজত্ব বিস্তারে। কিন্তু ইহার বাধাও অনেক। প্রথমত ধনতন্ত্রের ভিতরে ধনিক গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিরোধ থাকে। সকল দেশের ধনতন্ত্রের উন্নতি সমান তালে চলে না। কাজেই কোনো কোনো দেশের ধনিকগোষ্ঠী মুনাফা শিকারের প্রতিযোগিতায় পিছনে পড়িয়া থাকে। ইহাদের অগ্রগতির বাধা দু'দিকে। প্রথমত, শোষণের বিরুদ্ধে নিঃস্ব মজুরশ্রেণীর প্রতিবাদ, বিদ্রোহ এবং সংঘবদ্ধ প্রতিরোধশক্তি বাড়িতে থাকে। দ্বিতীয়ত, অন্য দেশের প্রতিদ্বন্দ্বী ধনিকগোষ্ঠীরা দুনিয়ার ব্যবসার বাজার দখল করিয়া ফেলিতে থাকে। ধনতন্ত্রের এই সংকটে দেশে দেশে ধনিকগোষ্ঠীগুলির মধ্যে দুনিয়ার বাজার ভাগবাঁটোয়ারা নিয়া কাড়াকাড়ি মারামারি শুরু হয়। জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখল, ইটালির আবিসিনিয়া

দখল, নাৎসি জার্মানির উপনিবেশ দাবি—এই সকলই নিজেদের দেশের ধনিক-গোষ্ঠীর মুনাফা শিকারের পথ পরিষ্কারের জন্য। কিন্তু অন্য দেশের ধনিকেরা যাহারা দুনিয়ার বাজার ভাগবাঁটোয়ারা করিয়া নিয়াছে, তাহারাও চুপ করিয়া থাকে না। কাজেই দেখা দেয় ধনতন্ত্রের অন্তর্বিরোধ, সংকট, প্রতিযোগিতা, যুদ্ধবিগ্রহ। কোনো দেশের ধনতন্ত্র যখন এইরূপ সংকটে ভাঙিয়া পড়িতে থাকে তখন দেখা দেয় ধনতন্ত্রের ফ্যাসিস্ট মূর্তি। ধনিকেরা প্রথমে চেষ্টা করে দেশের শোষণব্যবস্থাকে শক্তভাবে চালু রাখিতে। সেজন্য দরকার হয় শোষণের বিরুদ্ধে সমস্ত রকম প্রতিবাদের মুখ বন্ধ করা। ছল-চাতুরি, গুণ্ডামী ও নিষ্ঠুর জুলুমবাজী দ্বারা ধনিকগোষ্ঠীগুলি শোষিত শ্রেণীগুলিকে দাবাইয়া ফেলে। দীর্ঘ শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়া নিঃস্ব মজুরশ্রেণী যে সকল গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করিয়াছিল, তাহা সমস্তই কাড়িয়া নেওয়া হয়। এইভাবে শোষণব্যবস্থার সংকট দূর করিবার জন্য ধনিকেরা গণতন্ত্রের স্থানে নির্মম জুলুমতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। ধনতন্ত্রের ফাসিস্ট বন্দোবস্তে শোষিত শ্রেণীগুলি হুকুম তামিলের কলে পরিণত হয়। যেখানেই ধনতন্ত্রের সংকট চরমে পৌছায়, সেখানেই ধনিকেরা গণতন্ত্রের মুখোশ ফেলিয়া দিয়া জনসাধারণকে মুনাফা শিকারযন্ত্রের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। একদিকে দেশের ভিতরে নির্জলা জুলুমতন্ত্র চালু করিয়া শোষণব্যবস্থা শক্ত করা হয়, অন্য দিকে বিদেশের ধনিকগোষ্ঠীর সঙ্গে বাজার দখলের লড়াই করিবার জন্য প্রস্তুতি চলিতে থাকে। ফ্যাসিজমের চেষ্টা হয় পররাজ্য দখল এবং বিজিত দেশগুলিতে ফ্যাসিস্ট পদ্ধতিতে শোষণব্যবস্থা প্রচলন করা। সাম্রাজ্যবাদের মতো ফ্যাসিজমও দুনিয়ার বাজার দখল করিতে অভিযান শুরু করে।

এক হিসাবে ফ্যাসিজম হইল ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত পরিণতি। যন্ত্র এবং মজুর-শোষণের অবাধ বন্দোবস্ত হইল ফ্যাসিজম। জার্মানিতে নাৎসি দলের যখন উন্নতির শুরু, তখন মূলধনী ও শিল্পপতিরা নাৎসিদের সমর্থনে প্রচুর টাকা ঢালিয়েছে। যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব পর্যন্ত দেশ-বিদেশের ধনিকগোষ্ঠীরা নাৎসিদের কায়দা-কৌশলকে বাহবা দিয়াছে। যদিও অন্য দেশের ধনিকগোষ্ঠীদের ভয়ের কারণ ছিল, নাৎসিরা জার্মানিতে ক্ষমতা দখল করিলে দুনিয়ার বাজার দখলের জন্য হাত বাড়াইবে ইহা জানাই ছিল। তবুও অন্য দেশের ধনিকেরা অবাধ মজুর-শোষণের নূতন নাৎসি কায়দা দেখিয়া গদগদ হইয়াছিল। নাৎসি কায়দা নকল করিবার ইচ্ছা এক কথা; কিন্তু তাই বলিয়া নাৎসিদের দুনিয়া দখলের প্ল্যান মানিয়া নিতে অন্য দেশের ধনিকগোষ্ঠীগুলি সহজে রাজী হইবে কেন? ইহা ছাড়া

অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশে, যেমন ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে সাম্রাজ্যবাদের যুগেও সাধারণ মানুষদের কতকগুলি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী ছিল। নাৎসি নববিধানের সঙ্গে এই গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের ধরনধারণ, দৃষ্টিভঙ্গির আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কাজেই ফ্যাসিজমের সঙ্গে সাবেকী ধনতন্ত্রগুলির সংঘর্ষ ঘটিল দুই কারণে। একটি স্বার্থগত, অন্যটি আদর্শগত। অন্য দেশের ধনিকগোষ্ঠীগুলি শেষ পর্যন্ত নাৎসিদের দুনিয়া দখলের প্ল্যান ভয়ের চোখে দেখিল। আবার এইসব দেশের জনসাধারণ নাৎসি নববিধানে ধনতন্ত্রের চরম পাশবিক ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করিতে দৃঢ় সংকল্প নিল। ধনিকগোষ্ঠীর সংকীর্ণ স্বার্থ এবং দুনিয়ার জনগণের স্বার্থ দুই-ই ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধশক্তি প্রবল করিল।

ইহা ছাড়াও নাৎসি ফ্যাসিস্টতন্ত্রের আর-একটি দুর্দমনীয় শত্রু আছে। ফ্যাসিজমের লক্ষ্য হইল সারা পৃথিবীতে শোষিত শ্রেণীগুলিকে চিরকালের মতো গোলামে পরিণত করিয়া ধনিক-রাজ চিরস্থায়ী করা। পৃথিবীর এক প্রান্তেও যদি কোথায়ও শোষিত জনসাধারণের স্বাধীনতা থাকে, তাহা হইলেই ফ্যাসিজমের বিপদ। কারণ কোনোখানে যদি শোষিত জনগণের স্বাধীনতা-লাভের বিন্দুমাত্র আশা, প্রেরণা বা সুযোগ থাকে—তাহা হইলে দেশের শোষিত শ্রেণীগুলি ধনতন্ত্রের জুলমবাজী ভাঙিতে চেষ্টা করিবেই। সেই জন্য ফ্যাসিজমের সংকল্প হইল সারা পৃথিবীর জনসাধারণের আশাভরসা ও আদর্শ সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়নের ধ্বংসসাধন। সারা পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক বেড়াজালের মধ্যেও জনগণের সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র উন্নত সমাজব্যবস্থা চালু করিয়াছে, এই দৃষ্টান্ত প্রতি মুহূর্তে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর ধিক্কার প্রবল করিয়াছে, বৈপ্লবিক চেতনা দৃঢ় করিয়াছে। নাৎসি ফ্যাসিস্টতন্ত্রের পণ সেইজন্য সমাজতন্ত্রের সকল দৃষ্টান্তকে পৃথিবী হইতে মুছিয়া ফেলা। গত ত্রিশ বৎসরে দেশ-বিদেশের ধনিক-গোষ্ঠীগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করিবার জন্য কম চেষ্টা করে নাই। এমন কি স্বদেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়াও ইংলণ্ড ও আমেরিকার মূলধনীরা হিটলারকে বাড়িতে দিয়াছে এই আশায় যে, নাৎসিরা সমাজতন্ত্রের শেষ চিহ্নটি পর্যন্ত মুছিয়া ফেলিয়া ধনতন্ত্রকে সংকটের হাত হইতে বাঁচাইবে। হিটলার ও মুসোলিনি গিয়াছে; এখন আবার ট্রুম্যান, চার্চিল, বেভিন কোম্পানি বিশেষত আমেরিকার নেতৃবর্গ সারা পৃথিবীতে গণবিপ্লবের আতঙ্কে অস্থির হইয়াছে; গ্রীসে, তুরস্কে, ইরানে, ইন্দোচীনে ও জাপানে কোটি কোটি টাকা ঢালিতেছে, জনগণের মঙ্গলের জন্য নয়, গণবিপ্লব দমনের জন্য।

ফ্রণ্ট থেকে চিঠি

রালফ ফকস

[রালফ ফকস এই শতাব্দীর সমান বয়সী। ১৯০০ সালে ইংলণ্ডের এক সম্পন্ন পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করার পর মসৃণ ও নিরুদ্বিগ্ন জীবনের পথে পা না বাড়িয়ে রালফ ফকস গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ড্রেস রিহার্সাল-রূপে অভিহিত স্পেনের গৃহযুদ্ধ শুরু হতেই তিনি নানা দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক ও মানুষের মতো মানুষদের সমবায়ে গঠিত আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে নাম লেখান। সেখানে তিনি ইংরেজ সৈনিকদের রাজনৈতিক কমিশার হিসেবে কাজ করেন। কর্তব্যরত অবস্থায়ই তিনি স্পেনের আন্দালুসিয়ায় লোপেরা গ্রামের কাছে এক যুদ্ধে ফ্যাসিস্ট বাহিনীর মেশিনগানের গুলিতে নিহত হন।
সাহিত্যিক হিসেবে রালফ ফকস আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী। বাঙলা সহ পৃথিবীর নানা ভাষায় তাঁর বহু রচনা অনূদিত হয়েছে।
স্পেন থেকে মৃত্যুর কয়েকদিন আগে লেখা তাঁর দুটি চিঠির অনুবাদ প্রকাশ করা হল।— সম্পাদক]

ম্যালবাসেত্ই, ১১ ডিসেম্বর ১৯৩৬

যে কমরেড ছুটিতে যাচ্ছেন, তাঁর মারফত তোমাকে এই চিঠি পাঠাচ্ছি। এ এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। দুটি গাড়িতে করে আমরা প্যারিস থেকে রওনা হলাম, আর ফ্রান্সের ভেতরে সারাটা পথ লোকেরা মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছে, এমনকি আমরা যে আগে নমস্কার করব তারও অপেক্ষা করে নি। ওরা জানত আমরা কোথায় চলেছি, তবু বলেছে, "সুখে থেকো।" মাদ্রিদ প্রতিরোধ সারা ইয়োরোপকে রক্ষা করেছে। ফ্রান্সের মেজাজ ক-সপ্তাহ আগে যা ছিল এখন তা থেকে একেবারে অন্য রকম।

বার্সেলোনায় আমরা শহরের মধ্য দিয়ে মার্চ করে গেলাম, গেলাম পার্টি ও এনার্কিস্টদের সদর দপ্তরের পাশ দিয়ে। লোকেরা সর্বত্রই আমাদের অভিনন্দন জানাল…

আমাদের এই ছোট্ট সেনাদলে সব জাতির লোকই আছে, এদের মধ্যে

ফরাসী, বেলজিয়ান, জার্মান ও পোলই বেশি। পোলাণ্ড থেকে আসা য়ুক্রেনীয়-দের সঙ্গে কথা বললাম। এরা প্রায় সারা জীবনই সৈনিক। এবারে একটা ন্যায়সঙ্গত ব্যাপারের জন্য লড়াই করার সুযোগ পেয়ে খুব খুশী।

বহু বছর যাবৎই উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য 'লীগ অব নেশনস'-এর সেনাদলের কথা বলছে। ছাখো, শান্তি আর স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার প্রথম সেনাদল আমরাই গড়লাম। বর্তমানে, ব্রিগেডের সদর-দপ্তরে আমি একজন পদস্থ কর্মী। কিন্তু কাজ না পেয়ে হাঁপিয়ে উঠেছি, এরা বলছে সব ইংরেজ এখানে এসে পড়লেই আমি রাজনৈতিক কমিশার হিসাবে যোগ দেব।

এ্যালবাসেত্ ই. ১৮ ডিসেম্বর

ইংরেজদের ঘাঁটিতে রাজনৈতিক কমিশার হিসেবে আমি এখন অনেক বেশি আনন্দদায়ক কাজ করছি। আমাদের বাহিনীতে যোগ দিতে যাঁরা আসছেন তাঁদের রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে শিক্ষিত করে তোলাই আমার কাজ, এমনি কাজই আমি চাই। কিন্তু এখানে সবকিছুই ভীষণ এলোমেলো—খুব বড় জোর পাঁচ কি ছ'ঘণ্টার ঘুম, আর সুযোগ আদৌ যদি জোটে তাহলেই খাওয়া।

তা সত্ত্বেও, যখন আমাদের লোকদের সত্যি একাজে রপ্ত করে তুলতে পারি, তখন এটা এমন একটা কাজ হয়ে ওঠে যা আমরা, আমাদের কেউই, জীবনে কখনো করি নি। যেসব ইংরেজ যাচ্ছে আমি একধারে তাদের ধাত্রী, মাতা, শিক্ষক এবং অধিনায়ক—আর এর জন্য যথেষ্ট খাটতে হয়। আমাদের ফ্রন্টে যেতে এখনো কিছু দেরি আছে।

অনুবাদ : সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

ক্রিস্টোফার কডওয়েল

জন স্ট্যাচি

[স্পেনের গৃহযুদ্ধে আন্তর্জাতিক বাহিনীর সদস্য প্রখ্যাত ব্রিটিশ কমিউনিস্ট ও তরুণ বুদ্ধিজীবী ক্রিস্টোফার কডওয়েল (আসল নাম ক্রিস্টোফার সেণ্ট জন স্প্রিগ) ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭ সালে মাত্র উনত্রিশ বছর বয়েসে স্পেনের জারামা নদীতীরের কাছাকাছি ছোট একটি পাহাড়ের ঘাঁটিরক্ষার সংগ্রামে বীরের মৃত্যু বরণ করেন।
কডওয়েলের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ ***Studies In a Dying Culture*** ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়। জন স্ট্র্যাচি সেই বইয়ের একটি ভূমিকা লেখেন। এখানে তার অংশবিশেষের বাঙলা তরজমা প্রকাশিত হল।—সম্পাদক]

"সকলকে বলি, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার মূল্য আমার কাছে কতখানি। স্পেনের গণবাহিনীর কাছে আমাদের সাহায্যের মূল্য অনেক। তাদের আজকের সংগ্রাম নিশ্চয়ই কাল হবে আমাদের সংগ্রাম, বিশেষ করে তারা যদি অকৃতকার্য হয়। এই বিশ্বাসই আমাকে কর্তব্য নির্ণয়ের নিশানা দিয়েছে।"

আন্তর্জাতিক বাহিনীর ব্রিটিশ দলে যোগ দেবার সপক্ষে, এই পুস্তকের লেখকের (কডওয়েলের—অনুবাদক) ছিল এই বক্তব্য। ১৯৩৬ সালের ১১ ডিসেম্বর সে বাহিনীভুক্ত হয়।

১৯৩৭-এর ১২ ফেব্রুয়ারির অপরাহ্ণে, ডাল্‌স্টন উপজাতীয় এক সর্দারের নেতৃত্বে, মেশিনগান বিভাগের কোনো এক ভূমিকায়, জারামা নদীর লাগোয়া একটি ছোট পাহাড় রক্ষার লড়াইয়ে সে নিহত হয়।

"...গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার মূল্য আমার কাছে কতখানি।" কডওয়েল যে ছিলেন কমিউনিস্ট এবং অনেকেরই বিশ্বাস কমিউনিস্টরা গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার শত্রু। তাদের ধারণা যে-কোনও কমিউনিস্ট যখন গণতন্ত্র বা স্বাধীনতার প্রতি তার আনুগত্যের কথা বলে, সেটা তার ধাপ্পা। কিন্তু এই তো এমন একজন কমিউনিস্ট, যে শুধু গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রতি তার আনুগত্যের কথা ঘোষণা করেই ক্ষান্ত থাকে নি বা সম্প্রতি মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের মতো একজন যেমন

গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে নিজের জান কবুলের কথা উচ্চারণ করেই বসে থাকেন তেমনটি না করে যে নাকি গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে সত্যি সত্যিই আপন প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।

অবশ্যই একটা খটকা জাগে এখানে! এরা কি শুধু রাজনৈতিক চালবাজির জন্যই লড়ছে এবং মরছে? এরা কি ফ্যাসিস্ট আক্রমণের প্রতিরোধে রুখে দাঁড়িয়েছে; বিজ্ঞানের সর্বাত্মক বিধ্বংসী শক্তিতে বলীয়ান এই নয়া বর্বরতার থাবার মুখোমুখি কি এরা দাঁড়িয়েছে; কডওয়েলের হত্যাকারী জার্মান ও ইতালীয়ান হানাদার বিমানবহরের আচ্ছাদনের আড়ালে যুদ্ধোন্মাদ পেশাদার মুর উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে এরা লড়ছে কি; যে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতায় সত্যিই এদের আস্থা নেই তারই স্বার্থে এরা কি ঘরদুয়ার ছেড়ে এত কিছু করছে?[১] তথাপি কডওয়েল ছিল একজন কমিউনিস্ট; এবং একজন কমিউনিস্ট, যে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার রক্ষায় প্রাণ আহুতি দিয়েছে।

এলিজাবেথীয়দের কাছে মৃত্যু ছিল মহান। সম্ভবত কডওয়েলের মৃত্যু এবং লণ্ডন ও গ্লাসগো ও মিডল্‌স্‌ব্রো ও কারডিফ থেকে যারা গিয়েছিল—ওরই সঙ্গে যারা স্পেনে মৃত্যুবরণ করেছে—তাদের মৃত্যুও তেমনি মহান; এর ফলে ব্রিটেনের মানুষ এইটে হৃদয়ঙ্গম করতে শুরু করবে যে কেন কমিউনিস্টরা লড়াই

১. তার মৃত্যুঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি:
"প্রথম দিন স্প্রিগের (কডওয়েল তার লেখক-জীবনের ছদ্মনাম) দল এক পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান করছিল। চতুর্দিক থেকে ওদের অবস্থা ছিল সঙ্গিন—প্রথমত কামানের গোলাবৃষ্টি, পরে বিমানবহর থেকে মেশিনগানের গুলি এবং অতঃপর মাটির ওপর থেকেই মেশিনগানের আক্রমণ। তারপর মুরবাহিনী বিপুল সংখ্যায় পাহাড় ঘিরে আক্রমণ জোড়ে এবং যেহেতু আমাদের সঙ্গীদের তখন আর অল্পই অবশিষ্ট ছিল যাদের মধ্যে স্প্রিগ তখনো অমিতবিক্রমে তার মেশিনগান নিয়ে লড়াইয়ে অবিচল আছে, সেই অবস্থায় আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ—যিনি ছিলেন একজন ডালসটন উপজাতীয় সর্দার—আমাদের হাত গুটিয়ে নেবার আদেশ দিলেন।
পরে পিছু হটবার সময় আহত এক সাথীর মুখে স্প্রিগের কথা শুনি। ওকে শেষ যখন দেখা যায়, তখনও সে মেশিনগান নিয়ে মাত্র ত্রিশ গজ দূরে অগ্রগামী মুরবাহিনীকে রুখে তার সাথীদের পলায়নের পথ মুক্ত রাখছে। জীবিত অবস্থায় সে পাহাড়ের দখল আদৌ ছাড়ে নি এবং কখনো যদি এমন মানুষ কেউ থাকে যে তার কমরেডদের জীবন রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে, তাহলে সেই মানুষ হল স্প্রিগ।"

করে এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্ম প্রাণ দেয় ; কেননা সকল সন্দেহের উর্ধ্বে রক্তের স্বাক্ষর ব্যতিরেকে আর কোনো কিছুতেই তাদের আন্তরিকতায় লোকের বিশ্বাস আসত না।

স্বীয় বিশ্বাসের জন্ম মৃত্যুবরণের চাইতেও বেশি কিছু কডওয়েল করে গিয়েছে। কেননা সেই সব বিশ্বাস নিয়ে সে উনত্রিশ বৎসর জীবনযাপন করেছে। এবং সেই সময়টা জুড়ে সে তার জীবনে ভরে তুলেছিল এক উজ্জ্বল কর্মকাণ্ড। যে বইগুলি সে লিখে গেছে তার সংখ্যা বিস্ময়কর।···

আমাদের মনে ভেসে ওঠে সৃজনী-প্রতিভায় ভরপুর এক তরুণের ছবি ; এমন এক তরুণ যে বন্যার মতো মেলে ধরেছে তার সৃষ্টিপ্রবাহ—তার মধ্যে আছে ভালো, মন্দ এবং গতানুগতিক ; এমন এক তরুণ যে বিপুল সম্ভাবনার সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যসূচক এবং সুদুর্লভ লক্ষণাবলীর অন্যতম যে প্রাচুর্যপূর্ণতা, তার দ্বারা চিহ্নিত ছিল। সে ছিল এমন এক তরুণ যে প্রাণপ্রাচুর্যের উত্তাপে কেবল নিজের হাত দুটি সেঁকেই ক্ষান্ত হয় নি, পরন্তু জীবন-অগ্নির শিখাগুলিকে প্রবল আবেগে উদ্দীপিত করেছে ; এমন এক তরুণ যার সবকিছুতে উৎসাহ ছিল—নভশ্চরণ থেকে শুরু করে কবিতা পর্যন্ত, গোয়েন্দাকাহিনী পর্যন্ত, কোয়াণ্টাম মেকানিকস পর্যন্ত, হেগেলীয় দর্শন পর্যন্ত, প্রেম পর্যন্ত, মনঃসমীক্ষণ পর্যন্ত এমনি তার অনুভূতির বিস্তার যে এর সবকিছু সম্বন্ধেই তার কিছু না কিছু বক্তব্য ছিল নিতান্ত সাবলীল।

বিশের কোঠার বছরগুলিতে মানুষ এমনি হলেই শোভা পায়। একথা সত্য যে তেমন কোনো মানুষ নভশ্চরণ, প্রেম বা কোয়াণ্টাম মেকানিকস বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো বক্তব্য হাজির করবে এটা খুব একটা প্রত্যাশিত নয়।[১] সেই মানুষ যখন তিরিশের কোঠায় পা দেবার উপক্রম করে তখন অবশ্য তার সর্বগ্রাসী মনোযোগ বিশেষ কোনো একটি, বা হয়তো দুটি, বিশেষভাবে নির্বাচিত ক্ষেত্রে গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট হয় ; এবং সেটা হবে তুলনাতীতভাবে তার যাযাবরী দশক থেকে অনেক গুণ বেশি ঐশ্বর্যপূর্ণ।

কডওয়েল উনত্রিশ বছরে মাত্র পা দিয়েছিল, তখনো সে আবিষ্কার করছিল নিজেকে ; তার শেষের রচনাগুলির মধ্যে প্রতিভাত হচ্ছে পরিমিতিবোধের তীক্ষ্ণ সচেতনতা, আলোকপাতের পারঙ্গমতা ; এবং তখনই এল ঐ মৃত্যুবাহিনী।

---

১. এ এক অনন্যসাধারণ ব্যাপার যে অধ্যাপক লেভির মত এই যে, পদার্থবিদ্যা বিষয়ে কডওয়েল নাকি সত্যিই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কিছু অভিমত জ্ঞাপন করতে পেরেছে।

তার অপর দুই মূল্যবান গ্রন্থ *Illusion and Reality* এবং *The Crisis in Physics* সম্বন্ধে কোনো কিছু বলা আমার অভিপ্রেত নয়। এই ভূমিকার এক-মাত্র উদ্দেশ্য এই গ্রন্থের আটটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্তর্লীন ঐক্যসূত্রটি এবং যে-আদর্শের জন্য এই লেখক প্রাণ দিয়েছেন সেইটিই তুলে ধরা ; কডওয়েলের কথা এবং কাজের মধ্যে যে পরম ঐক্য তা তুলে ধরা ; এ সেই ঐক্য যা, আমার মনে হয়, মানুষ আন্তরিকতা বলতে যা বোঝাতে চায় তাই।

কারণ এই গ্রন্থ হল স্বাধীনতা বিষয়ক। স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়, কমিউনিস্টরা কেন সংগ্রাম করে এবং তার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয় এবং কেন তাদের এই উপলব্ধি যে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে কমিউনিজম স্বাধীনতারই নামান্তর এই কথার বিশদ ব্যাখ্যায় এই গ্রন্থ এক পরিশ্রমী, জটিল, সুবিস্তৃত, বলিষ্ঠ প্রয়াস।...

আমরা এত অলস, স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন এবং ভয়কাতর যে দেখেও দেখতে চাই না ফ্যাসিস্ট আক্রমণকারীদের রুখে দাঁড়াবার সংগ্রামে আমাদের দেশও তার অংশ নিয়েছে। কডওয়েল প্রাণ দিয়েছে, আরও অনেকেই প্রাণ দেবে—যারা বেঁচে থাকতে পারত এই পৃথিবীকে তাদের প্রাণশক্তি দিয়ে সমৃদ্ধ করতে। আসুন, অন্তত এই কথা আমরা এই রক্তরঞ্জিত তিরিশ দশকের তরুণ-তরুণীদের বোঝাতে চেষ্টা করি—কেন কডওয়েল তার প্রিয় প্রাণ আহুতি দিল।

অনুবাদ: বারীন্দ্রনাথ ঘোষ
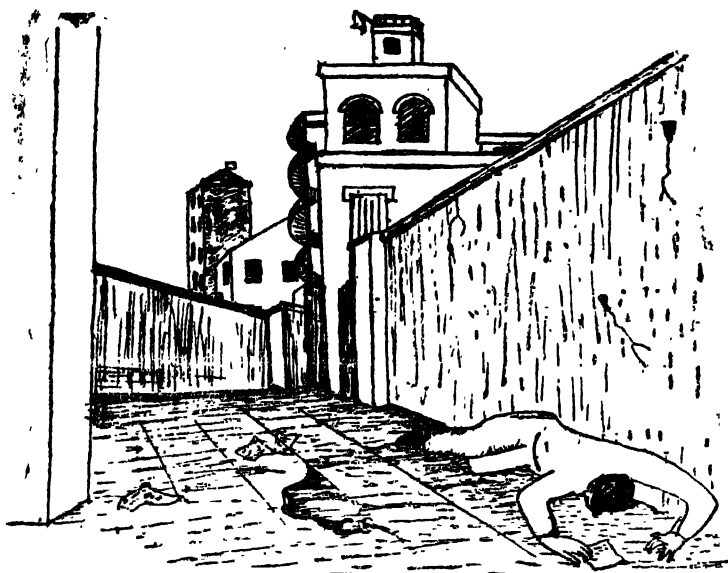
আমার বন্ধুদের বোলো

গেব্রিয়েল পেরি

[গেব্রিয়েল পেরি ছিলেন ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'লুমানিতে'-র বৈদেশিক দপ্তরের সম্পাদক এবং ফরাসী পার্লামেন্টের কমিউনিস্ট সদস্য। জার্মান ফ্যাসিস্টরা ফ্রান্স দখল করলে তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৯৪২-এর ১৫ ডিসেম্বর ভোরবেলা তাঁকে গুলি করে মারা হয়। মৃত্যুর কয়েক মিনিট আগে পেরি যে ছোট্ট চিঠিটি লেখেন, এখানে তারই অনুবাদ প্রকাশ করা হল। গেব্রিয়েল পেরির শহিদত্ব বরণের চমৎকার স্কেচ এঁকেছিলেন ইংরেজ কমিউনিস্ট প্যাট্রিক কার্পেন্টার ও সেটি ছেপেছিল 'ডেলি ওয়ার্কার'। সেই ছবি অবলম্বন করে এই স্কেচটি এঁকেছেন অনুবাদক স্বয়ং।—সম্পাদক]

আমার বন্ধুদের বোলো যে আমার সারা জীবনের বিশ্বাসের প্রতি আমি শেষ পর্যন্ত অনুগত থেকেছি। আমার দেশবাসীকে বোলো যে আমি প্রাণ

দিচ্ছি যাতে ফ্রান্স বাঁচতে পারে।

শেষবারের মতো আমি আমার বিবেককে পরীক্ষা করলাম। আমার কোনো খেদ নেই। আমি সবাইকে শুধু একটিই কথা বলে যেতে চাই: যদি জীবনটা এখন আবার ফিরে পাই তো এতদিন যে পথে চলেছি, আবার সে পথ দিয়েই চলব।

আজকের এই রাতে আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করছি যে আমার প্রিয় বন্ধু পল ভাইলাঁ-কুতুরিয়ের ঠিকই বলতেন—কমিউনিজম হচ্ছে পৃথিবীর যৌবন এবং তা পথ তৈরি করে যায় যাতে করে আগামী দিনগুলি সঙ্গীতমুখর হয়ে উঠতে পারে। মৃত্যুর মুখোমুখি আমি যে এতটা সাহস ও স্থৈর্য দেখাতে পারছি, সন্দেহ নেই তার অন্যতম কারণ আমার শিক্ষাগুরু ছিলেন মার্শেল কাঁশা।

বিদায়! ফ্রান্স দীর্ঘজীবী হোক।

অনুবাদ : সুনীল মুন্সী

চিঠি ও কবিতা

আর্নেস্ট টলার

[জার্মানির প্রখ্যাত বিপ্লবী কবি ও নাট্যকার আর্নেস্ট টলার হিটলারের ক্ষমতা-দখলের পরে (১৯৩৯) নাৎসিদের উৎপীড়নে প্রাণ হারান। অবশ্য বলা হয় যে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। 'ছেচল্লিশ নম্বর'-এ বাঙালি শিল্পী-সাহিত্যিকদের এক সভায় সে যুগে হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় টলারকে উৎসর্গ করে রচিত তাঁর প্রসিদ্ধ ইংরিজি কবিতা 'আর্নেস্ট টলার' আবৃত্তি করেন, তাতে এই আর্ত জিজ্ঞাসা ছিলঃ প্রাণের প্রিয় আর্নেস্ট, বলো, আমাদের বলো—তোমার ঘাতক আসলে কারা ?
টলার আজীবন সংগ্রামী। কুড়ির দশকের জার্মানিতেও তিনি দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ ছিলেন। ঐ সময় নাইডারশোয়েনফেল্ড দুর্গে বন্দী অবস্থায় রোমাঁ রোলাঁকে যে-চিঠি তিনি লেখেন, তার অনুবাদ এবং বন্দী অবস্থায় লেখা তাঁর একটি কবিতার তরজমা প্রকাশিত হল। প্রাক্-হিটলার যুগে রচিত এই চিঠি ও কবিতা জার্মানির অবিস্মরণীয় সন্তান আর্নেস্ট টলারের ভবিষ্যৎ জীবন ও মরণের অমোঘ পূর্বাভাস।—সম্পাদক]

নাইডারশোয়েনফেল্ড ১৯২১

প্রিয়বরেষু

আজকেই আপনার চিঠি আমার হাতে এল। আমার কাছে খুব দামী এই চিঠি। বিদেশী ভাষা বলে জেলখানার কর্তৃপক্ষ আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। মা পাঠিয়েছেন জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে আপনার চিঠি।

আপনি যদি জানতেন আপনার লেখা পড়ে আমার আনন্দ! আমার এক কমরেডকে চিঠিটি দেখাতে সে হেসে বললে, "এই একটা চিঠির জন্যেই জেলখানায় যাওয়া যায়।" অবশ্যই একথা আক্ষরিকভাবে নেবেন না। জেল মনুষ্যত্ব খর্ব করে।

'জেলখানার গান' আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। আসলে এগুলো গানের থেকে একটু বেশি, যাকে বলা যায় ডাক কিংবা ঘোষণা। আমি ডাক দিয়েছি সেই সব মানুষদের যারা তাদের বাড়ির জানলার গরাদের সামনে দাঁড়িয়ে ভুলে আছে তাদের ঔদাসীন্যের কি দারুণ মাশুল দিতে হবে একদিন। আমাদের

পৃথিবীটা কি এখন এক নরকে পরিণত হয় নি ক্রমাগত হত্যা অত্যাচার এবং মন ও শরীরের প্রবল ক্ষুধার হাহাকারে? এই ডামাডোলে আমার গলার স্বর কোথায় পৌঁছবে? যারা আজ দেশ জুড়ে মাতব্বরি করছে আর মানুষকে ঠেলে নিয়ে চলেছে এক খাদ থেকে আর-এক খাদের দিকে. তারা নিশ্চয় ভুলেও কান দেবে না এদিকে।

আমার গানের লক্ষ্য ভবিষতের মানুষ—আজকে যারা শিশু, যাদের কাছে মানবতা একটা জীবন্ত ব্যাপার আজকের চালু রাজনৈতিক নেতাদের চেয়েও, যারা মনে করে তারা চাপা পড়েছে এবং একদিন মাথা তুলে উঠবে।

সোয়ালোর গান

[১৯২২ সালে এক জোড়া সোয়ালো আমার কারাগারের সেলে বাসা বেঁধেছিল]

সেনেগাল আর লেক ওমানডাবায়
আফ্রিকার শস্য ছুঁয়ে ছুঁয়ে
কেন তোমরা এলে এই শীতার্ত এপ্রিলের জার্মানিতে?
গ্রীসের দ্বীপপুঞ্জে কেন বাঁধলে না নীড়
বাসা বাঁধলে না বরং
সমুদ্রে বিছানো দ্বীপমালার প্রাচীন গুহায়?
কোন ভবিতব্যে তোমরা আজ ধাবমান?

আমাদের এই বসন্তকাল
হোয়েলডারলিনের বসন্ত নয়
জার্মানির বসন্ত আর জার্মানির শীত একাকার
মমতাশূন্য তীক্ষ্ণ তুষারে।

সোয়ালো সোয়ালো!
তোমরা ঠিক আমাদের কবিদের মতো
মানুষের জন্যেই তারা মরে।
তোমাদের সঙ্গী যেমন আকাশ ঝড় আর পাথর
তবু মানুষের কাছেই আসো ঘুরে ঘুরে॥

অনুবাদ: অসীম রায়

চিঠি ঃ কবিতা

ক্লাইভ ব্র্যানসন

[১৯০৭ সালে ভারতের মাটিতেই ক্লাইভ ব্র্যানসনের জন্ম। বাবা ছিলেন ব্রিটিশ সামরিক অফিসার। বালক বয়সে ইংলণ্ডে যান, সেখানেই থাকতেন। গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হন। স্পেনের মুক্তিসংগ্রাম শুরু হলে ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে যোগ দেন। আট মাস ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কাটিয়ে দেশে ফেরেন। ফ্যাসিবিরোধী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেন ১৯৪১ সালে। বেয়াল্লিশ সালে ভারতে আসেন। ১৯৪৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি আরাকান ফ্রণ্টে তাঁর মৃত্যু হয়।
'ব্রিটিশ সোলজার ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে ভারতবর্ষ সম্পর্কে লেখা তাঁর চিঠিপত্র ও কবিতা সংকলিত হয়েছে। আগস্ট-আন্দোলন, পঞ্চাশের আকাল, পাকিস্তান-প্রসঙ্গ, সংগঠিত শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন প্রভৃতি সম্পর্কে ব্র্যানসনের মত স্পষ্ট। তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সার্থক সংগ্রাম করতে হলে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান ও জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করাটা দরকার।
'ব্রিটিশ সোলজার ইন ইণ্ডিয়া' থেকেই একটি চিঠি এখানে অনুবাদ করা হল। রচনার শিরোনাম আমাদেরই দেওয়া।—অনুবাদক]

১০ জুলাই
আহ্‌মেদনগর

খবরের কাগজে একবার চোখ বুলিয়ে নেবার জন্য মেসে গেলাম। শুনলাম একজন মেজর তার বন্ধুকে বলছে—"জার্মানরা আবার জোরসে চেপে ধরেছে।" কথাটা কানে যেতেই আমার মনে একসঙ্গে এলো রাগ আর হতাশা। স্পেনের যুদ্ধের সময় ঠিক এই রকম মানসিক অবস্থা আমার হয়েছিল। ডানকার্কের সময় এই রকম ছিল আমার মানসিকতা।

আমাদের বীর মিত্রপক্ষ তৃতীয়বারও একই রকম মার খাবে। আমরা বিস্ফারিত চোখে সেই দিকে তাকিয়ে থাকব। আর একবার এই-ই হবে আর

কি! আমরা বীর সহযোদ্ধাদের জন্যে পাঠাব সোনার কাজ করা তলোয়ার। অগ্নিস্রাবী বক্তৃতাবাজি করতে থাকব। বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে থাকব তিউনিসিয়ার কথা। যতক্ষণ বমি না আসে ততক্ষণ এই-ই করতে থাকব। মিউনিখ আর বার্সিলোনার সময় লজ্জায় যেমন মাথা হেঁট হয়েছিল এবারও তাই হবে।

কিছু না করার স্বাধীনতা তার, এই বিধিলিপি
যুগ যুগ ধরে এই তো পেয়েছে মানুষ
চুনকাম করা আকাশ—কারার গাত্র
মাটিতে মেঝেতে ঘোরাফেরা সার
বার বার পাক খাওয়া। সবই তো তাদের
গাছ মাঠ পাখি পুকুর বিত্ত রত্ন
শুধু যেন তারা করে না কিছুই, ভাবে না কিছুই
দুই হাত দিয়ে কিছুই গড়ে না
তারিয়ে তারিয়ে চাখে না জীবন। হুঁশিয়ারি আছে :
"করপুটে যারা ধারণ করবে ঝঞ্ঝা
হাতুড়ির মারে স্তব্ধতা যারা ভাঙবে
তারাই গারদে পচবে।" নরককুণ্ডে প্রতিধ্বনিত
পাখি-পাখালির স্বর। মানুষের স্বরে
অন্তবিহীন অর্থহীনতা। এখানে কেবল
শূন্য, অপরিমিতের শূন্য। এখানে কেবল
স্বাধীনতা হল কিছু না করার
ঘাড় ধ'রে রাখা, জবরদস্তি, করতে না দেওয়া
—এই স্বাধীনতা!

(মেষের শুভ্র চামড়া পরেছে নেকড়ে)

খাবার টেবিলে সেই একই ধরনের সিনিক্যাল কথাবার্তা—সবই আমার মনের কথা। একজন সার্জেন্ট, যে ল্যাঙ্কাসায়ার থেকে এসেছে, বলল—"গত মাসে ব্রাইটলিতে কী কাণ্ড! সমুদ্রতীরে অবতরণ করা হচ্ছে। না, না, ঠাট্টা করছি না। আমরা ক্যানাডিয়ানদের কাছ থেকে ব্ল্যাকপুল ছিনিয়ে নিলাম!" এই দেশে, আমাদের স্বদেশেও, হাজার হাজার সৈন্য ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে

আছে। এই জন্যে এদের মধ্যে যে কত ক্ষোভ আর রাগ আর ক্ষোভ—তা যদি জানতে!

ভারতের একটা সুখবর দিতে পারি। আর একজন নামকরা কংগ্রেসী সবেমাত্র জেল থেকে ছাড়া পেয়েই বিবৃতি দিয়েছেন—কংগ্রেসের নঞর্থক নীতির ফলে দেশের মানুষের মধ্যে যে অসহায় ভাব এসেছিল তা এবার কাটিয়ে ফেলতে হবে; আরও সদর্থক নীতির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে যেতে হবে।

অনুবাদঃ রাম বসু

ইতালীয় সাম্যবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ শহিদ আন্তোনিও গ্রামশ্চি

রোমাঁ রোলাঁ

[স্পেনের গৃহযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই রোমাঁ রোলাঁর পত্র ও প্রবন্ধের সংকলন *I Will Not Rest* প্রকাশিত হয়। এই বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন সরোজ দত্ত। 'শিল্পীর নবজন্ম' নামে তিন খণ্ডে তা 'অগ্রণী বুক ক্লাব' থেকে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬, মাঘ ১৩৫২। প্রথম খণ্ডে ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ তারিখ চিহ্নিত অনুবাদকের একটি চমৎকার ভূমিকা আছে, তাতে প্রসঙ্গত ফরাসী ভাষা বিশেষজ্ঞ "কবি ও সাংবাদিক" অরুণ মিত্রের কাছে ঋণস্বীকার করা হয়েছে। মাঘ ১৩৫১ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত নীরেন্দ্রনাথ রায়ের 'রম্যাঁ রলাঁ' প্রবন্ধটি প্রথম খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়।

'অগ্রণী বুক ক্লাব' পরে এক খণ্ডে সমগ্র 'শিল্পীর নবজন্ম' প্রকাশ করে। এই সংস্করণে অনুবাদকের ভূমিকা ও নীরেন্দ্রনাথ রায়ের প্রবন্ধটি বর্জিত এবং সরোজ আচার্যর লেখা মূল্যবান একটি ভূমিকা সংযোজিত হয়েছে। বইয়ের কোথাও পূর্ববর্তী সংস্করণের উল্লেখ নেই, নতুন সংস্করণের প্রকাশকালও দেওয়া হয় নি। এখানে 'শিল্পীর নবজন্ম'র এই অখণ্ড সংস্করণ থেকে 'ইউরোপে ফ্যাশিজম্' পর্বের অন্তর্গত সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ সালে লেখা ১৬ সংখ্যক রচনা 'মুসোলিনীর জেলে যাহারা মরিতে বসিয়াছেন'-এর অংশবিশেষ বানান ও যতিচিহ্নের প্রয়োজনীয় সংশোধন সহ পুনর্মুদ্রণ করা হল। 'গ্রামসি' বানানটি অবশ্য বদালানো হয় নি। প্রবন্ধের শিরোনামা আমাদের দেওয়া। বলা প্রয়োজন রোঁলা 'ইউরোপে ফাশিজম্' পর্বেই 'রাইখস্টাগ বিচার', টরগেলর-থেলমান ও গ্রামশ্চি প্রসঙ্গে প্রায় পর পর কয়েকটি অসামান্য রচনা লেখেন।

রোলাঁর কণ্ঠেই সেদিন পৃথিবীর বিবেক কথা বলত। এই মহৎ মানুষ ও যুগন্ধর শিল্পীর জীবনদীপ ফ্যাসিস্টরা নির্বাপিত করে। যেমন তারা হত্যা করেছিল পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও সৃজনশীল কমিউনিস্ট আন্তোনিও গ্রামশ্চিকে।—সম্পাদক]

মুসোলিনির উপর হইতে জগতের দৃষ্টি সরাইয়া লওয়া হিটলারের দুষ্কৃতিগুলির অন্যতম। অগ্নিকাণ্ড, পুস্তকের বহ্ন্যুৎসব, নির্যাতন ও হত্যালীলার বীভৎস উল্লাস মেশিনগান ও ক্যাস্টর অয়েলের বীরের মহিমা ম্লান করিয়া দিয়াছে। আডলফের পাশে বেনিতোকে উদার ও সহৃদয় বলিয়া মনে হইতেছে। বৃদ্ধ শয়তান আজ নির্বিরোধী ভদ্রলোক সাজিয়াছেন। সম্প্রতি অধিকাংশ ছবিতেই তাঁহাকে গম্ভীর ও সহনশীলরূপে দেখানো হইতেছে। আজ ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে যে আপসের চেষ্টা চলিতেছে তাহার বিরুদ্ধে যাহাতে জনমত গঠিত না হইয়া উঠিতে পারে তজ্জন্য হিটলারের পাশাপাশি মুসোলিনিকে এমনভাবে দেখানোর চেষ্টা হইতেছে যাহাতে মনে হইবে রোমে আজ পুনরায় শৃঙ্খলা আসিয়াছে এবং আগস্টসের মতো মুসোলিনিও বিবদমান উপদলগুলির কলহ কোলাহলের মধ্যেও শান্তি স্থাপন করিয়াছেন। তিনি একজন মহাপুরুষ, বুর্জোয়াদের ভরসার স্থল তিনি। শিশুদের চরিত্রগঠনের জন্য মুসোলিনির কাহিনী পড়ানো হইতেছে।

এ আনন্দ উৎসবে আমরা বাধা দিতে চাই। আমরা গাহিতে চাই অন্য গান। থেলমানের আঠারো মাস কয়েদ-বাস দেখিয়া যাঁহারা গ্রামসির সাত বৎসর ধরিয়া তিল তিল যন্ত্রণাভোগের কথা ভুলিয়া যান, আমরা তাঁহাদের দলে নই। ফুরার-এর পাশে, ফুরার-এর উপরে ডুচের স্থান তৈয়ারি করো। ডুচে গুরুদেব, ফুরার শুধু তাহার শিষ্য।...

আজ আমরা দণ্ডিতদের লইয়া...দণ্ডাজ্ঞার সম্মুখে উপস্থিত হইব। এই মহাধূর্ত স্বেচ্ছাচারীর নিকট...নির্যাতন নিপীড়নের কৈফিয়ত দাবি করিব।...

[মুসোলিনির দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত] এই মৃত্যুপথযাত্রীদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, রোমের ঝুটা-সম্রাট যাঁহাকে রথের চাকায় বাঁধিয়া টানিয়া লইয়াছে, সেই আন্তোনিও গ্রামসির কথা এইবার বলিব।

তিনি নেতা। দুঃখবরণের কঠোরতায় তিনি বহুর মধ্যে স্বতন্ত্র। ইতিহাসে মাত্তেওত্তির পাশেই তাঁহার নাম ক্ষোদিত থাকিবে। হৃদয় তাঁহার মাত্তেওত্তির মতোই বিশাল, মনের দিক হইতে তিনি বোধকরি মাত্তেওত্তির চেয়েও বড়। কারণ, ইতালিতে নূতন সমাজব্যবস্থা গঠনে তিনিই ছিলেন অগ্রণী।

এই মহাপুরুষের পরিচয় এখনো ফ্রান্স ভালোভাবে পায় নাই। তাই ইহার সম্বন্ধে কিছু বলিব।

পৃষ্ঠদেশ সামান্য ন্যুব্জ, বড় বড় দুই চোখে সরল সম্মুখ দৃষ্টি, সে দৃষ্টি যেন কী

খুঁজিয়া ফিরিতেছে; বিশাল ললাটটিকে ঘনতরঙ্গিত কেশদাম যেন মুকুটের মতো ঘিরিয়া রাখিয়াছে। দুর্বল দেহ, লৌহকঠিন মনোবল। শিশুকাল হইতে রুগ্ন হওয়ার ফলে সঙ্গীদের সাথে তিনি খেলিতে পান নাই; ফলে পড়িবার ও ভাবিবার একটা অদ্ভুত নেশা তাঁহাকে চিরজীবনের মতো পাইয়া বসিয়াছে। কোনো তিক্ততা নাই। আছে শুধু শিখিয়া শিখাইবার আনন্দ। আর আছে সংস্কৃতির প্রতি একটা অদ্ভুত আসক্তি। শুধু সংস্কৃতি গ্রহণ নহে, সংস্কৃতি বিতরণের একটা অধীর আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মধ্যে অনির্বাণ দীপশিখার মতো জ্বলিতেছে। উত্তরজীবনে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এই সম্পদ বিতরণ তিনি পরম কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন: "যাহাদের বর্ণপরিচয় হয় নাই তাহাদের পার্টি হইতে বহিষ্কৃত করিবার উদ্যোগ পর্যন্ত আমি করিয়াছিলাম। কমিউনিস্ট কখনও নিরক্ষর হইতে পারে না; জীবনের যত কিছু মিথ্যা ও শূন্যতাকে আমরা আঁকড়াইয়া থাকি, সব কিছু বিসর্জন দিয়াও তাহাকে ইহা শিখাইতে হইবে।" তাঁহার জন্ম হয় সার্দিনিয়ায়, তুরিনে তিনি শিক্ষালাভ করেন। অল্প বয়সেই তিনি পিয়ের মন্তেসির শক্তিশালী শ্রমিকদের সংস্পর্শে আসেন। ইতালির মজুর ও কৃষকদের মধ্যে সংযোগসাধন করিতে তিনি ছাড়া আর কেহ পারে নাই। ইতালীয় রাষ্ট্র কর্তৃক নিপীড়িত সার্দিনিয়ার বাসনা-বেদনা এবং উত্তর ইতালির শ্রমিকের বিপ্লবী প্রকৃতি তাঁহার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, বক্তৃতার ঝড় তিনি তুলিতে পারেন না। যাহারা পারে তাহাদের তিনি সন্দেহ ও বিদ্বেষের চোখে দেখেন। কিন্তু লেখনী তাঁহার ক্ষুরধার, তীক্ষ্ণ ও নির্মম। তাঁহার রচনাভঙ্গিকে পেগুাই-এর রচনাভঙ্গির সহিত তুলনা করা হয়। বারংবার তীব্র তীক্ষ্ণভাবে এক কথা বলিয়া বক্তব্যকে তিনি পাঠকের মনের গহনে প্রবেশ করাইয়া দেন। তাঁহার দার্শনিক মন হেগেলের দর্শনে পরিপুষ্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভাষাতত্ত্বের বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তাই মন তাঁহার সর্বোপরি দ্বান্দ্বিক শক্তিতে শক্তিমান। তাঁহার প্রথম প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়: তুরিনের 'ক্রি দ্য পোপ্‌ল' কাগজে এবং 'লাভান্তি'তে। ১৯১৯ সালের মে মাসে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকরী সমিতির সহযোগিতায় তিনি 'আর্দিনে নুওভা' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁহার সম্পাদকীয় দপ্তর একসময় ইতালির শ্রমিক-বিপ্লবের নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৯২৫ সালে তিনি লেখেন: "বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের

উপর নির্ভর করিলে চলিবে না; ইহাই যথেষ্ট নহে। স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন কখনো শ্রমিকশ্রেণীকে বর্তমান বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সীমা ছাড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে না। চাই সচেতন যোদ্ধা, চাই ভাবাদর্শের জ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম সে করিতেছে সে-অবস্থা তাহাকে বুঝিতে হইবে, যে সামাজিক সম্পর্ক-গুলির মধ্যে সে বাস করে শ্রমিককে তাহার স্বরূপ চিনিতে হইবে; এই সম্পর্ক-ব্যবস্থার মধ্যে কোন মৌলিক শক্তি কাজ করিতেছে, বুঝিতে হইবে সামাজিক বিকাশের সেই ধারাগুলিকে, সমাজের বুকের সমন্বয়ে অযোগ্য কতকগুলি বিরোধীশক্তি যে-ধারাগুলির মূলে…”

এইভাবে তিনি শ্রমিক বিপ্লবের শিক্ষক হইয়া দাঁড়াইলেন কিন্তু তাঁহার শিক্ষা প্রকাশ পাইল কথার মধ্য দিয়া নহে, কাজ ও বলিষ্ঠ চরিত্রের মধ্য দিয়া। ১৯১৯-২০ সালে তুরিনে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই ‘কারখানা পরিষদ’ আন্দোলন গড়িয়া ওঠে। এইগুলিকেই তিনি সংগ্রামের মধ্যে বিপ্লবী সেনাবাহিনীর ইউনিটে এবং জয়লাভের পর শ্রমিকরাষ্ট্রের ইউনিটে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। জয়লাভ তাঁহার দেখিয়া যাওয়া ঘটিল না, কারণ সোশ্যাল ডেমোক্রাট দলের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর মনোবল ভাঙিয়া পড়ে এবং কারখানা অধিকার, বিশেষ করিয়া ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে ২৫,০০০ শ্রমিকের তুরিনের ফিয়াট কারখানা অধিকার দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই।

কিন্তু তুরিনের শ্রমিকেরা একটা মহান দৃষ্টান্ত দেখাইল। ইয়োরোপের অপর প্রান্তে বলশেভিক রাশিয়ার বিরাট ও বিজয়ী রাষ্ট্র-পরীক্ষার সহিত এ দৃষ্টান্তের সংযোগ রহিয়াছে। এই তরুণ নেতার প্রতি জর্জেস সোরেল ও বেনেদেত্তো ক্রোচে-র দৃষ্টি পড়িল।

গ্রামসি ছিলেন ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য। তাঁহার ‘অর্দিনে নুওভো’ পত্রিকা তখন দৈনিক হইয়াছে। এই দৈনিকখানি দুই বৎসর ধরিয়া শ্রমিকশ্রেণীর সংযুক্ত ফ্রণ্ট গঠনের জন্য, মতবাদের দিক হইতে (Theoretical) পার্টির পুনরুজ্জীবনের জন্য এবং নিম্নমধ্যশ্রেণী বুদ্ধিজীবী-শ্রেণীর সবচেয়ে প্রগতিশীল অংশের সমর্থনলাভের জন্য সংগ্রাম চালায়। বুদ্ধি-জীবীদের মধ্যে সবচেয়ে পিয়েরো বাবিত্তির সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। দুইজনেই ছিলেন হেগেলীয় দর্শনে সুপণ্ডিত। তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া লিবারেলিজম ও কমিউনিজম-এর সর্বশক্তি একত্রিত করিবার চেষ্টা করিলেন।

১৯২২ সালের জুলাই মাসে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল-এর তিনি ইতালীয়

নাজিমুদ্দীনরা মন্ত্রী থাকিবার সময়ে যে-অবস্থা ছিল, শামসুদ্দীন ও সন্তোষ বসুরা মন্ত্রী হওয়ার পরেও সেই অবস্থাই রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার উজিরির গদি হাসিল করিবার জন্যই শুধু লম্বা লম্বা কথা বলিতেন তাহা বুঝিতে কোনো কষ্টই আজ আর হইতেছে না।

ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল হইতে ২৪ জন লম্বা মেয়াদী বন্দী বাঙলার প্রধান-মন্ত্রীকে যে-লম্বা চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা খবরের কাগজে ছাপা হইয়া গিয়াছে। দমদম সেণ্ট্রাল জেল হইতেও ২১ জন লম্বা মেয়াদী বন্দী এই রকমই একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। এই সকল বন্দীর এক সময়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যোগ ছিল। এখন তাঁহাদের সন্ত্রাসবাদী মত আর নাই। দেশের স্বাধীনতা লাভ করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের ভিতরে আগেকার চেয়েও শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু, তাঁহারা এখন দেশের জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া মজুর ও চাষীর, ক্ষমতার উপরেই বিশ্বাস করেন। বাহির হইয়া আসিলে মজুর-চাষীর পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহারা স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য লড়াই করিবেন। জেলের দেওয়ালের ভিতর হইতে তাঁহারা দেশবাসীর নিকটে আবেদন জানাইয়াছেন যে জাপানী দুশমনদিগকে রুখিতে হইবে। দেশের লোক যে তাঁহাদের ভালবাসে, তাঁহারা যে অনেক ভণ্ড দেশসেবকের মতো আমাদের দেশকে জাপানীদের নিকটে বেচিয়া দিতে চাহেন না, এই কথা সরকারও বিশ্বাস করে। বিশ্বাস না করিলে তাঁহাদের চিঠির ভাষা তুলিয়া দিয়া সরকার জাপানের বিরুদ্ধে প্রচারের কাজ চালাইত না। যাঁহাদের চিঠিতে কাজ খানিকটা আগাইয়া যায়, তাঁহাদের মুখের কথায় যে আরো অনেক বেশি কাজ হইতে পারে এই কথা বুঝিবার মতো মগজ কোথাও না কোথা থাকা দরকার।

মজুরেরা কৃষকেরা যাঁহাদের বিশ্বাস করেন; ভালবাসেন, যাহাদের কথায় তাঁহারা ভরসা পান, সেই সকল নেতা আজ কাজের ময়দানে হাজির নাই। সরকার হয়তো তাঁহাদিগকে বিনা বিচারে জেলের ভিতরে আটক করিয়া রাখিয়াছে, কিংবা নানা রকম হুকুমের বাঁধনে বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে অকেজো করিয়া নানা জায়গায় ফেলিয়া রাখিয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ প্রভৃতি রাজকর্মচারীদের সহিত জনসাধারণের ভালোবাসার সম্বন্ধ কোনো দিনও ছিল না, আজও নাই। ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের কথায় জনসাধারণের বিশ্বাস নাই। পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের যাহারা চাটুকার, তাহাদিগকে জনসাধারণ ঘৃণা করে। তাহাদের কথায়ও জনসাধারণ কাজে নামিবে না। যাঁহাদের কথায় জনসাধারণ

মাতিয়া উঠিবে তাঁহাদিগকে কাজের বাহিরে রাখা হইয়াছে। যে-ভুল আজ ইংরেজ সরকার এই দেশে করিতেছে, বর্মাতেও তাহারা সেই ভুলই করিয়াছে। বর্মার কমিউনিস্টরা জেলের বাহিরে নানা জায়গায় আটক ছিলেন। টেনাসারিমে জাপানীর হামলা আরম্ভ হওয়া মাত্রই তাঁহারা সরকারকে জানাইয়া দেন যে যুদ্ধে তাঁহারা সকল রকম সাহায্য করিবেন। তাঁহাদের একমাত্র শর্ত ছিল রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি। ইহা সত্বেও বর্মা সরকার বেশির ভাগ কমিউনিস্টকে জেলের বাহির হইতে জেলের ভিতরে পাঠাইয়া দিল, আর জেল হইতে ছাড়িয়া দিল জাপানের পক্ষপাতী থাকিন পার্টির লোকদিগকে।

দেশের জনসাধারণের সাহায্য ছাড়া আজকালকার দিনে যুদ্ধ জিতিতে পারা যায় না। ভাড়া করা সিপাহীদের দ্বারা যুদ্ধে জিতিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন লোকদিগের চেষ্টাতেই শুধু পাওয়া যাইতে পারে। সরকার জাপানীদের হারাইতে চায়, কিন্তু, জাপ-বিরোধী বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিতে চায় না। অনেক বেশি খারাপ দিন না আসিলে কাহারও এমন কুবুদ্ধি হইতে পারে না।

আমরা ইংরেজ ধনীদের শোষণ ও শাসনের হাত হইতে ভারতের স্বাধীনতা লাভ করিতে চাই। উহার জন্য যে-কোনো প্রকারের দুঃখ সহিতে আমরা পেছপাও হইব না। ইংরেজ ধনীদের হাতে যে অনেক জ্বালা আমরা সহিয়াছি সে-কথা আমরা ভুলিয়া যাই নাই এবং কোনো দিন ভুলিবও না। কিন্তু, নিজেদের নাক কাটিয়া ইংরেজ ধনীদের যাত্রাও আমরা ভাঙিতে চাই না। জাপানের নিকট ভারতবর্ষকে বেচিয়া দিয়া আমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব না। কাজেই, আমাদের এই অতি আদরের দেশকে আমরা পশু ও বর্বর জাপানের দখলে যাইতে দিতে পারি না। আমরা আমাদের সকল শক্তি দিয়া জাপানের বিরুদ্ধে লড়িব। তাহারই জন্য আজ আমরা আমাদের মজুর ও কৃষক নেতাদের ফিরাইয়া চাই, আর ফিরাইয়া চাই আমাদের দেশপ্রেমিকদের। তাঁহারা আসিয়া আমাদের পাশে দাঁড়াইলে আমাদের তাকত অনেক বাড়িয়া যাইবে। বাঙলাদেশের মন্ত্রীরা দাবি করিতেছেন যে তাঁহারা দেশের প্রতিনিধি। দেশের যাঁহারা প্রতিনিধি তাঁহারা আজিকার এই সংকটের দিনে দেশের জনসাধারণের নেতাদিগকে আটক করিয়া রাখিতে পারেন না। ফাঁকি দিয়া কাজ হাসিল করা চলিবে না। মন্ত্রীদের নিকটে জনসাধারণের দাবি এই যে তাঁহারা হয়তো আজ এখনই বন্দীদের ছাড়াইয়া আনিবেন, নতুবা, মন্ত্রিত্বের গদি ছাড়িয়া দিবেন।

ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'র দ্বিতীয় সম্মেলন উপলক্ষে
শ্রদ্ধানন্দ পার্কে জনসমাবেশ। কলকাতা ১৯৪৪
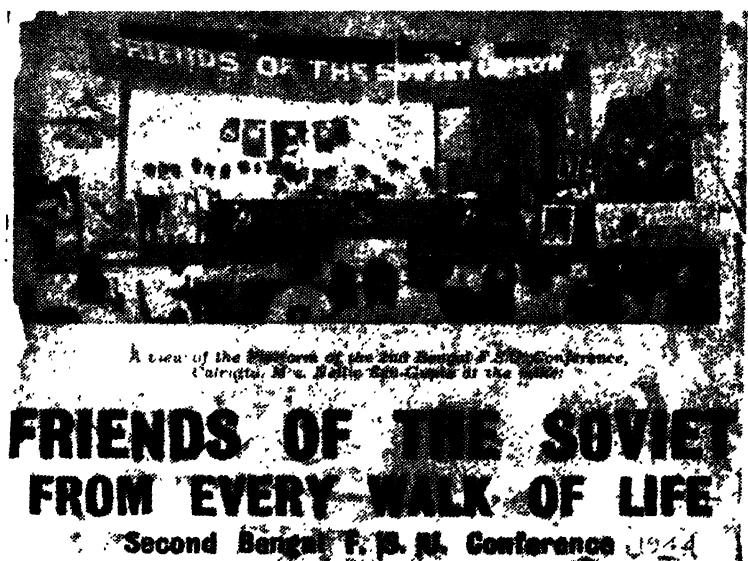
'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি'র বাঙলা শাখার দ্বিতীয় সম্মেলন
শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা বক্তৃতা করছেন। কলকাতা ১৯৪৪
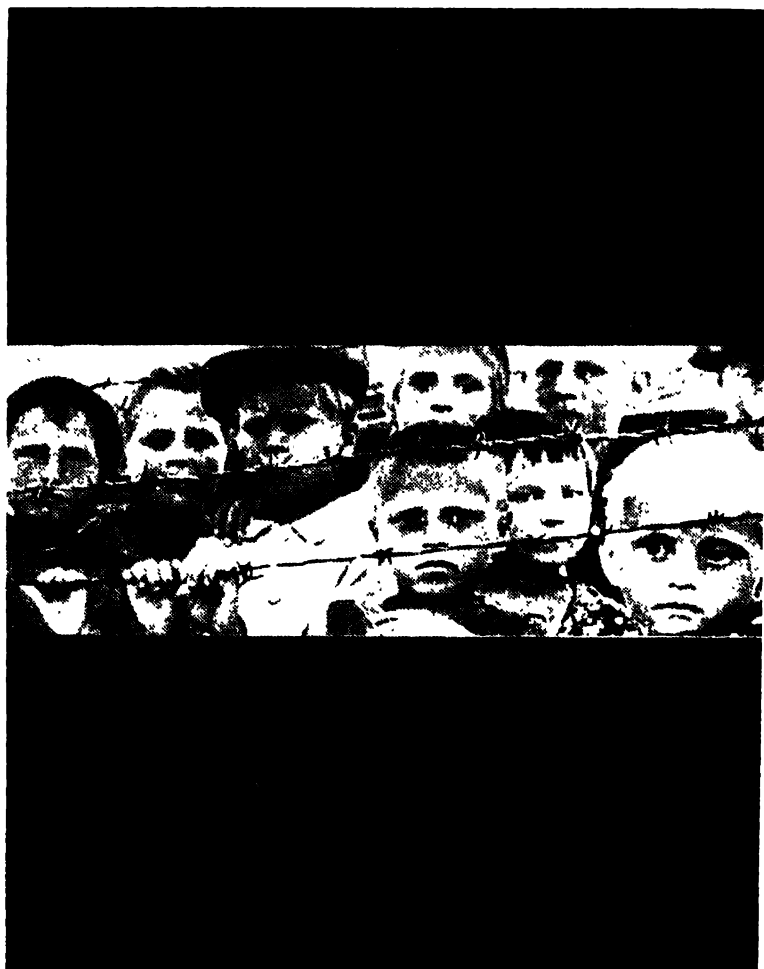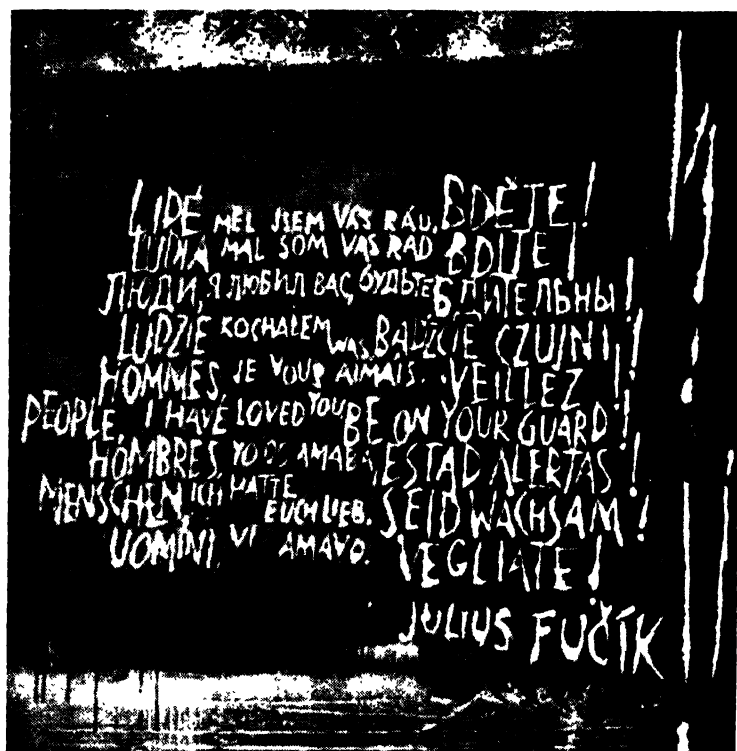
মানুষ ! আমি তোমায় ভালোবেসেছি

হুঁশিয়ার থেকো

—জুলিয়াস ফুচিক

৯ মে ১৯৪৫

মানুষের জয়।

ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

[অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভারতে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের গোড়ার যুগের অন্যতম প্রধান নেতা ও 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি'র তিনি ছিলেন প্রথম যুগ্মসম্পাদক। 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'র সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ'র পক্ষে তিনি সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সঙ্গে 'প্রগতি' [১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] ও 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি'র পক্ষে এস. কে. আচার্যর সঙ্গে *THE LAND OF THE SOVIETS* [৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] সম্পাদনা করেন। তাঁর 'ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে' প্রবন্ধটি আমরা পাক্ষিক 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রণ করলাম।

১ এপ্রিল ১৯৪২, ১৮ চৈত্র ১৩৪৮, বুধবার 'জনযুদ্ধ'র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সাইজ—ক্রাউন ¼, পৃষ্ঠা—৮, দাম—এক আনা। "সম্পাদক—বঙ্কিম মুখার্জি এম, এস, এ।" "২৩ নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অগ্নিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২১৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।"

প্রথম পৃষ্ঠার মাথায়, বাঁদিকে, বড় বড় হরফে ছিল JANAYUDDHA; ডান দিকে, Regd. No. (রেজিস্ট্রেশন নম্বর দ্বিতীয় সংখ্যায় পাওয়া যায় —C2836)।

একটু নিচে, মাঝখানে, 'জনযুদ্ধ' নামটির লেটারিং-ব্লক ব্যবহার করা হয়। তার নিচেই ছিল "—জনসাধারণের রাজনৈতিক পাক্ষিক পত্রিকা—"। তার নিচে সম্পাদকের নাম।

প্রতি পৃষ্ঠায় তিনটি কলাম থাকত। প্রথম পৃষ্ঠায় 'কোনদিকে' এই শিরোনামায় অস্বাক্ষরিত দুটি ছোট লেখা ছিল: 'সোভিয়েট রুশ অপরাজেয়' এবং 'ঐক্যবদ্ধ চীনের ভূমিকা'। প্রথম পৃষ্ঠার ঠিক মাঝখানে সোমেন চন্দর একটি ছবি ছিল। ছবির ক্যাপশান: "ঢাকায় ফ্যাশিষ্ট গুণ্ডা কর্তৃক নিহত শ্রমিক-কর্ম্মী ও সুসাহিত্যিক সোমেনচন্দ্র চন্দ্র।"

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ছিল 'সম্পাদকীয়' ('স্বাধীনতার যুদ্ধে অগ্রসর হও!')। এই নাতিদীর্ঘ রচনার শেষ প্যারাতে লেখা হয়: "জাপানী দস্যুদের রুখিবার জন্য সকল বাঙ্গালী একত্র হও, স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধের জন্য রণসাজে সাজো!"
এই সংখ্যার অন্যান্য লেখা হল:

'ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে'—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পৃষ্ঠা ৩)। 'চীনের সংগ্রাম ভারতের আদর্শ'—বিনয় ঘোষ (পৃষ্ঠা ৪)। 'বন্দীদের মুক্তি চাই'—সুধী প্রধান এবং 'মুনাফা না দেশরক্ষা!'—গোপাল হালদার (পৃষ্ঠা ৫)। 'সোভিয়েটের যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ'—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (পৃষ্ঠা ৬)।
দ্বিতীয় সংখ্যা 'জনযুদ্ধ'র এই 'নে'টিশ' প্রকাশিত হয়:

"আগামী সংখ্যা হইতে জনযুদ্ধ সাপ্তাহিকে পরিণত হইবে এইরূপ আশা করা যাইতেছে। গ্রাহক ও এজেন্টরা এ বিষয়ে অবিলম্বে ম্যানেজারের সঙ্গে পত্রালাপ করিবেন।"
অবশ্য, তার ঠিক নিচেই ছিল " 'জনযুদ্ধর নিয়মাবলী' ":

" 'জনযুদ্ধ' প্রতি মাসের ১লা ও ১৫ই তারিখে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক আনা। বার্ষিক মূল্য সডাক ১।০ টাকা ও ষান্মাসিক মূল্য ৮০। মণি অর্ডার যোগে মূল্য অগ্রিম পাঠাইবেন। ভিঃ পিঃ করা হয় না। মফঃস্বলের কাহাকেও ১৫ খানার কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্সির নিয়মাবলী ও বিজ্ঞাপনের হারের জন্য ম্যানেজারের কাছে পত্র লিখুন।

"লেখকগণ রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন এবং অমনোনীত লেখা ফেরত পাইতে হইলে ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

"আন্দোলন ও এই কাগজের সম্পর্কে কৃষক ও শ্রমিকদের চিঠিপত্র পরম সমাদরে গৃহীত হইবে।

"জনযুদ্ধ কার্য্যালয়"
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কিষাণ সভা অফিস"

পরবর্তী সংখ্যা থেকে 'জনযুদ্ধ' সাপ্তাহিক হয়ে যায়।
১ মে ১৯৪২, ১৮ বৈশাখ ১৩৪৯, শুক্রবার প্রকাশিত হল সাপ্তাহিক 'জনযুদ্ধ'র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা। অর্থাৎ, এক মাসে 'জনযুদ্ধ'র তিনটি সংখ্যা বেরুল, তার মধ্যে দুটি "প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা"। তদুপরি, নতুন সংখ্যাটি ছিল এই পত্রিকার প্রথম বিশেষ সংখ্যা ও প্রথম 'মে দিবস সংখ্যা'।

আগের নিছক নামলিপি বদলে অপেক্ষাকৃত বড় আর চিত্রিত হেডপিস [শিল্পী : মণি রায়] দেওয়া হল। তার নিচে ঘোষণা করা হল "—জনসাধারণের রাজনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা—"।

প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ছিল 'যুদ্ধক্ষেত্রের খবর' শিরোনামায় দীর্ঘ একটি রচনা এবং 'ট্রাম কোম্পানীর দুর্ব্যবহার' ও 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সভ্য সংগ্রহ' শীর্ষক ছোটো দুটি আলোচনা। তৃতীয় পৃষ্ঠায় ছিল সম্পাদকীয়—'পহেলা মে'।

এই সংখ্যার অন্যান্য লেখা :

'সোভিয়েট দেশে যুদ্ধ ব্যবস্থা'—সিরাজুল ইসলাম (পৃষ্ঠা ৪)। 'জাপানী দস্যুর বিরুদ্ধে পোড়া মাটির কৌশল'—গোপাল হালদার (পৃষ্ঠা ৫)। 'বন্দী-মুক্তি'—সুধী প্রধান (পৃষ্ঠা ৬)। 'এ-আর-পি / বাংলাকে রেঙ্গুন হইতে দিব না'—জ্যোতি বসু (পৃষ্ঠা ৭)। 'একতা আগে, হাতিয়ার পরে'—বিনয় ঘোষ এবং 'রংপুরের চিঠির উত্তর' ও 'জায়গা খালি করা' শীর্ষক অস্বাক্ষরিত দুটি রচনা (পৃষ্ঠা ৮)। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র-সম্মেলন'—শঙ্কর রায়চৌধুরী (পৃষ্ঠা ১১)।

দ্বাদশ পৃষ্ঠায় এক কোণে প্রকাশিত হল :

" 'জনযুদ্ধে'র নিয়মাবলী।

" 'জনযুদ্ধ' এখন হইতে প্রত্যেক সপ্তাহের শনিবারে প্রকাশিত হইবে। এই ১লা মে সংখ্যা বিশেষ সংখ্যা বলিয়া ১২ পৃষ্ঠা কাগজ করা হইল। কিন্তু পরের সংখ্যাগুলি ৮ পৃষ্ঠাই থাকিবে। প্রতি সংখ্যা মূল্য এক আনা। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৷৹ ও ষান্মাসিক মূল্য ১৸৹ আনা। মণি অর্ডার যোগে মূল্য অগ্রিম পাঠাইবেন—ভিঃ পিঃ করা হয় না। মফস্বলের কাহাকেও ১৫ খানার কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য ডিপোজিট দিতে হয়। কাগজ পাঠাইবার খরচ এজেন্টদের দিতে হইবে।

"জনযুদ্ধ কার্য্যালয়"

২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কিষাণ সভা অফিস।"

প্রথম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা (২২ জুলাই ১৯৪২, ৬ শ্রাবণ ১৩৪৯, বুধবার) থেকে প্রথম বর্ষ সপ্তদশ সংখ্যা (২৬ আগস্ট ১৯৪২, ৯ ভাদ্র ১৩৪৯, বুধবার) পর্যন্ত 'জনযুদ্ধ'র "জনসাধারণের রাজনৈতিক সাপ্তাহিক" এই ঘোষণাটি ছাপা হয় নি।

সাপ্তাহিকের ঐ প্রথম বর্ষ সপ্তদশ সংখ্যার শেষ পাতায় 'এই সব কমরেড মুক্ত' শিরোনামায় এক লম্বা তালিকা প্রকাশিত হয়। কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীদের গতিবিধি সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার বা তাঁদের নামে জারী গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাতিল করার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার ফলে বোঝা যায় কমিউনিস্ট পার্টি এবার প্রকাশ্যে আইনসঙ্গতভাবেই কাজ করতে পারবে।

অবশেষে প্রথম বর্ষ অষ্টাদশ সংখ্যা (• সেপ্টেম্বর ৯৪২, ১২ ভাদ্র ১৩৪৯, বুধবার) থেকে 'জনযুদ্ধ'কে "কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র" হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

বাঙলা সাংবাদিকতার ইতিহাসে 'জনযুদ্ধ' বহু দিকচিহ্নের স্রষ্টা। বাঙলা সংবাদপত্রে নিয়মিত 'রিপোর্টাজ' রচনার রেওয়াজ 'জনযুদ্ধ'ই সৃষ্টি করে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় সোমনাথ লাহিড়ীর নেতৃত্বে অপরিসীম দক্ষতার সঙ্গে 'জনযুদ্ধ' যে ভূমিকা পালন করে, তা পৃথিবীর যে কোনো ভাষার সাংবাদিকতারই গৌরব। ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনেও 'জনযুদ্ধ' ছিল সর্বতোভাবেই অগ্রগণ্য। চল্লিশের দশকে বাঙলার শিল্পী-সাহিত্যিকরা যে-যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেন—কমিউনিস্ট পার্টি ও 'জনযুদ্ধ' পত্রিকাই তাকে জননীর স্নেহে ও সতর্কতায় লালন করে। সর্বোপরি, জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে 'জনযুদ্ধ'র ভূমিকা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সমাজমানসকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত করার ব্রতও সে পালন করে। তাছাড়া, ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর পক্ষে এবং সাম্প্রদায়িকতা বা ইত্যাকার অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে 'জনযুদ্ধ'কে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে যেতে হয়। কিংবদন্তীতে পরিণত এই পত্রিকার ইতিহাস আজও রচিত হয় নি এটা সমগ্র জাতিরই দুর্ভাগ্য। হীরেন্দ্রনাথের প্রবন্ধটিতে বানান (যেমন সোভিয়েট=সোভিয়েত, ফ্যাশিজম্ =ফ্যাসিজম, জার্মনী=জার্মানি, ইত্যাদি) ও যতিচিহ্নের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক]

মুমূর্ষু ধনতন্ত্রের জঘন্য বিকাররূপে যখন ফ্যাসিজমের উদ্ভব ঘটেছিল, তখন থেকেই সকল দেশের মুক্তিকামী, সকল দেশের জনসাধারণ, তাকে নিজেদের পরম শত্রু বলে মনে করে এসেছে।

আসন্ন বিপ্লবের আশংকায় দিগ্বিদিক্‌শূন্য হয়ে পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদ এই ফ্যাসিজমের শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করে এসেছে। এশিয়ায় জাপানকে, আফ্রিকায়

ইতালিকে, ইয়োরোপে জার্মানিকে ইংরেজ-ফরাসী-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ উৎসাহ দিয়েছে, সাহায্য করেছে, ছলে বলে কৌশলে দেশের জনসাধারণের ফ্যাসিজম-বিরোধকে নিষ্ফল করে দিয়েছে, আর বকধার্মিকের মতো নিজেদের গণতান্ত্রিক বলে পরিচয় দেবার চেষ্টা করে এসেছে।

এর কারণ ফ্যাসিজমের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদ যে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল, ফ্যাসিজমের দংশনভয় যে তার ছিল না, তাও নয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের ভরসা ছিল ফ্যাসিস্টরা প্রথমে আক্রমণ করবে দুনিয়ার মালিকদের চক্ষুশূল সোভিয়েতভূমিকে। সে আক্রমণে প্ররোচনা ও সমর্থনের অভাব তাদের হবে না, আর সোভিয়েতভূমিকে বিধ্বস্ত করতে পারলে, একবার পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশে অধিকার বিস্তার করতে পারলে, সোভিয়েৎদেশের বিপুল ঐশ্বর্য করায়ত্ত করতে পারলে, তাদের শক্তিলালসা চরিতার্থ হবে। প্রাচীন, সুপ্রতিষ্ঠ সাম্রাজ্যগুলির সঙ্গে ফ্যাসিজম আর লড়তে চাইবে না। এতে শুধু যে সাম্রাজ্যবাদই লড়াই এড়িয়ে যাবে তা নয়, সোভিয়েতকে ধ্বংস করার ফলে সবত্রই মুক্তি-আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সাম্যবাদী গণশক্তিকে চূর্ণ করা যাবে।

সাম্রাজ্যবাদের এ আশা ছলনামাত্র বলে প্রমাণ হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তকে ইতিহাস ব্যর্থ করে দিয়েছে। যে সাপকে দুধ কলা দিয়ে পোষা হয়েছিল, তা আর পোষ মানতে রাজী হয় নি, ফণা তুলে কামড়াতে এসেছে।

প্রায় আড়াই বছর আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এইভাবে শুরু হয়ে গেছল। তখন থেকে সাম্রাজ্যবাদের সংকট বেড়ে চলেছে। ফ্যাসিজমের প্রবল প্রতাপের সামনে ফ্রান্স মাথা নিচু করেছে, সারা ইয়োরোপ একটা গোলামখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংরেজ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের ভবিষ্যৎ ক্রমেই অন্ধকার হয়ে উঠেছে।

সাম্রাজ্যবাদের সংকট এমনই ঘোরালো হয়ে উঠেছিল যে ন-মাস আগে যখন হিটলার তার দলপালকে সোভিয়েত আক্রমণ করার হুকুম দিল, তখন ইংরেজ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ আর পরিত্রাণের আশা করতে পারল না, হিটলারের আমন্ত্রণে সোভিয়েত-আক্রমণে যোগ দিতে পারল না। ইতিহাসের চাকা এমন-ভাবে ঘুরে গেছল, সোভিয়েত-মৈত্রী দেশে দেশে এমনভাবে ছড়িয়ে গেছল, যে, ফ্যাসিজমবিরোধী গণশক্তিকে আর উপেক্ষা করা চলল না। যা মাত্র কিছুকাল আগে ছিল একেবারে অভাবনীয়, সে-ই ঘটল। ইংরেজ আর আমেরিকান

সরকার সোভিয়েতের সঙ্গে চুক্তি করল, নামজাদা সোভিয়েতবিরোধীরা সোভিয়েত-প্রীতি প্রচার করতে বাধ্য হল।

গণশক্তির একটা বিরাট সুযোগ এল—যুদ্ধ চালিয়ে ফ্যাসিজমকে ধ্বংস করে নতুন দুনিয়া গড়ার সুযোগ এল।

জাপান যখন লড়াইয়ে নামল তখন সর্বদেশের গণ-আন্দোলনের কর্তব্য আরও পরিষ্কার হয়ে গেল। আমাদের দেশের দরজায় যুদ্ধ এসে পৌঁছেছে—আমরা চাই বা না চাই, আমাদের জীবনকে লণ্ডভণ্ড করার ভূমিকা আরম্ভ হয়ে গেছে। যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা নির্বিকার ঔদাসীন্য আর সম্ভব রইল না। জাগ্রত চীনের বীর জনসাধারণের সংগ্রামের সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম যুক্ত হয়ে গেল। সাম্যবাদী সোভিয়েত আর বিপ্লবী চীন হল সর্বদেশের জনসাধারণের পুরোধা। জনযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু সবাই বুঝল না; কত বড় একটা পরিবর্তন যে ঘটে গেল, তা সবাই ধরতে পারল না। কেউ কেউ বলল যে ফ্যাসিজম আর সাম্রাজ্যবাদে লড়াই—আমাদের তাতে কি? আমাদের কাছে দুই-ই সমান, আর হয়তো ফ্যাসিস্টরা আমাদের প্রভুদের তাড়িয়ে দিলে আমাদেরই স্বাধীন হবার রাস্তা খুলে যাবে। আরও শোনা গেল যে ফ্যাসিস্টরা ক্রমাগতই এ দেশকে উদ্দেশ করে বলছে যে আমাদের সঙ্গে তাদের কোনো ঝগড়া নেই, আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা তারা চায়, সুতরাং ইংরেজের বিরুদ্ধে তাদেরই বরং আমাদের সাহায্য[১]

এই অলীক মোহ যদি আমাদের আচ্ছন্ন করে থাকে তো সমূহ বিপদ উপস্থিত হবে। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে যে খাল কেটে কুমীর নিয়ে আসাটা কিছু কাজের কথা নয়। দেশের উপকার করছি ভেবে ফ্যাসিস্ট কুমীরকে লোভ দেখিয়ে আনা হচ্ছে আত্মহত্যারই নামান্তর।

জার্মানিতে তো ফ্যাসিস্টরা নিজেদের সোশ্যালিস্ট বলে পরিচয় দিত। কিন্তু সেখানে শ্রমিকশ্রেণীর যে দারুণ দুর্গতি ঘটেছে, তা সকলেই জানে। ইতালিতে জনসাধারণের ঐ একই অবস্থা। জাপানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বড়লোক সর্বেসর্বা; সেখানকার গরিবদের আফিম গেলানোর মতো বোঝানো হয় যে সম্রাটের জন্য তারা যেন সব রকম স্বার্থত্যাগ করে, নিজেদের দাবিদাওয়া ছেড়ে দেয়, দরকার হলে প্রাণ দেয়। যেখানে ফ্যাসিস্টদের আধিপত্য, সেখানেই সাধারণ লোকের চরম বিপত্তি।

১. বাক্যটি অসমাপ্ত ছিল। মনে হয় পড়তে হবে "সাহায্য করা উচিত।"

গরিবদের দাবিয়ে রাখো; লেখাপড়া, শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান রসাতলে যাক—শুধু মারণাস্ত্র তৈরি করার জন্য বিজ্ঞানকে ব্যবহার করো; সকলকে বোঝাও যে কয়েকজন নেতার হুকুম তামিল করাই সবচেয়ে বড় কর্তব্য; যুদ্ধই জীবনের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা, সুতরাং বিনা আপত্তিতে মানুষ যুদ্ধের রসদ হোক—এই হচ্ছে ফ্যাসিস্টদের কথা। মিথ্যা প্রচার করে, বিরোধীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে, ফ্যাসিস্টরা প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। কদর্য নির্যাতনে তাদের সমকক্ষ কোথাও নেই।

হিটলার "পবিত্র জার্মান আর্যদের" নেতা; সুতরাং যাঁরা—

"মোক্ষমুলার বলেছে আর্য্য,
"তাই শুনে মে'রা ছেড়েছি কার্য্য,
"মোরা বড় বলে করেছি ধার্য্য,
"আরামে পড়েছি শুয়ে"—

তাঁদের নাকি দারুণ উল্লাস হয়ে থাকে। কিন্তু যদি আমরা ইহুদি, মার্কসিস্ট লিবারাল, খ্রীষ্টান প্রভৃতির উপর হিটলারের অকথ্য অত্যাচারের কথা ভুলতেও রাজী থাকি, তবু ভুলতে পারি না যে হিটলার ভারতবাসী সম্বন্ধে ঘৃণা উদ্গার করতে কখনও কুণ্ঠিত হন নি। ভুলতে পারি না যে "Honorary aryans" হতে হলে জাপানের মতো আমাদেরও ফ্যাসিজমের কলঙ্ককালিমা মাখতে হবে।

ফ্যাসিস্টরা শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করেছে; সাম্যবাদের তারা চিরশত্রু; স্বাধীন চিন্তা তারা উৎপাটিত করেছে; সভ্যতার বিরুদ্ধে বর্বর অভিযান তারা সর্বত্র চালিয়েছে। এশিয়া-আফ্রিকা-ইয়োরোপে যেখানেই তারা গেছে সেখানেই হাহাকার, সেখানেই মানুষের পায়ে নতুন কড়া শিকল তারা লাগিয়েছে। সারা ইয়োরোপ আজ হিটলারের পদানত। আফ্রিকায় পুরনো রোমান সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠাই হচ্ছে মুসোলিনির স্বপ্ন; তাই ইসলামের রক্ষক বলে যখন নিজেকে প্রচার করে তখনই বিনা কারণে মুসলমান রাজ্য আলবেনিয়া আক্রমণ করতে তার সংকোচ হয় নি। "এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য"—এই রব তুলে জাপান চীনের উপর আজ দশ বৎসর ধরে কদর্য আক্রমণ চালিয়ে আসছে—কোরিয়া, ফর্মোজা, মাঞ্চুরিয়াতে সাম্রাজ্য স্থাপন করেও সন্তুষ্ট হয় নি। যত তারা এ দেশের দিকে এগিয়ে আসছে, ততই তাদের ভণ্ডামির পরাকাষ্ঠা আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি।

ফ্যাসিস্টরা আমাদের স্বাধীন করে দেবে ভাবার মতো বাতুলতা আর নেই।

তারা অবশ্য কখনও বলতে ইতস্তত করে নি যে সাম্রাজ্যবিস্তার তাদের উদ্দেশ্য। আজ শুধু তারা যুদ্ধজয়ের জন্য আমাদের কানে কুহক-বার্তা পাঠাচ্ছে—"ভারতবর্ষ ভারতবাসীদের জন্য", "এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য"। তাদের আসল মতলব কিন্তু সকলের কাছেই পরিষ্কার হওয়া উচিত।

এ দেশে অনেক বারই আমরা খাল কেটে কুমীর ডেকে এনেছি। এটা হচ্ছে জয়চাঁদ, সংগ্রামসিংহ, মীরজাফরের দেশ। এখানে যে কেউ ভাববে যে জাপান এলে আমরা স্বাধীন হয়ে যাব, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

তাই আজ জোর করে বলার সময় এসেছে যে ফ্যাসিস্ট বর্বরদের সাহায্যে স্বাধীনতার স্বপ্ন হচ্ছে একটা বিষাক্ত মোহ। এ দারুণ মোহান্ধতা, এ জঘন্য ক্লৈব্য আমাদের ত্যাগ করতেই হবে।

সোভিয়েতের যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

[সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে বাঙলার প্রগতিশীল সাংবাদিকতার 'পিতামহ' বলা হয়। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র গৌরবের যুগে সত্যেন্দ্রনাথ তার সম্পাদক ছিলেন। পরে তিনি সাপ্তাহিক 'অরণি'র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক হন।

বাঙলার প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের ছিল নাড়ির যোগ। তাঁরই সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দুটি বিখ্যাত সভা থেকে 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ' ও 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি' গঠিত হয়। এই দুটি সংগঠন এবং 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'র সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বস্তুত, তাঁর বাড়ি এক সময় প্রগতিশীল ফ্যাসিবিরোধী সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তাঁর সহোদরা-কন্যা শান্তি ভাদুড়ীকে অরুণ মিত্র বিবাহ করেন, স্বামী-স্ত্রী তাঁরা ঐ বাড়িরই এক অংশে ভাড়া থাকতেন; সত্যেন্দ্রনাথের অপর ভাগিনেয়ী তৃপ্তি ভাদুড়ী (তৎকালে কলেজের ছাত্রী ও ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী, পরে শম্ভু মিত্রকে বিবাহ করেন) তাঁর অভিনেত্রীজীবনের সূচনাপর্বে ঐ বাড়িতে থাকতেন; তাঁর এক ভাগিনেয় বিজন ভট্টাচার্যও এক সময় ঐ বাড়িতেই ছিলেন; জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নবজীবনের গান'-এর বহু অংশ ঐ বাড়িতেই প্রথম গাওয়া হয় [দ্র. 'আমাদের নবজীবনের গান']। গণনাট্য আন্দোলনের 'ট্রায়ো' বিজন ভট্টাচার্য-শম্ভু মিত্র ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং 'অরণি' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত প্রগতি লেখক সংঘের অরুণ মিত্র-স্বর্ণকমল-বিনয় ঘোষ-সরোজ দত্ত প্রমুখের নিয়মিত আশ্রয় ছিল সত্যেন্দ্রনাথেরই বাড়ি।

তিনি কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ছিলেন। প্রতিক্রিয়া যখনই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তার বহুমুখী আক্রমণ শুরু করেছে, অবিচল সত্যেন্দ্রনাথকে তখনই অকুতোভয়ে কমিউনিস্টদের পাশে দাঁড়াতে ও তাঁর সম্পাদকীয় কলমটিকে শাণিত তরোয়ালের মতো ব্যবহার করতে দেখা গেছে।

রসিক সদালাপী সত্যেন্দ্রনাথের মুখের বহু গল্প আজও সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক আড্ডায় শোনা যায়। তাঁর সম্পাদকীয় রচনার বহু পংক্তিই প্রবচনে পরিণত হয়েছে।

পাক্ষিক 'জনযুদ্ধ'র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা (১ এপ্রিল ১৯৪২, ১৮ চৈত্র ১৩৪৮, বুধবার) থেকে আমরা তাঁর 'সোভিয়েটের যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ' প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করলাম। বানান (যেমন নাৎসী=নাৎসি, সোভিয়েট=সোভিয়েত, ফাসিস্ত=

ফাশিস্ত, বৃটেন = ব্রিটেন, কোন = কোনো, মত = মতো, প্রভৃতি) ও যতিচিহ্নে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক]

বিশ্বাসঘাতক নাৎসি নায়কগণ যেদিন অতর্কিতে সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করিয়াছিল, সেইদিন হইতেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের স্বরূপে রূপান্তর ঘটিয়াছে। এই রূপান্তর উপলব্ধি করিয়াছিলেন সর্বপ্রথম সাম্যবাদীরা। তাঁহারা যখন বলিলেন যে, আত্মরক্ষার্থে অগ্রসর সোভিয়েতের যুদ্ধ আমাদেরই যুদ্ধ, অর্থাৎ নিপীড়িত ও শোষিত জনসাধারণের যুদ্ধ, তখন অন্তত আমাদের দেশে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে বিদ্রূপ শুনিয়াছি। তাহাদের স্থূল যুক্তি হইল এই যে, সোভিয়েত লড়িতেছে নিজেদের দেশ ও জাতির জন্য। তাহা লইয়া পরাধীন ভারতের মাথা ঘামানোটা হয় অনধিকার চর্চা, নয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে বুলির ভাঁওতায় কায়েম করিবার চেষ্টা। তাহাদের আর একটা ভরসা ছিল যে, দুই-তিন মাসের মধ্যেই জার্মানি লড়াই ফতে করিবে। কিন্তু দেখা গেল পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ববৃহৎ যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া অজেয় বলিয়া প্রচারিত বিপুল নাৎসি বাহিনীকে হটাইয়া দিল। জয়-পরাজয় এখনও অনিশ্চিত; কিন্তু আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত একটা বৃহৎ দেশের মানবসমষ্টির ঐক্যবদ্ধ সংকল্প যে অসাধ্য সাধন করিতে পারে, তাহা প্রমাণিত হইল। যাহাদের মনে মুক্তির কোনো ভরসা ছিল না, যাহারা নাৎসি আধিপত্য বরণ করাই বিধিলিপি মনে করিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়াছিল, তাহারাও বুঝিতে পারিল আপাত প্রতীয়মান দুর্বল জাতি এই দুর্দিনেও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে পারে এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে পরাহত করিবার মতো বল সঞ্চয় করিতে পারে, যদি তাহারা যুদ্ধকে দেশবিশেষ বা রাষ্ট্রবিশেষের সংকীর্ণ ও কৃত্রিম পরিধিকে অতিক্রম করিয়া সম্যক দেখিতে ও বুঝিতে পারে। আজ আমরা তাহাই দেখিতেছি। সকল দেশেই ফাশিস্ত-বিরোধী 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' গঠনের চেষ্টা দেখিতেছি। সাম্যবাদীরাও এই কথাই শ্রেণীনির্বিশেষে সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং আজ তাঁহাদের চেষ্টা বহু বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কিঞ্চিৎ সাফল্যের সন্ধান পাইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের ভয়চকিত সন্দেহাতুর শাসকগণের বিকৃত চিন্তা এবং এক শ্রেণীর স্বদেশবাসীর চিত্তে পরের অনুগ্রহে পরিত্রাণ পাইবার নির্বোধ আশা ইহার অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে।

কিন্তু এই বাধা অনতিবিলম্বে অপসারিত হইবে। জাপ-সাম্রাজ্যবাদের

অতর্কিত আক্রমণ ও অগ্রগতি আজ ভারতকে যে ধ্বংসের মধ্যে টানিয়া লইবার উপক্রম করিয়াছে তাহা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র পথ সোভিয়েত রাশিয়ার অবলম্বিত পথ। সোভিয়েত রাশিয়ার আদর্শ গ্রহণ করিয়াই চীন আজও স্বাধীনতার সংগ্রামক্ষেত্রে দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া আছে। এই আদর্শের প্রভাবেই ব্রিটেনের সাম্রাজ্যনীতির ব্যবস্থার অচলায়তনে নূতন ভাব প্রবেশ করিয়াছে। যাঁহারা একদা নিজেদের অপরের প্রভু ছাড়া কিছুই ভাবিতে পারিতেন না, তাঁহারা আজ মিত্ররূপে দেশে দেশে হস্ত প্রসারণ করিতেছেন। প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদের বাঁধ ভাঙিয়া আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভাবধারা বন্যার মতো বেগমান হইয়া ব্রিটেনের জাতীয় জীবনে সকল বিভাগে প্রবেশ করিতেছে। এবং তাহারই তরঙ্গাভিঘাতে ভারতবর্ষও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সোভিয়েত-প্রদর্শিত জনযুদ্ধের নিয়ম-প্রণালী তথ্য ও সাধনা ভারতের স্বাধীনতাকামীদের গ্রহণ করিতেই হইবে, এ সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনো সংশয় নাই।

অথচ অত্যন্ত পরিতাপের কথা, কেবল যে আমাদের রক্ষণশীল শাসকেরা ইহা বুঝিতে বিলম্ব করিতেছেন, তাহা নহে; সাম্যবাদের প্রতি বৃথা আক্রোশ বশত একদল লোক ফাশিস্ত-বিরোধী সর্বদলীয় সংঘ গঠনের বিরোধিতা করিতেছেন। ইহারা একপ্রকার অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট জাতীয়তাবাদের আবরণে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াই বাহবা কুড়াইতে ব্যস্ত। আজ যদি সোভিয়েত রাশিয়া নাৎসি বর্বরতার অভিযানের গতিরোধ না করিত এবং পূর্ব-এশিয়ার শীর্ষে সোভিয়েত চতুরঙ্গ বাহিনী প্রস্তুত হইয়া না থাকিত, তাহা হইলে বার্লিন-টোকিওর মিলিত অভিযান তাঁহাদিগকে বাহবা কুড়াইবার অবসর দিত না। সোভিয়েত রাশিয়ার জনযুদ্ধের কৌশল আজ ভারতের স্বাধীনতাকামীদের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছে। এই কারণেই জাতীয় কংগ্রেসের মতো প্রতিষ্ঠান গান্ধিজীর অহিংসার পাশ মুক্ত হইয়া দেশরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের কথা চিন্তা করিতে পারিতেছেন। প্রবলের আক্রমণ হইতে জাতীয় স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে যে মূল্য দিতে হয় ভারতকেও তাহাই দিতে হইবে। ফাশিস্তবিরোধী যুদ্ধ ভারতবর্ষেরও যুদ্ধ, এই বাস্তব সত্যের সহিত আমরা আজ মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছি। ব্রিটেনও এই সত্যকে অস্বীকার করিতে পারিতেছে না। এই সন্ধিক্ষণে দলাদলি ভুলিয়া প্রগতিশীল স্বাধীনতাকামী জাগ্রত নরনারীদের কর্তব্য ফাশিস্ত বিরোধী সংঘে যোগদান করা। আমরা দেখিয়া সুখী হইয়াছি এইভাবে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবার

জন্য কারাপ্রাচীরের অন্তরাল হইতে বন্দীবীরেরাও স্বদেশবাসীর নিকট আবেদন করিয়াছেন।[১] সোভিয়েতের রক্তপতাকা নিপীড়িত মানবের মুক্তিপতাকারূপে এখনও সগর্বে উড্ডীন থাকিয়া অবিশ্বাসী ও অল্পবিশ্বাসীর সংশয় মোচন করিতেছে। ভারতের জাতীয় পতাকাও ঐ রক্তপতাকার গৌরব মর্যাদা অর্জন করিবে, যদি আজ আমরা সম্মিলিত হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে তাহা ধারণ করি এবং ঘোষণা করি যে সোভিয়েত যুদ্ধ ও আমাদের সংগ্রামের মধ্যে মূলত কোনো ভেদ নেই।

১. সম্ভবত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বন্দীবীরদের বিখ্যাত বিবৃতিটি প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করা হয়েছে। কারান্তরাল থেকে পাঠানো আরও কয়েকটি বিবৃতি এই সময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। যেমন:

ঢাকা জেল হইতে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও অন্যান্য মামলার বন্দী কমরেড গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, মোক্ষদা চক্রবর্তী ও প্রিয়দা চক্রবর্তী চট্টগ্রামে বোমা বর্ষণের সংবাদে কমরেড পূর্ণেন্দু দস্তিদারের কাছে নিম্নলিখিত তার পাঠাইয়াছেন:—

"চট্টগ্রামের জনসাধারণের প্রতি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি। স্থির প্রতিজ্ঞায় অটল হইয়া দাঁড়ান। চট্টগ্রামের জনগণই জাপানী ঘাতকদের মারিয়া হটাইবে।

'জনযুদ্ধ'। ৩০ মে ১৯৪২, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯

জেল হইতে সংগ্রামপন্থীর ঘোষণা / সমস্ত ভেদাভেদ ভুলিয়া এক সাথে জাপানীকে / রুখিতে হইবে

রাজসাহীর একজন 'সংগ্রামপন্থী' নেতা দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ওরফে গোরা / মৈত্র স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির একজন কমরেডের কাছে রাজসাহী / সেণ্টাল জেল হইতে নিম্নলিখিত চিঠি লিখেন:—

প্রিয়…

…আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দিন দিন ঘোরালো হয়ে উঠছে দেখে / মনের ভিতর নানা সমস্যায় নানা চিন্তাধারা আমার ব্যাকুল করে তুলেছে। / বর্বর জাপানী তার রক্তচক্ষু নিয়ে আমাদের সোনার বাংলার বুকে হানা / দিচ্ছে। ঘোর দুর্দিন এসে পড়েছে। তাই তোমাদিগকে দু'একটা কথা / স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। বাংলার এই সংকটের দিনে সমস্ত বাক্‌বিতণ্ডা / ভুলে সকলের সঙ্গে মিশে বর্বর জাপানীকে সমূলে ধ্বংস করতে হবে। / এই হবে আমাদের একমাত্র পণ।…ইতি— তোমাদের গোরাদা

'জনযুদ্ধ'। ৫ মে ১৯৪৩

কারামুক্তির পরও কমিউনিস্ট রাজবন্দীরা একাধিক বিবৃতি প্রকাশ করেছেন।
—সম্পাদক

সংস্কৃতি আন্দোলনের নূতন ধারা

চিন্মোহন সেহানবীশ

['জনযুদ্ধ'র দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা (২৮ এপ্রিল ১৯৪৩, ১৫ বৈশাখ ১৩৫০, বুধবার) ছিল বর্ধিত মূল্য (তিন আনা) ও কলেবরে প্রকাশিত 'নববর্ষ সংখ্যা'। 'সংস্কৃতি আন্দোলনের নূতন ধারা' এই বিশেষ সংখ্যাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। চিন্মোহন সেহানবীশ বাঙলায় প্রগতি সাহিত্য ও গণসংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠক। 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি'র আন্দোলন এবং লেখক-শিল্পীদের ফ্যাসিস্টবিরোধী সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডেও তাঁর বিশিষ্ট অবদান আছে। চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের তিনি ছিলেন অন্যতম নেতা।

২৬ জানুয়ারি ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলন' নামে অস্বাক্ষরিত ও দীর্ঘ একটি রচনায় সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলনের (১৫-১৭ জানুয়ারি ১৯৪৪) যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাতে প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে : "যুক্ত প্রদেশ প্রগতি লেখক সঙ্ঘের শিবদাস সিং চৌহান, নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের যুক্ত সম্পাদক বিষ্ণু দে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার আবদুল্লা রসুল সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান। ইহার পর সঙ্ঘের বিদায়ী সম্পাদক চিন্মোহন সেহানবীশ গত বছরের কাজের বিবরণী পাঠ করেন।..."

লক্ষণীয় যে উদ্ধৃতির শেষাংশ তথ্য হিসেবে নতুন।

'ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'র সংগঠন সমিতি গঠিত হয় ২৮ মার্চ ১৯৪২ সালে (সভাপতি : অতুলচন্দ্র গুপ্ত, যুগ্মসম্পাদক : বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়)। ঐ বছরই ১৯-২০ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনে সংঘের যে নতুন কার্যকরী সমিতি নির্বাচিত হয়, তার পুরো তালিকা হচ্ছে :

সভাপতি : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সহ সভাপতি : যামিনী রায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। 'অর্থাগারিক' : অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী। সভ্য : বুদ্ধদেব বসু, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, প্রমথনাথ বিশী, আবু সয়ীদ আইয়ুব, স্নেহাংশু সেনগুপ্ত, হিরণকুমার সান্যাল, সজনীকান্ত দাস, অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, আবদুল কাদির, বিনয় ঘোষ, মহীউদ্দিন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবিশ[১]।

১. হবে 'সেহানবীশ'।

সম্পাদক : সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে। [দ্র. "ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের পক্ষে ২৪৯ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত" ও বিষ্ণু দে রচিত কাব্যপুস্তিকা '২২শে জুন']

'জনযুদ্ধ'র ২৮ এপ্রিল ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত চিন্মোহন সেহানবীশের প্রবন্ধটিতেও বলা হয়েছে : "কবি বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় এর যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হলেন।"

অথচ, আট মাস পরে ২৬ জানুয়ারি ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত 'জনযুদ্ধ'র উপরে উদ্ধৃত রচনায় (আসলে যা সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলনের রিপোর্ট) বলা হচ্ছে সংঘের বিদায়ী সম্পাদক ছিলেন চিন্মোহন সেহানবীশ। রচনায় কোথাও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখ নেই। আর, এই সম্মেলনকে বিষ্ণু দে অভিনন্দন জানিয়েছেন "নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের যুক্ত সম্পাদক" হিসেবে, 'ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'র যুগ্মসম্পাদক রূপে নয়।

এই সম্মেলন নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্যান্য সদস্য : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শচীন দেববর্মণ, অতুল বসু, গোপাল হালদার, আবুল মনসুর আহম্মদ। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রথম 'ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'য় যোগ দিলেন। প্রথম সম্মেলনে নির্বাচিত কমিটি কি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল? "বিদায়ী সম্পাদক" হিসেবে সে কারণেই কি চিন্মোহন সেহানবীশকে দ্বিতীয় সম্মেলনে "গত বছরের কাজের বিবরণী" পাঠ করতে হয়?

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস রচনার কাজে নিযুক্ত চিন্মোহন সেহানবীশ বর্তমানে দিল্লী আছেন। এ বিষয়ে তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করা তাই সম্ভব হয় নি।

'সংস্কৃতি আন্দোলনে নূতন ধারা' আজও নানা কারণে প্রয়োজনীয়। লেখকের বহু পঠিত পুস্তিকা '৪৬ নম্বর'ও বিবিধ তথ্যের আকর।

পুনর্মুদ্রণকালে রচনাটির বানান ও যতিচিহ্নের আবশ্যিক পরিবর্তন করা হয়েছে।—সম্পাদক]

২১-এ জুন ১৯৪১। রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি বহু মনীষী এক বিবৃতিতে নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইঙ্গিত সোভিয়েতভূমির পরে বর্বর নাৎসি

বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। সদ্যোজাত সোভিয়েত-সুহৃদ-আন্দোলন বহু বুদ্ধিজীবীকে আকর্ষণ করল। গান, প্রাচীরপত্র ও পুস্তিকার মধ্য দিয়ে এই নূতন সংস্কৃতির সঙ্গে সোভিয়েত সুহৃদ সঙ্ঘ১ জনসাধারণের পরিচয় ঘটাতে লাগল। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় এই সময়ে তাঁর অধুনা-বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'অরণি' প্রকাশ আরম্ভ করলেন। তাঁর চারদিকে এসে জুটলেন জন-কয়েক তরুণ ও শক্তিশালী মার্কসবাদী লেখক যাঁরা এতদিন বিভিন্ন পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে কোনোগতিকে প্রগতি আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। কমরেড বিনয় ঘোষের সাহিত্য-সমালোচনা ও সোভিয়েত সভ্যতা সম্পর্কে লেখা বইগুলি ইতোমধ্যেই পাঠকসমাজে চাঞ্চল্য এনেছিল। তিনি ও আরও অনেকে 'অরণি'র মধ্য দিয়ে বেশ একটা বলিষ্ঠ ভাবধারা প্রবাহিত করতে লাগলেন। ১৯৪২ সালের ৭ ডিসেম্বর পূর্বপ্রান্তে জাপানের তড়িৎ আক্রমণ ফ্যাশিস্ট বিপদের আসন্নতা বুদ্ধিজীবীকে আরও সজাগ করে তুলল। ছাত্রেরা একটি 'সংস্কৃতি বাহিনী'র সাহায্যে নাটক, গান ও প্রাচীরপত্রের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গের জিলাগুলিতে জাপ-বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে লাগল। তরুণ কবি সুভাষ মুখার্জির "বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ" গানটি এই সময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

এই সময়ে একটি ঘটনা বাঙলাদেশের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মনকে বিশেষ-ভাবে নাড়া দিল। ১৯৪২-এর ৮ মার্চ তারিখে কমরেড সোমেন চন্দ পঞ্চম বাহিনীর আক্রমণে প্রাণ হারান। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী। বোঝা গেল বিশ্বব্যাপী জনমুক্তির যুদ্ধে মজুর ও চাষীর পাশে সাহিত্যিকদেরও ডাক পড়েছে তাঁদের সৃষ্টি রক্ষার জন্য প্রাণপাতের। বাঙলাদেশের ছোটবড় সমস্ত লেখক এক অসম্ভ বিবৃতিতে এই বর্বর হত্যার প্রতিবাদ জানালেন। ছাত্র ফেডারেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রাচীর' নামক তাদের কবিতা সংকলন উৎসর্গ করা হল সোমেনের স্মৃতির প্রতি। সোমেনের মৃত্যুর অন্যতম প্রত্যক্ষ ফল হল ২৮-এ মার্চ তারিখে কলকাতার ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলন। এরই থেকে জন্ম হল 'ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'র।[২] তার সভাপতি হলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আর কবি বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় এর যুগ্মসম্পাদক নিযুক্ত হলেন।

১. 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি'র কথাই বলা হচ্ছে। —সম্পাদক

২. প্রকৃতপক্ষে ঐ সভা থেকে সংঘের একটি সংগঠনী সমিতি তৈরি হয়, তার সভাপতি হন অতুলচন্দ্র গুপ্ত। ঐ বছরই ১৯-২০ ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে নতুন যে কার্যকরী কমিটি হয়—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তার সভাপতি ছিলেন।—সম্পাদক

প্রথম থেকেই সংঘ বাঙলাদেশের বহু খ্যাতনামা কবি, নাট্যকার, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও অভিনেতার সহযোগিতা পেয়ে আসছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, অতুল গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হিরণকুমার সান্যাল, হুবিবুল্লা বাহার, আবু সৈয়দ আয়ুব, যামিনী রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই নানা ভাবে এ সংঘের কাজে সাহায্য করেছিলেন। পুস্তিকা প্রকাশ, আলোচনা সভা, সাহিত্যিক মজলিস, গণসঙ্গীতের আসর প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এদের কাজ এগিয়ে চলেছে। বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু, বিজন রায়, রাহুল সাংকৃত্যায়ন (মূল গ্রন্থ থেকে অনুবাদ), বিষ্ণু দে, বিনয় ঘোষ[৩] প্রভৃতির লেখা পুস্তিকা সংঘের তরফ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সব থেকে জনপ্রিয় হয়েছে তাদের 'জনযুদ্ধের গান'। এর দ্বিতীয় সংস্করণও (২০০০ কপি) সম্প্রতি নিঃশেষ হয়েছে।[৪]

১৯৪১ সালের ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর তারিখে সংঘের দ্বিতীয় অধিবেশন[৫] হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (মূল সভাপতি), হুবিবুল্লা বাহার, আবু সৈয়দ আয়ুব, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে সম্মেলনের সভাপতি-মণ্ডলী গঠিত হয়। বাঁকুড়া, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, যশোহর প্রভৃতি জেলা থেকে প্রতিনিধিবৃন্দ এতে যোগদান করেন। তা ছাড়া বাঙলার বাইরে থেকেও প্রতিনিধি বা অভিনন্দনলিপি মারফত সাড়া পাওয়া যায়। এই সম্মেলনের খবর দৈনিক পত্রিকাগুলিতে বেশ ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়।

সাহিত্যিক মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেও 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' এখন পর্যন্ত সংগঠনের দিক থেকে দুর্বল। শিল্পীদের কাছে এখনও যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যায় নি। অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ কর্মীর অভাব যথেষ্টই রয়েছে। অবশ্য সম্প্রতি শহরের বুদ্ধিজীবী আবহাওয়া ও স্বতঃস্ফূর্তি থেকে সংঘের আন্দোলনকে

---

৩. 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' বিনয় ঘোষের কোনো পুস্তিকা প্রকাশ করে নি। 'অরণি'র উদ্যোগে প্রকাশিত ও সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থমালা'র বিনয় ঘোষ দুটি পুস্তিকা লেখেন।—সম্পাদক

৪. 'জনযুদ্ধের গান'-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় এই প্রবন্ধ ছাপা হওয়ার মাত্র কিছুদিন পরে, মে ১৯৪৩ সালে।—সম্পাদক

৫. সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পীদের ২৮ মার্চের অধিবেশনকে কেউ বলেছেন প্রকাণ্ড সভা, কেউ বলেছেন প্রথম সম্মেলন। সম্ভবত সভা, বড়জোর কনভেনশন, বলাই সঙ্গত। সেই হিসেবে ১৯-২০ ডিসেম্বর সংঘের প্রথম সম্মেলন হয়েছিল—এ কথা বলাই বোধহয় ঠিক হবে।—সম্পাদক

সংগঠিত রূপ দেবার আন্তরিক চেষ্টা হচ্ছে। মফস্বল থেকেও বেশ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। নৈহাটি, দিনাজপুর, রংপুর, হাওড়া ও গাইবাঁধা থেকে ডাক এসেছে সংঘের কাছে এবং শীঘ্রই ঐখানে শাখা খোলবার চেষ্টা চলেছে। গান ও অভিনয়ের দুটি স্থায়ী দল দ্রুত গড়ে উঠেছে। বোম্বাইতে আগামী প্রগতি লেখক সম্মেলনে যোগদানের জন্য প্রায় পনরো জন প্রতিনিধি যাবেন। ঐ সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীর জন্য সংঘ থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নাম মনোনীত হয়েছে।

এইখানে বাঙলাদেশে গানের আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এর সূত্রপাত ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউটের আমল থেকে। সে আন্দোলন ছিল একান্তভাবে কলকাতার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ—মজুর, কিষানের সংগ্রামের সঙ্গে সে আন্দোলনের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। এই সময়কার কিছু গান নিয়ে কমরেড বিনয় রায় শুরু করেন তাঁর আন্দোলন। গোড়া থেকে তাঁর লক্ষ্য ছিল কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করা। বিটা কিষান সম্মেলন থেকে তিনি কিছু হিন্দী গান আনেন। ভারতভূষণ অগ্রবালের 'বড় চলো' গানও এই সময় পাওয়া গেল। এরই সাহায্যে 'সোভিয়েট সুহৃদ সঙ্ঘ'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধারম্ভের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে তিনি মাতিয়ে তুললেন সমস্ত জনসভাকে। এরপরে ডোমার কিষান সম্মেলনে তাঁর উত্তরবঙ্গের ভাষায় লেখা গেরিলা গান "হই হই হই" চাষীদের মাঝে বিপুল উন্মাদনার সৃষ্টি করল। মফস্বল থেকেও গান আসতে লাগল কিছু কিছু। বোম্বাই থেকে শেখা ও হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি হিন্দী গানও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গানের আন্দোলন যে মধ্যবিত্তের আওতা থেকে ক্রমেই জনসাধারণের দিকে এগোচ্ছে তার আর-এক প্রমাণ বিভিন্ন জেলার চলিত ভাষায় গান রচনা। মৈমনসিংহ-এর হাজং নামক আদিম জাতির মধ্যে জনযুদ্ধের গান ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা স্ত্রী-পুরুষ-শিশু একযোগে এই গান গায় ও সঙ্গে সঙ্গে নাচে। মিশনারী প্রভাবাধীন গারোদের মধ্যেও এই সুরের ছোঁয়াচ লাগছে। সম্প্রতি কমরেড বিনয় রায় উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের ১০টি জেলায় ঘুরে ১৩টি কেন্দ্রে ৯০ জনকে গান শিখিয়েছেন, স্থানে স্থানে গানের কেন্দ্র স্থাপন করে এসেছেন।

গোড়ার থেকেই এসব গান ছিল ফ্যাসিস্টবিরোধী, কিন্তু প্রথম প্রথম মনে হত এর সঙ্গে বুঝি দেশের মাটির যোগ নেই। বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদই যে আজ ফ্যাসিস্টবিরোধী রূপ নিতে বাধ্য এ সত্য তখনও কি রাজনীতিতে, কি সাহিত্যে,

কি গানে প্রতিফলিত হয় নি। কিন্তু পরে জনযুদ্ধের গানের সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীতের গোড়ার দিককার ব্যবধান গেল ঘুচে। জনযুদ্ধের গানই এ যুগের জাতীয় সঙ্গীতের রূপ নিল। "শোন মজুর কিষাণ দল" কিংবা কমরেড হেমাঙ্গ বিশ্বাসের "ও তোর সোনার ধানে বর্গী নামে" যে কোনো জাতীয় সঙ্গীতের মতোই মর্মস্পর্শী। কিন্তু এ শুধু 'স্বদেশী' যুগের অন্ধ পুনরাবৃত্তি নয়। ফ্যাসিস্টবিরোধিতা, ব্যাপক আন্তর্জাতিক দৃষ্টি ও চাষীমজুরের সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় এ গান আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। ভাষায় এল স্বচ্ছতা—বুদ্ধিজীবী প্যাঁচানো কথার জায়গায় এল সহজ ও মর্মস্পর্শী কথা। বর্তমানে 'ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' এই গানের আন্দোলনকে সংগঠিত করবার চেষ্টা করছে।

কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস প্রভৃতিতেও নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব দেখা যেতে লাগল যদিও সত্যকার সৃষ্টির দিক থেকে বড় কিছু এখনও দেখা দেয় নি। বুদ্ধিজীবীসুলভ ঘোলাটে ভাবের কোয়াশাও সম্পূর্ণ কাটে নি। তবে জনযুদ্ধের তাণ্ডব জনসাধারণের মধ্যে যে আলোড়ন এনেছে তার মুখে এ সমস্ত বাধা তৃণের মতো ভেসে যাবে। মুষ্টিমেয়র বিলাসের সামগ্রী থেকে সংস্কৃতি আজ গণআন্দোলনের মূর্ত প্রকাশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। চারদিকের সব লক্ষণ দেখে মনে হয় বাঙলা সংস্কৃতির ধারা আজ একটা বাঁকের মুখে।

সভ্যতা ও ফ্যাশিজম্

(সাহিত্যিকের জবানবন্দি)

বুদ্ধদেব বসু

['ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' প্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য এবং প্রায়-বিস্মৃত পুস্তিকা 'সভ্যতা ও ফ্যাশিজম্' পুনর্মুদ্রিত হল। ছাপার কয়েকটি সহজবোধ্য ভুল সংশোধন ছাড়া পুস্তিকার পাঠ আমরা সাধ্যমতো যথাযথ রাখার চেষ্টা করেছি। —সম্পাদক]

রাজনীতি আমার জীবনে কখনো আলোচ্য বিষয় ছিলো না। বাল্যকাল থেকে জেনেছি আমি কবি, আমি সাহিত্যিক, আমার মধ্যে যা-কিছু ভালো যা-কিছু খাঁটি তা রচনাচর্চাতেই একান্তে প্রয়োগ করেছি। এ-ব্যাপারে যেমন প্রবল আন্তরিক উৎসাহ অনুভব করেছি এবং আজ পর্যন্ত করি, তেমন আর কিছুতেই করি না এ-কথা স্বীকার করতে আমার বাধা নেই। ভালো লিখবো, আরো ভালো লিখবো—আমার সমস্ত জীবনের মূল প্রেরণীশক্তি এই ইচ্ছার মধ্যে নিহিত। এই রসের রাজ্যে অধিষ্ঠিত হ'য়ে রাজনীতির কোলাহল কখনো ভালো ক'রে আমার কানে পৌঁছয়নি। তার 'পরে আমার অন্তরের অবজ্ঞাই অনুভব করেছি। তার কারণ রাজনীতি বলতে বুঝেছি কপটাচরণ, ক্রূরতা, ধূর্ততা, ক্ষণিকের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ধ্রুব আদর্শের অবমাননা। শিল্পী মনের পক্ষে ও বস্তু বিশেষ লোভনীয় হ'তে পারে না।

রাজনীতির যে একটা বড়োরকমের সংজ্ঞা আছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পরাধীন দেশে পাওয়া সহজ নয়। আমাদের অ্যাসেমব্লি সভার বিতর্ক, আমাদের মন্ত্রীদের বক্তৃতা সবই যেন একটি অনুষ্ঠান মাত্র, তার পিছনে যথার্থ শক্তি নেই আর তাই এর অবাস্তবিকতা এক-এক সময় দুঃসহ হ'য়ে ওঠে। যার সঙ্গে বাস্তব জীবনের যোগ এত ক্ষীণ তার সম্বন্ধে সাধারণ লোকের উদাসীন হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। তবু এই পরাধীন দেশেই কখনো কখনো এমন একটি বিরাট আন্দোলন আবর্তিত হ'য়ে ওঠে যা সমগ্র দেশবাসীকে বিদ্যুৎস্পর্শে সচকিত ক'রে তোলে, এবং জাতির জীবনে স্থায়ীভাবে তার চিহ্নও রেখে যায়। এমন একটি আন্দোলনের দিন এসেছিলো বঙ্গভঙ্গের সময়, তখন আমাদের জন্ম-কাল। সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার কিছু নেই; কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গানে ও প্রবন্ধে যে ফসল তা ফলিয়েছিলো তা থেকে তার তীব্র উদ্দীপনাটি হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করতে পারি। তার পরের বড়ো আন্দোলন গান্ধিজির

অসহযোগ, তখন আমি নিতান্ত বালক। সে-হুজুগে মেতেছিলাম, চটের মতো মোটা খদ্দর পরেছিলাম, যে সব যুবকেরা সাত দিন, এক মাস কি তিন মাসের জন্য জেলে গিয়েছিলেন তাঁদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় ও ঈর্ষায় মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে ছিলো, এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আসবে না এমন অসম্ভব কথা যে বলে তাকে মনে মনে মূঢ় বলতে প্রস্তুত ছিলাম—কিন্তু আজ পিছনে তাকিয়ে দেখছি বালকবয়সের অন্যান্য অনেক উত্তেজনার মতোই সে হুজুগ আমার মন থেকে নিঃশেষে মরে গেছে, কোনো চিহ্ন রাখেনি। আমার গঠনে অসহযোগ আন্দোলনের কোনো হাত নেই।

তারপর মহাত্মার দ্বিতীয় আন্দোলন, তখন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বছর। আর সেই সঙ্গে পূর্ববঙ্গে সন্ত্রাসীদের রক্তাক্ত অভ্যুদয়। ছিলেম ঢাকায়; একদিকে ভারতব্যাপী সত্যাগ্রহের তুমুল বিপর্যয়, অন্যদিকে স্থানীয় শ্বেতাঙ্গ হত্যার উন্মত্ততা —চাটগাঁর অস্ত্রাগার লুঠ, খবরের কাগজ ও সিগারেট বন্ধ, গাঁজাখুরি গুজবে সমস্ত দেশের মাথা খারাপ হবার দশা—সব মিলিয়ে ১৯৩১-এর সেই গ্রীষ্মকাল আমার মনে নিদারুণ একটি স্মৃতি হয়ে আছে। লজ্জার বিষয় হ'লেও স্বীকার করবো দেশব্যাপী এই দু'মুখো আন্দোলনে আমি অবিচলিত ছিলেম, আমার প্রাণে কোনো সাড়া জাগেনি। আমি তখনো ব'সে ব'সে একান্তচিত্তে সাহিত্যচর্চা করেছি, হয়তো সেটা খুবই লজ্জার কথা, কিন্তু সত্য গোপন করবো না। মহাত্মাজি আমাদের সকলেরই প্রণম্য, কিন্তু তাঁর আন্দোলনে কোনো উদ্দীপনা অনুভব করেনি এমন লোক আমি ছাড়াও দেশে হয়তো আছে। এদিকে সন্ত্রাসবাদের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে যেটাকে বলা যেতে পারে রোম্যাণ্টিক, শিল্পী মন তা থেকে যে সহজে অব্যাহতি পায় না তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথও 'চার অধ্যায়' না লিখে পারেননি। সন্ত্রাসবাদ জিনিসটাই রোম্যাণ্টিক রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি হিসাবে তা যতই ভ্রান্ত হোক, নৈতিক বিচারে যতই দুষ্ট হোক, এর মধ্যে একটা প্রচণ্ড নাটকীয়তা আছে যা সাহিত্যিকের পক্ষে লোভনীয়। সাহিত্যের উপাদান হিসেবে এর অভিনবত্ব আছে এবং এ নিয়ে যে অসংখ্য গল্প উপন্যাস বাংলা ভাষায় লেখা হয়নি তার কারণ অবশ্য বাইরের বাধা।

এখানে একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করা অবান্তর হয় না। স্বদেশি আন্দোলন কেন বাংলা সাহিত্যে সোনার ফসল ফলালো, আর গান্ধিজির আন্দোলন কেন আমাদের সাহিত্যে আঁচড়ও কাটতে পারলে না এ-প্রশ্ন অনেকের মনকেই অনেক সময় নাড়া দিয়েছে। এ-যুগের লেখকদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিলে সমস্যার

সমাধান খুব সহজেই হ'য়ে যায়, কিন্তু প্রশ্নটি এত সহজ নয়। স্বদেশি যুগে রবীন্দ্রনাথের যে-বীণা রুদ্রস্বরে বেজেছিলো, অসহযোগের ঝোড়ো হাওয়ায় তার তারগুলি একবার কেঁপেও উঠলো না এর কি কোনো কারণ নেই? যে-হাওয়া হৃদয়ে এসে ঘা দেয় সাহিত্যে তা প্রতিফলিত হবেই, লেখক সেখানে যন্ত্রী নন, যন্ত্র। প্রশ্নের উত্তর পেতে হ'লে এই দুই আন্দোলনের জাতের তফাৎ বুঝতে হবে। স্বদেশি আন্দোলনের মূলে ছিলো বাংলাদেশের হৃদয়-শতদলের উন্মীলন। তার মধ্যে শুধু স্বায়ত্তশাসনের, শুধু অখণ্ড বঙ্গভূমির কথা ছিলো না, শিল্পে কর্মে জ্ঞানে বাণিজ্যে সমস্ত দেশে তা নবজীবন এনেছিলো। তখনকার দিনের দিশি কাপড়, দিশি জিনিস ব্যবহারে স্বদেশের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যোগের কথাটাই বড়ো ছিলো, অসহযোগে তা হয়েছিলো ল্যাঙ্কাশায়ারের ভাত মারবার পলিসি। রাজনৈতিক পদ্ধতি হিসেবে শেষেরটাই হয়তো কার্যকরী, এবং কার্যকরী হবার জন্যেই অসহযোগ আন্দোলনকে বড়ো বেশি না-ধর্মী হ'তে হয়েছিলো। বিলেতি কাপড় পোরো না, ইংরেজের স্কুলে যেয়ো না, তাড়ি খেয়ো না, ট্যাক্সো দিয়ো না—চারদিকে 'না' দিয়ে ঘেরা ব'লেই এই আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে তার স্বাক্ষর রাখতে পারেনি। এত বেশি 'না' সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল নয়। স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের একটা ইতিহাস জড়িত, কিন্তু সংস্কৃতির প্রতিও অসহযোগের সহযোগিতা ছিলো না, স্বরাজ লাভের জন্য শিক্ষা স্থগিত রাখতে হবে এও তার পলিসির অন্তর্গত ছিলো। বিলেতি পণ্য বয়কটের হিড়িকে যখন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও দেশে প্রতিকূল মনোভাব গ'ড়ে উঠতে লাগলো তখনই রবীন্দ্রনাথকে প্রতিবাদ জানাতে হ'লো 'শিক্ষার মিলন' লিখে। সংস্কৃতি জিনিসটাই আন্তর্জাতিক, তা দেশ-কালের বেড়া মানে না, সুতরাং যে-আন্দোলন কার্যোদ্ধারের খাতিরেও সংকীর্ণ অর্থে ন্যাশনাল তা সাহিত্যের উপাদান সহজে হয় না। একটা জিনিস আছে মানুষের স্বাভাবিক স্বদেশপ্রেম, সে যেমন তার নিজের গৃহটিকে নিজের মাকে ভালোবাসে, তেমনি তার দেশকেও ভালোবাসে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সেই স্বদেশপ্রেমেরই উচ্ছ্বাস। তাই তার ব্রত উদ্‌যাপনে এত গান এত ছন্দ এত কাব্য। কিন্তু অসহযোগের বাণী স্বদেশপ্রেমের নয় সর্বাঙ্গীন বিদেশিবর্জনের, তার মধ্যে এমন একটি শক্তি ছিলো যা দেশের জনসাধারণকে স্পর্শ করেছে কিন্তু হৃদয়ের এমন একটি শুষ্কতা ছিলো যা সাহিত্যের প্রেরণা জোগাতে পারে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, স্বদেশি আন্দোলন আবেগপ্রবণ আর অসহযোগ কর্মপ্রধান। যা নিছক কাজ তা সাহিত্যের এলাকায়

বাইরে, কাজের পিছনে যে-আদর্শ যে-ভাবাবেগ সঞ্চিত থাকে সেটাই সাহিত্যের উপজীব্য। অসহযোগে ভাবাবেগের প্রাবল্য ছিলো না, তার পিছনে যে-আদর্শ ছিলো তা বড়ো জোর শুষ্ক বৈরাগ্যের আদর্শ, সাহিত্যিকের পক্ষে তার কোনো আকর্ষণ নেই। এই কারণেই সাহিত্যের অনুপ্রেরণা হিসেবে তার ব্যর্থতা—বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যের কথাই বলছি।

গান্ধিজির লবণ আন্দোলন যে-সময়ে সে-সময়েই শুরু হ'লো বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য-মন্দা। কী অসম্ভব সস্তা সমস্ত পণ্য, অথচ দেশব্যাপী দারুণ অনটনের হাহাকার। কাগজে পড়তে লাগলুম, মার্কিন দেশে রাশি-রাশি কফি পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, স্তূপীকৃত শস্য দেয়া হচ্ছে জলে ভাসিয়ে, এদিকে ঘরে ঘরে অন্নাভাব। বাংলাদেশের বেকারবাহিনী জোয়ারের জলের মতো ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগলো। নিজের জীবনে উপলব্ধি করলুম কী তুচ্ছ, কী অকিঞ্চিৎকর সাহিত্যিকের মূল্য, সুজলা সুফলা বাংলাদেশে তার অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা হয় কি না হয়। কোনো কোনো দিকে হঠাৎ যেন আমার চোখ খুলে গেলো, মানুষের জীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্বন্ধে সেই প্রথম সচেতন হলুম। ইকনমিক্সের জটিল পথ আমার অধিগম্য নয়. কিন্তু একটা সন্দেহ মনে উঁকি দিলে যে ঐ শাস্ত্রটাই হয়ত ভুয়ো, আমাদের দেশের রাজনীতির মতোই তা বাস্তবের সম্পর্করহিত। কেননা যে শাস্ত্র শুধু বলে যে কোনো-কোনো অবস্থায় লক্ষ-লক্ষ নর-নারীকে ক্ষুধিত রেখে শস্য জলে ভাসিয়ে দিতে হয়, আর কিছু বলে না একেই নিয়ম ব'লে স্বীকার ক'রে নেয়, তার প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রাখা সহজ নয়। যাকে বলি অর্থনীতি তা তো পদার্থবিজ্ঞানের মতো প্রাকৃতিক শাস্ত্র নয়, আলো এবং উত্তাপ যখন যে-ভাবে ব্যবহার করবার তা করবেই তার উপর মানুষের হাত নেই, কিন্তু মানুষের কেনা-বেচা খাওয়া-পরা তো মানুষেরই হাতে, অতএব যে-শাস্ত্র পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকের দুঃসহ দারিদ্র্য দুঃখকেই 'নিয়ম' ব'লে মেনে নেয়, তার সমস্ত যুক্তিতর্কের আড়ালে কোথাও না-কোথাও প্রচণ্ড ফাঁকি আছেই এ-সন্দেহ বেশিদিন চাপা দিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

বাণিজ্য-মন্দার জোয়ারে যখনি ভাটা প'ড়ে এলো তখনই দেখলুম ইটালি আবিসিনিয়ার গলা কাটবার জন্য ছুরি শানাচ্ছে—বর্তমান মহাযুদ্ধের সেই তো আরম্ভ। সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ হ'লো জর্মানিতে হিটলারের অভ্যুদয়, অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখলুম একটা সুসভ্য উন্নত মহৎ জাতি নিজেদের যুগ-যুগ-সঞ্চিত অমূল্য উত্তরাধিকার পায়ে ঠেলে ফেলে বর্বরতার কাঁটাওলা বর্ম প'রে বীভৎস মূর্তিতে দাঁতে দাঁত ঘসছে। জর্মানির যাঁরা শ্রেষ্ঠ মানব, যাঁদের নামে জগতের

কাছে জর্মানির পরিচয়, নাৎসিশাসন সভ-ঘুম-ভাঙা কুম্ভকর্ণের মতো তাঁদেরই চিবিয়ে খেতে উদ্যত—এ দৃশ্য যখন দেখলুম; যখন দেখলুম আধুনিক জর্মানির দুই মহামানব—আইনস্টাইন আর ফ্রয়েড—তাঁদের মধ্যে একজন হ'লেন চোর্যের অপবাদ নিয়ে বিতাড়িত, আর একজন বার্ধক্যের শেষ অবস্থায় পাহারাওলা ঘেরাও হ'য়ে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লেন; যখন দেখলুম জর্মানির সব বড়ো-বড়ো লেখক শিল্পী, সাঙ্গীতিক নির্বাসনে দুর্দশাগ্রস্ত কিংবা মাতৃভূমিতে বন্দী; যখন কানে এলো ইহুদিদের উপর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী, মেয়েদের স্বাধিকারহরণের ইতিহাস, সমস্ত জাতির চলা-ফেরায় আচারে-ব্যবহারে চিন্তায়-রচনায় সর্বপ্রকার স্বাধীনতা যখন ইস্পাতের হাতে লুণ্ঠিত হ'লো, তখন বুঝলুম পৃথিবীতে খুব বড়োরকমের একটা গোলমাল লেগেছে। আর তার প্রমাণের জন্যও বেশিদিন অপেক্ষা করতে হ'লো না, আফ্রিকার শেষ কালো ছায়াটুকু শোষিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই লাগলো স্পেনের গৃহ-যুদ্ধ। এই স্পেনের যুদ্ধে যেটুকু আমার চোখ খোলবার বাকি ছিলো সেটুকুও খুলে গেলো; বোঝা গেলো, পৃথিবীতে লোভ উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে; বিশেষ একটি শ্রেণীর স্বার্থ সম্পূর্ণ বজায় রাখবার জন্য শুধু যে দুর্বল বিদেশি জাতির উপরেই অত্যাচার চলে নয়, স্বজাতিকেও রক্তস্রোতে ভাসানো হয়; শুধু যে বিদেশের ধনরত্ন লুণ্ঠন ক'রে নিজেদের 'উন্নতি' সাধন করা হয় তা নয়, নিজের দেশের মধ্যে যাঁরা মুক্তির আদর্শ মানেন, যাঁরা সাম্য ও মৈত্রীর মন্ত্রে দীক্ষিত তাঁদের বধ করতে লুব্ধতার ছুরি সর্বদাই উদ্যত।

অন্যদিকে আমাদের চোখের সামনে ছিলো সাম্যবাদী রাশিয়া—রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি পড়েছিলুম। জারের আমলে যে-দেশ ছিলো দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ভয়াবহ অন্ধকারে মগ্ন, মাত্র কুড়ি বছরের সাধনার ফলে সে-দেশের কী আশ্চর্য নবজন্ম। ফরাসি বিপ্লবের পরে মানুষের মুক্তির ইতিহাসে এত বড়ো ঘটনা আর ঘটেনি। ইংরিজি অনুবাদে রুশ সাহিত্য প'ড়ে ছেলেবেলা থেকেই ঐ দেশের উপর আকর্ষণ জন্মেছিলো, রুশ গল্পে উপন্যাসে বঞ্চিত উৎপীড়িত বুভুক্ষু বিশ্বমানবের হৃৎস্পন্দন যেমন শুনতে পেয়েছিলুম তেমন আর কোথাও শুনতে পাইনি। সেই দেশ সকল মানুষকে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে, অন্নে বস্ত্রে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে সকলের মনুষ্যোচিত অধিকার স্বীকার করেছে, এই খবর একটি গভীর অনুপ্রেরণা হ'য়ে আমার হৃদয়ে বাজলো। মুক্তির বাণী, সাম্যের বাণী—এ তো কবিরই বাণী, যুগে-যুগে কত কবির মুখে এই বাণী অনন্ত সুরে বেজেছে; এর কোনো বিশেষ স্থান কি কাল নেই, এ সমগ্র বিশ্বমানবের চিরকালের সংগীত।

এই বাণী শেলির, এই বাণী রবীন্দ্রনাথের, এই বাণী দেশবিদেশের সকল মহৎ কবির; মানুষকে মুক্তি দাও, মানুষকে ভালোবাসো, কঠোরের বদলে সুন্দরের পূজা করো, পাষাণহৃদয় উৎপাটিত ক'রে রক্তমাংসের হৃদয়কে স্বীকার করো। তাই যখন নবীন রাশিয়ার মূল মন্ত্র আমার কানে এলো—'যে কাজ করবে না, সে খাবেও না'—তখন এই বাণীতে যেন বিরাট মহাকাব্যের কল্লোল শুনতে পেলুম। এত বড়ো কথা কে আর কবে বলেছে! পৃথিবীতে অনেক সুন্দর সভ্যতা জেগেছে এবং ডুবেছে, কিন্তু চাঁদের একটি দিকই যেমন পৃথিবী থেকে দেখা যায় তেমনি সকল সভ্যতার একটি দিকই আমরা দেখেছি এবং সে-দিকটি চাঁদের মতোই মনোহর। চাঁদের উল্টো পিঠ আমরা কখনো দেখবো না, হয়তো তা ঘোর কালো, হয়তো দুঃস্বপ্নের মতো ভয়ানক। কিন্তু সভ্যতার উল্টো পিঠটি একটু নাড়া দিলেই বেরিয়ে পড়ে—সেই একতলার ঘরে বোবা অন্ধকারে নরকঙ্কালের সারি, সেখানে দাসপ্রথা, দারিদ্র্য, অত্যাচার, রক্তপাত—তা অতি ভয়ানক। কোটি-কোটি লোকের জীবনের মূল্যে কয়েকটি মানুষ সুরভিত অবসরে ব'সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ক'রে সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখবে এটাই ছিল নিয়ম। ভিতরে-ভিতরে প্রতিবাদ জমেছে, এ-নিয়ম বিশ শতকে এসে টলেছে কিন্তু একেবারে ভাঙেনি। সভ্যতার এই অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব যখন সব দেশেই মনীষীর ও শ্রমিকের মনে-মনে দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে, তখন রাশিয়া বজ্র-স্বরে ঘোষণা করলে, 'যে কাজ করবে না সে খাবেও না।' শুধু যে মুখে বললে তা নয়, কাজেও খাটালে। সভ্যতার একতলার ঘরে আলো জ্বলজো—শুধু তা-ই নয়, নিচের তলা ব'লে কিছু আর রইলোই না। সভ্যতার ছন্দোহারা বেঢপ বেসামাল চেহারা দূর হ'লো, তা সর্বাঙ্গীন শ্রীতে উঠলো মুঞ্জরিত হ'য়ে। আমি বলি না রাশিয়াতে সেই নিখুঁত ছন্দের সুষমা আজই গ'ড়ে উঠেছে, হয়তো তা হয়নি, না হ'য়ে থাকলে দোষও দেবো না কারণ বাধা বিস্তর, কিন্তু এ-পর্যন্ত রাশিয়া যেটুকু করেছে সেটুকুই আশ্চর্য এবং সব চেয়ে বড় কথা এই যে মানবজীবনে ছন্দের সেই সুষমাই রাশিয়ার লক্ষ্য, তারই জন্যে সেই বিরাট বিচিত্র দেশের অক্লান্ত সাধনা। রাশিয়া নবীন একটি সভ্যতার জন্মভূমি।

একদিকে জর্মানি ইটালিতে মনুষ্যত্বের অবমাননা ও সভ্যতার বিনাশ; অন্যদিকে রাশিয়াতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা দান ও সভ্যতার পূর্ণবিকাশের সাধনা। এই জুড়ি দৃশ্য যখন দেখলুম তখন রাজনীতির বড়োরকমের একটা অর্থ মনে ধরা দিলো। তখন বুঝলুম রাজনীতি শুধু অ্যাসেমব্লি হলের বক্তৃতা নয়, মাছ ও

পাঁউরুটির বিতরণ নিয়ে নোংরা কলহ নয়, আমাদের প্রত্যেকের জীবন যাপন, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ রাজনীতির উপর নির্ভরশীল, এবং সেইজন্য তার আলোচনায় আমাদের সকলেরই প্রয়োজন। শান্তির সময়, সুখের সময় নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব, হয়তো সে-অবস্থাই স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, কিন্তু চারদিকে যখন অশান্তির আগুন লেলিহান হয়ে জ্বলে ওঠে তখন কবি বলো শিল্পী বলো ভাবুক বলো কারো পক্ষেই মনের মধুর প্রশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা আর সম্ভব হয় না, যার প্রাণ আছে তার প্রাণেই ঘা লাগে। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও আমরা দেখেছি তাঁর ধ্যানী আত্মস্থতাকে বহির্জগতের পীড়ন বার-বার ভেঙে ভেঙে দিয়েছে, তীব্রস্বরে তিনি অভিশাপ দিয়েছেন হত্যাকারী অত্যাচারীকে, জাপান যখন চীনকে গ্রাস করতে উদ্যত হ'লো, জাপানের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র বিক্ষোভের প্রমাণ রয়েছে অনেক কবিতায় আর নোগুচিকে লেখা চিরস্মরণীয় পত্রাবলীতে। লোভ জিনিসটা অতি কুৎসিৎ এবং কবি কুৎসিতকে সইতে পারেন না। তাই আজ পৃথিবী ভ'রে লোভ যখন তার বীভৎসতম মূর্তিতে প্রকট তখন আমরা কবিরা, শিল্পীরা স্বভাবতই, নিজের প্রকৃতির অদম্য টানেই, ঐ বীভৎসতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো—এর মধ্যে রাজনীতির কোনো গূঢ়তত্ত্ব নেই, আমাদের মনুষ্যত্বের, কবিচরিত্রের এটা ন্যূনতম দাবি।

বর্বরতার বিরুদ্ধাচরণ মনুষ্যধর্ম মাত্র, কিন্তু লেখকদের পক্ষে এর বিশেষ একটু তাৎপর্য আছে। পশুত্বের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতেই হবে, নয়তো আমাদের অস্তিত্বই যে থাকে না। জর্মানি থেকে মনীষীরা যখন একে-একে বিতাড়িত হতে লাগলেন, জাপানের বোমাবর্ষণে চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যখন বিধ্বস্ত হ'তে লাগলো, তখন ঘৃণায় শিহরিত হ'য়ে এ-কথাই ভাবলুম যে দু'দিন পরে এইরকম কোনো পৈশাচিক শক্তি যদি ভারতবর্ষের দিকে বিষাক্ত ফণা উদ্যত করে তাহ'লে আমরা যারা কবি শিল্পী বিদ্যানুরাগী আমরা আমাদের স্বাধিকার থেকে সকলের আগে বঞ্চিত হবো, এই দুর্গত পরাধীন দেশেও চিন্তার ও আত্ম-প্রকাশের যেটুকু স্বাধীনতা আমাদের আছে সেটুকুও আর থাকবে না, শুধু যে আমাদের জীবিকা কিংবা জীবন যাবে তা নয়, যা কিছু আমাদের কাছে মূল্যবান, যে-সব জিনিস আছে ব'লে আমরা বাঁচতে চাই এবং যা না-থাকলে আমাদের জীবনের কোনো মানে থাকে না সব একেবারে ছারখার হ'য়ে যাবে। স্পানিশ যুদ্ধে, চীন-জাপানের যুদ্ধে এটুকু আমাদের শিক্ষা, বৃহত্তর রাজনীতিতে সেই প্রথম দীক্ষা।

তারপর সেদিন যুদ্ধ বাধলো। বর্বরতার শেষ সূক্ষ্ম মুখোস খ'সে পড়লো, ভণ্ডামির ভদ্রতাটুকু পর্যন্ত কোনোখানে আর রইলো না। জলে স্থলে আকাশে

হত্যা আজ স্বেচ্ছাচারী, শুধু যোদ্ধহত্যা নয়, নারীহত্যা, শিশুহত্যা, জনতার সামগ্রিক বিনাশ, তাছাড়া সত্যের, সুন্দরের সমস্ত আদর্শের হত্যা। এই হত্যার ঢেউ আজ ভারতের উপকূলে এসে পৌচেছে। আজ এ-কথা অতি নিষ্ঠুরভাবেই উপলব্ধি করতে হচ্ছে যে জগতের রাজনীতির ফেনিল আবর্তের সঙ্গে অতি তুচ্ছ এই যে আমি, আমার অত্যন্ত তুচ্ছ সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্তই জড়িত। আমি তো অতি ভালোমানুষ, সাতেও নেই পাঁচেও নেই, নিরিবিলি ঘরের কোণে ব'সে পড়াশুনো করতে চাই আর মাঝে-মাঝে এক-আধটা কবিতা লিখতে চাই, কিন্তু আমাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে কে? যে-কোনো অতর্কিত মুহূর্তে আমার বাসস্থান, প্রিয়জন, আমার সমস্ত আশা ভালোবাসা সুদ্ধু আমি একেবারে লোপাট হ'য়ে যেতে পারি। কিংবা কোনো আসুরিক শক্তি হয়তো কেড়ে নেবে আমার কলম, থামিয়ে দেবে আমার সমস্ত কর্মোদ্যম, পাথর চাপা দেবে আত্ম-প্রকাশের আবেগে—তাহ'লেই বা আমার অস্তিত্ব থাকে কোথায়? অতএব দেখা যাচ্ছে এই যে আমার ঘরে ব'সে আপন কাজ করবার অধিকার, যার উপর আলো-হাওয়ার মতোই মানুষের জন্মগত দাবি, এও বিশ্বের রাজনীতির জটিল গ্রন্থিতে বাঁধা। আমার পক্ষে—এবং অনেকের পক্ষেই—এ উপলব্ধি অতি মর্মান্তিক। কখনো ভাবিনি মানুষের বাঁচবার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে, কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছি এ-অধিকার থেকে যুগে-যুগে তারাই বঞ্চিত হয়েছে যারা বীজ বোনে যারা তাঁত চালায় যারা ধান কাটে, যারা তাদের পেশীবহুল দৃঢ় স্কন্ধে সমস্ত জীবনের ভার বহন ক'রে আসছে। আজকের দিনে এমন এক রাষ্ট্রশক্তি প্রবল হ'য়ে উঠেছে যারা এই ব্যবস্থাকেই স্থায়ী করবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় লিপ্ত, এবং সকল মানুষকেই লৌহশাসনের যন্ত্রে পিষ্ট না করলে যাদের চলে না। তাদের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি এমনই যে সকলের আগে কবির মুখ বন্ধ করা তাদের দরকার, কেননা কবি সত্য ও সুন্দরের উপাসক।

এরই নাম ফ্যাশিজম। অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক থেকে ফ্যাশিজম্-এর ব্যাখ্যার মধ্যে আমি যাবো না, আমি দেখতে পাচ্ছি এটা সংস্কৃতির প্রতিশ্রুত শত্রু সভ্যতার ইতিহাসে এ একটা তীব্র বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া। সেইজন্যে আমরা যারা সংস্কৃতিতে, বিশ্বমানবের ঐতিহাসিক প্রগতিতে আস্থাবান, আমাদের এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই হবে। এটা কোনো চিন্তাভাবনা বিশ্লেষণের কথা নয়, কোনো পরাক্রান্ত মূঢ় যদি রবীন্দ্রনাথকে জুতো দেয় তাকে সহ্য করা যেমন আমাদের পক্ষে অসম্ভব, এও তেমনি। রবীন্দ্রনাথ পূজ্য নন, এ-কথা যেমন ম'রে গেলেও বলতে পারবো না,

তেমনি অপমানিত, লাঞ্ছিত কিংবা নির্বাসিত হ'লেও এ-কথা মানতে পারবো না যে দেশের তথাকথিত 'উন্নতির' জন্য সভ্যতার সর্বনাশ যদি দরকার হয় সর্বনাশই করতে হবে। আমাদের কাছে আগে সভ্যতা, আগে মনুষ্যত্ব, তারপর অন্য সব-কিছু।

তাছাড়া ভেবে দেখতে হবে যে ফ্যাশিজ্ম্ শুধু একটা সামরিক নীতি কিংবা রাজনৈতিক পদ্ধতি নয়, ফ্যাশিজ্ম্ একটা মনোভাব। মনোভাব মাত্রই অত্যন্ত ব্যাপক, জীবনের সমস্ত ছোটো খাটো ব্যাপারে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এটা আজকের দিনে অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়ে উপলব্ধি করছি যে কোনো ব্যক্তির যদি রবীন্দ্রনাথের গান কি যামিনী রায়ের ছবি ভালো না লাগে, সেই রুচির কিংবা রুচির অভাবের সঙ্গে জড়িত আছে তার রাজনৈতিক মতামত। হয়তো সে-মতামত সম্বন্ধে সে নিজে খুব বেশি সচেতন নয়, কিন্তু খোঁচা দিলেই মনের কথা বেরিয়ে পড়ে, এবং যে সব কথা সে অবলীলাক্রমে ব'লে যায় তার ভয়াবহ তাৎপর্য সে নিজেও বোঝে না। স্ত্রী-পুত্রের প্রতি, বন্ধুর প্রতি, একদিকে ভৃত্য ও অন্যদিকে বড়ো সায়েবের প্রতি ব্যবহারে, বিদেশি ও বিধর্মী সম্বন্ধে ভঙ্গিতে, তার প্রতিদিনের তুচ্ছতম আচরণে ও আলোচনায় তার মূল মনোভাব নানাভাবে প্রকট হ'য়ে ওঠে। আমাদের দেশেও আজকের দিনে এমন লোকের অভাব নেই যারা যা-কিছু প্রগতিশীল তারই বিরোধী, যা-কিছু নতুন সে সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, যারা স্ত্রীজাতিকে সন্তানবাহী ক্রীতদাসী বানিয়ে রাখবার পক্ষপাতী, নিজের স্ত্রীকে প্রহার করতে ও পরস্ত্রীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে যারা নিয়ত উৎসুক, এদিকে সামাজিক জীবনে স্ত্রী-পুরুষের স্বাধীন মেলামেশার কথা শুনলে যারা মূর্ছা যায় যারা যে-কোনোরকম বিদেশি কিংবা অন্য ধর্মাবলম্বী সম্বন্ধে বিদ্বেষের ভাব পোষণ করে, অথচ পরস্পরের কুৎসারটনায় যাদের জিহ্বা চির চঞ্চল, যারা নিছক গুণ্ডামির একান্ত ভক্ত—অবশ্য সে-গুণ্ডামির যতক্ষণ জিৎ হ'তে থাকে। গুণ্ডামিকে তারা পৌরুষ মনে করে, হৃদয়হীন কঠোরতাকে শক্তি ব'লে বাহবা দেয়। তাই যখনই যে-জাত পশুশক্তিতে দুর্দান্ত হ'য়ে ওঠে তারা অন্য কিছু বিচার না করে তারই ভজনা করে। এ-সব লোক বাইরে থেকে দেখতে দিব্যি লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোক, কিন্তু যে কোনো বিষয়ে দু'একটা কথা বললেই বোঝা যায় তাদের মনোভাবটা কী। চোখ বুজে ব'লে দেয়া যায় যে এটাই ফ্যাশিস্ট মনোবৃত্তি—হয়তো সচেতন নয়, অচেতন—কিন্তু শেষ হিসেব মেলাবার দিনে এদের সমস্ত অচেতন ইচ্ছা বাঁধন-ছেড়া ক্ষিপ্ত কুকুরের মত ছুটে বেরিয়ে এসে তাদেরই

কামড়াতে যাবে মুক্তির সাধনায় জীবন যাদের উৎসর্গিত। দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে এই লড়াইতে আপাতত ফ্যাশিষ্টদের জিৎতে দেখে আমাদের দেশের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি প্রবল উৎসাহে ফেঁপে উঠছে; এতদিনে সমাজজীবনে আমরা যেটুকু অগ্রসর হয়েছি এক দলের মনের ইচ্ছা তার সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত ক'রে দিয়ে সেই যুগে ফিরে যায় যখন মনের সুখে বৌ ঠ্যাঙানো যেতো এবং ছোটোলোক'দের পায়ের তলায় পিষে রাখলে তারা সেই শ্রীচরণযুগলকে জড়িয়ে ধ'রে ভক্তিভরে সেখানে মাথা ঠেকাতো। আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকের মনেই এই প্রতিক্রিয়া আজ বন্দী সর্পের মতো ফোঁসফোঁস করছে, একবার ছাড়া পেলে তার বিষ সমস্ত জাতির দেহে সঞ্চারিত হবে এমন আশঙ্কা আছে ব'লেই আজ আমরা যারা প্রগতিতে বিশ্বাসী তাদের একত্র হ'য়ে দাঁড়াতে হবে, জোর ক'রে বলতে হবে যে এই কুৎসিত মনোবৃত্তির আমরা বিরোধী, এর বিরুদ্ধে যা-কিছু করবার সব করবো, তার জন্য যত নির্যাতন সইবার সব সইবো। এটা বীরত্বের কথা নয়, পেশাদার যোদ্ধার ফাঁকা বুলি নয়, এটা আমাদের প্রাণের কথা—কারণ সভ্যতার সুষমা যদি ধ্বংস হ'য়ে যায় তাহ'লে পেটে খেতে পেলেও জীবনের কোনো মানে থাকে না এই আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস।

আমি জানি আমার এ-সব কথা অনেকের কাছে সেণ্টিমেণ্টাল লাগবে। অনেকে বলবেন, প্রগতি বলে কিছু নেই, পরিবর্তনের নিত্যচক্রে পৃথিবীর ইতিহাস ঘুরছে। সভ্যতার গতিপথ চক্রাকার এটা ফ্যাশিস্ট দর্শনেরই কথা, কিন্তু সে-কথা ছেড়েই দিলুম। বাস্তবিক পক্ষে সভ্যতার বিবর্তনের ছবিটা ঋজু না গোল না সর্পিল আকারের, সে আলোচনার এখানে সময় নেই। আমি বলতে চাই যে আমি প্রগতিতে বিশ্বাস করি স্রেফ এই কারণে যে তা না-করলে জীবন একেবারে নিরর্থক হ'য়ে যায়। সভ্যতাকে মাঝে মাঝে বর্বরতা এসে গ্রাস করবেই এ-কথা যদি নিয়ম ব'লে মেনে নিতে হয় তাহ'লে কোনো কর্মে আমার আর উৎসাহ থাকতে পারে না, বেঁচে থাকবার মূল তাগিদটাই যায় মরে। তাছাড়া ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে সভ্যতার আলো কখনোই জগৎ থেকে একেবারে নিবে যায়নি—কখনো চীনে কখনো রোমে, কখনো ভারতে কখনো আরবে কখনো বা ইওরোপে সে-আলো উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটেছে, তার রশ্মি বিকীর্ণ হয়েছে সমস্ত জগতে। ইতিহাস যেদিন থেকে আরম্ভ, সেদিন থেকে পৃথিবীর এক প্রান্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'লেও আর একদিকে আলো জলেছে, এবং পর পর এতগুলি সভ্যতার ওঠা-পড়ার মধ্যে

কোনো মিলনগ্রন্থি কি নেই? আছে বইকি, সমস্ত ইতিহাস এক সূত্রে বাঁধা। প্রাচীন গ্রীস রোম মিশর ভারত চীনের উত্তরাধিকার জগৎ থেকে তো হারিয়ে যায়নি, তারা যা ক'রে গেছে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কাজ আরম্ভ হয়েছে তার পর থেকে। এমনি ক'রে-করেই মানবজাতির ইতিহাস গাঁথা হ'য়ে চলেছে, বংশের পর বংশ শতাব্দীর পর শতাব্দী। একেই তো বলি প্রগতি। অতীত এসে বর্তমানে মিলিত হয়, বর্তমান ধাবিত হয় ভবিষ্যতের দিকে। এর মধ্যে কত পরিবর্তন, কত বিপ্লব, কত ভাঙা-গড়া কিন্তু সব মিলিয়ে এর অন্তরালে একটি ঐক্যের সুর বাজছে, তারই নাম প্রগতি। আরো মুক্তি, আরো সৌন্দর্য, আরো সভ্যতা, পৃথিবীর সমস্ত জাতিতে বর্ণে শ্রেণীতে সভ্যতার উৎসাহ সঞ্চালিত করে দেয়া—সমস্ত ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন বাণী তো এই। আজকের দিনে নতুন আলো জ্বলেছে রাশিয়াতে; পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় ভাঙন ধরেছে তাতো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তাই বলেই কি তাকে আজ নিন্দে করতে বসবো? তাই ব'লেই কি বলতে শুরু করবো, ঢের ভালো ছিলো আমাদের জাতিভেদ, সতীদাহ, ঢের ভালো জাপানের শিন্তোবাদ, যেহেতু এ-সভ্যতায় আর কাজ চলছে না সেইজন্যই ব'লে বসবো যে বর্বরতাই ভালো? কক্ষনো না। এই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা জগৎকে যা দিয়েছে তার মূল্য অসীম, কিন্তু তার দিন ফুরিয়ে এসেছে, সব সভ্যতারই এক-দিন মরণদশা ঘটে। তার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ, তার মধ্যে যেটা মূল শক্তি, অর্থাৎ বিজ্ঞানের লৌকিক ব্যবহার সেটা থাকবেই, কিন্তু এ-সভ্যতার যেটা দুর্মামুখিক দিক সেটা কালের কবলে ঝরে পড়বে। এ-সভ্যতা রূপান্তরিত হ'য়ে যে নতুন মূর্তি নেবে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে রাশিয়াতে। আমরা তাকিয়ে আছি সে-যুগের দিকে যখন সমস্ত পৃথিবী এক হবে শান্তি হবে স্থায়ী, জগতে শোষিত জাতি কিংবা শোষিত শ্রেণী আর থাকবে না, বিজ্ঞানের অলৌকিক কীর্তির ফলভোগ করবে সকল মানুষ, অন্নবস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য স্বাধীনতা থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না, শিল্পকলা জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশ হবে সর্বতোভাবে অপ্রতিহত। অনেকেই বলবেন এটা কবিকল্পনা মাত্র। এ-কখনো সম্ভব নয়, হিউম্যান নেচারই এ-রকম নয় যে···কিন্তু এই কাল্পনিক হিউম্যান নেচারের দোহাই দিয়ে অনেক অসত্যই এতদিন আমাদের বিশ্বাস করানো হয়েছে, আর আমরা ঠকবো না। মানুষ স্বভাবতই হীন, লোভী, ঈর্ষাকাতর কি দাম্ভিক নয়; অবস্থার বিপাকেই সে ও-রকম হয়, এবং অবস্থা বদলালে তার স্বভাবও যে বদলায় তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। তাছাড়া, যাঁরা বলেন যে পৃথিবী কখনো স্বর্গ হবে

না তাঁদের জিজ্ঞেস করি যে এইভাবেই কি চলবে চিরকাল? পৃথিবীর এত ঐশ্বর্য, বিজ্ঞানের এত শক্তি নিয়ে এই অভাব এই হাহাকার কুড়ি বছর পর-পর খণ্ডপ্রলয়, একেই কি চুপ ক'রে মেনে নিতে হবে। একবার চেষ্টা ক'রে দেখাই যাক্ না হয় কিনা। যে-কারণে পৃথিবীতে আজ ঐশ্বর্যের অন্ত নেই, সেই কারণেই যুদ্ধ আজ-কাল এমন ঘোর দানবিক যে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের স্পৃহা কিংবা প্রয়োজন যদি দূর করা না যায়, পৃথিবীর সব দেশ সব জাতি এক প্রীতির বন্ধনে যদি যুক্ত না হয় তাহ'লে দুশো বছরের মধ্যে মনুষ্যজাতিই হয়তো আর থাকবে না। কেউ-কেউ এমনও আছেন যাঁরা বলবেন না-যদি থাকে না-ই থাকবে, মনুষ্যজাতিকে থাকতেই হবে তারই বা কী মানে আছে? আমি স্বীকার করবো ও-কথা বলবার মতো প্রকাণ্ড দার্শনিক এখনো আমি হ'তে পারিনি, জীবনের প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা, মানুষের প্রতি আমার স্বাভাবিক মমত্ববোধ, আমি কোনোরকমে সন্ধ্যা-আহ্নিক ক'রে ব্যাঙ্কের টাকা গুছিয়ে যে-কোনো অবস্থায় নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষা ক'রে দিন গুজরান করতে চাই না, আমি নিবিড়ভাবে বাঁচতে চাই, আমি সেই মহৎ স্বার্থ রক্ষা করতে ইচ্ছুক যা আমার একলার নয়, সকলেরই স্বার্থ। আমি আমার সেই ভালো চাই যাতে অন্য সকলেরই ভালো। আমি মনুষ্যজাতিকে শ্রদ্ধা করি, তার সাধনার মহিমায় আমি মুগ্ধ; তাই আমি শান্তি চাই, প্রীতি চাই, মুক্তি চাই, যাতে এই মানুষ তার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি অর্জন করতে পারে। যা চাচ্ছি তা শিগগির হয়তো হবে না, সহজেও হবে না, কিন্তু সেইজন্যই তো আরো উদ্যোগ আরো নিষ্ঠা আরো সাহস দরকার, আগে থেকেই হার মানলে চলবে না, ভীরু হ'লে চলবে না, নৈরাশ্যের আবছায়ায় নিজের কাপুরুষতা লুকিয়ে রাখলে সব চেয়ে বড়ো ক্ষতি আমার নিজেরই এ-কথা আমরা প্রত্যেকেই যেন প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি করি।

একটা ছোটো ঘটনার উল্লেখ করে এ-প্রবন্ধের শেষ করি। একবার একটি কলেজের ছাত্র আমাকে বলছিলো, 'হিট্লারের আমলে জর্মানির কী আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে তা তো দেখছেন। আমাদের দেশে এইরকমই দরকার।' আমি তাকে বললুম, 'ওরা আইনস্টাইনকে তাড়িয়েছে—' সে বাধা দিয়ে বললে, 'ওরা ভয়ানক খারাপ লোক, তাদের তাড়ানোই উচিত।' আমি তাকে জিজ্ঞাস করলুম, 'আচ্ছা ধরো আমাদের স্বদেশি হিটলার যদি রবীন্দ্রনাথকে তাড়াতে চান তুমি তাতে রাজি আছো?' সে একটু চুপ করে থেকে বললে, 'দেশের উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথকে যদি তাড়াতে হয়ই তবে তাড়াতেই হবে।' আমি বললুম, 'যে উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথকে তাড়াতে হয় সে-উন্নতি আমি চাই না কারণ মনে-মনে আমি নিশ্চয়ই জানি যে সেটা উন্নতি নয়, ঘোর অবনতি।' এই কথাই আমার শেষ কথা।

বার্সিলোনা আমাদের পথ দেখিয়েছে

পাবলো পিকাসো

[পিকাসোর এই চিঠিটি পৌষ ১৩৫৯ সনের 'নতুন সাহিত্য' থেকে পুনর্মুদ্রণ করা হল। পত্রিকায় অনুবাদকের কোনো নাম ছিল না।
লেখার শুরুতে তৃতীয় বন্ধনী চিহ্নের ভেতর সম্পাদকের নিম্নলিখিত 'নোট'টি প্রকাশিত হয়:

> কয়েক মাস আগে স্পেন থেকে জনৈক তরুণ চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসোকে তাঁর শিল্পকর্ম, শান্তির সপক্ষে সংগ্রামী ভূমিকা ও তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের মুগ্ধ প্রশংসা করে চিঠি লেখেন। সেই সঙ্গে তিনি গুরুত্ব দেন শিল্পনৈপুণ্য বিকাশের চেষ্টায় স্পেনের শিল্পীরা যে-সমস্ত বাধার সম্মুখীন তার ওপর। জবাবে এই মর্মে এক খোলা-চিঠি লেখেন পিকাসো।

রচনাটির শিরোনামা আমাদেরই দেওয়া। বানান ও যতিচিহ্নের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক]

"তোমার চিঠিতে শিল্পী-জীবনের সূচনায় তোমার পথের প্রতিবন্ধকের কথা জানলাম। আরও জানলাম, নিজের কাজ চালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উন্নততর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে তুমি দৃঢ়সংকল্প। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, এ-পরিস্থিতি আর এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দেশের অপেক্ষাকৃত নবীন বুদ্ধিজীবীদের বর্তমান অবস্থা ও মনোভাবকেই প্রতিফলিত করছে। আমি নিশ্চিত, মনে-প্রাণে বিদ্রোহী এঁরা, ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ প্রজাতন্ত্র রক্ষায় অস্ত্র হাতে লড়াই চালিয়েছিলেন যে-অগ্রজরা তাঁদের আদর্শের প্রতি এঁরা বিশ্বস্ত।

"তরুণ শিল্পী, তোমার পক্ষে যেমনটি, ফ্রাঙ্কো-অধ্যুষিত স্পেনের একজন লেখক ও বাদ্যযন্ত্রীর পক্ষেও ঠিক তেমনি, জীবনের বাস্তব অসুবিধাগুলো আর আমাদের দেশবাসীর বর্তমান অবস্থার জানান দেয় এমন কোনোকিছু প্রকাশের স্বাধীনতার অভাব শিল্পসৃষ্টিতে কতই না বিঘ্নস্বরূপ। কিন্তু এ-সব বিপত্তি যত প্রচণ্ডই হোক না কেন, কিছুতেই এরা যেন আমাদের সৃষ্টির গতি রোধ না করে। আমাদের কণ্ঠস্বরে স্পেনের আজ বড় প্রয়োজন। এই গ্লানিকে, শাসনব্যবস্থার এই দুর্নীতিকে

আমাদের ধিক্কার দিতে হবে; ওদের মনোভাবকে ভাষা দেবার জন্যে, সংগ্রামে ওদের উজ্জীবিত করে রাখার উদ্দেশ্যে, ওদের বীরত্বগাথা গাইব বলেই জনগণের হৃদয়ের কাছে পৌঁছতে হবে আমাদের।

"তরুণ বুদ্ধিজীবীরা যে-সমস্যার সম্মুখীন—ক্ষুধার জ্বালায় মরতে চলেছে যে, নতুন কাজে শিক্ষানবিশীর সমস্ত পথ যার বন্ধ সেই নওজোয়ান মজুরের ঐ একই সমস্যা, একই সমস্যা এক টুকরো রুটির জন্যে উদয়াস্ত খেটে-মরা মরদ চাষীর।

"এত উদ্যোগকে পঙ্গু করে দিচ্ছে পথের যে-কাঁটা, তার একটা বিশেষ নাম আছে: সে নাম, ফ্রাঙ্কো। এ-দুর্দশার অবসান ঘটাতে হলে খতম করতে হবে আজকের শাসনব্যবস্থাকেই। বার্সিলোনার জনসাধারণ আমাদের পথ দেখিয়েছে। উত্তর-আমেরিকার শাসকগোষ্ঠীর দেওয়া সাহায্য এ-ব্যবস্থাকে বাঁচাতে পারে না। আমাদের দেশবাসীর জয় হবেই। সারা দুনিয়া জুড়ে লাখো লাখো স্ত্রী-পুরুষ আমরা শান্তির আদর্শকে রক্ষা করছি। আমাদের কপোত আজ লড়াকু বাজপাখির সমান শক্তি ধরে।

"তরুণ সহকর্মী, তাদেরই পাশে তোমার স্থান, স্বাধীনতা আর ঐ একই সঙ্গে স্পেনের সংস্কৃতি ও শিল্প-ঐতিহ্যের সপক্ষে লড়ছে যে-জনসাধারণ। ফ্যাসিজম ও যুদ্ধের হাত থেকে স্পেনকে বাঁচানোর জন্যে তাঁদের যথাকর্তব্য করার আকাজ্ক্ষা—দেশের তরুণতর বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে এর চেয়ে মহৎ উদ্দেশ্য আর কিছু নেই।"

রবীন্দ্রসত্তা ও ফ্যাসিবাদ

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র চিন্তা ও সাহিত্যসৃষ্টির ধারা অনুসরণ ও অনুধাবন করলে দেখা যায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কবিকাহিনী' থেকে শুরু করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এক বিশেষ মৌল জীবনসত্তার অনুভব বিকশিত ও পুষ্ট হতে হতে চলেছিল—যাকে আমরা বলতে পারি অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে, লোভী হিংস্র আগ্রাসনের বিরুদ্ধে—অতন্দ্র অভিযান, শাণিত প্রতিবাদ।

উচ্চ অভিজাতকুলে জন্মে, তৎসাময়িক জীবনধারা ও ধারণাকে আত্মস্থ করেও পদে পদে তিনি নিজেকে উত্তীর্ণ করে চলেছেন প্রাগ্রসর জীবনবোধের দিকে। মনে হয়, যেন ব্রাহ্মসমাজদর্শন ও উপনিষদের মূল ধারাকে তিনি অঙ্গীকৃত করেও রূপান্তরিত করেছিলেন বৈজ্ঞানিক সমাজচেতনা ও মূল্যায়নের দিকে। তাই দেখতে পাই যখনই বিশ্বমানবসমাজের কোনো অংশ হিংস্র আগ্রাসনের শিকার, তখনই সদাজাগ্রত রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদে মুখর।

মানব রিপু সকল, যা মনুষ্যসমাজের পূর্ণ বিকাশের মৌলিক বাধাস্বরূপ হয়ে ব্যক্তি মানুষ ও মানবসমাজকে মানবতাবিরোধী আগ্রাসী শক্তির কাছে বন্দী দাস করে রাখে—তা হচ্ছে লোভ, নীচতা, হীনম্মন্য কাপুরুষতা। ফ্যাসিবাদের মতো অ-মানবিক সংস্কৃতিরও ভিত্তি এইখানেই।' তাই এই রিপুগুলির ব্যক্তি ও সামাজিক প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের সাবধানবাণী ও প্রতিবাদ তীব্রভাবে সোচ্চার। ফ্যাসিবাদের আক্রমণ শুধু রাষ্ট্রক্ষমতায় সীমাবদ্ধ নয়, তা সমগ্র মনুষ্যসমাজের বিরুদ্ধে বিশ্বমানবতার বিরুদ্ধে এক জঘন্য পৈশাচিক অভিযান।

এই ফ্যাসিবাদী সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার শোষণ ও ধ্বংসাত্মক আক্রমণের বিরুদ্ধে অতন্দ্র প্রহরী রবীন্দ্রনাথ। যখনই স্বৈরতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদী দানবীয় শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তখনই রবীন্দ্রনাথের লেখনী শাণিত খড়্গে রূপান্তরিত। ব্যুয়র যুদ্ধের কাল থেকে শুরু করে ওঁর জীবনের শেষ অধ্যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংকটকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বহু বিচিত্র সৃষ্টিধারায় ফ্যাসি-বিরোধিতা তাই নিরবচ্ছিন্ন। রবীন্দ্রনাথ সত্যই স্বভাব-ফ্যাসিবিরোধী।

মুখবন্ধঃ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদের মূল আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাবে বলেন :

সমস্ত য়ুরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে—কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল। অনেকদিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন ঘরে বদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই করবে।...

আজ মানুষ মানুষকে পীড়ন করাবার জন্য নিজের এই অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রকে ব্যবহার করেছে ; তাই সে ব্রহ্মাস্ত্র আজ তারই বুকে বেজেছে।...

['মা মা হিংসীঃ' : 'রবীন্দ্র রচনাবলী',
দ্বাদশ খণ্ড। সন ১৩২১/১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মূল কারণ সম্পর্কে লেখেন :

...পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে—তাহা এক দেশের উপর আর এক দেশের রাজত্ব এবং সেই দুই দেশ সমুদ্রের দুই পারে।

এত বড়ো বিপুল প্রভুত্ব জগতে আর কখনো ছিল না। য়ুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা।

এখন মুশকিল হইয়াছে জর্মনির। তার ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে ভোজের শেষ বেলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত।...

আজ ক্ষুধিত জর্মনির বুলি এই যে, প্রভু এবং দাস এই দুই জাতের মানুষ আছে। প্রভু সমস্ত আপনার জন্য লইবে, দাস সমস্তই প্রভুর জন্য জোগাইবে—যার জোর আছে সে রথ হাঁকাইবে, যার জোর নাই সে পথ করিয়া দিবে।

য়ুরোপের বাহিরে যখন এই নীতির প্রচার হয় তখন য়ুরোপ ইহার কটুত্ব বুঝিতে পারে না।

আজ তাহা নিজের গায়ে বাজিতেছে।

['লড়াইয়ের মূল' : 'রবীন্দ্র রচনাবলী',
ত্রয়োদশ খণ্ড। সন ১৩২১/১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ]

এই শতাব্দীর কুড়ির দশক থেকে বিশ্ব-পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে থাকে। মুসোলিনির স্বরূপ তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারেন এবং ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে বলেন :

ইতালির বর্তমান সমৃদ্ধিকে মানিয়া লইয়াও যদি দেখা যায় উহা অর্জনের জন্য

যে-পন্থা ও প্রক্রিয়া অনুসৃত হইয়াছে তা নীতিবিগর্হিত এবং ধরিত্রীর অবশিষ্টাংশের পক্ষে বিপদস্বরূপ, তবে তাহাকে বিচার করিবার অধিকার আমাদের অবশ্যই আছে। গবর্নমেণ্টের বাক্‌স্বাধীনতা অপহরণের কুৎসিৎ অপরাধ এবং বিশ্বশান্তির পক্ষে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাংক্ষায় আমি উহারই প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছি।

['দ্য স্টার', লণ্ডন। ৫ আগস্ট ১৯২৬। ইংরাজি থেকে অনুবাদিত]

বন্ধু চার্লস ফ্রীয়ার য়্যাণ্ড্রুজকে এক চিঠিতে লেখেন :

"ফ্যাসিবাদের কর্মপদ্ধতি ও নীতি সমগ্র মানবজাতির উদ্বেগের বিষয়। যে-আন্দোলন নিষ্ঠুরভাবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে দমন করে, বিবেক-বিরোধী কাজ করতে মানুষকে বাধ্য করে এবং হিংস্র রক্তাক্ত পথে চলে বা গোপনে অপরাধ সংঘটিত করে—সে-আন্দোলনকে আমি সমর্থন করতে পারি এমন উদ্ভট চিন্তা আসার কোনও কারণ নেই। আমি বরাবরই বলেছি পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলি সযত্নে উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবকে লালন-পালন করে সারা পৃথিবীর সামনে এক ভয়াবহ বিপদের সৃষ্টি করেছে।"

['ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান', লণ্ডন। ৫ আগস্ট ১৯২৬
উদ্ধৃতিটি মূল ইংরাজি থেকে অনুবাদিত]

আঁরি বারব্যুস প্রেরিত ঐতিহাসিক আবেদনপত্র [তৃতীয় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] ও তাঁর ব্যক্তিগত চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

বলাই বাহুল্য যে আপনার আবেদনের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে। আমি স্পষ্টই বুঝছি এই আবেদন আরও অসংখ্যের কণ্ঠ ধ্বনিত করছে—সভ্যতার অন্তঃস্থল থেকে হিংসার আকস্মিক বিস্ফোরণে যাঁরা বিষণ্ণ।...

['বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি', শান্তিনিকেতন। জুলাই ১৯২৭
ইংরাজি থেকে অনুবাদিত]

সমাজ ও সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিকাশকে লক্ষ্য করেই 'শিশুতীর্থ'-য়[১] কবি উচ্চারণ করেন :

১. 'শিশুতীর্থ'ই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র মূল ইংরাজি কবিতা। হিটলারী অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিপর্বের জার্মানিতে একটি খ্রীষ্টীয় পালা দেখার প্রতিক্রিয়ায় লেখা। —'রবীন্দ্র রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড

চলেছে পঙ্গু, খঞ্জ, অন্ধ, আতুর,
আর সাধুবেশী ধর্ম ব্যবসায়ী—
দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা।
সার্থকতা !
স্পষ্ট করে কিছু বলে না—কেবল নিজের লোভকে
মহৎ নাম ও বৃহৎ মূল্য দিয়ে ওই শব্দটার ব্যাখ্যা করে।
আর শাস্তি শঙ্কাহীন চৌর্যবৃত্তির অনন্ত সুযোগ ও
আপন মলিন ক্লিন্ন দেহমাংসের অক্লান্ত লোলুপতা
দিয়ে কল্পস্বর্গ রচনা করে।

['শিশুতীর্থ' : 'রবীন্দ্র রচনাবলী',
তৃতীয় খণ্ড। সন ১৩৩৮/১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ]

আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ফ্যাসিবাদী পরিণতি সম্পর্কে নির্ভুল বোধ ও অভিজ্ঞতা থেকেই অনিবার্য উপলব্ধি :

সভ্যতার এই ভিত্তিবদলের প্রয়াস দেখেছিলুম রাশিয়ায় গিয়ে। মনে হয়েছিল নরমাংসজীবী রাষ্ট্রতন্ত্রের রুচির পরিবর্তন যদি এরা ঘটাতে পারে তবেই আমরা বাঁচবো নইলে চোখরাঙানীর ভান করে অথবা দয়ার দোহাই পেড়ে দুর্বল কখনোই মুক্তিলাভ করবে না। নানা ত্রুটী সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি।...

['চিঠিপত্র', একাদশ খণ্ড। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ]

২৮ জুলাই ১৯৩৬ সালে আরও একটি চিঠিতে তিনি অমিয় চক্রবর্তীকে লেখেন :

যেমন হয়েছে জার্মানীতে, ইটালিতে, তেমনটা ঘটাতে হাত নিশপিশ করেছে ইংলণ্ডের নবদন্তোদ্গত ফ্যাসিস্টদের। বলা যায় না কালক্রমে ইংলণ্ডে যদি এই ফ্যাসিস্টদের রাস্তাই প্রশস্ত হয়, তা হ'লে আন্দামানে লোক-বিরলতা ঘটবে না।...সোভিয়েট রাশিয়ার নাম করা এদেশে অপরাধ বিশেষ। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে না করেও থাকতে পারিনে।...সেখানে সোভিয়েট য়ুরোপ এবং সোভিয়েট এশিয়ার মাঝখানে কোনো অসম্মান নেই।"

['চিঠিপত্র', একাদশ খণ্ড]

তারপরই স্পেনে ফ্যাসিবাদী প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ ও ফ্যাশিবাদ-বিরোধী লীগ'-এর সভাপতি রবীন্দ্রনাথের মর্মভেদী আহ্বান :

স্পেনে আজ বিশ্বসভ্যতা আক্রান্ত ও পদদলিত। স্পেনের জনগণের গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছে। অর্থ ও জনবল দিয়ে বিদ্রোহীদের সাহায্য করছে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ।···

শিল্প-সংস্কৃতির গৌরবকেন্দ্র মাদ্রিদ আজ জ্বলছে। বিদ্রোহীদের বোমার ঘায়ে তার অমূল্য শিল্পসম্পদ বিধ্বস্ত। এমন কি হাসপাতাল ও শিশুসদনগুলিও রেহাই পাচ্ছে না। নারী ও শিশুদের হত্যা, গৃহহীন ও ভিক্ষুক করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের এই সর্বনাশা প্লাবন রোধ করতেই হবে। স্পেনে কুসংস্কার, জাতিদ্বেষ, বর্বর লুণ্ঠনবৃত্তি এবং যুদ্ধবাদকে মহনীয় করে পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা চলেছে তাকে চূড়ান্ত প্রত্যাঘাত হানতেই হবে।···

['স্টেটসম্যান', কলকাতা। ৩ মার্চ ১৯৩৭। ইংরাজি থেকে অনুবাদিত]

ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিস্বাধীনতা-রক্ষা-সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের বাণী :

"ঔপনিবেশিক শোষণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখন আরও তীব্র হয়ে উঠবে, তখন ইংরেজ নাগরিকরা বাধ্য হবে তাদের সরকারের হাতে আরও বিশেষ ক্ষমতা তুলে দিতে, যাতে তাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য রক্ষা করা যায়। তারপর একদিন তারা হঠাৎ জেগে উঠে দেখবে যে তাদের নিজেদের স্বাধীনতাও লুপ্ত হয়েছে এবং তারা চলে গেছে ফ্যাসিস্টদের বজ্রমুষ্টির আওতায়।"

['অমৃতবাজার পত্রিকা', কলকাতা। ১৭ অক্টোবর ১৯৩৭
উদ্ধৃতিটি মূল ইংরাজি থেকে অনুবাদিত]

স্পেন ও আবিসিনিয়ায় আগ্রাসী ফ্যাসিবাদের বীভৎস আক্রমণের সামনে ক্লীবতার পৃষ্ঠপোষক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ গর্জে ওঠেন :

···রাষ্ট্রপতি যত আছে
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ-নির্দেশ
রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি রুদ্ধ ওষ্ঠাধরের চাপে
সংশয়ে সংকোচে। এদিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণী নদীপার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংসক্ষুধিত শকুনি,

আকাশেরে করিল অশুচি। মহাকাল সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা-'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন···

এই সময়ই আশৈশব বিশ্বশান্তির পূজারী কবির কণ্ঠে বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের আকুল আহ্বান :

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

['প্রান্তিক'-১৮ : 'রবীন্দ্র রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড। সন ১৩৩০/১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ]

এশিয়ায় জাপানী ফ্যাসিবাদ চীন আক্রমণ করে। জাপানের কবি নোগুচি রবীন্দ্রনাথকে চীনের সঙ্গে দূতিয়ালির আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র লেখেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সে-আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে এবং জাপানী সমরবাদের প্রতি নোগুচির নির্লজ্জ সমর্থনকে ধিক্কার জানিয়ে কবি তাঁর পত্রোত্তরের শুরুতেই লেখেন :

প্রিয় নোগুচি,

আপনি আমাকে যে-পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে আমি গভীর বিস্ময় বোধ করিয়াছি। আপনার লেখার মধ্য দিয়া ও আপনার সহিত ব্যক্তিগত যোগাযোগের ফলে আমি জাপানের যে-ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলাম, এই পত্রের সুর ও বিষয়বস্তুর সহিত তাহার কোনো সামঞ্জস্য নাই। একথা ভাবিতে কষ্ট হয় যে সর্বাত্মক সমরবাদী উত্তেজনা কখনও কখনও সৃজনপ্রতিভাধর শিল্পীকেও অসহায়ভাবে অভিভূত করে এবং অকৃত্রিম মনীষা নিজ মর্যাদা ও সত্যনিষ্ঠাকে যুদ্ধদানবের বেদীমূলে উৎসর্গ করে।

ফ্যাসিস্ত ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়ায় নির্বিচার হত্যার নিন্দায় আপনি আমার সহিত একমত বলিয়া মনে হয়, অথচ চীনের লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর মারাত্মক আক্রমণকে আপনি ভিন্ন মানদণ্ডে বিচার করিতেছেন। বিচারের ভিত্তি অবশ্যই ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্যের মারাত্মক রীতির অনুকরণে জাপান

যে আজ সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ সকল নীতি লঙ্ঘন করিয়া চীনের মানুষের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী যুদ্ধ শুরু করিয়াছে—এই সত্যকে কোনো যুক্তিই পরিবর্তন করিতে সক্ষম নয়।···

আপনাদের দেশের লোকদের আমি ভালোই জানি। তাহারা যে চীনের নর-নারীদিগকে আফিং প্রভৃতি নেশায় আচ্ছন্ন করার পরিকল্পনায় স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করিতেছে, তাহা ভাবিতেও আমার ঘৃণা হয়। তাহারা না বুঝিয়াই এ কাজ করিতেছে।···

আমি জানি একদিন আপনার দেশবাসীদের মোহ ঘুচিবে এবং রণোন্মত্ত সমরনায়কগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ তাহাদের শতাব্দীকাল ধরিয়া দূর করিতে হইবে।···

আমরা আশা করি অদূর ভবিষ্যতে চীন ও জাপানের জনগণ মিলিতভাবে এই তিক্ত অতীতের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিবেন। প্রকৃত এশীয় মানবতার নবজন্ম হইবে। এমন মানবসমাজ যেখানে বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের সাহায্যে ভ্রাতৃহত্যার স্থান নাই তেমন ভবিষ্যতের প্রতি লজ্জাবিহীনভাবে আস্থা প্রকাশ করিবেন এবং তার জয়গানে মুখরিত হইবেন।

[রবীন্দ্রনাথ-নোগুচি পত্রালাপ, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। ইংরাজি থেকে অনুবাদিত
দ্র. ***Anti Fascist Traditions in Bengal***]

চেকোস্লোভাকিয়ায় হিটলারী আগ্রাসনের খবরে বিচলিত রবীন্দ্রনাথ বন্ধু দার্শনিক লেস্‌নিকে লেখেন :

আপনার দেশের জনগণের দুঃখে আমি সম্পূর্ণ একাত্ম-সমব্যথী। আপনাদের দেশে যা ঘটছে তা সহানুভূতিযোগ্য স্থানীয় দুর্ভাগ্যমাত্র নয়। এ এক মর্মান্তিক উদ্ঘাটন যা দেখিয়ে দিচ্ছে গত তিন শতাব্দী ধরে যে সব আদর্শ ও নীতিবোধের চর্চা আর অর্জনে পশ্চিমের জনগণ প্রাণও দিয়েছেন, আজ তার অভিভাবকত্ব বর্তেছে একদল কাপুরুষের হাতে। এই কাপুরুষ দল আত্মরক্ষার সংকীর্ণ মূল্যে এই অর্জিত সম্পদ বিক্রি করে দিচ্ছে।

['হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড,' কলকাতা। ১০ নভেম্বর ১৯৩৮
ইংরাজি থেকে অনুবাদিত]

অমিয় চক্রবর্তীকে আরেকটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

দেখলুম দূরে বসে ব্যথিতচিত্তে, মহা-সাম্রাজ্যশক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয়

ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখতে লাগল জাপানের করাল দংষ্ট্রাপংক্তির দ্বারা চীনকে খাবলে খাবলে খাওয়া, অবশেষে সেই জাপানের হাতে এমন কুশ্রী অপমান বারবার স্বীকার করল যা তার প্রাচ্যসাম্রাজ্যের সিংহাসনচ্ছায়ায় কখনও ঘটেনি। দেখলুম ঐ স্পর্দ্ধিত সাম্রাজ্যশক্তি নির্বিকারচিত্তে এবিসিনীয়াকে ইটালির হাঁ করা মুখের গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেখল, মৈত্রীর নামে সাহায্য করল জার্মানীর বুটের তলায় গুঁড়িয়ে ফেলতে চেকোশ্লোভাকিয়াকে; দেখলুম নন-ইণ্টারভেনশনের কুটিল প্রণালীতে স্পেনের রিপব্‌লিক্‌কে দেউলে করে দিতে—দেখলুম ম্যুনিক প্যাক্টে নতশিরে হিটলারের কাছে একটা অর্থহীন সই সংগ্রহ করে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করতে। ...মানব ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নাৎসিজমের কলঙ্ক প্রলেপ আর সহ্য হয় না...

['চিঠিপত্র' : একাদশ খণ্ড। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সংবাদ পেয়ে কবি ঘোষণা করলেন :

জার্মানির বর্তমান শাসকের দাম্ভিক ন্যায়হীনতায় বিশ্বের বিবেক আজ গভীরভাবে আহত। বর্তমান পরিস্থিতি পূর্বের অনেকগুলি ক্ষেত্রে দুর্বলের অসহায় পীড়নের চূড়ান্ত পরিণতি।...

আমি কেবলমাত্র এই আশা প্রকাশ করতে পারি যে মানবজাতি এই পরীক্ষায় জয়যুক্ত হোক। সর্বকালের জন্য জীবনের শুচিতা এবং অত্যাচারিত জনগণের স্বাধীনতা দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হোক! পৃথিবী এই রক্তস্নানের ধারায় চিরতরে কালিমামুক্ত হোক!

['মডার্ন রিভিউ'। অক্টোবর ১৯৩৯
ইংরাজি থেকে অনুবাদিত]

সংকলক : নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন

[এই শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সহজাত ঘৃণা ও ক্রোধ স্বাভাবিকভাবে সাম্রাজ্যবাদের যে নিষ্ঠুর ও নিকৃষ্টতম প্রকাশ ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ—তার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও প্রবল বিরোধিতায় পরিণত হয়। তখনকার জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা জওহরলাল নেহরু বলেন ফ্যাসিবাদ যেখানে রাজত্ব করে সেখানে জঙ্গলের আইন-কানুনই থাকে। সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে অনিবার্যভাবে আমাদের জাতীয় মুক্তির আন্দোলন বিশ্বের যেখানে যেখানে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন হচ্ছে—কি চীন, কি চেকোস্লোভাকিয়া, কি স্পেন, কি আবিসিনিয়া—তাদের সকলের সঙ্গেই সৌভ্রাত্র ও সৌহার্দ্য স্থাপন করে। সেদিনের একমাত্র সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র, সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের একমাত্র ভরসাস্থল, সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকেও সে বন্ধুতার হাত প্রসারিত করতে চেয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচীতে, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের নেতাদের—বিশেষত নেহরুর—বক্তব্যের মধ্যে এই ফ্যাসিবাদবিরোধী সুর খুবই স্পষ্ট এবং জোরাল। তারই কোনো কোনো অংশ এখানে একত্রিত করার চেষ্টা হয়েছে।—সংকলক]

ফ্যাসিবাদ এখন দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে ফ্যাসিবাদ ইটালির ঘরোয়া ব্যাপার নয়। যখনই কোনো দেশে কতকগুলো বিশেষ ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা দেখা দেয়, তখনই ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হয়। শ্রমিকশ্রেণী যখন শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ধনবাদী রাষ্ট্রের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তোলে, ধনিকশ্রেণীও তখন স্বাভাবিকভাবেই আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। সাধারণত ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের সময়েই শ্রমিকশ্রেণীর এ ধরনের জাগরণ দেখা যায়। যদি ক্ষমতাসীন শাসকশ্রেণী সাধারণ গণতান্ত্রিক উপায়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে শ্রমিক-জাগরণকে দমন করতে না পারে, তাহলে তখন তারা ফ্যাসিস্ট পদ্ধতি অবলম্বন

করে। সে পদ্ধতি হল ধনিকশ্রেণীকে রক্ষা করার জন্য কিছু জনপ্রিয় বাগাড়ম্বর দ্বারা এক ধরনের গণআন্দোলন সৃষ্টি করা। এই আন্দোলনের প্রধান সমর্থন যোগায় নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ, প্রধানত বেকাররা এবং রাজনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ ও অসংগঠিত শ্রমিক-কৃষকদের অংশ। এই আন্দোলনকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে বড় বড় ধনিকগোষ্ঠী। যদিও ফ্যাসিস্টদের নীতি ও কর্মপদ্ধতি হিংসার উপরই প্রতিষ্ঠিত, তবুও দেশের ধনবাদী সরকার বহুলাংশে তাদের তোয়াজ করে, কারণ উভয়েরই শত্রু এক—সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী শ্রমজীবী জনতা। ক্ষমতায় এলে ফ্যাসিস্টরা শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত সংগঠনকে ধ্বংস করে এবং সমস্ত বিরোধীদের সন্ত্রস্ত করে।

[কন্যা ইন্দিরাকে লেখা জওহরলাল নেহরুর চিঠি, ২২ জুন ১৯৩৩]

১৯৩৫-এর ২৭-এ অক্টোবর, রবিবার, কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী দলের বাঙলা শাখার দপ্তরে ৬০টি রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সভা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী দল, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, 'গণবাণী' গোষ্ঠী, মুসলিম যুব পরিষদ, বঙ্গীয় সমাজতন্ত্রী দল, বাঙলার লেবার পার্টি, বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে শ্রমিক সংঘ, কলকাতা ট্রাম-শ্রমিক ইউনিয়ন প্রভৃতির নেতৃবৃন্দ। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে 'ইটালি-আবিসিনিয়া যুদ্ধবিরোধী সংঘ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়। আবিসিনিয়ার উপর ফ্যাসিস্ট ইটালির আক্রমণের নিন্দা করে ও আবিসিনীয়দের বীরত্বপূর্ণ স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি সৌহার্দ্য জানিয়ে সভায় একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। সভায় যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী নেতা অতুলকৃষ্ণ বসু, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের শান্তিরাম মণ্ডল ও ট্রামশ্রমিকনেতা মহম্মদ ইসমাইল।

['আনন্দবাজার পত্রিকা', ২৯ অক্টোবর ১৯৩৫]

আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সমর্থন জানিয়ে ও ফ্যাসিস্ট ইটালির আক্রমণের নিন্দা করে ভারতের খ্যাতনামা বহু চিকিৎসক সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, ভারতীয় চিকিৎসক সংঘের কেন্দ্রীয় পরিষদ সিদ্ধান্ত করেছে যে আবিসিনিয়াতে আহত স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের চিকিৎসা ও সেবা করার জন্য একদল ভারতীয় চিকিৎসককে স্বেচ্ছাসেবক-

হিসেবে পাঠানো হবে। সে-কারণে আড়াই লক্ষ টাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে অর্থ ও ঔষধ দান করার জন্যও স্বাক্ষরকারীরা আবেদন করেছেন। সাহায্য পাঠাতে হবে সংঘের সম্পাদকের কাছে—৬৭ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা—এই ঠিকানায়। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন ডাক্তার নীলরতন সরকার, বিধানচন্দ্র রায়, কুমুদশঙ্কর রায়, এ. সি. সেন, চারুচন্দ্র বসু প্রভৃতি।

['আনন্দবাজার পত্রিকা', ২৮ নভেম্বর ১৯৩৫ (সংক্ষেপিত)]

আদ্দিস আবাবা এখন বিজয়ীর পায়ের তলায়। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বীরের মতো লড়াই করেও ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদের দানবশক্তির কাছে আবিসিনিয়া আজ পরাজিত।.... সাময়িকভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিজয়ী হয়েছে, কিন্তু আবিসিনিয়ার বা অন্য কোনো পরাধীন দেশের মুক্তিসংগ্রাম থেমে যাবে না, চলবেই, যতদিন পর্যন্ত না সাম্রাজ্যবাদকে নিশ্চিহ্ন করে পৃথিবীর সর্বত্র স্বাধীনতা বিজয়ী হয়। আবিসিনিয়ায় আমাদের বিপর্যস্ত ভাইদের জন্য ভারতবর্ষে আমরা এখন বিশেষ কিছুই করতে পারব না, কেননা আমরাও সাম্রাজ্যবাদের পদানত। কিন্তু তাঁদের এই চরম দুর্দিনে আমরা তাঁদের পাশে আছি—এই কথাটুকু তাঁদের নিশ্চয়ই জানাতে পারি, কারণ আমরা ভরসা রাখি যে শৃংখল-মুক্ত সুদিনেও আমরা ঐক্যবদ্ধভাবেই দাঁড়াব।

[১৯৩৬-এর ৫ মে 'আবিসিনিয়া দিবস' পালনের আহ্বান জানিয়ে জওহরলালের বিবৃতি]

আমি এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত যে আন্তর্জাতিক পটভূমিতে দেশের সমস্যাকে বিচার করাই নিজেদের সমস্যার একমাত্র সঠিক বিচার।...সারা পৃথিবী জুড়ে কি বিরাট পরিবর্তন আসছে! ইটালীয় সাম্রাজ্যবাদ বীর আবিসিনীয়দের বোমা মেরে হত্যা করছে; জাপানী সাম্রাজ্যবাদ উত্তর-চীন ও মঙ্গোলিয়ায় তার আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ঐসব রাষ্ট্রের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে বকধার্মিকের মতো প্রতিবাদ জানাচ্ছে, অথচ নিজে একই দুর্ব্যবহার করছে ভারতবর্ষে ও সীমান্ত-অঞ্চলে। আর এ সব কিছুর পেছনে রয়েছে এক ক্ষয়িষ্ণু অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা যা এই সমস্ত সংঘর্ষকে তীব্র করে তুলছে ...আমি সুনিশ্চিত যে পৃথিবী ও ভারতের সমস্ত সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি খুঁজে পাওয়া যাবে সমাজতন্ত্রের মধ্যেই।

[জওহরলাল নেহরু : কংগ্রেস সভাপতির ভাষণ থেকে, লক্ষ্ণৌ, ১৯৩৬]

বিশ্বযুদ্ধের বিপদ এখন অনেক বেশি বেড়ে গেছে। বিভিন্ন দেশে দেখা দিয়েছে ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব, ইটালি আক্রমণ করেছে আবিসিনিয়াকে, জাপান আক্রমণ করেছে উত্তর-চীন ও মঙ্গোলিয়াকে, বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তিদের মধ্যে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে এবং অস্ত্রসজ্জার জোর প্রতিযোগিতা চলছে। ফলে পৃথিবী জুড়ে এক বিরাট ভয়াবহ যুদ্ধের বিপদ দেখা দিচ্ছে।… কংগ্রেস এই বিপদের বিরুদ্ধে দেশকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে এবং ঘোষণা করছে যে ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে না।

[যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাব : লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস, ১৯৩৬]

ইয়োরোপের ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রগুলির সৈন্য ও অস্ত্রে পরিপুষ্ট সামরিক গোষ্ঠী-সমূহের বিরুদ্ধে স্পেনের জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে জাতীয় কংগ্রেস গভীর সহানুভূতি ও উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে। কংগ্রেসের কাছে এটা স্পষ্ট যে স্পেনে আজ ফ্যাসিবাদ ও গণতান্ত্রিক প্রগতির মধ্যে যে-লড়াই চলছে, তা সমস্ত পৃথিবীর পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতবর্ষকেও তা প্রভাবিত করতে বাধ্য।…ভারতবর্ষের জনসাধারণের হয়ে কংগ্রেস স্পেনের জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং স্বাধীনতার জন্য তাদের এই মহান সংগ্রামে স্পেনের জনতার পাশে দাঁড়াবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

[কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব : ফৈজপুর, ডিসেম্বর ১৯৩৬]

চীনের উপর জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বর্বর আক্রমণ এবং বেসামরিক অধিবাসীদের উপর নিষ্ঠুর বোমাবর্ষণে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গভীর উদ্বেগ ও ঘৃণা প্রকাশ করছে।

বহু বাধা ও বিপত্তি সত্ত্বেও জাতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য চীনের জনগণের সাহসী ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রতি কমিটি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছে এবং জাতীয় বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে অভ্যন্তরীণ ঐক্য গড়ে তোলার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছে।

চীনের জনগণের সঙ্গে সৌহার্দ্য জানিয়ে জাপানী পণ্য ব্যবহার সম্পূর্ণ বর্জন করার জন্য কমিটি ভারতের জনগণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে।

[নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব : কলকাতা, অক্টোবর ১৯৩৭]

স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চেকোস্লোভাকিয়ার সাহসী জনগণের সংগ্রামের

প্রতি সুদৃঢ় সৌহার্দ্য জানিয়ে কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। আমরা আশা করি যে দেরিতে হলেও মানবতার বিবেক এখনও জাগ্রত হবে এবং আসন্ন বিপর্যয়ের হাত থেকে মানসভ্যতাকে রক্ষা করবে। আপনি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

[১৯৩৭-এর এপ্রিলে এলাহাবাদে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে চেকোস্লোভাক রাষ্ট্রপতি ডাঃ বেনেসের কাছে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর তারবার্তা].

গত কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটেছে। ফ্যাসিস্ট আক্রমণাত্মক অভিযান বেড়েই চলেছে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাই ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রগুলির অঘোষিত নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতি নিরবচ্ছিন্নভাবে জার্মানি, স্পেন ও দূর-প্রাচ্যে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রদেরই সমর্থন করে এসেছে।···ফলে এক সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠছে।

[হরিপুরা কংগ্রেসের প্রস্তাব : ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮]

সম্প্রতি আমি বার্সিলোনাতে গিয়েছিলাম এবং নিজের চোখে দেখে এসেছি সেখানকার ধ্বংসস্তূপ। · সে ছবি আমার হৃদয়ে গাঁথা রয়ে গেছে। স্পেন এবং চীনে যখন প্রতিদিন বিমান থেকে বোমা বর্ষণের খবর পড়ি, তখন তার ভয়াবহ ফলাফলের কথা ভেবে আমি শিউরে উঠি। তবে, সেই ধ্বংসলীলাকে ছাপিয়ে আমার চোখের সামনে আর-একটা ছবি ভেসে ওঠে—দীর্ঘ দু-বছর ধরে কি অতুলনীয় বীরত্বের সঙ্গে স্পেনের মৃত্যুহীন জনগণ এই ভয়াবহ ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে। ভারতের জনসাধারণের পক্ষ থেকে প্রজাতন্ত্রী স্পেনের সেইসব বীর নরনারীকে আমি আজ জানাতে চাই আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন। ইতিহাসের আদিকাল থেকেই চীনের জনগণের সঙ্গে আমরা মৈত্রীর সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ—তাঁদের প্রতিও তাই আমরা আমাদের বন্ধুতার হাত বাড়িয়ে দিই। স্পেন এবং চীনের বিপদ আমাদেরও বিপদ; তাঁদের উপর আঘাত এলে আমরাও ক্ষতবিক্ষত হই। ভবিষ্যতে ভালোমন্দ যাই আসুক না কেন, আমরা হাতে হাত ধরেই তার মোকাবিলা করব।

[১৯৩৮-এর জুলাই, পারী শহরে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে জওহরলাল নেহরুর বক্তৃতা]

আমাদের সমস্ত সহানুভূতি চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতি। যদি যুদ্ধ আসে তাহলে তাঁদের ফ্যাসিস্টপ্রেমী সরকার সত্ত্বেও ইংরেজরা অনিবার্যভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেই। কিন্তু যে ব্রিটিশ সরকার ফ্যাসিস্ট ও নাৎসি রাষ্ট্রের প্রেমে গদগদ, সেই সরকার কেমন করে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করবে?··· সে যাই হোক, ভারতবর্ষে আমরা সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদ উভয়েরই বিরুদ্ধে, কারণ আমরা জানি যে এরা উভয়েই বিশ্বশান্তি ও স্বাধীনতার শত্রু।

[জওহরলাল নেহরু: 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'-এ চিঠি, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮]

দেশে ও সারা পৃথিবীতে ফ্যাসিবাদকে রুখতেই হবে। ভারতীয় হিসেবে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চাই এবং তার জন্য সংগ্রামও করে যাব। কিন্তু আমি এটাও বিশ্বাস করি যে আন্তর্জাতিক বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও ভারতের স্বাধীনতা প্রয়োজন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য।···স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ···একটি ফ্যাসিবাদবিরোধী দুর্গে পরিণত হবে।

[জওহরলাল নেহরু, ২৩ অক্টোবর ১৯৩৮]

আমাকে আজ আপনারা যে সম্মান জানালেন তা আসলে স্পেনের প্রজাতন্ত্র ও আন্তর্জাতিক ব্রিগেডকে সম্মান দেখানো। গণতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে এই প্রচণ্ড সংগ্রামে আমি একজন সাধারণ সৈনিক। আড়াই বছর ধরে স্পেন লড়ছে এবং এখনও অপরাজিত রয়েছে। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্পেনের গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্কোকেই কার্যত সাহায্য করছে, সে-ই আমাদেরও পরাধীন করে রেখেছে। আমাদেরও তাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। স্পেনের জনগণ যেমন গড়েছে, আমাদেরও তেমনি শ্রমিক কৃষক ও মধ্যশ্রেণীর ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

[১৯৩৮-এর ১৭ ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের ভারতীয় সদস্য গোপাল মুকুন্দ হুদ্দারের বক্তৃতা]

আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ও বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সপক্ষে আমরা দৃঢ়ভাবেই দাঁড়িয়েছি। রক্ষণশীল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যখন স্পেনে গোপনে ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোকেই সাহায্য করছিলেন, তখন আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা জওহরলাল প্রকাশ্যেই প্রজাতন্ত্রী স্পেনের সঙ্গে সৌহার্দ্য জানাচ্ছিলেন। মাদ্রিদ রক্ষার বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে আন্তর্জাতিক বিগ্রেডে ভারতীয়

কমরেডরাও লড়াই করেছেন।...জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনের সপক্ষেও ভারতের জাতীয় কংগ্রেস একটি সৌভ্রাত্রমূলক চিকিৎসকদল পাঠিয়েছে। আমাদের দেশের মধ্যে একইভাবে সমস্ত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গড়ে তুলতে হবে।

[১৯৩৯-এর জানুয়ারিতে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলনে সভাপতি ডাঃ কে. এম. আশরফের ভাষণ]

কংগ্রেস বার বার ঘোষণা করেছে যে ভারতবর্ষ ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ সাম্রাজ্যবাদেরই নিকৃষ্ট রূপ, যার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণ দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে আসছে। পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে নাৎসি জার্মানির আক্রমণাত্মক অভিযানকে তাই কংগ্রেস তীব্র নিন্দা করছে। যদি এই যুদ্ধ সত্যিই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য হয়, তবে ভারতের তাতে সমর্থন আছে। কিন্তু যদি এই যুদ্ধ আসলে স্থিতাবস্থা রক্ষার (অর্থাৎ সাম্রাজ্য, উপনিবেশ ও কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করার) জন্য হয় তাহলে ভারত তাতে জড়িয়ে পড়তে কিছুতেই রাজী নয়।...কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি ঘোষণা করছে যে তারা চায় সারা পৃথিবীতে জনগণের প্রকৃত গণতন্ত্র বিজয়ী হোক এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও ভয়াবহ যুদ্ধের অভিশাপ চিরতরে লুপ্ত হোক।

[কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির প্রস্তাব, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯]

ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ প্রতিদিন আরও শক্তিমান হয়ে উঠছে। ভারত মনে করে যে পৃথিবীর শান্তি ও প্রগতির পক্ষে এটাই সবচেয়ে বড় বিপদ। প্রতিক্রিয়ার এই জোয়ারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার জন্য যারাই লড়াই করছে, ভারত মনপ্রাণ দিয়ে তাদেরই পাশে আছে। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদকে ভারত কোনোদিনই সহ্য করবে না।

[রামগড়ে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ভাষণ, মার্চ ১৯৪০]

জাপানী আক্রমণ আজ আসন্ন। যারা মনে করে জাপান ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবে, তাদের মনোবৃত্তি ক্রীতদাসের। আমরা প্রভুবদল চাই না। আমরা সর্বশক্তি দিয়ে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করব।

[এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় মৌলানা আজাদের ভাষণ, এপ্রিল ১৯৪২]

আমাদের এ রকম কোনো ভ্রান্ত ধারণা নেই যে হিটলার আমাদের স্বাধীনতা দেবে। আমরা জানি যে আমাদের স্বাধীনতা ব্রিটেন কি হিটলার কারুর কাছ থেকেই দান হিসেবে আসতে পারে না। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের দৌলতে ফ্যাসিস্ট আক্রমণকারীকে সশস্ত্র প্রতিরোধ করার পথ আমাদের বন্ধ। কিন্তু আমরা কিছুতেই হিটলার বা জাপানের কাছে দাসত্ব স্বীকার করে নেব না।

[জওহরলাল নেহরু, বোম্বাই, ৮ জুন ১৯৪২
'অমৃতবাজার পত্রিকা,' ৯ জুন ১৯৪২]

আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের অভ্যুদয়ের সূচনায় ভারতে শুধু আমার মনে নয়, আরও অনেকের মনে কি গভীর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। চীনের বিরুদ্ধে জাপানী আক্রমণে ভারত গভীরভাবে বিচলিত হয়েছিল, ইটালি কর্তৃক আবিসিনিয়া-ধর্ষণ আমাদের মনে ঘৃণার সঞ্চার করেছিল, চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের ক্ষতবিক্ষত করেছিল, দীর্ঘ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পর প্রজাতন্ত্রী স্পেনের পতন আমাদের মনে গভীর শোকের সৃষ্টি করেছিল।···ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের কি পরিহাস যে আজ যখন ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী তুমুল যুদ্ধ চলছে, তখন আমি ও আমার মতাবলম্বী অনেকে জেলখানায় দিন কাটাচ্ছি; আর যারা সেই যুগে হিটলার মুসোলিনি ও জাপানকে তোয়াজ করেছিল—তারাই আজ ফ্যাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধে মাতব্বরি করছে···।

[জওহরলাল নেহরু, 'ভারত আবিষ্কার', ১৩ এপ্রিল ১৯৪৪]

১৯৪৪-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের বার্ষিক সম্মেলনে দেশনেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ঘোষণা করেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের লালফৌজের হাতে ফ্যাসিস্ট সেনাদলের চরম পরাজয় মানবতার জীবনে অভিশপ্ত অন্ধকার রাতকে তাড়িয়ে স্বাধীনতা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রাকে সুনিশ্চিত করছে। আমাদের ছাত্রসমাজ আন্তর্জাতিকতাবাদে আচ্ছন্ন হচ্ছে, এই অভিযোগের উত্তর দিয়ে শ্রীমতী নাইডু বলেন: "আকণ্ঠ পাঁকে ডুবে থাকার চেয়ে এক পা চুংকিং-এ ও এক পা মস্কোতে থাকাও ভালো।"

যখন বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা একের পর এক তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ

করছিল, তখন সোভিয়েত রাশিয়া তার প্রতিটি আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিকে রক্ষা করেছিল, আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে এবং শান্তির স্বপক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল। সমগ্র ইয়োরোপ ও এশিয়ায় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দুর্গ আজ একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই।...যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাজিত হয়, তবে ইয়োরোপে গণতন্ত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

[জওহরলাল নেহরু, 'বিশ্বইতিহাস পরিচয়']

সংকলক : মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়

ভারত ও চীন

বিনয় ঘোষ

[স্বনামধন্য গবেষক বিনয় ঘোষ রচিত 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থমালা'র (২৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) অন্যতম পুস্তিকা 'ভারত ও চীন'-এর কয়েকটি পৃষ্ঠা বানান ও যতিচিহ্নের প্রয়োজনীয় সংশোধন সহ প্রকাশ করা হল।—সম্পাদক]

আমাদের ভারতকে আমরাই বাঁচাব

আমাদের হাজার বছরের প্রতিবেশী ও শুভাকাংক্ষী চীনের এই ইতিহাস থেকে আমাদের আজ শিখবার কিছু নেই কি? যে এশিয়াতে ফ্যাসিস্ট জাপান কামানবন্দুক নিয়ে লক্ষ লক্ষ নরমুণ্ডের উপর "নূতন সভ্যতা" গড়তে যাচ্ছে, সেই এশিয়ার সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্মদাতা ও উত্তরাধিকারী কারা? ভারত ও চীন। এশিয়ার হাজার হাজার বছরের বিচিত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কাদের সমাজের, কাদের শিক্ষার, কাদের দৈনন্দিন জীবনের, আচার-ব্যবহারের কাহিনী অমর অক্ষরে লেখা আছে? ভারত ও চীনের। সেই চীন যখন আজ জাপানের রাহাজানি, লুণ্ঠন ও আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়ছে, সেই চীনকে ধ্বংস করে যখন বর্মার সীমান্ত বঙ্গোপসাগর ও পূর্ব-ভারত মহাসাগর থেকে জাপানী কামান ভারতভূমির দিকে উদ্যত, যখন জাপানী বিমান ইতিমধ্যেই বোমার আঘাতে শত শত ভারতবাসীকে হত্যা করেছে, ভাইজাগ কোকোনদ কলম্বো চট্টগ্রাম ও আসামের শত শত পরিবারকে গৃহহীন করেছে, তখনও কি আমাদের বুঝতে দেরি হবে চীনের শক্তি কোথায়, কেন চীন লড়ছে, চীনের যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ কি না, চীনের একতা ও দৃঢ়তার অক্ষয় হাতিয়ার আমাদেরও হাতিয়ার কি না? কোনো নেতার মুখ চেয়ে, কোনো বাধার সামনে চীনের জনসাধারণ চুপ করে বসে থাকে নি। কোনো 'পাকিস্তান'[১] কোনো 'হিন্দুস্থান' চীনা বৌদ্ধ ও মুসলমানদের একতার পথে বাধা হয় নি, কোনো দাবি দেশরক্ষার শ্রেষ্ঠ দাবিকে ছাড়িয়ে মাথা তুলতে পারে নি চীনে। সব দাবি, সব অভিযোগ, গোষ্ঠীগত ও দলগত সব আদর্শ একমাত্র মহৎ আদর্শের

---

১. 'পাকিস্থান' ছিল—সম্পাদক

মধ্যে এক হয়ে মিশে গিয়েছিল এবং সে-আদর্শ হচ্ছে দেশরক্ষার আদর্শ, স্বাধীনতার আদর্শ, দেশপ্রেমের আদর্শ, শত্রুকে ধ্বংস করার আদর্শ। এখনও কি আমাদের ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত দাবিদাওয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব করার সময় আছে? চীনের জনসাধারণের মতো আজ দেশের নিদারুণ জীবন-মরণ সংকটের দিনে ভারতের চাষী-মজুর-ছাত্রকে সংগ্রামের পথ দেখাতে হবে। **চীনের মতো বৃহত্তম ঐক্যের পথে আজ জাপ-বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতের মুক্তিসংগ্রাম শুরু হবে। কোটি কোটি ভারতবাসীকে বলতে হবে, 'আমাদের ভারতকে আমরাই বাঁচাব'।** তাহলে জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ হয় নিরপেক্ষতার নিরাপদ সিংহাসন থেকে নেমে এসে ভারতবাসীর মিলিত অভিযানের সঙ্গে পা মেলাতে এবং কোটিকণ্ঠের সঙ্গে সুর মেলাতে বাধ্য হবেন, না হয় বায়ুতে বিচরণ করে বায়ুর সঙ্গে মিলিয়ে যাবেন। আমরা দাঁড়িয়ে দিন গুনব না। যদি আজ আমরা দশজন ভারতবাসী মিলেও একজন জাপানী ফ্যাসিস্ট দস্যুকে কবর দেবার শপথ করি, তাহলে সমস্ত জাপান উজাড় করেও ভারতের একসিকিও শত্রু দখল করতে পারবে না। আজ তাই আমাদের আদর্শ হবে, **'একজন ভারতবাসী —একজন জাপানী দস্যু'**। জাপান তো জাপান, দশটি জাপান আসাম বাঙলা বিহার উড়িষ্যা যুক্তপ্রদেশ পর্যন্ত গ্রাস করতে দেউলিয়া হয়ে যাবে। ফ্যাসিস্ট জাপানের চিতাশয্যার উপর দাঁড়িয়ে স্বাধীন ভারত ও চীন সমগ্র এশিয়ার, তথা সমগ্র বিশ্বের, মুক্তি ঘোষণা করবে।

ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে আজকের কর্তব্য

স্নেহাংশু আচার্য

['ফ্যাশিবাদ বিরোধী জনসংঘ' স্নেহাংশু (কান্ত) আচার্যর 'ফ্যাশিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে আজকের কর্তব্য' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। ডাবল ক্রাউন ১/১৬ সাইজের মোট বত্রিশ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকার প্রথম পৃষ্ঠা কভার, কোনো ব্লক ব্যবহার করা হয় নি—অলংকরণ হিসেবে সরু-মোটা রুল ছাপা হয়েছে। তৃতীয় পৃষ্ঠায় "ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী সংগ্রাম দীর্ঘ-জীবী হ'ক" এই রণধ্বনির নিচে রবীন্দ্রনাথের একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি ("...আজ যাহারা সাম্রাজ্য-লিপ্সার বেদীমূলে আত্মবিসর্জন করিতেছে,...চরম জয়লাভের উদ্দেশ্যে আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্রত গ্রহণ করিব।")। চতুর্থ পৃষ্ঠাটি সাদা। তারপর 'এক' থেকে 'পঁচিশ' পৃষ্ঠা পর্যন্ত মূল প্রবন্ধ। উল্টোপিঠ সাদা। তার পরের পৃষ্ঠার মাঝখানে কালো তারকার মধ্যে সাদা একটি বৃত্ত, তার মধ্যে সাদা কাস্তে-হাতুড়ির ছোট্ট ছবি। উল্টোপিঠে, অর্থাৎ চতুর্থ কভারে, 'অন্যান্য বই'-এর বিজ্ঞাপন।

'সভ্যতা ও ফ্যাশিজম্' এবং বিজন রায়ের পুস্তিকায় 'স্বাধীনতার শত্রু জাপান'-এর দাম বলা হয়েছে এক আনা, এখানে /১০; বিজন রায়ের পুস্তিকায় মনসুর হাবিব রচিত 'ক্লেম ভরোশিলভ'-এর দাম জানানো হয় নি, 'সভ্যতা ও ফ্যাশিজম্'-এ তার কোনো উল্লেখই নেই—এখানে এই পুস্তিকাটির দাম বলা হয়েছে ।৶০। 'সভ্যতা ও ফ্যাশিজম্'-এ 'সর্ব্বহারার শ্রেষ্ঠ নেতা' পুস্তিকাটির দাম বিজ্ঞাপিত হয় নি, বিজন রায়ের পুস্তিকায় ও এখানে (বানান বলা হয়েছে 'সর্বহারা'র) দাম দেখি /০। *China calling*-এর দাম এই তিনটি পুস্তিকার কোনটিতেই দেওয়া হয় নি। 'সভ্যতা ও ফ্যাশিজম্'-এ 'আজকের কর্ত্তব্য' (মূল পুস্তিকায় বানান আছে 'কর্তব্য')-র দাম জানানো হয় নি। এ বাদে 'জাপানের স্বাক্ষর', 'সভ্যতা ও ফ্যাশিজম্' এবং 'আজকের কর্তব্য' পুস্তিকার চতুর্থ কভারে প্রকাশিত 'অন্যান্য বই'-এর তালিকা একই।

আরও একটি বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলে।

'সোভিয়েট সিরিজ'-এর তিন নম্বর পুস্তিকায় 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি'র ঠিকানা দেওয়া হয়েছে ২৪৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট। 'জাপানী শাসনের আসল রূপ'

এবং 'সভ্যতা ও ফ্যাশিজম্'-এ 'ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'র ঠিকানা দেওয়া হয়েছে ২৪৯ বহুবাজার স্ট্রীট। সংঘের পক্ষে প্রথম পুস্তিকার প্রকাশক সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় (দ্বিতীয় পুস্তিকায় প্রকাশকের কোনো নাম নেই)। 'ফ্যাশিবাদ বিরোধী জনসংঘ'র ঠিকানাও ২৪৯ বহুবাজার স্ট্রীট, জনসংঘের পক্ষে এই পুস্তিকার প্রকাশকও সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়।

সেদিন ২৪৯ বহুবাজার স্ট্রীট একই সময়ে ছিল কিষাণ সভার আপিশ, ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কার্যালয়, পীপলস রিলিফ কমিটির আপিশ, 'জনযুদ্ধ'র কার্যালয়, এবং 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি', 'ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' আর 'ফ্যাশিবাদ বিরোধী জনসংঘ'র অফিস। ঐতিহাসিক এই বাড়িটির কথা যেন বর্তমান যুগ বিস্মৃত না হয়!

জুলাই ১৯৪২ সালে 'ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'র পক্ষে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১/১০ গোলাম মহম্মদ রোড থেকে প্রথম সংস্করণ 'জনযুদ্ধের গান' প্রকাশ করেন (তৎকালে সংঘের সংগঠন সমিতির যুগ্মসম্পাদক ছিলেন বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। আজও বিষ্ণু দে-র বাড়ির ঠিকানা ১/১০ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড। 'জনযুদ্ধের গান' প্রকাশের সময় সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্ভবত তাঁর সাম্রাজ্যবাদ-সামান্তবাদ-বিরোধী চেতনার প্রাবল্যে ঠিকানা থেকে 'প্রিন্স' শব্দটি বর্জন করেন।)। 'জাপানী শাসনের আসল রূপ' পুস্তিকাটি ঐ সংঘের পক্ষে ঐ জুলাই ১৯৪২ সালেই সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ২৪৯ বহুবাজার স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সময়ে 'ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' প্রকাশিত দুটি পুস্তিকায় প্রকাশকের নাম এবং সংঘের ঠিকানার এই ভিন্নতা চোখ এড়িয়ে যাবার নয়।

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ সালের সাপ্তাহিক 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়ের একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি'র কার্যালয় ২৪৯ বহুবাজার স্ট্রীট থেকে ৪৬ ধর্মতলায় স্থানান্তরিত করা হল। 'জনযুদ্ধ'র ঐ সংখ্যায় 'ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'র একটি বইয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, দেখা যায় তাতেও সংঘের ঠিকানা বলা হয়েছে ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রীট। পরে এই ছেচল্লিশ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটেরই তিন তলায় প্রগতিশীল, ফ্যাসিস্টবিরোধী গণসংস্কৃতিসেবী শিল্পী-সাহিত্যিকদের ঐতিহাসিক মিলনকেন্দ্র গড়ে ওঠে। চিন্মোহন সেহানবীশের পুস্তিকা '৪৬ নম্বর', জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর প্রবন্ধ 'আমাদের নবজীবনের গান' ('কালান্তর', শারদীয় ১৩৮০) ও হীরেন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায়ের 'তরী হতে তীর'-এ ঐ সময়কালের চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়।
স্নেহাংশুকান্ত আচার্য 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি'র প্রথম যুগ্মসম্পাদক। হীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে একযোগে তিনি *The Land of the Soviets* সম্পাদনা করেন। 'জনযুদ্ধ'য় মাঝে মাঝে লিখতেন। 'ফ্যাশিবাদ বিরোধী জনসংঘ'র তিনি অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন। জনসংঘের সেদিনের কার্যকলাপ আজ প্রায় বিস্মৃত। অবিলম্বে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা উচিত।
এখানে 'আজকের কর্তব্য'র কয়েকটি পৃষ্ঠা প্রকাশিত হল। বানান ও যতিচিহ্নে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক]

আমাদের আশু কর্তব্য: সক্রিয় সচেতনতা

আমাদের স্বাধীনতার পথ রয়েছে জাপানকে বাধা দেওয়ার মধ্যে কিন্তু এটাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। অনেকে হয়ত চিন্তা করেন যে এই পথ নিলে আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই সাহায্য করব এবং আমাদের স্বাধীনতার জন্য কিছু করতে পারব না। এই রকম ভাবটা উপর থেকে দেখলে মনে আসে বটে, কিন্তু সেটা যে কত বড় ভুল তা বুঝতে হবে। কারণ আমরা তখনই জাপানের বিরুদ্ধে সত্যিই রুখে দাঁড়াব যখন বুঝতে পারব যে সেইটাই আমাদের স্বাধীনতার একমাত্র উপায়।

আমাদের জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হবে খুব সচেতনভাবে। আমরা যেন চোখ বুজে কেবল কামানের খোরাক না হই। কারণ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে—এই কথা চিন্তা করে আমাদের থাকতে হবে সর্বদা সচেতন, আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত রাখতে হবে মূল লক্ষ্যের দিকে। আমরা দেখেছি কিভাবে কতগুলো দেশ চলে গেল জাপানীদের হাতে যেহেতু সেসব দেশের জনগণ রইল নিশ্চেষ্ট হয়ে এবং যেহেতু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ স্থাপন করল না। অন্যদিকে আমরা দেখেছি কিভাবে মহাচীন ও সোভিয়েতের জনগণ যুদ্ধ করছে এই দুর্ধর্ষ ফ্যাসিস্ট শক্তিদের বিরুদ্ধে এবং কিভাবে তারা ক্রমশ জয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আরও স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে ইংলণ্ড ও আমেরিকার জনগণের শক্তি যা এতদিন লুপ্ত ছিল তাদের সাম্রাজ্যবাদীদের দৃঢ়মুষ্টির ভেতর। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আজ দুর্বল এবং নৈতিক দিক থেকে একদম অচল। ব্রিটেনের জনগণই আজ সমরনীতির একমাত্র নিয়ন্তা

—এই সময়েই তো দরকার আমাদেরও নিজেদের বলে বলীয়ান হওয়া। আমাদের ঘোষণা করতে হবে পৃথিবীর জনগণের কাছে আমাদের ফ্যাসিস্ট-ধ্বংসের স্থিরসংকল্প। আজ আমরা এই সংকল্প নিয়ে যদি নামি এই মহাযুদ্ধে, তবে তার ফলাফল অতি সহজভাবেই বোঝা যাবে। প্রথমত, আমাদের এই একাগ্র ইচ্ছার সঙ্গে সংঘবদ্ধ ও দৃঢ়ভাবে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলে আমাদের শক্তির বিপুলতা বৃদ্ধি পাবে। এতে জাগবে আরও বেশি করে আমাদের নৈতিক চেতনা ও স্বাধীনতার ইচ্ছা। এবং যতই আমরা এগিয়ে যাব এই পথে ততই দেখব সাম্রাজ্যবাদীরা কিভাবে আস্তে আস্তে আরও শক্তি হারিয়ে ফেলছে। সেইজন্য আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে কি করে আমরা সম্পূর্ণভাবে এই যুদ্ধে যোগ দিতে পারি। কারণ সেই পথে প্রধান বাধা আসছে ও আসবে আমাদের সাম্রাজ্যবাদীদেরই দিক থেকে। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সরাতে হবে সেই বাধা এবং তাতেই সাম্রাজ্যবাদও ভেঙে যাবে। একেই বলা হয় সচেতনভাবে যুদ্ধে যোগ দেওয়া। কারণ, এই পুরনো আমলাতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ আমাদের বাধা দেবেই—সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের পরিচালনা আমাদের হাতে আসার অন্তরায় হবে তারাই। মূঢ়ের মতো শুধু সাম্রাজ্যবাদীদের করুণার দিকে তাকিয়ে থেকে কোনোই লাভ হবে না—সেটা হবে দাস-মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক।

জাপানী শাসনের আসল রূপ

বিজন রায়

['ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' কয়েকটি পুস্তিকা ও সংকলন প্রকাশ করে। অধিকাংশেরই প্রকাশকাল দেওয়া নেই। 'জাপানী শাসনের আসল রূপ' সংঘ প্রকাশিত পুস্তিকামালার অন্যতম। চল্লিশের দশকে লেখক-শিল্পীদের ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন: "ঐ প্যামফ্লেটটিকে আমরা সেযুগে সংঘের ম্যানিফেস্টোর মতো গুরুত্ব দিয়ে বিক্রি করেছি।" বিজন রায়ের ছদ্মনামে এই পুস্তিকা লিখেছিলেন সুশোভন সরকার।

আষাঢ় ১৩৬৪ সনে 'বাক্' প্রকাশনী 'সমাজ ও ইতিহাস' নামে সুশোভন সরকারের একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করে। সংকলনের নবম প্রবন্ধের নাম 'ফ্যাশিজ্‌মের প্রকৃতি'। প্রবন্ধের নিচে লেখা হয়েছে "॥ পুস্তিকা: জুলাই ১৯৪২ ॥"

আমরা মিলিয়ে দেখেছি 'জাপানী শাসনের আসল রূপ' পুস্তিকার '২' চিহ্নিত অধ্যায়টিই 'ফ্যাশিজ্‌মের প্রকৃতি' নামে 'সমাজ ও ইতিহাস'-এ সংকলিত হয়েছে। সুশোভন সরকারের সাক্ষ্য অনুসারে মূল পুস্তিকাটির প্রকাশকাল তাহলে ধরতে হয় জুলাই ১৯৪২।

মূল পুস্তিকার চতুর্থ কভারে 'অন্যান্য বই'-এর যে বিজ্ঞাপন আছে, তার প্রথমটির নাম 'সভ্যতা ও ফ্যাশিজম্'। আবার, বুদ্ধদেব বসু রচিত ঐ পুস্তিকার চতুর্থ কভারে 'অন্যান্য বই'-এর যে-বিজ্ঞাপন আছে, তার প্রথমটির নাম 'জাপানী শাসনের আসল রূপ'। 'সভ্যতা ও ফ্যাশিজম্' পুস্তিকায় প্রকাশিত 'অন্যান্য বই'-এর তালিকায় মনসুর হাবিব রচিত 'ক্রেম ভরোশিলভ' পুস্তিকাটির উল্লেখ নেই। এ ছাড়া, সুশোভন সরকার ও বুদ্ধদেব বসু রচিত পুস্তিকা দুটিতে প্রকাশিত 'অন্যান্য বই'-এর তালিকায় আর কোনো গরমিল চোখে পড়ে না।

অর্থাৎ, জুলাই ১৯৪২-এর মধ্যেই তাহলে ঐ পুস্তিকা ও সংকলনগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। 'জাপানী শাসনের আসল রূপ' ডাবল ক্রাউন ১/১৬ সাইজের পুস্তিকা। কভারে কোনো ব্লক ব্যবহার করা হয় নি। হালকা আকাশী রঙের কাগজে বড় বড় হরফে রচনা ও লেখকের নাম, তার নিচে সংঘের নাম ও ঠিকানা (২৪৭,

বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা)। তারও নিচে, একটু ডানদিকে: "দাম—চার আনা।" প্রচ্ছদ-অলংকার হিসেবে সরু-মোটা রুল ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় কভারে জানানো হয়েছে পুস্তিকার প্রকাশক: সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় (বর্তমানে 'স্টেটসম্যান'-এর সাংবাদিক), "প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র": "ন্যাশনাল বুক এজেন্সী" (১২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা)।

পুস্তিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৯। মূল প্রবন্ধ ১-৩৫, তাছাড়া ৩৬-৩৭ পরিশিষ্ট—১ এবং ৩৮-৩৯ পরিশিষ্ট—২।

'সমাজ ও ইতিহাস'-এর ভূমিকায় সুশোভন সরকার লিখেছেন: "...এ ধরনের লেখায় ঐতিহাসিক পরম্পরার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ বাঞ্ছনীয়, তাই প্রতি প্রবন্ধের নিচে প্রথম প্রকাশের তারিখ নির্দেশ করা হল। একই কারণে প্রকাশিত বক্তব্যের সংশোধন অনুচিত মনে হয়েছে—মূলের সঙ্গে তফাত দেখা যাবে কেবল বানান, পরিভাষা ও দুএকটি শব্দের অদলবদলে।"

আগেই বলা হয়েছে 'জাপানী শাসনের আসল রূপ'-এর ২ চিহ্নিত অংশ-টুকুই (৩৫ পৃষ্ঠার মধ্যে মাত্র সাড়ে পাঁচ পৃষ্ঠা) লেখক 'ফ্যাসিজ্‌মের প্রকৃতি' নামে স্বতন্ত্র নিবন্ধাকারে 'সমাজ ও ইতিহাস'-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থাৎ, ঐ দীর্ঘ প্রবন্ধের এক সামান্য অংশই তিনি পরবর্তীকালে পরিমার্জনার সুযোগ পেয়েছেন। "দুএকটি শব্দের অদলবদলে"র প্রকৃতি সম্বন্ধে পাঠকদের কৌতূহল স্বাভাবিক। মূল পুস্তিকায় তৃতীয় পংক্তিটি ছিল: "কতকগুলি ধারণা ও ব্যবস্থার সংক্ষেপে পরিচয় দেবার জন্যেই এই নামের (ফ্যাসিজমের—সম্পাদক) সৃষ্টি হয়েছে।" 'ফ্যাশিজ্‌মের প্রকৃতি'র সংশোধিত পাঠ: "কতকগুলি ধারণা ও ব্যবহার সংক্ষেপে নির্দিষ্ট করার জন্যই...।" চতুর্থ প্যারায় ছিল: "ইতিমধ্যে দেশে দেশে আর্থিক শোষণের ফলে সাধারণ লোকের মনে অসন্তোষ আর সমাজতন্ত্রী বা সোশ্যালিস্ট্‌ মনোভাব দেখা দেয়।" সংশোধিত পাঠে 'সমাজতন্ত্রী' স্থলে 'সমাজবাদী' বলা হয়েছে। ছোট্ট পরিবর্তনটুকু গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। সপ্তম প্যারায় ছিল: "অতীতের গৌরব কথা, বর্তমান নেতাদের মাহাত্ম্য, সমস্ত জাতিটার একতাবোধ, অন্যদের প্রতি বিদ্বেষ, বিপ্লবীদের সম্বন্ধে মিথ্যা-প্রচার, ভবিষ্যতে সৌভাগ্যের সম্ভাবনা—এইরকম নানা অবান্তর কথা বন্যার স্রোতের মতন লেখকদের মন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে।" সংশোধিত পাঠে 'লেখকদের' জায়গায় বলা হয়েছে "...লোকদের মন..."। অর্থাৎ, পুস্তিকায় বিজন রায়ের উদ্দিষ্ট ছিলেন বাঙালি লেখক সমাজ, গ্রন্থে সুশোভন সরকারের উদ্দিষ্ট হলেন

পাঠক সাধারণ। অষ্টম প্যারায় মূল পাঠ ছিল : "...যুদ্ধের আর এক সুবিধা এই যে লোকদের তাতে উত্তেজনা দিয়ে ভোলানো যায়, তাদের বলা চলে যে যুদ্ধের জন্য দায়ী হল প্রতিবেশীরা, নিরীহ আমরা শুধু বাঁচবার জন্যে খানিকটা জায়গা চাই মাত্র, তাতেও এরা বাধা দিয়ে আমাদের গলা টিপে মারতে চায়।..." সংশোধিত পাঠে "জায়গা চাই মাত্র"-র পর পূর্ণচ্ছেদ দিয়ে পরবর্তী অংশ বর্জন করা হয়েছে। (বানান, যতিচিহ্ন এবং 'লোকদের' স্থলে 'লোকেদের' জাতীয় শব্দের পরিবর্তনগুলি আর দেখানো হল না।)
সেদিনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অধুনা প্রায়-বিস্মৃত 'জাপানী শাসনের আসল রূপ' পুস্তিকার অষ্টম তথা শেষ অধ্যায়টি বানান ও যতিচিহ্নের প্রয়োজনীয় সংশোধন সহ পুনর্মুদ্রণ করা হল।—সম্পাদক]

বিদেশে জাপানের প্রভুত্ব বিস্তারের বর্ণনা এই লেখার এলাকার মধ্যে না পড়াতে সে সম্বন্ধে আলোচনা আর দরকার নেই। কিন্তু তার কথা আমরা অবশ্য কিছুতেই ভুলতে পারি না। জাপানের মুক্তিদাতা রূপ শুধু হাস্যকর নয়, যারা কিছুমাত্র খবর রাখে তাদের কাছে একথা অসহ্য বললে অত্যুক্তি হয় না।

১৮৭৪ সালে সামুরাইদের পরামর্শে জাপান রুকু দ্বীপমালা দখল করে আর ফরমোজাতে আক্রমণ চালায়। পরের বছর কোরিয়ার দিকে নজর পড়ল। সেই থেকে জাপান ক্রমাগত রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করে আসছে, আজও তার শেষ নেই। এই দিগ্বিজয়ে সাধারণ জাপানীদের যৎসামান্য লাভ হয়ে থাকতে পারে, তার জন্যে অবশ্য প্রচুর ত্যাগস্বীকার আর প্রাণনাশ তাদের ভাগ্যেই জুটেছে। আসল লাভ হয়েছে মুষ্টিমেয় জাপানী ধনীর, সেই লোভে বলিদান দেওয়া হয়েছে প্রতিবেশীদের।

সাম্রাজ্যতন্ত্রের যুগে, ১৮৯৪ থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বছর, জাপানের চাপ সইতে হয়েছে প্রধানত চীনদেশকে। যাঁরা এশিয়াবাসীর জন্যেই এশিয়া দাবি করেন, তাঁরা জাপানীর হাতে চীনের লাঞ্ছনার কথা ভুলে যান কেন? অত্যাচারী নিজের জাতভাই হলেই কি অত্যাচারের চেহারা বদলে যায়?

উত্তর ও দক্ষিণ দুদিকে জাপানের বিস্তার হতে পারে—প্রথমটার লক্ষ্য রাশিয়ার পূর্ব প্রদেশগুলি, দ্বিতীয়টার লক্ষ্য প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল আর দ্বীপমালা। জাপান কোন পথে এগোবে, তার প্রধান বাধা রাশিয়া না আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, এ নিয়ে সেদেশে অনেক জল্পনা হয়েছে। কিন্তু প্রসারের

অক্ষুণ্ণ চেষ্টাই হল আসল লক্ষ্য করবার ব্যাপার, তার বিশেষ দিকটা তার তুলনায় অবান্তর। যেদিকেই জাপান এগোক না কেন, তার প্রধান ধাক্কা পড়বে চীনের উপর। তাতে প্রবল বাধা সৃষ্টি করতে পারে চীনের সঙ্গে ভারতের অন্তরঙ্গ যোগ। চীন অপরকে পায়ে দলতে চায় না, চীন চায় আমাদের সঙ্গে সমানে সমানে মৈত্রী; অন্যদিকে জাপান চায় সোজাসুজি অথবা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাদের উপর প্রভুত্ব।

১৯২৯ এর আর্থিক সংকটে জাপানের নেতারা মনে করলেন যে মাঞ্চুরিয়া দখল করে বিপদ এড়াবেন। তখন দেশবাসীদের তাঁরা আশ্বাস দিলেন যে মাঞ্চুরিয়া হাতে এলে লাভ হবে সমস্ত জাতির, শুধু কয়েকটি ধনীর নয়। এই মর্মে বহুদিন মনভোলানো প্রচারকার্য চলেছিল। বলা হয়েছিল, মাঞ্চুরিয়া জাপানীদের পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য এনে দেবে। সে-দেশ দখল আনল মালিকদের প্রচুর লাভ—কয়লা, লোহা, কাঠ, সোয়াবীন ব্যবসায়ীদের দুহাত লুটে ভরে গেল। সাধারণ লোকেরা আরও তীব্রভাবে মজুরি করল, সৈনিক হয়ে সে দেশ জয় আর রক্ষা করল, তারপর চীনের অন্যান্য প্রদেশ জয় করতে তাদের পাঠানো হল। স্বর্গরাজ্যের এই নমুনা।

মাঞ্চুরিয়াবাসীদের ও জাপানের অন্যান্য বিদেশী প্রজাদের কথা না তোলাই ভালো। কোরিয়াকে পায়ে চাপা হয়েছে, মঙ্গোলিয়ায় হাত পড়ছে, চীনের কথা ত সকলেই জানে। সর্বত্রই জাপানীদের সুবিধা-স্বার্থই হল আসল কথা, দলভুক্ত সহকারীরা সম্ভব হলে কিছু প্রসাদ পেতে পারে মাত্র।

রাসবিহারী বসু প্রকাশ্যে, সুভাষচন্দ্র বসু সম্ভবত, জাপানের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা দেশভক্ত, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে তাঁদের চোখ অতীতের দিকে। বর্তমান জগতের অবস্থা তাঁরা বুঝতে চান নি। হয়ত তাঁদের বিশ্বাস যে জাপানকে দিয়ে শুধু কার্যোদ্ধার করে নেবেন। আমরা যেন না ভুলি তার দাম দিতে হবে সাধারণ লোকদেরই। বাঙলার মজুর, কিষান, ছাত্র আর সাধারণ লোকদের আসল স্বার্থ জড়ানো রয়েছে অন্যপক্ষের সঙ্গে। আজ জনযুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা বাঙলা জাপানী ও জাপানের অনুচরদের সংকল্প ব্যর্থ করুক।

কংগ্রেসী নেতারা আজ নির্জীব, নিষ্ক্রিয়। গান্ধীজীর ধর্ম যে এখন অচল, গত কয়েক বছরে তা প্রমাণ হয়েছে। সে কথা স্বীকার না করে থাকলে কংগ্রেসের ক্রিপস-এর সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার কোনও মানেই পাওয়া যায় না।

তবু অভ্যাস বড় কঠিন জিনিস। তাই রাজাগোপালাচারীকে বর্জন করতে হল, আর পণ্ডিত নেহরুকে এমন বক্তৃতা দিয়ে যেতে হচ্ছে যার এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের মিল থাকে না। অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াবার কিংবা জোর করে চোখ বন্ধ করে রাখবার দিন কি এখনও কাটবে না?

জনসাধারণ জেগে উঠলে সূর্যের আলোর সামনে সব সংশয় আর কুয়াশা কেটে যাবে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বাঙলাদেশ একাধিক বার পথ দেখিয়েছে। আজকে আবার বাঙালিরা এগিয়ে এসে দেশকে নতুন দিকে নিয়ে যেতে পারে না কি? ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট হতে পারে, কিন্তু আজকের দিনে কর্মীদের কর্তব্য কি, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জনগণকে জাগাতেই হবে।

—পরিচয়—

ফ্যাশিস্ট দানবতার হিংস্র আক্রমণে সমগ্র বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতি বিপন্ন—নির্দোষ ও নিরস্ত্র ভারতের তথা বাংলার শ্যামল ক্রোড়ও আজ ফ্যাসিষ্টদের অগ্নিবাণে বিধ্বস্ত। সভ্যতা ও প্রগতির এই মারাত্মক শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সৃষ্টি।

যে-জঘন্য ফ্যাশিস্ট মনোভাবের বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া ঢাকায় তরুণ সাহিত্যিক ও একনিষ্ঠ ফ্যাশিস্টবিরোধী কর্মী সোমেন চন্দের নৃশংস হত্যার জন্য দায়ী, তার তীব্র নিন্দা ক'রে বাংলার বিখ্যাত শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশ ক'রে এই পৈশাচিক মনোবৃত্তি যে আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে তাতে মর্মান্তিক বিক্ষোভ ও শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রথম সম্মেলনে উপস্থিত শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ ক'রে সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই প্রতিশ্রুত শত্রুকে রুখবার জন্য লেখক ও শিল্পীদের আসন্ন গুরুদায়িত্ব একবাক্যে অঙ্গীকার করেন। তারপর সোমেন চন্দের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত "প্রাচীর" নামক একটি কবিতা সংগ্রহের গান ও কবিতাগুলি ফ্যাশিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে

প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য প্রাচীর গ'ড়ে তোলবার দুর্জয় সংকল্পে ও ফ্যাশিস্টবিরোধী আদর্শের জয়গানে মুখরিত। সম্প্রতি রবীন্দ্র স্মৃতিবাসরে বাংলার ফ্যাশিস্টবিরোধী শিল্পী ও লেখকগণ মুক্তি ও প্রগতির প্রতীক অমূল্য রবীন্দ্র সঙ্গীতগুলির মধ্য দিয়ে এবং রবীন্দ্রনাথের "রথের রশি" নাটকটি অভিনয় ক'রে বিশ্বের সর্বাগ্রগণ্য ফ্যাশিস্টবিরোধী মনীষীর উদাত্ত বাণীর কথাই দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেন।

ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, যামিনী রায়, অতুল গুপ্ত, ইন্দিরা দেবী, আবু সৈ-ইয়দ আয়ুব, প্রমথনাথ বিশী, সুবোধ ঘোষ, জ্যোতির্ময় ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ রায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আব্দুল কাদের, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ মুখার্জি, সমর সেন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, সরোজ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। **এই সংঘের সংগঠন সমিতি শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত (সভাপতি) গোপাল হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে (যুগ্ম সম্পাদক) লয়ে গঠিত হয়েছে।**

* 'জাপানী শাসনের আসল রূপ'-এর 'পরিশিষ্ট-১'।

—লেখক ও শিল্পীগণের প্রতি নিবেদন—

ভারতবর্ষ আজ অভূতপূর্ব বিপদের সম্মুখীন। আমাদের গৃহ, পরিজন, জীবিকা ও গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় জাপানের আক্রমণে বিপন্ন হইয়াছে। আমরা এতদিন যে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়াছি, যে মুক্তির জন্য অপরিমেয় আত্মোৎসর্গ করিয়াছি, সেই মুক্তি যখন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে ঠিক সেই সময় ফ্যাশিস্টরা কঠিনতর শৃঙ্খলে আমাদের বাঁধিবার জন্য উদ্যত; জাপানী আক্রমণকে যদি আমরা প্রতিরোধ করিতে না পারি তবে এদেশে নূতন করিয়া এমন এক বিদেশী স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে যাহা আমাদের এতদিনকার সংগ্রামার্জিত কোন অধিকারই লেশমাত্র টিকিয়া থাকিতে দিবে না—আমাদের কংগ্রেস, আমাদের সংবাদপত্র,

আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক আন্দোলন ও অন্যান্য বিবিধ অধিকারকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে।

এই চরম সঙ্কটকালে সাহিত্যিক-সমাজ দেশের ভাগ্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারে না। অন্যান্য বুদ্ধিজীবী ও বৃত্তিজীবিগণ অপেক্ষা সমাজে সাহিত্যিকদের মর্য্যাদা ও প্রভাব অনেক বেশী। এই মর্য্যাদা ও প্রভাবের উপযুক্ত মূল্য দিবার দিন আজ আসিয়াছে। আজ বিপন্ন জাতিকে আত্মরক্ষার দৃঢ়সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ করিবার, বিভ্রান্ত জনসাধারণের চিন্তাকে আত্মসমর্পণ ও আত্মঘাতের পথ হইতে ফিরাইয়া পরিত্রাণের পথে চালিত করিবার দায়িত্ব সাহিত্যিকের।

শুধু স্বজাতি ও স্বদেশ নয়, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিকে আসন্ন ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্বও আজ সাহিত্যিকের পক্ষে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। সৃষ্টির ভার আমার, রক্ষার ভার অপরের এই মনোভাব আজ সাহিত্যকে বর্জন করিতে হইবে। নিজের সৃষ্টি রক্ষায় তাহার নিজেকেই অগ্রণী হইতে হইবে। ফ্যাশিস্টরা জানে যে, দেশের স্বাধীন চিন্তানায়ক ও মনীষীরা তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির বড় বিঘ্ন—তাই আজ রোমঁ্যা রোলাঁ বন্দী, টলস্টয়ের স্মৃতি অপমানিত, প্রবাসে নির্বাসনে বৃদ্ধ ফ্রয়েডের জীবনাবসান, আইনস্টাইন, টমাস মান প্রমুখ মহাভাগগণ স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত। ফ্যাশিস্ট জার্মানীর মন্ত্রশিষ্য* জাপানে এবং জাপান অধিকৃত দেশে অসংখ্য লেখক ও শিল্পী নিহত ও নির্য্যাতিত। জার্মানীতে ইউরোপের অমর সাহিত্যসৃষ্টির বহ্ন্যুৎসব এবং চীনের বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানী বোমার অগ্নিকাণ্ড—সংস্কৃতির ধ্বংসের একই অভিযান। এই ধ্বংসবন্যার গতিরোধ করিবার জন্য সাহিত্যকে আজ তাহার সাহিত্য ও সর্বস্ব পণ করিতে হইবে এবং এই প্রতিরোধ-সংগ্রামের মধ্য দিয়া নূতন জগতের নূতন সাহিত্যকে সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে।

দেশ ও সংস্কৃতি রক্ষার এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া "ফাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ" গঠিত হইয়াছে। আমরা আমাদের দেশের সমস্ত সাহিত্যিক ও শিল্পীগণকে এই সংঘে যোগদান করিয়া সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার ভিত্তিতে অবিলম্বে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে আহ্বান জানাইতেছি।

* 'জাপানী শাসনের আসল রূপ'-এর 'পরিশিষ্ট-২'।

—অন্যান্য বই—

ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের দ্বারা প্রকাশিত

বুদ্ধদেব বসুর

সভ্যতা ও ফ্যাশিজম্— ।৵০

প্রতিভা বসুর

ফ্যাশিজম্ ও নারী—/১০

সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির দ্বারা প্রকাশিত

Land of the Soviets (A Symposium)—Rs. 2

সোভিয়েট দেশ (প্রবন্ধ সংকলন)—১॥০

বুদ্ধদেব বসুর

* সোভিয়েট রাশিয়ার শিল্প ও সংস্কৃতি

R. P. Dutt's

Europe against Hitler—4 as.

(Second impression)

বীণা দাসের

* সোভিয়েট ইউনিয়নে নারী

গোপাল হালদারের

* সোভিয়েট যুদ্ধের তিন মাস

* সোভিয়েট যুদ্ধ ও ভারতবর্ষ

* সোভিয়েট কী লড়াই ঔর হামারা কর্ত্তব্য

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের

সর্ব্বহারার শ্রেষ্ঠ নেতা—/০

মনসুর হাবিবের

ক্লেম ভরোশিলভ

ফ্যাশিবাদ বিরোধী জনসংঘের দ্বারা প্রকাশিত

Hiren Mukerjee's

China Calling

স্বাধীনতার শত্রু জাপান—/০

মনোরঞ্জন রায়ের—দেশরক্ষী বাহিনী—।/০

স্নেহাংশু আচার্য্যের—আজকের কর্ত্তব্য—,১০

* নিঃশেষিত।

(বিক্রয়লব্ধ অর্থ সোভিয়েট সাহায্যার্থে এবং ফ্যাশিবাদ-বিরোধী প্রচারকার্য্যে ব্যয়িত হয়)

ফ্যাসিস্টবিরোধী নামের সার্থকতা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[১৯৪৪ সালের ১৫-১৭ জানুয়ারি 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'র দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন হয়। সম্মেলন পরিচালনার জন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শচীন দেববর্মণ, অতুল বসু, গোপাল হালদার ও আবুল মনসুর আহম্মদকে নিয়ে যে-সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়—প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন তার সভাপতি। [দ্র. ১৯৪৪ সালের ২৬-এ জানুয়ারি সংখ্যা 'জনযুদ্ধ' সাপ্তাহিক]

সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য অতুল বসু তাঁর ভাষণে বলেন: "প্রচলিত পথে চলার সুবিধা আর নূতন কিছু করার মোহ—এই দুইই ক্ষতিকর। শিল্প-রূপে আজ দেশের কথা বলিতে হইবে; দেশের মাটির সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়াই শিল্প সৃষ্টি করিতে হইবে।"

গোপাল হালদারের পর আবুল মনসুর আহম্মদ তাঁর বক্তৃতায় বলেন: "...ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের জীবনাদর্শের এবং ঐতিহাসিক শিক্ষা ফ্যাসি-জমের বিরোধী। কাজেই ভারতের লেখক ও শিল্পীদের ফ্যাশিস্টবিরোধিতা একটা নেতিবাচক ভাববিলাসিতা নহে। ইহার মধ্যে আমাদের জীবনের যোগ আছে।"

সোভিয়েত-চীন এবং অপরাপর ফ্যাসিস্ট-পদানত দেশের নির্যাতিত সাহিত্যিক ও শিল্পীদের অভিনন্দন জানিয়ে "বিখ্যাত লেখিকা" প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ("শিল্পী" হাসিরাশি দেবী সহ ইনি ছিলেন সম্মেলনে ২৪ পরগনা জেলার প্রতিনিধি) একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। "অধ্যাপক" নীরেন্দ্রনাথ রায় ও ডা. বিজয়কৃষ্ণ বসু (চীনে প্রেরিত ভারতীয় মেডিকেল মিশনে শহিদ ডা. কোটনিসের সহকর্মী) প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করেন।

"অধ্যাপক" নীহার সরকার ('ছোটদের অর্থনীতি' ও 'ছোটদের রাজনীতি'র যশস্বী গ্রন্থকার, বর্তমানে জাতিসংঘের কাজে ব্যাঙ্কক প্রবাসী) এক প্রস্তাবে সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও প্রভৃতির মাধ্যমে "প্রগতিমূলক ভাবধারা প্রচারের দাবি" করেন। প্রস্তাবটি স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য সমর্থন করেন।

তারপর "দেশের মধ্যে অচল অবস্থার অবসানের জন্য দেশের মধ্যে বিরাট

ঐক্য গড়িয়া তোলার কাজে লেখক ও শিল্পীদের আহ্বান জানাইয়া মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন হিরণ কুমার সান্যাল।" সমর্থক: হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সব শেষে সাংগঠনিক প্রস্তাবটি তোলেন ঢাকার রণেশ দাশগুপ্ত। সমর্থনে বলেন মুর্শিদাবাদের সুশান্ত পাঠক।
'জনযুদ্ধ' থেকে আমরা প্রেমেন্দ্র মিত্রর বক্তৃতাটি উদ্ধৃত করলাম। বানান ও যতিচিহ্নের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। রচনার শিরোনামা আমাদের দেওয়া।—সম্পাদক]

অন্য সাহিত্যসভাগুলি হইতে এই সভার বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে সাহিত্যিকরা জনগণের সম্পর্কে আসেন, দেশের সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হন; তাঁহাদের কি কর্তব্য আছে, কি তাঁহারা দিতে পারেন—তাহাই জানিয়া যান। এই জন্যই ...এই সভায় আসিয়াছেন। যুগে যুগে মানুষের কল্যাণ, মঙ্গলের বিরুদ্ধে শত্রুরা বিভিন্নভাবে মাথা তুলিয়াছে, শিল্পীরাও তাহা বাধা দিয়াছে। আজ সেই শক্তি নূতন নাম নিয়াছে, তাই তাহার বিরুদ্ধেও আমাদের নূতন নামে অভিযান ঘোষিত হইবে। ফ্যাসিস্টবিরোধী নামের সার্থকতা এইখানে। ফ্যাসিজম মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতি জগতের শত্রু। দেশব্যাপী দুঃখ ও বিপদের মধ্যে আর সকলের সঙ্গে সাহিত্যিক ও শিল্পীদেরও কাজ করিবার আছে।

ইহা স্মরণ করিয়াই এই সংঘবদ্ধতা। অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমবেত হওয়া সাহিত্যিক ও শিল্পীর স্বধর্ম। সাহিত্যিককে আজ সজাগ হইতে হইবে। বেশি কথা বলিতে পারি বলিয়াই মানুষের সহজ সত্য ও শুভ চিন্তাকে আমরা যেন বিভ্রান্ত না করি।

মসীযোদ্ধা

অন্নদাশঙ্কর রায়

[মনস্বী সাহিত্যিকের স্বনামধন্য গ্রন্থ 'পথে প্রবাসে'র অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল। বানান ও যতিচিহ্নে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। রচনাটির শিরোনামা আমাদের দেওয়া।—সম্পাদক]

রোলাঁর কুটিরটির একদিকে হ্রদ অপর দিকে পর্বত। হ্রদের শাড়িটির পাড় ধরে পর্বতের পর পর্বত চলে গেছে, হ্রদের জল থেকে সোপানের মতো তেমনি পর্বতের উপর পর্বত উঠে গেছে। হ্রদের কূলে কূলে পর্বতের মূলে মূলে পল্লীর পর পল্লী। রোলাঁদের পল্লীটির নাম Villeneuve, আর রোলাঁর কুটিরটির নাম Villa Olga।...

'ভিলা অলগা'র একপাশে Hotel Byron নামক বৃহৎ হোটেল। রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে রবীন্দ্রনাথ নাকি এইখানে ছিলেন।

রোলাঁর কুটিরটির বাহিরটা নিঃস্ব। দেখলে প্রত্যয় হয় না যে এতবড় একজন সাহিত্যিক এরকম একটা অসুন্দর ছোট জরাজীর্ণ 'শালে'-তে থাকেন। কিন্তু ভিতরটি সাজানো—বসবার ঘরে বই-ভরা শেলফ, বই-ছড়ানো টেবিল, ফুলের সাজি, ফুল গাছের টব, দেয়ালে দেয়ালে ছবি ও দেয়ালজোড়া পিয়ানো।

রোলাঁর সাক্ষাৎ পাবার পরমুহূর্ত পর্যন্ত মনেই জাগে নি যে তাঁর ঘরের অন্তর-বাহির তাঁর নিজের অন্তর-বাহিরের প্রতিরূপক।

দীর্ঘদেহ ন্যুব্জপৃষ্ঠ মানুষটি, লাজুকের মতো ঈষৎ নত, মুখের গড়ন উল্টো-করে-ধরা পেয়ার ফলের মতো চওড়া সরু উঁচুনিচু। প্রশস্ত উন্নত ললাট সুদীর্ঘ শাণিত নাসা, ক্ষুধিত শীর্ণ কপোল, উদগ্র সংকীর্ণ চিবুক। চোখ দুটিতে কত কালের ক্লান্তি, হরিণশিশুর নিরীহতা। ওষ্ঠে গান্ধীর চেয়েও সরল হাসি, বেদনায় পাণ্ডুর।...

এতক্ষণ সহজভাবে কথা বলছিলেন আপনার লোকের মতো ঘরোয়াভাবে মৃদুমিষ্ট হেসে। যেই ভাবীযুদ্ধের সম্ভাবনার প্রসঙ্গ উঠল অমনি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন রাজা লীয়ারের মতো। নির্বাণোন্মুখ শিখার মতো স্তিমিত নেত্রে

আবেগ জ্বলে উঠল। দক্ষিণ হস্ত আবেগে উঠতে পড়তে লাগল, বেগময়ী ভাষার সঙ্গে তাল রেখে। তন্ময় হয়ে চেয়ার থেকে সরে সরে এসে খসে পড়েন বুঝিবা। গত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে তাঁর হৃদয়ের এক স্থলে একটি ক্ষত আছে, সেই ক্ষতটিতে আঙুল ছোঁয়ালে যাতনায় অধীর হয়ে ওঠেন।

প্রতীতির সহিত বললেন, নেশনরা যতদিন না ঠেকে শিখছে যে এক নেশনের ক্ষতিতে সব নেশনের ক্ষতি, যুদ্ধ ততদিন থাকবেই। কাতর স্বরে বললেন, মানুষের ইতিহাসে যুদ্ধের দেখছি অবসান হল না! তবু অসীম ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখলে আশার আমেজ থাকে। উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন, আলো জ্বালান, আলো জ্বালান, দিকে দিকে আলো জ্বালিয়ে তুলুন। যুদ্ধের প্রতিষেধ—শিক্ষা।

শিক্ষা সম্বন্ধে আর্টিস্টের কর্তব্য নিয়ে কথা উঠল। আর্টিস্ট কি কেবল চিরকালের সৌন্দর্য সৃষ্টি নিয়েই থাকবে, না, স্বকালের সমস্যা-সমাধানেও সাহায্য করবে? বললেন, দুই-ই করবে। সকল যুগের জন্য কিছু, নিজের যুগের জন্য কিছু। মানুষের মধ্যে একাধিক আত্মা আছে—কোনোটার কাজ আর্টের পূজা, কোনোটার কাজ সমাজের সেবা। যে-মানুষ আর্টিস্ট সে-মানুষ কেবল আর্ট চর্চা করে ক্ষান্ত হবে না, সে ভালোর সপক্ষে ও মন্দের বিপক্ষে প্রোপাগাণ্ডা করবে, ভলতেয়ার ও জোলার মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধ চালাবে। এর জন্যে যে তার যুগোত্তর সৃষ্টির ক্ষতি হবে এমন নয়। কেননা তার যুগোত্তর সৃষ্টির ভার তার যে-আত্মাটির হাতে, সে-আত্মাটি কিছু সর্বক্ষণ সজাগ নয়।...

মৈত্রীর সাধক, সত্যের ব্রতী

নীরেন্দ্রনাথ রায়

[প্রসিদ্ধ বুদ্ধিজীবী, 'পরিচয়' পত্রিকার এককালীন সম্পাদক, প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের অগ্রগণ্য তাত্ত্বিক, পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় 'পীপলস রিলিফ কমিটি'র অন্যতম প্রধান সংগঠক অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়ের 'রম্যাঁ রলাঁ (১৮৬৬-১৯৪৪)' প্রবন্ধটি ১৩৫১ সনের মাঘ সংখ্যা 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হয়। এখানে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল। বানান (যেমন রম্যাঁ রলাঁ=রোমাঁ রোলাঁ, সোভিয়েট=সোভিয়েত, ২৩শে=২৩-এ, নাৎসী=নাৎসি, ইত্যাদি) ও যতিচিহ্নের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। রচনার শিরোনামা আমাদেরই দেওয়া।—সম্পাদক]

রয়টার-এর তারযোগে রোলাঁর মৃত্যুসংবাদ পুনরায় প্রচারিত হইয়াছে। গান্ধীজীর অনাস্থা সত্ত্বেও এ-দুঃসংবাদের প্রতিবাদ হয় নাই—প্রতিবাদের দুরাশা পোষণ করা কঠিন। রোলাঁর তিরোধান, এই অকরুণ সত্যের জন্য আমাদের মনকে প্রস্তুত করাই যুক্তিযুক্ত। কিভাবে তাঁহার জীবনাবসান ঘটিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ এ দেশে আসিয়া পৌঁছায় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে নাৎসি জার্মানির নৃশংসতা তাঁহাকে মৃত্যুর পথে ঠেলিয়া দিয়াছে। তাই রোলাঁর এ মৃত্যুতে আমরা শোকের চেয়ে বেশি করিয়া অনুভব করিতেছি গর্ব ও গৌরব। সোভিয়েত ইউনিয়নের বাহিরে ফ্যাসিস্টবাদের ও নাৎসিতন্ত্রের বিরোধী ও সমালোচক রোলাঁর মতো এমন আর কেহ ছিল না। এতদিনে সেই কণ্ঠ ও সেই লেখনী চিরতরে রুদ্ধ হইল।

মনে পড়ে ১৯২৭ সালের ২৩-এ ফেব্রুয়ারির কথা। তখনও হিটলারের পালা শুরু হয় নাই, তাঁহার অগ্রজ মুসোলিনি আসর জমাইয়া বিরাজ করিতেছেন। পারীর বিপুল ফ্যাসিস্ট-বিরোধী জনসমাবেশ। ইহার উদ্যোগকর্তা ছিলেন আলবের্ট আইনস্টাইন, আঁরি বারব্যুস, রোমাঁ রোলাঁ ও পল লাজভ্যাঁ। আজ আইনস্টাইন স্বদেশ হইতে বিতাড়িত, বারব্যুস ও রোলাঁ অন্তর্হিত ও লাজভ্যাঁ ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য।…

এহেন লেখককে হাতে পাইলে হিটলার তাঁহার কি ব্যবস্থা করিবেন অনুমান করা অসম্ভব নয়। ভুবনবিদিত বন্দীনিবাসে রোলাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে বিধ্বস্ত করিবার যে আয়োজন হইয়াছিল তাহা এখন অপ্রকাশিত, কিন্তু তাহার বিফলতা সুপ্রকাশ। সেখান হইতে রোলাঁর শেষ প্রকাশ্য উক্তি সাম্রাজ্যবাদের কারাগার হইতে গান্ধীজীর সসম্মান মুক্তিতে অভিনন্দন। পরাধীন ফ্রান্সের বাণীমূর্তি শৃঙ্খলিত ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আনন্দের কথা, ফরাসী জনগণের সমবেত বীরত্বে স্বদেশের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার তিনি দেখিয়া গেলেন। আক্ষেপের কথা, হিটলারী জার্মানির উচ্ছেদ তাঁহার অগোচরে রহিয়া গেল, বিশ্বব্যাপী জনমুক্তির গৌরবময় ভবিষ্যৎ তাহার জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতাকে হারাইল।

যে-সাহিত্যগুরু জীবন ভরিয়া মৈত্রী-সাধনা করিয়াছেন বুদ্ধের মতো, সত্যের ব্রতে প্রাণ দিয়াছেন সোক্রাটিসের মতো—তাঁহাকে প্রণাম।

একটি বুলেট, একটি ফ্যাসিস্ট

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

['প্রাচীর' বাঙলা ভাষায়, সম্ভবত গোটা ভারতবর্ষেই, ফ্যাসিস্টবিরোধী কবিতার প্রথম সংকলন। 'দক্ষিণ কলিকাতা ছাত্র ফেডারেশান' (কার্যালয়ঃ ৫এ ইন্দ্র রায় রোড) প্রকাশিত এই সংকলন সম্পাদনা করেন মিহির বসু ও অজয় দাশগুপ্ত (বর্তমানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপরিষদের অন্যতম সম্পাদক)। 'প্রাচীর' উৎসর্গ করা হয় "সোমেন চন্দের স্মৃতিতে"। সংকলনটির প্রকাশকাল দেওয়া নেই। তবে এটি নিঃসন্দেহে ১৯৪২ সালের ৮ মার্চের পরে এবং ডিসেম্বরের আগে প্রকাশিত হয়। কারণ, 'একসূত্রে'র অন্যতম সম্পাদক সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন :..."কমরেড সোমেন চন্দের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত কাব্যসংগ্রহ 'প্রাচীর' ফ্যাসিষ্টবিরোধী ফ্রন্টের একটি স্মরণীয় গ্রন্থ।" 'একসূত্রে' বেরিয়েছিল ডিসেম্বর ১৯৪২ সালে।

অজয় দাশগুপ্ত জানিয়েছেন 'প্রাচীর' প্রকাশিত হওয়া মাত্র বাণ্ডিল বেঁধে নিয়ে তাঁরা খুলনা সম্মেলনে রওনা হন। তৎকালে দক্ষিণ কলকাতা ছাত্র ফেডারেশনের অন্যতম অগ্রগণ্য কর্মী শচীন সেন (বর্তমানে 'কালান্তর'-এর বিজ্ঞাপন-সচিব) এই তথ্যে সায় দেন। সাপ্তাহিক 'জনযুদ্ধ'র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় [২৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের তৎকালীন সম্পাদক শঙ্কর রায়চৌধুরী 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন' নামে যে-প্রবন্ধ লেখেন, সেটি পড়লে জানা যায় খুলনা গান্ধীপার্কে ৪-৫ এপ্রিল ছাত্র ফেডারেশনের প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, 'প্রাচীর' তার আগে অর্থাৎ এপ্রিল মাসের দুই-তিন তারিখ নাগাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এই সূত্রেই মনে পড়ে যায় পাক্ষিক 'জনযুদ্ধ'র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল ঐ বছরই ১ এপ্রিল তারিখে।

অজয় দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, 'প্রাচীর'-এর প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সংস্কৃতি-সম্পাদক, ছাত্রাবস্থায়ই কবি হিসেবে বিখ্যাত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়। আর্থিক দায়িত্ব বহনের অঙ্গীকার জানিয়ে 'প্রাচীর' ছাপার জন্য প্রেস ঠিক করে দেন অমিয় চক্রবর্তী, উৎসাহ বশে তিনি এমনকি প্রুফ-সংশোধন ইত্যাদি কাজও করেন। সম্মেলনের মুখ চেয়ে 'প্রাচীর'

প্রায় রাতারাতি ছাপা হয়। এক অর্থে 'প্রাচীর'কেই 'ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'র সূচনা বলা যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য অনুসারে সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ডের পর ছাত্র ফেডারেশন শিল্পী-সাহিত্যিকদের একটি যথোচিত শোকসভা অনুষ্ঠানের প্রস্তাব নেয় এবং প্রধানত ছাত্রকর্মীদের উদ্যোগেই ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনসটিট্যুটের সভায় লেখক-শিল্পীরা সমবেত হন ; আর সেই সভা থেকেই জন্ম নেয় 'ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'র সংগঠনী কমিটি—যার যুগ্মসম্পাদক হন বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। মনে রাখা দরকার শঙ্কর রায়চৌধুরীর উপরোক্ত প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল: "সম্মেলনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল এবং ছাত্রকবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচিত সংগীত গীত হইবার পর সভাপতি কর্তৃক উত্থাপিত শোকজ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হয়।. " সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা বাঙলা তথা ভারতীয় যে-কোনো ভাষার প্রথম ফ্যাসিস্টবিরোধী গণসঙ্গীত (বা 'জনযুদ্ধের গান') "বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ" তখন সচেতন মানুষদের মুখে মুখে ফিরছে।

'প্রাচীর'-এ *No passaran* শিরোনামায় একটি স্বাক্ষরবিহীন ছোট্ট গদ্য রচনা ছিল। অজয় দাশগুপ্তর সাক্ষ্য অনুসারে এই রচনাটি ইশতেহার আকারে খুলনা সম্মেলনে বিলিও করা হয়। এটি লিখেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। প্রায়-বিস্মৃত ও দুষ্প্রাপ্য সেই রচনাটি আমরা অবিকল প্রকাশ করলাম। অবশ্য, বর্তমান শিরোনামাটি আমাদেরই দেওয়া।—সম্পাদক]

* স্পেনের গণশক্তি একদিন ফ্রাঙ্কোর হঠকারিতার জবাব দিয়েছিল ধারালো বেঅনেটে। মাদ্রিদ জ্বলেছে, ফ্যাসিষ্টদের বর্ব্বর অভিযান প্রতিহত করতে গিয়ে দেশের শ্রেষ্ঠ যুবকেরা মৃত্যু বরণ করেছে। হিটলার, মুসোলিনীর মারণাস্ত্র নিয়ে ফ্রাঙ্কো জয়ী হয়েছে, কিন্তু স্পেনের গণতন্ত্রীরা টলেনি। আন্তর্জাতিক বাহিনীর রক্তে দেশে দেশে মুক্তিকামী রক্তবীজ জন্ম নিয়েছে। আজ চীনের দুর্জয় গরিলা বাহিনীর সংগ্রামে, সোভিয়েট লাল ফৌজের বিজয়ী বিক্রমে সেদিনকার সাবধানবাণী মূর্ত্ত হচ্ছে—'আমরা ফিরে আসবো।'
* চীনের জনগণ জাপানী নাগপাশ ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছে। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, চীনের বাহিনী জাপানী প্রতিরোধ করছে। তারা জানে জাপানী শৃংখল তাদের অত্যাচার আর মহামারী উপহার দেবে।

জাগ্রত চীনে জাপান আনতে চায় আফিমের তামসিকতা, চীনের রাস্তাগুলি জাপানী ভিক্ষুক দিয়ে ভরে দেবে। তাই সংহত চীন উঠে দাঁড়ালো, আকাশে উৎক্ষিপ্ত হ'লো বজ্রকণ্ঠ গান—'এদেশ আমার।'

* সোভিয়েটের রক্তিম ভূগোলে ফ্যাসিষ্টদের উন্মত্ত চীৎকার শোনা গেল। কিন্তু আহত সে ঢেউ দগ্ধ মেদিনীর চিহ্ন নিয়ে ফিরে গেল। মুক্ত জনপদগুলি নাৎসীদের কঙ্কালে স্তূপীকৃত হয়ে থাকলো। বিশ্ব মুক্তির দুর্গ বিপন্ন—দেশে দেশে মুক্তিকামীর দল শপথ নিলো: 'একটি বুলেট, একটি ফ্যাসিষ্ট।'
* ভারতবর্ষে সেই প্রতিরোধের প্রাচীর উঠছে। তার তলায় খোঁড়া হচ্ছে বিশৃঙ্খলের কবর। মিছিলে. প্রাচীরপত্রে ধ্বনিত হচ্ছে বিপন্ন ভারতের আকাঙ্খা: 'হাতিয়ার চাই।'

কবির প্রত্যয়

গোলাম কুদ্দুস

['ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'র (তৎকালীন পুস্তিকায়, পত্রিকায়, রচনা বা বিজ্ঞাপনে 'ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী' 'ফ্যাসিস্টবিরোধী' 'সঙ্ঘ' 'সংঘ' প্রভৃতি একাধিক বানান ব্যবহৃত হয়েছে) প্রথম সম্মেলন উপলক্ষে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গোলাম কুদ্দুস সম্পাদিত ফ্যাসিস্টবিরোধী কাব্য-সংকলন 'একসূত্রে' ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে (পৌষ ১৩৪৯) প্রকাশিত হয় [৩০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]। সংঘের নতুন কার্যালয় ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রীট থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই সংকলন প্রকাশ করেন।

'একসূত্রে'র দাম এক টাকা। এইটিই ছিল সংঘের সর্বাধিক মূল্যের প্রকাশন। 'পরিচয়' সাইজের এই সংকলনটির মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭২ (টাইটেল—২, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা—৩, গোলাম কুদ্দুসের ভূমিকা—৪, উল্টোপিঠ সাদা, সূচীপত্র—২, কবিতা—৬০)। সবুজ রঙের মলাটের কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম কভারে ওপর দিকে 'একসূত্রে' আর নিচের দিকে 'ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'—সংকলনের এবং সংগঠনের এই দুটি নাম প্রেস-টাইপে ছাপা হয়েছে। চতুর্থ কভারে আছে ছোট এই বিজ্ঞাপন :

ফ্যাসিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ

কর্তৃক প্রকাশিত

গ্রন্থমালা :

বুদ্ধদেব বসুর	'ফ্যাসিজ্‌ম্‌ ও সভ্যতা'	দু' আনা
প্রতিভা বসুর	'ফ্যাসিজম ও নারী'	দু' আনা
বিজন রায়ের	'জাপানী শাসনের আসল রূপ'	চার আনা
বিষ্ণু দে'র	'বাইশে জুন'	চার আনা
রাহুল সাংকৃত্যায়নের	'ফ্যাসিষ্ট ও নাৎসি শাসন'	ছ' পয়সা
গীতিসংকলন	'জনযুদ্ধের গান'	এক আনা

ফ্যাসিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ

৪৬, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনটির লে-আউটে ছোট-বড় হরফ ব্যবহৃত হয়েছিল।

টাইটেলের প্রথম পৃষ্ঠায় "…একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্র জীবন / এককাজে সঁপিয়াছি সহস্রটি মন…" রবীন্দ্রগীতির এই দুটি বিখ্যাত পংক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। সংঘ কর্তৃক ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'জনযুদ্ধের গান' গীতিসংকলনে এই পংক্তিগুলিই কিছুটা ভুলভাবে উদ্ধৃত হয়েছিল, তবে তাতে 'বন্দেমাতরম' শব্দটি এড়িয়ে যাওয়া হয় নি।

সংকলনে ৫৫ জন কবির কবিতা আছে। কবিতা কবির নামের বর্ণানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। সংকলনের প্রথম ও শেষ কবি যথাক্রমে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এবং হরপ্রসাদ মিত্র। ফ্যাসিস্টবিরোধী এই সংকলনে বাঙলার প্রবীণ ও নবীন কবিদের এক বৃহদংশই সমবেত হয়েছেন।

গোলাম কুদ্দুস লিখিত 'একসূত্রে'র দ্বিতীয় ভূমিকাটির অংশবিশেষ এখানে প্রকাশিত হল। বানান ও যতিচিহ্নে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। রচনার শিরোনামা আমাদেরই দেওয়া।—সম্পাদক]

বিজ্ঞানের কল্যাণে দেশবিদেশের সংযোগ বহুদিন থেকে ঘনিষ্ঠ। এত ঘনিষ্ঠ যে এক দেশের হাঁড়ির খবর অন্য দেশের নাড়িতে দোল দেয়। এই জাগতিক ঘনিষ্ঠ টানাহেঁচড়ায় এ যুগের সাহিত্য বিশ্বজনীন হতে বাধ্য। স্পেনের গৃহ-যুদ্ধে ইংরেজ কবি গভীর সংযোগ অনুভব করে, চীন দেশের আত্মকলহের ছায়া-পাত ইয়োরোপের সাহিত্যে। বিজ্ঞান-প্রসূত শিল্পবাণিজ্য যে-দেশে মধ্যযুগীয় বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত সে-দেশে এ সংযোগ-বোধ গভীর। বিংশ শতাব্দীতেও আমাদের সাহিত্যে পৃথিবীর ঘটনা-সংযোগের ছায়াপাত যে দুর্বল, তার কারণ আমাদের দেশের মধ্যযুগীয় আবহাওয়া। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প-প্রসার এযুগে অবশ্য স্বাধীনতারই গ্রহ-উপগ্রহ। তবু স্বাধীনতা-সংগ্রামেও এযুগে বিশ্বব্যাপারের রীতিপ্রকৃতি জানা অপরিহার্য। কারণ এযুগে বিশ্ব-বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা লাভের উপায় নেই।

আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি তাই বিশ্বকবি। ইরান, ইজিপ্ট, তুর্কি, রুশ, চীন, জাপান, স্পেন—পৃথিবীর যে প্রান্তেই আন্দোলনের আলোড়ন হোক রবীন্দ্র-সাহিত্যে তার সজাগ ছায়াপাত।…

এবার যার রথের চূড়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে তার আবির্ভাবের আগেই শহর-গ্রাম নির্বিশেষে দেশের মর্মস্থলে পড়েছে হেঁচকা টান।…

কিন্তু দেশের মানস-প্রতিনিধিদের মনে বহুপূর্বেই ফ্যাসিস্তবাদের পরিপূর্ণ অর্থ

প্রকট হওয়া উচিত ছিল। অবশ্য যুদ্ধ-অভিজ্ঞ এবং ভীত ইয়োরোপের সাহিত্যিকদের পক্ষে ফ্যাসিস্তবাদকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার, খড়্গটা চব্বিশ ঘণ্টা তাদের মাথার উপর ঝুলছে কিনা। আমাদের টনক নড়ল জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করার পর। পৃথিবীর ঘটনার সঙ্গে আমাদের যোগ আজ আন্তরিক। এর ফলে কাব্যের ক্ষেত্রে একটা নতুন সুর ধ্বনিত হয়েছে।...

বিদেশী আক্রমণ, বোমাবর্ষণ এবং ফ্যাসিস্ট শাসনের ভয় একটা জিনিস স্পষ্ট করেছে, নিষ্ক্রিয় এবং পক্ষপাতশূন্য থাকাই নিরাপদ নয়। "আমি কোনো রাজনীতি-সমাজনীতির ধার ধারিনে, আমি লোকটা নিরীহ গো-বেচারা ভালো মানুষ" বলে ঘরে বসে থাকার নিশ্চিন্ত দিন শেষ। ভালো মানুষ বলে বোমা তো কাউকে খাতির করে না! ফলে ফ্যাসিস্তভীতির অনিবার্যতা কতকগুলো পাঠক এবং লেখকের মনকে অন্তত নিষ্ক্রিয়তা এবং পক্ষপাতশূন্যতা থেকে সাময়িকভাবেও মুক্তি দিয়েছে। তাঁদের মনের ভাব: জীবন যখন এতই অনিশ্চিত তখন বাঁচতে হয় তো মানুষের মতো বাঁচা উচিত। মৃত্যু যদি এতই অনিবার্য তাহলে একটা আদর্শের জন্য মৃত্যুবরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কে জানে হয়তো সেই মৃত্যুর মধ্যেই জীবন প্রচ্ছন্ন আছে। এমনি করেই চরম বিপদের দিনে নির্জীব জাতির বাঁকা মেরুদণ্ডটা সোজা হয়ে আসে। সাম্প্রতিক কাব্যে এই সুস্থ জীবনভঙ্গিমার লক্ষণ সুস্পষ্ট।...

জনযুদ্ধের গানঃ ভাবী সংস্কৃতির ইঙ্গিত

বিনয় রায়

[প্রথম সংস্করণ 'জনযুদ্ধের গান'-এর মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬। ডবল ক্রাউন সাইজের এই পুস্তিকায় মলাটের জন্য আলাদা কোনো কাগজ ব্যবহার করা হয় নি। প্রথম কভারে (অর্থাৎ প্রথম পৃষ্ঠায়) প্রেস-হরফে শুধু সংকলনের নাম ছাপা হয়েছে। নামের নিচে পাতলা দুটি রুল ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কভার সাদা। চতুর্থ কভারে নিচের দিকে ছাপা : "ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের পক্ষ / হইতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১।১০ / গোলাম মহম্মদ রোড হইতে প্রকাশিত। / জুলাই ১৯৪২।" বাকি ১২ পৃষ্ঠায় গীতিকারের নামবিহীন মৌলিক ও অনুবাদিত হিন্দি এবং বাঙলা ভাষায় মোট ১২টি গান (প্রথম গানটি দু-পাতায়, নবম ও দশম গান দুটি এক পাতায়, বাকি গানগুলি এক-এক পাতায়) পর পর মুদ্রিত হয়েছে। গানগুলির প্রথম পংক্তি এবং বাঙলা গানের ক্ষেত্রে বন্ধনী চিহ্নের ভেতর গীতিকারের নাম যথাসম্ভব প্রকাশ করা হল : 'চাষী গেরিলার গান'—"হোই হোই হোই···" (বিনয় রায়)। / 'ভজন'—"কেক্‌রা, কেক্‌রা, নাম বাতাউ···" / "জাগ্‌রে মজ্‌দুর্‌, জাগ্‌রে কিষাণ···" / "বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ···" (সুভাষ মুখোপাধ্যায়) / "বড় চলো কিষাণ ধীর···" / "সোভিয়েটভূমি বিশ্বশ্রমিক প্রিয়···" (মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়) / "মজদুর্‌, মজদুর্‌, মজ্‌দুর্‌ হ্যায় হাম্‌···" / "সাবাস চীনা ভাই···" (বিনয় রায়) / 'রামপ্রসাদী'—"জাপানকে ভয় করবো না গো···" (প্রভাত বসু)। "বাংলার এই মাটিতে···" (সুভাষ মুখোপাধ্যায়) / 'ভাটিয়ালী' —"রইবনা আর ঘরের কোণে ওরে ও চাষী ভাই···" (প্রভাত বসু) / "জাগো, জাগো, জাগো সর্ব্বহারা···" (মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়)। ষষ্ঠ ও দ্বাদশ গান দুটি যে অনুবাদ তা কোথাও জানানো হয় নি।

সেপ্টেম্বর ১৯৪২ সালে এই সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আমরা যে-কপিটি দেখেছি, তার মলাট ছিল না; তাই দাম জানতে পারি নি। অন্যত্র একটি বিজ্ঞাপনে 'জনযুদ্ধের গান'-এর দাম বলা হয়েছে এক আনা। বিজ্ঞাপনটি প্রথম না দ্বিতীয় সংস্করণের তা বলা শক্ত। দ্বিতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২+২৯। বাঙলা-হিন্দি-উর্দু মৌলিক ও অনুবাদিত গানের সংখ্যা

তিরিশ। উর্দুতে শুধু জনৈক অজ্ঞাতনামা অনুবাদক কৃত 'ইনটারন্যাশনাল'-এর তরজমাটি প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দিতে জর্লি কাউলের দুটি এবং হলধরজী, ভারতভূষণ আগরওয়াল ও প্রভাত বসুর একটি করে মৌলিক গান আর জর্লি কাউল কৃত "বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ" এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বাঙলায় প্রভাত বসু (পাঁচটি), বিনয় রায় (চারটি), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (তিনটি), বিষ্ণু দে (দুটি) এবং ক্ষেত্র চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাপ্রসাদ রায়চৌধুরী, সুকান্ত ভট্টাচার্য, অবন্তী সান্যাল, মণীন্দ্র রায়, দয়াল কুমার ও "রঙপুরের কমরেডদের" লেখা একটি করে গান আছে। আর আছে 'ইনটারন্যাশনাল' ও 'সোভিয়েট-ল্যাণ্ড' গান দুটির মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বাঙলা অনুবাদ, অবশ্য "সোভিয়েট-ভূমি বিশ্বশ্রমিক প্রিয়" গানটি যে 'সোভিয়েটল্যাণ্ড'-এর অনুবাদ—তা জানানো হয় নি।

মে ১৯৪৩ সালে 'জনযুদ্ধের গান'-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মূল্য তিন আনা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২+৩৪। মলাটের জন্য আলাদা কভার পেপার ব্যবহার করা হয়েছে, তবে কোনো ব্লক ব্যবহৃত হয় নি। প্রথম ও চতুর্থ কভারে "এক সূত্রে বাঁধা আছি সহস্রটী মন /···আমরা সহস্র প্রাণ বহিব নির্ভয় / বন্দেমাতরম! বন্দেমাতরম!" এবং "আমরা ডরাইব না ঝটিকা ঝঞ্ঝায়, / ···তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন। / বন্দেমাতরম। বন্দেমাতরম"—রবীন্দ্র-গীতির এই দুটি বিখ্যাত স্তবক উদ্ধৃত হয়েছে। দ্বিতীয় কভারে আছে রবীন্দ্র-নাথেরই আরেকটি উদ্ধৃতি: "হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগরে ধীরে / এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে ॥" তাছাড়া আছে মূল্য নির্দেশ, প্রকাশক ও মুদ্রকের নাম ইত্যাদি। তৃতীয় কভারটি সাদা। বিনয় রায়ের লেখা দু-পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা এই সংস্করণের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। তাছাড়া এই সংস্করণে পূর্ববর্তী সংস্করণের অনেকগুলি গান বর্জিত ও বেশ কয়েকটি নতুন গান গৃহীত হয়েছে। কোন কোনো গানের মাথায় সুরনির্দেশ (যেমন "সুর ভাটিয়ালী, জেরালো ঝোঁক্" কি 'বাউল সুর' ইত্যাদি) বা কৌতূহলোদ্দীপক পরিচিতি (যেমন "বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ" গানটির ওপর লেখা হয়েছে "প্রথম জাপ-বিরোধী গান—" কি 'চাষী গ্যেরিলার গান'-এর ওপর লেখা হয়েছে "গত বৎসর ডোমার (রংপুর জেলা) প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে গাওয়া হয়—অদ্ভুত উৎসাহের সৃষ্টি করে ; ভাষা—উত্তর বঙ্গের", কি 'জনযুদ্ধের ডাক, ২য় খণ্ড'র পরিচিতি হিসেবে বলা হয়েছে "মৈমনসিংহের কৃষক কবি নিবারণ পণ্ডিতের

ছড়া জনযুদ্ধের ডাক, ১ম খণ্ড বিভিন্ন জেলায় অদ্ভুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এখানে ঐ ছড়ার ২য় খণ্ড থেকে একটা অংশ দেওয়া হ'ল। পট গানের সুর।" প্রভৃতি) আছে। সংকলনটি "বাংলা বিভাগ", "হিন্দিবিভাগ" ও "ইনটারন্যাশনাল" এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত। বাঙলা বিভাগে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের পাঁচটি; বিনয় রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সত্যেন সেন (পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ কমিউনিস্ট সাহিত্যিক, বর্তমানে বাঙলাদেশের নাগরিক)-এর দুটি করে এবং ক্ষেত্র চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, দয়ালকুমার, নিবারণ পণ্ডিত, মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় ('সোভিয়েটল্যাণ্ড'-এর অনুবাদ)-এর একটি করে গান আছে। আর আছে হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দুটি হিন্দি গানের অনুবাদ (একটি করেছেন দিলীপ রায় ও সুনীল চট্টোপাধ্যায়—দুজনে)। হিন্দি বিভাগে আছে বিখ্যাত 'লা মার্সাই' গানটির হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ "অব, কমর বাঁধ তৈয়ার হো লক্ষ কোটী ভাইয়ো,···।" আর আছে ট্রামশ্রমিক রহমানের লেখা একটি কাওয়ালি। ৩, ৪, ৫ সংখ্যক গানের ওপরে বা নিচে কোনো নাম নেই, ৬ সংখ্যক গানের নিচে আছে রহমানের নাম। হয়তো পাঁচটি গানই সেই রহমানের লেখা। জানি না তিনি আজ কোথায়, কি করছেন। 'ইন্টারন্যাশনাল' বিভাগে আছে 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীতের বাঙলা তরজমা (মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত), হিন্দি ভাষান্তর ("উঠো জাগো ভূখে বন্দী"—অনুবাদক : হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) এবং উর্দু রূপান্তর ("কেয়া থাক্ হ্যায় তেরি জিন্দেগানী" —অনুবাদক : অজ্ঞাত)।

'ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্প সংঘ'র পক্ষে 'জনযুদ্ধের গান'-এর তিনটি সংস্করণেরই প্রকাশক সুভাষ মুখোপাধ্যায়। প্রথম সংস্করণে বিষ্ণু দে-র বাড়ি ছিল প্রকাশকের ঠিকানা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে প্রকাশক বা সংঘের কোনো ঠিকানা দেওয়া হয় নি।

'পরিচয়'-এর এই ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংকলনের ছাপার কাজ চলা কালে মস্কোয় এক বাস দুর্ঘটনায় বিনয় রায়ের জীবনদীপ অকালে নির্বাপিত হয়েছে। তাঁর রচনাটি যখন আমরা কপি করি তখন ভাবতেও পারি নি সেটি প্রকাশকালে ইন্দ্রপাতসদৃশ এই মৃত্যুসংবাদ পাঠকদের জানাতে হবে। বিনয় রায় চল্লিশের দশকে শুধু বাঙলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেই গণনাট্য, বিশেষত গণসঙ্গীত, আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন।

'জনযুদ্ধের গান' তৃতীয় সংস্করণ থেকে আমরা বিনয় রায়ের মূল্যবান

ভূমিকাটি পুনর্মুদ্রণ করলাম। বানান ও যতিচিহ্নের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ সালে 'ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' প্রকাশিত সংকলন 'জাতীয় সঙ্গীত'-এ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৩ পৃষ্ঠার যে দীর্ঘ মননশীল ভূমিকা লেখেন, তাতে বিনয় রায়ের উপরোক্ত রচনার বহু সিদ্ধান্তই মান্য করা হয়েছে।

বর্তমান প্রবন্ধের শিরোনামা আমাদেরই দেওয়া।—সম্পাদক]

"জনযুদ্ধের গান'-এর দু-হাজার কপি অল্প কিছুদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবার পর বাঙলাদেশের চারদিক থেকে তাগিদ আসতে থাকে নতুন গানের বইয়ের জন্য।

এর মধ্যে অনেক নতুন গান রচিত হয়েছে। সেগুলো যোগ করে আর আগের কিছু গান বাদ দিয়ে তৃতীয় সংস্করণ বের করা গেল।

দ্বিতীয় সংস্করণের সময় প্রায় সবকটাই ছিল জাপবিরোধী গান। হলধরজীর "কেক্‌রা, কেক্‌রা," ছাড়া বাকি সবই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকদের রচনা। সে গানগুলোর সহজ আবেদন, সহজ অথচ জোরালো সুর হাজার হাজার মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। সভায়, মিছিলে, হাটে, গঞ্জে সর্বত্রই লোকের মুখে মুখে এই গানগুলো ফেরে। জাপবিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি এইভাবে জনযুদ্ধের গানের আন্দোলনও বেড়ে উঠতে থাকে। ফলে শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসেন নতুন নতুন গায়ক ও গান-রচয়িতা। তাঁরা গান লেখা শুরু করেন তাঁদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ ও তার প্রতিকারের উপায় নিয়ে। বিভিন্ন জেলায় নিজ নিজ ভাষাতেও গান লেখা শুরু হয় এর ফলে। এই গানগুলোর মধ্য দিয়ে লোকে পায় তাদের হতাশ ও দুর্দশাগ্রস্ত জীবনে আশা ও আলোর সন্ধান। নূতন উৎসাহে তারা এই গানগুলোকে গ্রহণ করে, মনে ফিরে পায় বল—জনযুদ্ধের গান সত্যিকারের জনসঙ্গীতের পথে কয়েক ধাপ এগোয়। তৃতীয় সংস্করণে এই জাতীয় কিছু গান যোগ করা হল। এই সম্পর্কে কয়েকটা কথা মনে রাখা দরকার।

বাঙলার সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রগতি আনবার চেষ্টা চলছিল গত একযুগ ধরে। কিন্তু সেই আন্দোলনের সঙ্গে গণজীবনের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না; ফলে প্রচেষ্টা ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে। আজকের এই গানের আন্দোলন সংস্কৃতিকে সেই

ব্যর্থতা থেকে মুক্ত করে জনসাধারণের সঙ্গে সংযুক্ত করার দায়িত্ব নিয়েছে এবং অনেকাংশে সমর্থ হয়েছে।

মানতেই হবে, ভাষা ও সুরের ক্ষেত্রে এ-গানগুলোর অধিকাংশই ওস্তাদের আসরে স্থান পাবে না; কিন্তু সংস্কৃতিতে প্রগতি অর্থে যদি জনসাধারণের সাংস্কৃতিক জ্ঞান ও ধারণা বৃদ্ধি বোঝায় তবে জনযুদ্ধের গান নিঃসন্দেহে সে-কাজে অনেক সাহায্য করেছে ও করছে। আজ প্রত্যেকটি দরদী সাহিত্যিক ও সঙ্গীতকারের কাজ এই গানের আন্দোলনকে নতুন ভাবের গান দিয়ে সমৃদ্ধ ও মার্জিত করা।

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময়কার স্বদেশী গান, ক্ষুদিরামের ফাঁসির গান, সন্ত্রাসবাদের খুনের গান, মুকুন্দ দাসের যাত্রাগান আমাদের দেশের হাজার হাজার লোককে একদিন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আজ দেশের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে যখন ধন, মান, ইজ্জৎ, জীবন, শিল্প, সাহিত্য সমস্তই আসন্ন ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে; তখন জনযুদ্ধের গানকেও সেই কাজ আরও শতগুণে বাড়িয়ে দেশের প্রত্যেকটি লোককে স্বাদেশিকতা, দেশরক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

কিন্তু এ শুধু 'স্বদেশী' আমলের স্বাদেশিকতার পুনরুজ্জীবন নয়। বলিষ্ঠ দেশপ্রেমের সঙ্গে এই গানের মধ্যে এসে মিলেছে ফ্যাসিজমকে রুখবার দুর্জয় সংকল্প, ব্যাপক আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আর মজুর কিষানের জীবন ও সংগ্রামের কথা। ফলে আরও সমৃদ্ধ ও সুসঙ্গত হয়ে উঠেছে সেদিনকার স্বাদেশিকতা। তাই এই গানের সহজ ও ধারালো কথার মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে ভাবী সংস্কৃতির ইঙ্গিত।

আমাদের সম্মানের বিজয়তিলক

টমাস মান

[নাৎসিদের ক্ষমতা-দখলকে উপহাস করে এবং নাৎসি অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে স্বেচ্ছানির্বাসিত টমাস মান একটি বিবৃতি দেন। য়্যালবার্ট আইনস্টাইন সেটি পড়ে টমাস মানকে একটি অভিনন্দনপত্র লেখেন। মানের প্রত্যুত্তর এখানে প্রকাশিত হল। চিঠিটির শুরুতে ছিল "প্রিয় অধ্যাপক আইনস্টাইন", আর শেষে "ইতি ভবদীয় টমাস মান"। এ-রচনার শিরোনামা আমাদেরই দেওয়া।—সম্পাদক]

বান্দোল (ভার) মে ১৫, ১৯৩৩
গ্রাণ্ড হোটেল

ধন্যবাদ জানিয়ে আপনার প্রীতিপূর্ণ পত্রখানির প্রাপ্তি স্বীকারে যদি দেরি হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্যে আমার ঘন ঘন স্থানান্তরণই দায়ী।

বিগত কয়টি ছন্নছাড়া মাসে, সম্ভবত সারা জীবনে, এতখানি সম্মান আমাকে কেউ দেয় নি। যে কাজ আমার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক আর যে জন্যে ধন্যবাদ পাবার আমার কোনোই কারণ নেই, সে কাজটুকুর জন্যেই আপনি আমার এতখানি প্রশংসা করলেন! আবার অন্যদিকে, আমার এই কাজটুকু আমাকে যে অবস্থাবিপাকে ফেলেছে, আমার পক্ষে তো তা স্বাভাবিক নয়; কেননা অন্য যে কোনো খাঁটি জার্মানের মতোই স্থায়ী নির্বাসন মেনে নেবার মন আমারও নেই, আর স্বদেশের সঙ্গে বিরোধ যা প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে, তা আমাকে পীড়া দিচ্ছে, ত্রস্ত করে তুলছে—এমন বিরোধের ছিটেফোঁটাও আমার স্বভাবের সঙ্গে ঠিক মেলে না। বরং গ্যেটে যে ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করেন, শহিদ হবার জন্য আদর্শের চেয়ে ঢের বেশি তা আমার স্বভাবের মধ্যে মজ্জাগত হয়ে আছে। সত্যিকারের কোনো অন্যায় আর অনিষ্টকর একটা এমন কিছু ঘটেছে—যা আমাকে এমন ভূমিকা নিতে বাধ্য করল। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই 'জার্মান বিপ্লব'-এর আগাপাশতলাই অন্যায় ও অনিষ্টকর। সত্যিকারের বিপ্লব, তা যত রক্তক্ষয়ীই হোক না কেন, তার জন্য সারা দুনিয়ার সহানুভূতি উচ্ছ্রিত থাকে। তেমন বিপ্লবের গুণগুলি এতে অনুপস্থিত। সত্যিকারের

'জাগরণ'ই এ নয়, যতই এর পুরুতপাদরিরা হল্লা করুক না কেন। বরং তা ঘৃণা, প্রতিহিংসা, সাধারণ নররক্তপিপাসু উন্মত্ততা আর পেটি-বুর্জোয়া নীচতা। আমি দৃঢ়নিশ্চয় যে জার্মানি বা বাকি দুনিয়ার জন্য কোনো কিছু সদর্থক তা বয়ে আনছে না। আর নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দীনতাবাহী এই শক্তিগুলির বিরুদ্ধেই আপ্রাণ প্রচেষ্টায় বিশ্বকে আমাদের সচেতন করতে হবে। জানি এই ভূমিকা আমাদের জন্য বয়ে আনতে পারে নিদারুণ সর্বনাশ, কিন্তু নিশ্চিত জানি একদিন তা-ই হয়ে উঠবে আমাদের সম্মানের বিজয়তিলক।

অনুবাদ: শুভব্রত রায়

দিনগুলি, রাতগুলি

কনস্ট্যানটিন সিমোনভ

[সিমোনভের যুদ্ধের ওপর লেখা রিপোর্টাজগুলি পৃথিবীতে আলোড়ন আনে। *Liberation* থেকে তারই একটি, Days and Nights, অনুবাদ করা হল।
—সম্পাদক]

একবার যে শুনেছে, ভোলা তার পক্ষে অসম্ভব। যখনই পেছনের দিকে তাকানো যায়, আর স্মরণ করা হয় বিগত সব বছরগুলো এবং কথা ওঠে 'যুদ্ধ' নিয়ে—আমাদের মানস-দৃষ্টিতে জেগে ওঠে দাউদাউ স্তালিনগ্রাদের রক্তপ্রকম্পিত দৃশ্যপট, আর শ্রুতি ভরে যায় ঘন ঘন বিমান আক্রমণের তর্জনগর্জনে। পোড়া পোড়া গন্ধে দম আটকে আসে, শুনতে পাওয়া যায় অগ্নিপ্রোজ্জ্বল ইস্পাত ফাটার আওয়াজ ও কর্কশ তীক্ষ্ণ ধ্বনির ঘর্ঘর।

স্তালিনগ্রাদ অবরোধ করেছে জার্মানরা। কিন্তু তারা যখন 'স্তালিনগ্রাদ' বলে, তাদের অর্থে তা কিন্তু শহরের মৌল কেন্দ্র না, লেনিন স্ট্রীটও না—না এমন কি তা শহরতলীও, তারা স্তালিনগ্রাদ বলতে বোঝাতে চায় ষাট কিলোমিটার ব্যাপ্ত ভল্গার সেই বিশাল ভূ-সীমানাকে—সমগ্র পরিবেশ-পরিবেষ্টনী, কলকারখানা ও শ্রমিক বসতি নিয়ে যে মহানগরী, তাকেই। বস্তুত ভল্গার পরিবেষ্টনীতে বেশ কতকগুলো শহরের সমাহারে গড়ে উঠেছে এই মহানগরীটি। তবে ভল্গার বাষ্পীয় যানবাহন থেকে দেখা এ আর আমাদের সে মহানগরী নয়। ভল্গার ঢালু তট বেয়ে উঠে যাওয়া মনোরম শ্বেতশ্রী-সৌধমালা, তীরে নামার হাল্কা সিঁড়ি, ছোটছোট স্নানঘর গড়া প্রাকার, মণ্ডপ আর ক্ষুদে ক্ষুদে বাড়িঘরের স্রোত-বিন্যস্ত সে-ভল্গাপারের শোভা আর নেই। এখন ধোঁয়া-ধূসর শহর; দিনরাতের নিত্যসঙ্গী তার লেহিলেহি নটিনী অগ্নিশিখা আর ভস্মঝঞ্ঝাপ্রবাহ।

স্তালিনগ্রাদের ধার ঘেঁষা শান্ত নীলাভ জলের ভল্গা—যার জলে আমরা দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম সূর্যালোকঝলসিত হরেকরকম বাষ্পীয়পোতের আনাগোনার খেলা, স্রোতপথ জুড়ে কাঠের ভেলা ও মন্থরগতি যানবাহনের শোভাযাত্রা—এ-ভল্গা আর সে-ভল্গা নেই। না, স্তালিনগ্রাদের কিনারছোঁয়া ভল্গা এখন যুদ্ধের নখরবিধ্বস্ত ভল্গা। এর সুবিন্যস্ত তটপ্রাকার এখন গোলাগুলিতে

ক্ষতবিক্ষত এবং বুকে বোমা ভেঙে ভেঙে সৃষ্টি করে চলেছে বিশাল বিশাল জলোৎক্ষেপ। অতিবোঝাই খেয়ানৌকা আর হাল্কা রণতরি পাড়ি জমাচ্ছে অবরুদ্ধ মহানগরীর দিকে। এর ওপরে চলেছে বন্দুকের ঘর্ঘরানি আর অন্ধকার-রঙা জলের ওপর ভাসতে দেখা যাচ্ছে আহতদের রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজাদি।

দিনের বেলায় মহানগরীর দালানকোঠাগুলোই জলন্ত মশাল আর রাতের বেলায় আদিগন্তই গনগনে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। প্রকম্পিত মৃত্তিকা-বক্ষে বিমানাক্রমণের ঘর্ঘরগড়ড়র্ঘর গর্জন আর গোলন্দাজ বাহিনীর গোলা ফাটানোর কড়াৎকর আওয়াজের কোনো বিরাম নেই। মহানগরীতে নিরাপদ স্থান একেবারেই অনুপস্থিত; দীর্ঘদিন তেমনটি যদিও থাকে নি, অবরুদ্ধ দিনগুলোতে নিরাপত্তা-হীনতার বোধ কাজ করেছে সবার মধ্যেই। বহু রাস্তার চিহ্ন অব্দি অবলুপ্ত, বাদবাকিগুলোতে বিপর্যয়ের দাগ ধরিয়েছে বোমার উৎপন্ন জ্বালামুখ। শহর ছেড়ে দিয়ে শিশু ও রমণীরা গাদাগাদি করে ঠাঁই নিয়েছে ভূ-অভ্যন্তরস্থ কুঠুরিতে, নয়তো ভল্গার ঢালে খুঁড়ে চলেছে গুহাগহ্বর। মাসখানেক ধরে ধ্বংসোন্মত্ততা চালিয়েছে জার্মানরা, তারা এ নগরীকে দখল করে নিতে চেয়েছে যে কোনো কিছুর বিনিময়ে। গুলি করে নামানো ভাঙা বোমারু বিমানের টুকরোগুলো রাস্তায় রাস্তায় চকচক করে আর আকাশে পাগলের মতো দাপিয়ে বেড়ায় বিমান-বিধ্বংসী কামানের গোলা, কিন্তু ঘণ্টাখানেকও বিরতি-ব্যবধান না-রেখে বিমানাক্রমণ থেকেছে অব্যাহত। এ মহানগরীকে নরক-পরিণতি দিতেই চেষ্টা চালিয়ে গেছে অবরোধকারীরা।

হ্যাঁ, পায়ের তলায় থথর করা মাটি আর মাথার ওপরে জলন্ত আকাশ, এখানে বসবাস, বস্তুতই, অসম্ভব। গতকালের শান্তি-নিবাসের বিধ্বস্ত দেওয়াল আর ঝাঁঝরা হওয়া জানালা দেখে কার গলাতেই বা না খিঁচুনি তোলা ঘৃণা জাগে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানে, বস্তুত, তিষ্ঠোনোই দায়। তার চেয়েও বেশি কথা, কিছু একটা না-করে থাকা এখানে দুরূহ। তবে, বেঁচে থাকা এবং যুদ্ধ করাটা সম্ভব, সম্ভব রক্ত ধোঁয়া আর আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই মহানগরীকে রক্ষা করা। আর, ঠিক এ-কারণেই আমাদের বেঁচে থাকার অঙ্গীকার। তা, মাথার ওপর মরণ যদি ঝুলতেই থাকে, আমাদের পাশে বিজয়বৈজয়ন্তীও রয়েছে। মাতাপিতাহারা অসহায় শিশুদের কান্না আর দালান-কোঠার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সে যে এখন আমাদেরই সহোদরা।

…ঘন ধোঁয়াশার বোরখা পরা মধ্যদিনের সূর্য। আবার সকাল থেকেই মহানগরীর বুকে জার্মান বাহিনীর বোমাবৃষ্টি। শহরের ওপর ছোঁ মেরে যায় একের পর এক বোমারুবিমানের ঝাঁক। আকাশটা কোনো বন্য জন্তুর চাকচাক দাগওয়ালা ধূসর-নীল চামড়ার মতো জ্বলন্ত ধাতব স্ফুলিঙ্গে পরিপূর্ণ। অগ্রসরমান হানাদারদের আক্রমণাত্মক চিৎকার। মুহূর্তের বিরতিহারা যুদ্ধ চলছে মাথার ওপর। তা দাম যতই দিতে হোক না কেন, জনগণের দায়দায়িত্ব যত না কেন ভয়ানক ও কঠোর হোক এবং যতই না চূড়ান্ত হয়ে দেখা দিক দুঃখদুর্দশা, সর্বস্ব পণ করে আত্মরক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মহানগরী। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়, যতক্ষণ না মৃত্যু, সংগ্রাম চলছে।

অনুবাদ : সত্য গুহ

একটি অবিস্মরণীয় আন্তর্জাতিক ইশতেহার

[প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্তে যারা সেই যুদ্ধ করেছিল এমন কিছু ফরাসী, জর্মন, অস্ট্রীয়, হাঙ্গেরীয় ও ইংরেজ নাগরিক বারব্যুস, রোলাঁ, হুর্জগ ও নিকোলাই-এর নেতৃত্বে একটি যুদ্ধবিরোধী সংঘ গঠন করেন। সংঘের নাম: 'ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ ক্লারাইট' ('ক্লার্তে')। ঠিকানা: পোস্টবকস ৮৬৬, মঁ ব্লাঁ, জেনিভা, সুইৎজারল্যাণ্ড।

I Will Not Rest গ্রন্থে রোলাঁ 'ক্লার্তে'-প্রসঙ্গ বারবার উল্লেখ করেছেন। এই 'ক্লার্তে' গ্রুপ ১৫-দফা সম্বলিত একটি ইশতেহার প্রচার করেন। তখনও ফ্যাসিবাদ বিশ্বের কোথাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন নয়। তবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বের অস্থির ও জটিল পরিস্থিতিতে ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থানের শর্তগুলি রচিত হচ্ছিল। ইশতেহারটি এই পটভূমিতেই রচিত। বহু মনীষীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন।

এই দলিলটি দেশবরেণ্য বিপিনচন্দ্র পালের কনিষ্ঠ পুত্র জ্ঞানাঞ্জন পাল মহাশয়ের সূত্রে পেয়েছি। বিপিনচন্দ্রের পুরনো নথিপত্রের ফাইলে ছিল। জ্ঞানাঞ্জনবাবুর বক্তব্যে প্রকাশ, বিপিনচন্দ্র তৎ-প্রদত্ত এক ভাষণে (কলেজ স্কোয়্যার, কলকাতা; ১২ ডিসেম্বর ১৯১৯) ইশতেহারটির দফাওয়ারি উল্লেখ করেন। তিনি এটি পান শিকাগোর 'ইউনিটি' পত্রিকা থেকে। যতদূর জানা আছে—বাঙলায় এই ইশতেহার ইতিপূর্বে প্রচারিত হয় নি।

অসামান্য এই দলিল সবচেয়ে উপযুক্ত সংকলনে সঠিক সময়েই এখন মুদ্রিত হল। রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর থাকায় স্বভাবতই এই আন্তর্জাতিক ইশতেহারটির প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ মমতা অনেকখানি বেড়ে যায়।—সংগ্রাহক ও অনুবাদক]

১. আমাদের সমাজব্যবস্থাটাই ভুল। এই ব্যবস্থার পরিণাম স্বল্পসংখ্যকের সুবিধা, স্বেচ্ছাচারী উৎপীড়ন, ধ্বংস এবং হত্যা।

২. অদ্যাবধি বেশিরভাগ মানুষকে ক্রীতদাস করে রাখা হয়েছে। পরম্পরাগত কুসংস্কারের বশে, মুষ্টিমেয়র খামখেয়াল চরিতার্থ করতে

অধিকাংশকে পেষণ ও জবাই করা হয়। সমস্ত শক্তির আধারের চেয়েও অজ্ঞতার দাপট হয়ে উঠেছে অনেক বেশি। বর্তমান সমাজের গোটা কাঠামোটাই দাঁড়িয়ে আছে অসঙ্গতির পরে ভর দিয়ে।

৩. ভুল থেকে ভুলেরই জন্ম, প্রগতি থেকে প্রগতির। আধা-মিথ্যার পরিণাম আরও খারাপ। যতক্ষণ সবকিছু পাল্টানো না হচ্ছে, ততক্ষণ কিছুই বদলানো সম্ভব নয়।

৪. ন্যায্য সমাজব্যবস্থার মৌল নীতিগুলি সরল। মহৎ ভাবুক, মহৎ নীতিবিদ ও সকল ধর্মের প্রতিষ্ঠাতারা চিরকালই উক্ত মৌল নীতিগুলির প্রশ্নে একমত।

৫. আদর্শের মতোই ক্ষমতাও সবার আয়ত্তে থাকা চাই। দৈহিক বা মানসিক, যে প্রকারেরই হোক, একমাত্র শ্রমই সম্মানীয়। একমাত্র শ্রমেরই পুরস্কৃত হওয়া উচিত। মুনাফাবাজী গরিষ্ঠসংখ্যকের বিরুদ্ধে অপরাধ, উত্তরাধিকার চৌর্যের সামিল।

৬. সকল মানুষকে হুবহু একই রকম সামাজিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়াতেই সাম্যের প্রকাশ। শ্রেণীসমূহের বিলোপ সাধনই শ্রেণীসংগ্রামের লক্ষ্য।

৭. স্ত্রীপুরুষ ভেদে নাগরিকদের মধ্যে কোনোরূপ বিভেদ করা যায় না।

৮. বিশ্বজনীন মানবহিতের সোপান হিসেবে রাষ্ট্রবিশেষের কল্যাণসাধন মহৎ কর্ম, কিন্তু নিছক সেখানেই ছেদ টানাটা হবে অপরাধ।

৯. যে-কোনো যুদ্ধের প্রস্তুতিই যাবতীয় যুদ্ধের পথ প্রশস্ত করে। আঞ্চলিক সীমানা ও আর্থনীতিক বিধিনিষেধগুলি উপর্যুপরি ভুল পথে নিয়ে চলে।

১০. পৃথিবীতে রকমারি ব্যক্তিস্বার্থ থাকলেও সর্বজনীন মঙ্গলের স্বরূপ এক। যেহেতু ন্যায় এবং নীতি—এ দুটি সর্বমানবিক, সুতরাং কোথাও কেউ বহিরাগত নয়।

১১. আলোড়ন সৃষ্টিকারী জনসমষ্টির অভ্যুত্থানের ফলে অধুনা খ্রীষ্টীয় যুগের চেয়েও পবিত্রতর ও মহত্তর এক নূতন যুগের সূচনা হচ্ছে।

১২. সবরকম প্রগতির গোড়ার কথা চিন্তা। দুনিয়ার অগ্রগতির অভিপ্রায়ে মননশীল ব্যক্তিদের উচিত আত্মোৎসর্গ করা।

১৩. রক্ষণশীলেরা আসলে স্থিতাবস্থারই ঢাক পেটায়।

১৪. রাজনৈতিক ধর্মঘটই সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। এটাই হচ্ছে বিবর্তন ও বিপ্লবের মধ্যবর্তী শান্তিপূর্ণ বিপ্লব।

দত্ত কমরেড বেন ব্রাডলির সঙ্গে যৌথভাবে একটি থিসিস দাখিল করেন যা দত্ত-ব্রাডলি থিসিস নামে পরিচিত।
এখানে 'ফ্যাসিজম য়্যাণ্ড সোশ্যাল রেভলিউশন' গ্রন্থের মূল্যবান ভূমিকাটির সংক্ষেপিত অনুবাদ প্রকাশ করা হল।—অনুবাদক]

বর্তমান সমাজের সামনে মাত্র দুটো রাস্তা খোলা আছে। একটা হল—উৎপাদনশক্তির শ্বাসরোধ করতে চেষ্টা করা, উন্নতিকে আটকানো, বৈষয়িক ও মানবিক শক্তিকে ধ্বংস করা, আন্তর্জাতিক পণ্য বিনিময়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, বিজ্ঞান ও আবিষ্ক্রিয়াকে ব্যাহত করা, মতাদর্শের বিকাশকে চূর্ণ করা এবং সীমিত সংগঠনে কেন্দ্রীভূত স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রগতিবিরোধী আপসে-কাজিয়া-রত, পুরোহিত-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার স্তরে—অর্থাৎ সংক্ষেপে বললে দাঁড়ায় বর্তমান শ্রেণী-আধিপত্য বজায় রাখবার জন্য—সমাজকে যেন আরো জোর করে আদিম স্তরে ঠেলে দেওয়া। এই হচ্ছে ফ্যাসিবাদের পথ। যেখানে বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতাসীন—তারা সেই পথের দিকেই অধিকতর পরিমাণে বাঁক নিচ্ছে। এ হল মানবজাতির ধ্বংসের পথ।

অন্য বিকল্পটি হচ্ছে—নূতন উৎপাদন-শক্তিকে সামাজিক শক্তি হিসাবে সংগঠিত করা; বর্তমানের সমগ্র সমাজের সাধারণ সম্পদ হিসাবে, সমাজের বৈষয়িক ভিত্তিকে দ্রুততার সঙ্গে প্রভূত পরিমাণে উন্নত করা। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, ব্যাধি এবং শ্রেণীগত ও জাতিগত বৈষম্য নির্মূল করা; বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অপরিমেয় অগ্রগতি ঘটানো এবং বিশ্ব-কমিউনিস্ট সমাজকে সংগঠিত করা—যেখানে সমস্ত মানুষ এই প্রথম পরিপূর্ণতায় পৌছাতে সক্ষম হবে এবং ভবিষ্যতে মানবজাতির যৌথবিকাশ সাধনে স্ব স্ব ভূমিকা পালন করবে। এই পথ হচ্ছে কমিউনিজমের—উৎপাদন-শক্তির জীবন্ত প্রতিনিধি যে-শ্রমিকশ্রেণী, পুঁজিবাদী শ্রেণী-আধিপত্যের উপর তাদের বিজয়ের দ্বারাই একমাত্র বাস্তবে এই পথ তারা অর্জন করতে পারবে এবং সেদিকেই তারা অধিকতর পরিমাণে মোড় নিচ্ছে। এই পথই আধুনিক বিজ্ঞান ও উৎপাদনশীল বিকাশকে সম্ভব ও অপরিহার্য করে তুলবে এবং মানবজাতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতির অকল্পনীয় সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে।

এর মধ্যে কোন বিকল্পটি জয়যুক্ত হবে? আজকের সমাজ এই তীক্ষ্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

বিপ্লবী মার্কসবাদ দৃঢ়নিশ্চিত যে উৎপাদনশক্তি কমিউনিজমের পক্ষে, অতএব কমিউনিজমই বিজয়ী হবে। কমিউনিজমের বিজয় শ্রমিকশ্রেণীর জয়ের মধ্যে প্রকাশিত হবে—বর্তমান দ্বন্দ্বসংঘাতের একমাত্র সম্ভাব্য চরম পরিণামই হচ্ছে এই। অপর বিকল্পের রাত্রির দুঃস্বপ্ন আর "অন্ধকার যুগ"-এর গা শিরশির করা যে-ছায়া সাময়িক কালের চিন্তানায়কদের কল্পনায় ইতিমধ্যেই উঁকি দিতে শুরু করেছে, তা পরাভূত হবেই, আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের সংগঠিত শক্তি তাকে পরাভূত করবেই।

কিন্তু এই অবশ্যম্ভাবিতা মনুষ্যনিরপেক্ষ ব্যাপার নয়। বরং বলা যায় প্রধানত মানুষের দ্বারাই তা অর্জন করা সম্ভব। এই মুহূর্ত থেকেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। কারণ এর উপরই মানবসমাজের সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সময় সংক্ষিপ্ততর হয়ে আসছে—কথায় বলে, কাচ ভেদ করে বালুকণা ছুটছে, সময় শেষ হতে আর দেরি নেই।

অনেকের কাছে, ফ্যাসিবাদের বিকল্প বা কমিউনিজম কোনো অভিনন্দন-যোগ্য বিকল্প নয় এবং তারা এটাকে অস্বীকার করতেই বেশি পছন্দ করে। উভয়কে তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে। এমন কি, তাদের মতে এরা হচ্ছে সমান্তরাল চরম মতবাদ। তারা তৃতীয় বিকল্পের স্বপ্ন দেখে যা ও দুটোর কোনোটার মতোই হবে না, এবং যা শ্রেণীসংগ্রাম ব্যতিরেকেই ধনতান্ত্রিক 'গণতন্ত্র', পরিকল্পিত ধনতন্ত্র ইত্যাদি কাঠামোর পথ বেয়েই শান্তিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করবে।

তৃতীয় বিকল্পের এই স্বপ্ন বস্তুতপক্ষে ভ্রান্ত। একদিকে, এ হচ্ছে অতীত যুগের—অর্থাৎ উদারনৈতিক পুঁজিবাদী স্তরের ধ্যানধারণার প্রতিধ্বনি যা ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবের সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। তাকে আর পুনর্জীবিত করা যাবে না। কারণ যে পরিস্থিতিতে এর উদ্ভব হয়েছিল তা এখন শেষ হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে পুঁজিবাদের চরম অবক্ষয় এবং শ্রেণীসংগ্রামের চরম তীব্রতার সময়। এমন কি, গণতান্ত্রিক কাঠামোর যে ক্যারিকেচার পশ্চিম-ইয়োরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোতে এখনো পর্যন্ত বিপজ্জনক-ভাবে টিকে আছে, অধিকতর খোলাখুলিভাবে একনায়কতান্ত্রিক এবং নিপীড়ন-মূলক পদ্ধতির আশ্রয়ে ক্রমাগত তারই সংযোজন ও পরিবর্তন চলেছে (যথা, প্রশাসনের হাতে ক্ষমতাবৃদ্ধি, পার্লামেন্টের ক্ষমতার সংকোচন, জরুরী ক্ষমতার

বৃদ্ধি, পুলিশী দমন ও সন্ত্রাসের প্রসার, বাক্‌স্বাধীনতা ও সভাসমিতি করার স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ, ধর্মঘটের অধিকারকে সীমাবদ্ধ করা, গণবিক্ষোভ ও ধর্মঘটকে সন্ত্রাসের পথে দমন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্রোড়পতি কাগজের সামাজিকভাবে চটকদার জনপ্রিয়তার ধোঁকাবাজি, সন্ত্রাসের পথে নির্বাচন ইত্যাদি)। সমস্ত দেশেই পুঁজিবাদের গতি নিঃসন্দেহে ফ্যাসিবাদের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। একজন মুসোলিনি বা একজন হিটলারের থেকে এখন এর ক্ষেত্র আরো ব্যাপক।

অন্যদিকে, পরিকল্পিত পুঁজিবাদ এর যুক্তিসম্মত অর্থের মুখোমুখি না হয়েই ফ্যাসিবাদের পিছনে অন্ধের মতো হাতড়ে বেড়াচ্ছে। পরিকল্পিত পুঁজিবাদের স্ববিরোধী লক্ষ্যে পৌঁছানোর বাস্তব চেষ্টাও একমাত্র ফ্যাসিবাদের পথে—অর্থাৎ উৎপাদনশক্তি আর শ্রমিকশ্রেণীকে দমন-পীড়নের পথ অনুসরণ করেই—করা যেতে পারে।

অতএব তৃতীয় বিকল্পের যে অতিকথন, প্রকৃতপক্ষে তা কোনো বিকল্পই নয়; আসলে তা হচ্ছে ফ্যাসিবাদের পথে অগ্রগমনের একটা ধাপ মাত্র। ফ্যাসিবাদ অবশ্যম্ভাবী নয়। ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদী বিকাশের কোনো আবশ্যিক স্তরও নয় যার ভিতর দিয়ে সব দেশকে যেতেই হবে। ফ্যাসিবাদের সম্ভাবনা ব্যর্থ করে দিয়েই সমাজবিপ্লব সম্ভব—যেমনটি হয়েছে রুশদেশে। কিন্তু সমাজবিপ্লব বিলম্বিত হলে ফ্যাসিবাদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

ফ্যাসিবাদকে প্রতিরোধ করা যায়। প্রতিরোধ করে তাকে পরাভূত করা যায়। ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে যদি কোনো মোহ না থাকে এবং এ-বিষয়ে যদি পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকে, তাহলেই তাকে প্রতিরোধ ও পরাভূত করা যায়। ফ্যাসিবাদের উৎপত্তির মূল বর্তমান সমাজের গভীরে প্রোথিত। ক্ষয়িষ্ণু পুঁজি-বাদই ফ্যাসিবাদকে জন্ম দেয়। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের অবক্ষয়ের মধ্যে ফ্যাসি-বাদের জন্ম। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিজয়ী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত গ্যারান্টি সৃষ্টি করা যায় এবং ফ্যাসিবাদের কারণগুলি সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা যায়।

অনুবাদ : অমিয় ধর

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানবজাতির বিজয়ের ত্রিংশতম বার্ষিকী উপলক্ষে

এই শতাব্দীর প্রথম যুগান্তকারী ঘটনা ১৯১৭ সালের অকটোবর (নভেম্বর) বিপ্লব।

ইতিহাসের অনিবার্য ধারাটিকে রুদ্ধ বা বিপথচালিত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়া তারপর ধারাবাহিক শুরু করে ষড়যন্ত্র, পাপ। একদিকে সোভিয়েত-অবরোধ, অন্যদিকে ক্রমে ক্রমে আবিসিনিয়া স্পেন চেকোস্লোভাকিয়া এবং মাঞ্চুরিয়ায় রক্তের অক্ষরে লেখা হয় সভ্যতার সেই কলঙ্কলিপি।

পৃথিবীর বিবেকবান মানুষরা, প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট দলগুলি এবং সর্বোপরি সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই সর্বাত্মক প্রতিরোধের চেষ্টা করে। তারপর, এই রাক্ষসশক্তি যখন পৃথিবীগ্রাসে উদ্যত হয় এবং যখন নিছক আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই সাম্রাজ্যবাদ ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি সোভিয়েত ইউনিয়ন আর সমাজতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক যুক্তফ্রণ্টে মিলিত হতে বাধ্য হয়—তখনও, পৃথিবীর দেশে দেশে ও প্রত্যক্ষ রণাঙ্গনে সব থেকে বেশি মূল্য দিতে হয় এই কমিউনিস্টদেরই। স্পেনের আন্তর্জাতিক বাহিনীর সদস্য কনফোর্ড, রালফ ফকস, কডওয়েল, ফেলিসিয়া ব্রাউন ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থানের সূচনাপর্বেই আত্মাহুতি দেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাদে গোটা ইয়োরোপ মানুষের বাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে। ইতালিতে গ্রামসচি, জার্মানিতে থেলমান, চেকোস্লোভাকিয়ায় ফুচিক, ফ্রান্সে পেরি—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবসন্তানরা—শহীদের মৃত্যু বরণ করেন। আইনস্টাইন, টমাস মান প্রমুখকে দেশ থেকে দেশে পালিয়ে বেড়াতে হয়। পৃথিবীতে প্রকৃতই মধ্যাহ্নে অন্ধকার ঘনায়। মহাত্মা রোমাঁ রোলাঁর মৃত্যুকে এই ভয়াবহ পরিস্থিতিই ত্বরান্বিত করে।

তার পাশাপাশি শুরু হয় প্রতিরোধ, মানব-কল্পনা পরাস্তকারী বীরত্ব। খোদ জার্মানিতে, নাৎসি-শাসিত ফ্রান্সে, যুগোস্লাভিয়া ও পূর্ব-ইয়োরোপের দেশে দেশে, এমন কি এশিয়ায়ও, দেশপ্রেমীরা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস উপেক্ষা করে এই গ্রহকে মনুষ্যবাসের উপযোগী করে তুলতে জীবন উৎসর্গ করেন। আর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমস্ত হলাহলকে প্রায় নীলকণ্ঠেরই মতো ধারণ করে মহান সোভিয়েত

ইউনিয়ন। ইতিহাস জানে 'মহান' এই শব্দটির এমন সুপ্রয়োগ শতাব্দীতে বার বার হয় নি। অথচ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চূড়ান্ত মুহূর্তেও এই রাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে—পৃথিবীর ভবিষ্যতেরই বিরুদ্ধে—'মিত্রশক্তি'র ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলতে এত অস্বাভাবিক বিলম্ব ও টালবাহানা না করলে সোভিয়েতের ক্ষতির পরিমাণ অনেকটা কমানো যেত।

শেষ পর্যন্ত মানুষ জয়ী হয়। রাইখ্‌স্টাকে রক্তপতাকা ওড়ে। তৃতীয় রাইখ ও হিটলারের পতন হয়। ইয়োরোপে তারপরও কিছুদিন এবং এশিয়ায় কয়েক মাস যুদ্ধ চলেছিল। কিন্তু হিটলার-ফ্যাসিবাদের ওপর মানবজাতির বিজয়ের তারিখ নির্দিষ্ট হয়েছে ঐ ৯ মে ১৯৪৫। অকটোবর বিপ্লবের পর বিশ শতকের পৃথিবীর এইটি দ্বিতীয় বৃহত্তম ঘটনা।

এ-বছর ঐ দিনটি, প্রকৃতপক্ষে গোটা ১৯৭৫ সালই, পৃথিবী জুড়ে হিটলার-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানবজাতির বিজয়ের ত্রিশতম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ফ্যাসিস্টবিরোধী সংখ্যা প্রকাশ করে 'পরিচয়'ও এই বিজয়োৎসবের শরিক হল। শ্রাবণ সংখ্যা থেকে 'পরিচয়' ৪৫ বছরে পদার্পণ করবে। সে-হিসেবে এই সংখ্যায় 'পরিচয়'-এর ৪৪ বছর পূর্তি হল। আমাদের কৃতবিদ্য পূর্বসূরীরা সেদিন প্রকৃতপক্ষে 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠাতেই বাঙলায় ধারাবাহিক ফ্যাসিবিরোধী রচনাচর্চা শুরু করেন। এই সংখ্যাটি প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা প্রতি মুহূর্তে তাঁদের কথা কৃতজ্ঞতা ও গর্বের সঙ্গে স্মরণ করেছি। অনেকে তাঁদের আজও জীবিত এবং সক্রিয় এটা বস্তুত গোটা জাতিরই সৌভাগ্য।

এ বছর ৯ মে ছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস। ভারতের অগ্রগণ্য ফ্যাসিবিরোধী রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের সঙ্গে হিটলার-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানবজাতির বিজয়ের ত্রিশতম বার্ষিকী দিবসটি মিলে যাওয়া তাই সব দিক থেকেই সঙ্গত হয়েছে।

আবার, ঐ দিনই গয়া সম্মেলনে ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ প্রগ্রেসিভ রাইটার্স নতুন করে তার যাত্রা শুরু করেছে। একই সঙ্গে সেখানে রবীন্দ্রদিবস এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানুষের বিজয়দিবস উদ্‌যাপিত হল।

ভারতবর্ষে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন জন্মলগ্ন থেকেই পৃথিবীব্যাপী ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামের আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়েছে। আর, 'পরিচয়' প্রথম থেকেই ছিল এই আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সহযাত্রী। গয়া সম্মেলনকে সে-কারণেই 'পরিচয়' অভিনন্দন জানায়। এই রাজ্যে সম্প্রতি যে 'ফ্যাসিস্টবিরোধী শিল্পী-

সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি' ও অধ্যাপকদের ফ্যাসিস্টবিরোধী সমিতি গঠিত হয়েছে—এই সুযোগে তাঁদেরও আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা আশা করি মিলিত উদ্যোগে এই সংগঠনগুলি নিজ দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হবে।

৪৫ বছরকে যদি প্রৌঢ়তার সূচনা ধরা যায়, তাহলে এই সংখ্যাটি অবশ্যই 'পরিচয়'-এর পরিণত যৌবনের সাক্ষ্য। আমাদের পূর্বাচার্যরা 'পরিচয়' এর বাল্যে কৈশোরে যৌবনে যে-ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করেন, আমরা নতুন যুগ ও পরিপ্রেক্ষিত অনুসারে সাধ্যমতো তারই ধারা অনুসরণ করছি।

এই সংখ্যাটির প্রাথমিক পরিকল্পনা রচনা করার সময় গৌতম চট্টোপাধ্যায়, সুনীল মুন্সী, রণজিৎ দাশগুপ্ত ও নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে প্রভূত সাহায্য করেছেন। সে আমলের বিদেশী বইপত্র প্রায় কোনোটিই সহজলভ্য নয়। বইসংগ্রহ, অনুবাদকর্ম, গ্রন্থনা ও প্রবন্ধ রচনার দায়িত্ব নিয়ে তাঁরা আমাদের মতোই এই সংখ্যাটি যথোচিতভাবে প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রম করেছেন। ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে রণজিৎ দাশগুপ্তর দীর্ঘ ও অতিশয় মূল্যবান প্রবন্ধটি দেরিতে পাওয়ায় প্রকাশ করা গেল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিদ্যা মুন্সী ইয়োরোপে ছিলেন, তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার একটি চমৎকার বিবরণও একই কারণে এই সংখ্যায় প্রকাশিত হতে পারে নি। শিবশঙ্কর মিত্রর তৎকালে লিখিত একটি রচনাও একেবারে শেষ মুহূর্তে পাওয়ায় আমরা প্রকাশ করতে পারলাম না। পুরনো কিছু পুস্তিকা এবং পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা-সংবাদ ইত্যাদিও সংগ্রহ করেছি, স্থানাভাবে প্রকাশ করা গেল না। এগুলি সবই পরে ছাপা হবে। দেশী-বিদেশী গান আর কবিতা বাদ দিয়ে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংকলন পূর্ণাঙ্গ হয় না—এ সম্পর্কে আমরা সচেতন। বেশ কিছু গান ও কবিতা আমরা সংগ্রহও করেছি। মূল ফরাসী থেকে এলুয়ারের একটি দীর্ঘ কবিতা তরজমা করেছেন স্বয়ং অরুণ মিত্র; আমাদের অনুরোধে অমলেন্দু গুহ কনফোর্ডের দুটি কবিতা, রাম বসু হার্নান্দেজের একটি কবিতা এবং শঙ্খ ঘোষ রোবসনের একটি গান প্রায় রাতারাতি অনুবাদ করে দেন। রোগশয্যা থেকে হো চি মিনের একটি ফ্যাসিস্টবিরোধী কবিতা অনুবাদ করে পাঠান অমিতাভ দাশগুপ্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সংখ্যাটি আমরা গদ্য সংকলন রূপে প্রকাশ করাই মনস্থ করি। তা নইলে পত্রিকার আয়তন আরও অন্তত ৫ ফর্মা (৮০ পৃষ্ঠা) বাড়াতে হত। অথচ, পরিকল্পনা-কালে দেশী-বিদেশী কবিতা ও গানের জন্য আমরা বত্রিশ পৃষ্ঠা বরাদ্দ করেছিলাম।

এই সংখ্যাটি ২৫ ফর্মার হচ্ছে। 'পরিচয়'-এর এত বৃহদায়তন সংখ্যা অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নি। পৃষ্ঠা আর বাড়ানো যায় না। স্বল্পসংখ্যক কবিতা ও গান দেওয়ার বদলে, পরে যথোচিত সংখ্যায় তার প্রকাশই আমরা সঙ্গত মনে করেছি।

এই সংখ্যায় অনেক দুষ্প্রাপ্য রচনা প্রকাশিত হল। ছাপার কাজ শুরু হওয়ার পর চিন্মোহন সেহানবীশ তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ ও পুস্তিকা আমাদের ব্যবহার করতে দিয়েছেন। তার কিছুদিন পরে অমল দাশগুপ্ত মারফৎ গোপাল হালদারের নিজস্ব সংগ্রহের কয়েকটি পুস্তিকাও আমরা হাতে পাই। অরুণ সেনও কয়েকটি পুস্তিকা ধার দেন। এবং, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কাজ হয়ে যাওয়ার পর একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক 'জনযুদ্ধ'র প্রথম দু-বছরের ফাইল পাই সুধী প্রধানের কাছে। কি ভাষায় ঋণপ্রকাশ করলে কৃতজ্ঞতার ভার খানিকটা লাঘব হয়, তা আমি জানি না।

'পীপলস ওয়ার' ও 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্রের প্রতিলিপি পেয়েছি শিবশঙ্কর মিত্রর সৌজন্যে। রবীন্দ্রনাথ ও পিকাসোর চিত্র-কর্মের প্রতিলিপি দিয়েছেন নিরঞ্জন সেনগুপ্ত ও কুণাল চট্টোপাধ্যায়।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপরিষদের সম্পাদক গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অজয় দাশগুপ্ত, 'মনীষা গ্রন্থালয়'-এর খগেন রায়চৌধুরী, 'কালান্তর'-এর শচীন সেন এই সংখ্যাটি প্রকাশে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাছাড়া, প্রভাত চৌধুরী, অমর মিত্র, শচীন দাশ, দীপ্তেন্দু দে, শম্ভু অধিকারী, গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়, কেশব দাশ, মণি সান্যাল এবং সুনীলবরণ কানুনগোর সহায়তাও ভুলবার নয়। কলকাতায় জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রাক্তন কনসাল ড. জোয়াকিম হাইডরিষ 'পরিচয়'-এর এই ফ্যাসিস্টবিরোধী সংখ্যাটি প্রকাশের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহী হন এবং দুর্লভ পরামর্শ ও সহায়তা দ্বারা আমাদের মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করেন।

আমাদের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী সংখ্যাটি সম্পর্কে আমরা পাঠকদের, বিশেষত ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত লেখক ও শিল্পীদের, মতামত প্রার্থনা করি।

ভারত—বিশেষত বাঙলা—সংস্কৃতির এই যুগান্তকারী পর্বের ইতিহাস আজও ঠিকমতো লেখা হয় নি। এক জায়গায় সমস্ত উপাদানও নেই। ছড়িয়ে

ছিটিয়ে কিছু আছে, কিছু বা বিনষ্ট হয়েছে। এই সংখ্যার কাজে নেমে নিজে আমি কম উপকৃত হই নি। অনেক তথ্য জানতাম না, কিছু জানতাম ভাসা ভাসা ভাবে। আজ বলা উচিত এই সমস্ত বইপত্র ঘেঁটে মানুষ হিসেবে, ভারতীয় ও বাঙালী হিসেবে, ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার সম্পর্কে আমার গর্ব—আমাদের সকলেরই গর্ব—বেড়েছে।

প্রার্থনা—জাতীয় জীবনের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আরও নানা কর্তব্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমরা সেই ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখি ও প্রসারিত করি। এ-ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপগুলি সম্মিলিতভাবে এই মুহূর্তেই নেওয়া দরকার। এবং, সে কাজে সব আগে চাই পূর্বাচার্যদের আশীর্বাদ ও সক্রিয় সহযোগিতা।

বাঙলা সহ বিভিন্ন ভাষার এমন অনেকের রচনা আমরা প্রকাশ করেছি—পরবর্তীকালে যাঁরা পক্ষ ত্যাগ করেছেন; কেউ বা চেয়েছেন নিজেরই গৌরবময় অতীতকে অস্বীকার করতে, বিস্মৃত হতে। তাঁদের পরবর্তীকালের ভূমিকা আমরাও সমর্থন করি না। এবং বহু সময় সে-কথা ঘোষণাও করেছি। কিন্তু একদা তাঁরা সোভিয়েত তথা মানব-প্রগতি ও মুক্তির পক্ষে এবং ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে যে-অবস্থান নিয়েছিলেন, আজ তা ইতিহাসের অন্তর্গত। তাঁদের অনেকে যদি চানও, সে ইতিহাস আর পালটানো যায় না। আজকের বিরোধ সত্ত্বেও সেদিনের সেই দায়িত্ববান ভূমিকার জন্য আজও তাঁদের অভিনন্দন জানাতে আমরা কুণ্ঠিত নই। বিশ্ব ও জাতীয় পরিস্থিতি হয়তো তাঁদের অনেকের মনে আবার শুভবুদ্ধি জাগ্রত করবে।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়